শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী দেবী

(প্রারম্ভ পত্র)

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,
—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে
পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ,

প্রণীত।

১ম খণ্ড—(ক) প্রাকৃতিক।

(খ) ঐতিহাসিক।

[প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত।]

প্রকাশক—

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

১৩২১

[মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলিকাতা,

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

যিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ও পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র সভ্যজগতে

যশোভূষিত হইয়াছেন;

যিনি বিদ্যোৎসাহিতায় ও দান-শৌণ্ডিকতায় বঙ্গদেশে

দ্বিতীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন;

যাঁহার বালসুলভ সরল প্রকৃতি, বীরোচিত মনস্বিতা

দরিদ্রতুল্য সামান্য জীবিকা এবং ঋষিতুল্য উচ্চ চিন্তা

ভারতের প্রাচীন উচ্চ আদর্শের জীবন্ত

দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে,

সেই চিরকুমার, তাপসব্রত, স্বজাতিকুলতিলক

যশোহর-খুল্‌নার অকৃত্রিম বন্ধু ও খুল্‌নার অধিবাসী

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় D. Sc, Ph. D, C. I. E, F. C. S.

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে,

তাঁহারই যত্নে, অর্থে, চেষ্টায় ও উৎসাহে কল্পিত, সংগৃহীত ও রচিত

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

সাদরে ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

দীন গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

—০:*:০—

আজ বহুবৎসরের কল্পনা ও সাধনার কতক ফল প্রকাশিত হইল। ঠিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এক সময়ে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বজাতীয় পুস্তকগুলি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করি। কিন্তু তন্মধ্যে বঙ্গদর্শনের বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি যে ভাবে আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়াছিল, তেমন আর কিছুই নহে। ঐ জাতীয় একটি প্রবন্ধের এক স্থানে আছে :—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে আনন্দ! আর এই আমাদের সর্ব্ব-সাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" সেই উদ্দীপনায় যে ভাবে আমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়াছিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার যদি কিছু শক্তি থাকে, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস-সঙ্কলনের সাধনায় ব্যয়িত করিব। কিন্তু আমাকে উৎসাহ দিবার বা সাহায্য করিবার কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না।

কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলাম; ক্রমে বঙ্গদেশ ও ভারবর্ষের স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। তৃপ্তি সাধিত হইল না। অবশেষে দৌলতপুর কলেজের গুরুতর কার্য্যে যোগদান করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টায়, এবং ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন উৎসর্গ করিলাম। স্বদেশীয় মহাত্মগণের ধারাবাহিক জীবন-চরিত লিখিব সংকল্প করিয়া তাহার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলাম; কিন্তু অন্য কেহ সে প্রস্তাবে আমার সহযোগী হইলেন না। তখন আমি যশোহর-খুলনার কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নানাভাবে

সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের জীবনী লিখিব বলিয়া কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মাসিক পত্রে দুই একটি প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যভাবে তাহার সদ্ব্যবহার হইল না। এমন সময়ে আমার কতকগুলি শোকাবেগময়ী এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়িনী রচনা "উচ্ছ্বাস" নামে প্রকাশ করিলাম। যাঁহার জন্মলাভে আমার খুলনা জেলা পবিত্র হইয়াছে, যাঁহার বিজ্ঞান-সেবায় পাশ্চাত্যমণ্ডল মুগ্ধ হইয়াছে, যাঁহার আদর্শ জীবন ও জীবনব্যাপী সাধনা দেশে বিদেশে কীর্ত্তিমণ্ডিত হইয়াছে, সেই স্বনামধন্য স্বদেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র (Dr. P. C. Ray) আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের বিলীয়মান মনোরথ ও তদুদ্দিষ্ট চেষ্টার কথা জানিতেন। আমি তাঁহাকে একখানি "উচ্ছ্বাস" উপহার দিয়াছিলাম। উহারই উত্তরে এক অদ্ভুত ধরণে আমাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি আর কিছুমাত্র না লিখিয়া এই কয়েক পংক্তিমাত্র লিখিয়া পাঠান :—

And the goddess Saraswati appeared in a dream and said, "my child! Why dost thou waste thy energies on such things as আবেগ বা উচ্ছ্বাস? Enough of it. For 2000 years the Hindus have been dreaming idle dreams and indulging in উচ্ছ্বাস। I have endowed thee with noble gifts. Do not take thyself today dreams. Thee I have chosen for a better work. Devote thyself assiduously to the noble task of writing a "History of Jessore-Khulna". That will make thy name remembered by the latest posterity. Awake, arise!" বাণীপুত্রের এই আশ্বাসবাণী কি ভাবে আমার হতাশ জীবনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল তাহা বুঝাইতে পারি না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই পত্র পাই; আমার চিরসম্পোষিত আশার অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া, আমি সেই দণ্ডে বদ্ধপরিকর হইলাম। পত্রের উত্তর না দিয়া কলিকাতায় গিয়া মহাত্মার সহিত দেখা করিলাম, তিনি আমাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিদ্বারা কার্য্যে অবতীর্ণ করাইলেন। ক্রমে এ কার্য্যের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া, অর্থের ভাবনা হইতে আমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া, আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সে আগ্রহের অনুরূপ সামর্থ্য বা সুযোগ আমার নাই, আমি তাঁহার অযাচিত দানের

প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা তাঁহারই সাহিত্যানুরাগের ফল; যাহা কিছু ভ্রম-প্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য একমাত্র আমিই দায়ী এবং অপরাধী।

মহামতি বিভারিজ (H. Beveridge B. C. S.) তাঁহার "বরিশালের ইতিহাসের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন:—"My idea always has been that the proper person to write the history of a district is one who is a native of it, who has lived all his life in it and who has abundance of leisure to collect information. It is only a Bengali who can treat satisfactorily of the productions of his country, or of its social condition—its castes, leading families, peculiarities of language, customs etc." ইহাই আমার একমাত্র ভরসা এবং সাহসের কথা। আমি খুল্‌নার অধিবাসী এবং এ জীবনের অধিকাংশ কাল সেখানেই কাটাইয়াছি। গত ১৭ বৎসর কাল অল্প বিস্তর ভাবে ইহার ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। গত পাঁচ বৎসরকাল এজন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছি। ফল কি হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

আমাদের দেশে প্রায় সকলেই দূরে বসিয়া ইতিহাস লিখেন। যিনি প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণসম্বলিত প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও প্রতাপাদিত্যের লীলাক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নভেল নাটকের ত কথাই নাই; উহার সবগুলিই কলিকাতার দ্বারবদ্ধ ত্রিতল গৃহে বসিয়া লেখা হইয়াছে। চাক্ষুষ প্রমাণের মত প্রমাণ নাই; কোন দেশের ইতিহাস রচনার প্রথম স্তরে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইলে, পরে তাহার উপর ভিত্তি রাখিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনা চলিতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে দেখিতে পাই, গবেষণা মুলতবি রাখিয়া সমালোচনাটাই অগ্রে চলে। আমি এই রীতির অনুসরণ করি নাই। যশোহর-খুল্‌না সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বিবরণী আছে, তাহা চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত রাখিয়া কার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু কিছু লিখিবার পূর্ব্বে নিজে না দেখিয়া বা কতিপয় স্থল অন্য দ্বারা এই কার্য্যের জন্য না দেখাইয়া, কিছু লিখি নাই। আমার দৃষ্ট-প্রমাণগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের বিবরণীর সহিত

মিলাইয়া, তৎপরে আমার যাহা অনুমান হইয়াছে, অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছি। বলবত্তর প্রমাণ দ্বারা কেহ আমার ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিব।

নিজে দেখিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, পথের কষ্ট, প্রাণের ভয়, অর্থের অভাব, কার্য্যের অসুবিধা আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দুর্গম সুন্দরবনে ভ্রমণ করিয়াছি, যেখানে প্রতিপলকে বা প্রতিপদ-বিক্ষেপে ব্যাঘ্রের ভয়, সেখানেও আমি নির্ভয়ে সঙ্গিগণসহ ঐতিহাসিক চিহ্নের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, নানাস্থানে বনে জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়াছি, পদব্রজে দূর পথ অতিক্রম করিয়া স্ফূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছি, অনাহারে অনিদ্রায় যে কত দিন গিয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু যতই করি না কেন, আমার চেষ্টা বা যত্ন যে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনও বোধ করিতে পারি নাই।

স্থানীয় লোকের নিকট কাজের সাহায্য অতি কমই পাওয়া যায়। কারণ গ্রামবাসীরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে এতই অনভ্যস্ত, স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বে এতই অনভিজ্ঞ, যে অনেক সময়ে দূর হইতে গিয়া তাহাদের গ্রামের কথা নূতন করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে বা দেখাইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে তাহাদের অনভিজ্ঞতার ফলে প্রতিবন্ধক যে উপস্থিত না হইয়াছে, তাহা নহে। কখনও আমাকে ডিটেক্‌টিভ সন্দেহ করিয়া লোকে দূরে সরিয়া গিয়াছে ; কখন আমাকে ফিতা ধরিয়া কোন স্থান মাপ করিতে দেখিলে, সাধারণ জমির খাজনা বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কা করিয়াছে ; কখনও বা ইন্‌কমট্যাক্সের ভয়ে স্থানীয় প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়াছে। অনেক যত্নে আমার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেও লোকে বুঝিতে পারে নাই, এই জন্য কিরূপে লোকে পয়সা খরচ করিয়া ব্যাগ ঘাঁড়ে করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইজন্য কোন স্থানে যাইবার সময় একজন স্থানীয় শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষাভিমানী লোকের অনুসন্ধান করিয়াছি। যাহা হউক, সর্ব্বত্র এ অবস্থা নহে। যে থানে শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস, সেখানে ঐতিহাসিক তত্ত্বে যতই যিনি অজ্ঞ হউন না কেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্যের অভাব দেখিলেও প্রাণের অভাব দেখি নাই। লোকে প্রাণখুলিয়া যত্ন করিয়া,আতিথেয়তার

চরমসীমা দেখাইয়া, অবশেষে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে অপরিমিত ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। সেইজন্য আশা হয়, যশোহর-খুল্‌নাবাসী যে উৎসাহ আমাকে দিয়াছেন, আমার পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া যে উদ্বেগের পরিচয় দিয়াছেন, আমার এই পরিশ্রমের ফল সেইরূপ আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। এই পুস্তক প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রায় বহন করিলেও ইহার জন্য আনুষঙ্গিক ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যাপারে আমার মত দরিদ্র-শিক্ষকতা ব্যবসায়ীর স্বল্পবৃত্তির যাহা কিছু অবশেষ, সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছে।

ভগবানের কৃপায় আমাকে পুস্তক-প্রকাশের জন্য অর্থাভাব ভোগ করিতে হয় নাই; সুতরাং পয়সার খাতিরে বা পরের অনর্থক মনস্তুষ্টির প্রত্যাশায় আমাকে কিছু লিখিতে হয় নাই। আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই লিখিয়াছি। বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি কোন প্রকার স্বার্থ, স্বজাতিপ্রীতি, ভয় বা অসূয়া আমাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই এবং কোন জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের অযৌক্তিক নিন্দা দ্বারা এ পুস্তক কলঙ্কিত হয় নাই। নিশ্চয়ই আমি পদে পদে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা সমস্তই অজ্ঞানকৃত, কোন উদ্দেশ্যমূলক নহে। উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক কেহ আমার ভ্রম নিরসন করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব।

আমি এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিলে, প্রথমেই একটা কথা উঠিয়াছিল, আমি যশোহর-খুল্‌নার বিবরণী একত্র করিয়া লিখিতেছি কেন? যশোহরের ইতিহাসের ভার অন্যের উপর দিয়া আমি খুল্‌নার ইতিহাস পৃথক্ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করি না কেন? আমি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই; কারণ যশোহর ও খুল্‌না পৃথক্ করা যায় না। আজ্ ত্রিশ বৎসর কাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খুল্‌নাকে নূতন জেলা করিলেও, খুল্‌না রীতিনীতি, সমাজবন্ধন ও প্রত্নতত্ত্বে যশোহরই আছে; যশোহর বাদ দিলে খুল্‌না ভিত্তিশূন্য হয়, খুল্‌না বাদ দিলে যশোহর প্রাচীনগৌরবশূন্য হয়। ভৈরব-কপোতাক্ষ, যমুনা-ইচ্ছামতী, মধুমতী-বলেশ্বর প্রভৃতি নদ-নদীর যেমন প্রথমাংশ যশোহরে প্রবাহিত হইয়া, তাহাদের শেষাংশ খুল্‌নার মধ্যে আসিয়া প্রকাণ্ড ও বলবান্ হইয়াছে, ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতও তেমনি যশোহর হইতে খুল্‌নার মধ্যে আসিয়া কায়পরিগ্রহ করিয়া

গৌরবান্বিত হইয়াছে। খাঁজাহান যশোহর হইতে আসিয়া খুল্নায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যশোরাধিপতি প্রতাপের রাজধানী খুল্নার সম্পত্তি হইয়াছে। এই দুই জেলার যে পৃথক্ পৃথক্ সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই এককথা দুইবার লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় জেলা পৃথক্ করিলে ঐতিহাসিক-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

আমি প্রস্তাবিত যশোহর-খুল্নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি, (১) প্রাকৃতিক—ইহাতে ভৌগলিক বিবরণী থাকিবে। (২) ঐতিহাসিক—ইহাতে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত থাকিবে। (৩) বৈষয়িক—ইহাতে যাবতীয় বিবরণী ও হিসাব পত্র (statistics) থাকিবে এবং (৪) আভিধানিক (gaz etteer)—ইহাতে (ক) প্রধান প্রধান স্থানের ইতিহাস, (খ) প্রধান প্রথান বংশের বিবরণ, ও (গ) প্রধান প্রধান কৃতী পুরুষের জীবনবৃত্ত থাকিবে। অনেকেই যেরূপ খণ্ডবিবরণী বা statistics দিয়া প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন, আমি তাহা করি নাই।

অদ্য যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাকৃতিক অংশ সম্পূর্ণ এবং ঐতিহাসিক অংশের অর্দ্ধেক আছে। আমি ঐতি-হাসিক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (১) হিন্দু বৌদ্ধযুগ, (২) পাঠন রাজত্ব, (৩) মোগল আমল ও (৪) ইংরাজ শাসন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান খণ্ডে প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরাজ আমলের ইতিহাস থাকিবে এবং তৃতীয় খণ্ডে খণ্ড-বিবরণী ও আভিধানিক অংশ গ্রহণ করা যাইবে। এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তক শেষ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রস্থ হইতেছে। উহাতে প্রথমেই বারভূঞার আবির্ভাবের কথা দিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘ কাহিনী আরব্ধ হইবে। পরে যথাস্থানে সীতারামের ইতিহাস, চাঁচড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশ এবং নড়াইল, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জমিদারবংশের বিবরণ থাকিবে। বলা বাহুল্য, আমাকে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সংগ্রহজন্যই অধিকতর চেষ্টা এবং সুন্দরবনে দুঃসাহিক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান খণ্ডে আমি প্রথমেই প্রাকৃতিক বিবরণী দিয়াছি বটে, কিন্তু উহাতে নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির ভৌগোলিক বিষয়ের ধারাবাহিক নীরস তালিকা

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করি নাই। সরকারী রিপোর্ট হইতে ভাষান্তরিত করিয়া সেরূপ তালিকা দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু সেরূপ নীরস ও সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে পাঠকেরা বিরক্তির সহিত পত্রোত্তোলন করিয়া চলিয়া যান। আমি ঐ সকল বিষয়ের অনাবশ্যক সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়া, নীরস জিনিসকে সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি; তজ্জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং তাহাতে কিছুমাত্র সফলকাম হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকগণই বিচার করিতে পারেন।

এই প্রাকৃতিক অংশের মধ্যে সুন্দরবনের এক বিবরণী দিয়াছি। উহাতেও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ খুলিয়া জীবজন্তু বা বৃক্ষলতার বিবরণী দেই নাই। আমি যাহা নিজে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া বুঝিয়াছি, তাহারই কতক আভাস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বৃক্ষলতা প্রভৃতির বেলায় উহা দ্বারা মানুষের কতটুকু প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি। সুন্দর বনের প্রাচীন মনুষ্যাবাসের চিহ্নগুলি অধিকাংশই নিজে দেখিয়া লিখিয়াছি; যেখানে অন্যের সাহায্য লইয়াছি, সেখানে যাঁহার কথা নিজের কথার মত বিশ্বাস করিতে পারি, এমন লোকেরই সাহায্য লইয়াছি। ঐ অংশের বিবরণী সংগ্রহ জন্য আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত। ইনি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের অগ্রজ—তেমনি বিদ্যোৎসাহী, তেমনি অনুসন্ধিৎসু এবং তেমনি উদারহৃদয়। সুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ জন্য তাঁহার অধিকাংশ জীবন কাটিয়াছে; সুন্দরবন তাঁহার নখদর্পণস্বরূপ। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি সুন্দরবনে যাইতে পারিতাম না, বোধ হয় কেহই পারেন না। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের অর্থ ও উৎসাহ যে কার্য্যের প্রাথমিক বল, রায় সাহেব নলিনী বাবুর কার্য্যক্ষেত্রে সাহায্য, ঐকান্তিক স্নেহ ও সহানুভূতি এবং বহুবৎসরের অভিজ্ঞতা সেই কার্য্যের প্রধান সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা ভাষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না; আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিতেছি।

ঐতিহাসিক বিবরণী দিতে গিয়া আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ প্রবাদ-মালাকেই ইতিহাস বলিয়া ব্যাখ্যাত করি নাই। সর্ব্বত্রই কালপর্য্যায় ও সমগ্র বঙ্গেতিহাসের উপর সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছি। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া যশোহর খুল্‌নার ইতিহাসের কথা বলিতে গিয়া, আমাকে সর্ব্বত্রই বঙ্গেতিহাসের ঘটনা

পরম্পরারও ধারাবাহিক উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এমন কি, স্থানে স্থানে দিল্লীর কথাও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারি নাই। দেশের ইতিহাসের সহিত যশোহর-খুল্‌নার যে একটু আধ্‌টু সম্পর্ক আছে,পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত মিল রাখিবার জন্য, আমাকে সেই সম্পর্কে স্থানে স্থানে দেশের কথাও বলিতে হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাতে বিরক্ত হইবেন কিনা জানি না, তবে আমার বিশ্বাস এই যে,বঙ্গের অঙ্গ হইতে ছিন্ন করিলে যশোহর-খুল্‌নার মত স্থানের বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মূল্য অতি কম, আর ঐতিহাসিকতা দুর্ব্বোধ্য হইলে, প্রবাদকাহিনী বৃদ্ধসৈনিকের গল্পকথায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা জেলার ইতিহাস লিখিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই ; নইলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" এ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। সুতরাং বাঙ্গালাকে বাদ দিয়া কোন জেলারই অধিবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা যায় না।

আমি অনেক জিনিস যশোহর-খুল্‌নায় টানিয়া লইয়াছি। টানিয়া লইবার কি কারণ বা অধিকার আছে, আমার অনুমানের কি ভিত্তি আছে, তাহা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সংযোজিত করিয়াছি। কোন কোন স্থানে একটা লোভনীয় প্রত্ন-কীর্ত্তিদ্বারা যশোহরকে যশোভূষিত করিবার জন্য হয়ত সাধারণ দৃষ্টিতে যশোহরের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান যশোহর জেলা ও প্রাচীন যশোর রাজ্য উভয়ের সীমার একটা বিশেষ আভাস দিয়া থাকিলে আমি হয়ত ক্ষমার্হ হইব। সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে কিছু টানিয়া লওয়ার একটা রীতি আছে ; আমি হয়ত সেই ভাবে টানিয়া লইয়াছি। বিভিন্ন জেলার ঐতিহাসিকগণ এই ভাবে টানিয়া লইবার জন্য জাল পাতিলে মোটের উপর যে নূতন তথ্য উঠিবে, উহা বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক বিনা গণ্ডগোলে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবেন। আমি যাহা টানিয়া লইয়াছি, সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট স্বত্বের মোকদ্দমা করিয়া, অন্য কেহ তাহা স্বচ্ছন্দে নিজের করিয়া লইতে পারেন। আমি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইব না। যদি কোন সম্পত্তিকে লাভের সম্পত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকি, তবে তাহা যে কেহ ভোগ করেন, তাহাতেই বাঙ্গালার লাভ।

নূতন ঘর বাঁধিবার মত নূতন ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য

বহুলোকের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের জন্য আমি যে কতজনের নিকট সাহায্য পাইয়াছি এবং কতজনের নিকট আমি যে অল্পবিস্তর ঋণী তাহা বলিবার নহে। সকলের ঋণ উপযুক্ত ভাবে এখানে স্বীকার করিবার স্থান নাই। আশা করি তজ্জন্য কেহ ক্ষুব্ধ না হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তন্মধ্যে কয়েকজন মহাত্মার নিকট আমি অপরিমিত ভাবে ঋণী। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের একমাত্র আশ্রয়স্থলস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমি সময়ে সময়ে উপদেশ পাইয়াছি; রামচন্দ্র খানের পুত্র ভুবনানন্দের সংবাদ আমি তাঁহারই নিকট জানিতে পারি। সাহিত্যরথী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উপদেশ ও পুস্তকাদির সাহায্য দ্বারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এবং আর্য্যাবর্ত্ত-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ—এই দুই জনের নিকট হইতে আমি যে কত ভাবে উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। ইঁহারা উভয়েই যশোহরের অধিবাসী এবং যশোহরবাসীর গৌরবস্থল। আমি ইঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে চাহি না। মহারাজ বসন্তরায়ের বংশধর সুলেখক রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়, বনগ্রাম স্কুলের হেড্ মাষ্টার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ এবং ৺যশোরেশ্বরীর সেবক কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা তিন জনে আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহ করিয়া অকৃত্রিমভাবে তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল, মধিয়ার বিখ্যাত রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, জয়দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত ওভারসিয়ার, তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু, মৌভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু, সেখহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুবর্গের নিকট হইতে আমি যে সকল সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য

চিরবাধিত রহিব। খুল্‌নার পূর্ব্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত ব্রাডলী-বার্ট মহোদয় আমাকে কোন কোন ভাবে উৎসাহ দিয়া সুন্দরবনের বিবরণী সংগ্রহের সহায়ক হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আমাকে খালিফাতাবাদের মুদ্রা ও একটি বুদ্ধ মূর্ত্তির ফটো লইতে অনুমতি দিয়া বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শিবানন্দকাটি নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকৃত ৺যশোরেশ্বরীর বর্ণচিত্রের ছবি লইতে দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ভি, সেন মহোদয় আমার সমস্ত ছবি ও কয়েকখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। মদীয় প্রিয়তম ছাত্র পল্লীচিত্র-সম্পাদক শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র মিত্র নানাস্থানে আমার সঙ্গে গিয়া পুরাকীর্ত্তির ফটো তুলিয়া দিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। রাড়ুলী শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সর্পের ইতিহাসসম্পর্কীয় প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহে সাহায্য করিয়া, নানাস্থানে আমার সহচররূপে পুরাকীর্ত্তির সংবাদ দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দে সুন্দরবন ভ্রমণ কালে আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন। আমি পুস্তকের ভিতর তাঁহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র বসু ও শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ, আমার সঙ্গে বা পৃথক্‌ভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। আমার চির-বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বহুস্থানে দূর-দুর্গম পথে আমার সহচর হইয়া, বহু কায়ক্লেশের অংশীদার হইয়া, নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সূচীপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া যে ভাবে আমায় সাহায্য করিয়াছেন ভাষায় তাহার পর্য্যাপ্ত আভাস দিতে পারি না। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। ইহা ব্যতীত আমার কত প্রিয়তম ছাত্রের নিকট যে আমি ঋণী আছি, তাহা বলিতে পারি না। স্থানাভাবে তাহাদের নামের তালিকা দিতে না পারিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই দশমাসব্যাপী মুদ্রাযন্ত্রের নানা যন্ত্রণার পর পুস্তকখানি বাহির হইল। মফস্বলে বসিয়া প্রুফ দেখিয়া কলিকাতার প্রেস হইতে পুস্তক বাহির করা কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিবেন না।

আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও অসংখ্য ভ্রম প্রমাদ হইতে পুস্তকখানিকে রক্ষা করিতে পারি নাই। পাঠকগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি ভগবানের কৃপায় এ পুস্তকের কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন ইহাকে নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিব।

দৌলতপুর কলেজ,
দৌলতপুর, খুল্‌না।
২৪ শে ভাদ্র ১৩২১

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

প্রথম অংশ—প্রাকৃতিক।

দ্বিতীয় অংশ—ঐতিহাসিক।

(১) হিন্দু বৌদ্ধ যুগ।

পাঠান রাজত্ব।

চিত্রসূচী।

মানচিত্রের সূচী।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

প্রথম অংশ—প্রাকৃতিক

—০ঃ০—

প্রথম পরিচ্ছেদ—উপক্রমণিকা।

যুক্ত-জেলা—বঙ্গদেশে প্রেসিডেন্সী বিভাগের পূর্ব্বাংশই যশোহর-খুল্‌না জেলা। যশোহর অতি প্রাচীন রাজ্য। অতি অল্পদিন হইল (১৮৮২) খুল্‌না ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথক্ হইলেও ইহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পৃথক্ করা যায় না; পৃথক্ হইলেও ইহাদের সামাজিক ও অন্য প্রকৃতি প্রায় একই আছে। সুতরাং এই দুইটি জেলা যুক্তরূপেই বিচার করা উচিত। এই যুক্তজেলা বঙ্গদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। যশোহরের দক্ষিণে খুল্‌না; উভয় জেলা একত্র উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সীমা—এই যুক্ত-জেলার পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা, উত্তরে নদীয়া জেলা, পশ্চিমে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা, এবং দক্ষিণে ২৪ পরগণা ও বঙ্গোপসাগর। পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ হইতে আরম্ভ করিলে, যথাক্রমে মধুমতী, গৌরী (গোরাই), কুমার, ইচ্ছামতী, যমুনা ও কালিন্দী নদী এবং বঙ্গোপসাগর—এই প্রাকৃতিক পরিখা দ্বারা ইহা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত; কেবলমাত্র পশ্চিমোত্তর কোণে তিন চারি স্থলে ইহার কোনও প্রাকৃতিক সীমা নাই। সেখানে নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণাই ইহার সীমা। মধুমতীর তীরস্থ মাণিকদহ হইতে সিদ্ধিপাশা, রাজঘাট, গৌরীঘোনা, সাগরদাঁড়ি ও ত্রিমোহিনী দিয়া চাঁদুড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত আঁকাবাঁকা রেখা উভয় জেলাকে পৃথক্ করিতেছে।

অবস্থান—এই যুক্তজেলা উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২১°৩৮′ কলা হইতে ডিগ্রী ২৩°৪৭′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ডিগ্রী ৮৮°৪০′ কলা হইতে ডিগ্রী ৮৯° ৫৮′ কলার মধ্যে অবস্থিত। উভয় জেলার প্রধান নগরী যশোহর ও খুল্‌না একই

ভৈরব নদের দক্ষিণ পারে প্রতিষ্ঠিত। যশোহর নগরী উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২৩° ১০´ কলা এবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা ডিগ্রী ৮৯°১৩´ কলার সন্ধিস্থলে এবং খুল্‌না সহর উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২২°৪৯´ কলা এবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা ডিগ্রী ৮৯°৩৪´ কলার সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে।

পরিমাণ—উভয় জেলার পরিমাণ ফল ৭,৬৯০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে সুন্দরবন ২,৬৮৮ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সুন্দরবন সমস্তই খুল্‌নার অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন বাদ দিলে খুল্‌নার পরিমাণ ২,০৭৭ বর্গমাইল অর্থাৎ খুল্‌নার নয় আনা অংশ সুন্দরবন এবং সাত আনা অংশমাত্র বসতি। যশোহরের পরিমাণ ফল ২,৯২৫ বর্গমাইল অর্থাৎ খুল্‌নার বসতি অংশের প্রায় দেড় গুণ। খুল্‌না উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এবং যশোহর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। যশোহর ত্রিভুজাকৃতি এবং খুল্‌না মোটামুটি একটি আয়ত ক্ষেত্র।

লোকসংখ্যা—গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারি বা লোকগণনা অনুসারে উভয় জেলার মোট লোকসংখ্যা ৩১,২৫,০৩০ জন; তন্মধ্যে যশোহরে ১৭,৫৮,২৬৪ এবং খুল্‌নায় ১৩,৬৬,৭৬৬ জন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের পর খুল্‌না প্রথম পৃথক্ জেলা হওয়ার সময় হইতে গত ত্রিশ বৎসরে খুল্‌নার জন সংখ্যা ২,৮৬,৮১৮ বাড়িয়াছে এবং ঐ সময় মধ্যে যশোহরে ১,৮১,১১১ জন লোক কমিয়াছে। ভৈরব প্রভৃতি * নদনদী মরিয়া যাওয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। যশোহরে প্রতি বর্গমাইলে ৬০১ জন লোক বাস করে এবং খুল্‌নায় সুন্দরবন বাদ দিয়া বসতি অংশে ৬৫৮ জন লোক বাস করে। সুন্দরবন সহিত খুল্‌নার হিসাব করিলে, উহার প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২৮৭ জন লোক।

আয়—উভয় জেলায় গবর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে যশোহরে প্রায় ১৮ লক্ষ এবং খুল্‌নায় ১৫ লক্ষের কিছু উপর। সুন্দরবন ক্রমশঃ আবাদ হওয়ার জন্য খুল্‌নার আয় বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন প্রথম জেলা হইয়াছিল, তখন খুল্‌নার আয় মাত্র ৬ লক্ষ টাকা ছিল।

সব্‌ডিভিসন্ বা উপবিভাগ—যশোহরে ৫টি উপবিভাগঃ—(১) যশোহর সদর, (২) মাগুরা, (৩) ঝিনাইদহ, (৪) নড়াইল ও (৫) বনগ্রাম।

---

* "Jessore like Nadia is a land of moribund rivers and obstructed drainage and declining population." Census Report, 1911.

ইহার মধ্যে সদর সব্‌ডিভিসনে যশোহর, মণিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকারগাছা ও বাঘেরপাড়া এই ৫টি থানায় মোট ১১০১ খানি গ্রাম; মাগুরা সব্‌ডিভিসনে মাগুরা, সালিখা ও মহম্মদপুর থানায় মোট ৫৮৭ খানি গ্রাম; ঝিনাইদহে শৈল-কূপা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও কোট চাঁদপুর থানায় ৮৩৪ খানিগ্রাম; নড়াইলের মধ্যে কালিয়া, নড়াইল ও লোহাগড়া থানায় ৫৪১ খানি গ্রাম এবং বনগ্রাম উপবি-ভাগে বনগ্রাম, মহেশপুর, সারসা ও গাইঘাটা এই চারিটি থানায় ৬৯৫ খানি গ্রাম। যশোহর জেলার মোট গ্রামসংখ্যা ৩৭৫৮।

খুল্‌না জেলায় তিনটিমাত্র সব্‌ডিভিসন্ (১) খুল্‌না সদর, (২) বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। ইহাদের মধ্যে খুল্‌না সদরে খুল্‌না, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও পাইক-গাছা থানায় মোট ৯২৯ খানি গ্রাম; বাগেরহাট উপবিভাগে বাগেরহাট, মোল্লা-হাট, রামপাল ও মোরেলগঞ্জ থানায় ১০৪৫ খানি গ্রাম এবং সাতক্ষীরার মধ্যে সাতক্ষীরা, আশাশুনি,কলারোয়া, কালীগঞ্জ ও মাগুরা* নামক পাচটি থানায় মোট ১৪৬৭ খানি গ্রাম। খুল্‌নার গ্রাম সমষ্টি ৩৪৪১; উভয় জেলায় ৮টি উপবিভাগে ৩২টি থানায় মোট—৭১৯৯ খানি গ্রাম। গড়ে ২২৫ খানি গ্রাম লইয়া এক একটি থানা, প্রতি গ্রামে ৪৩৩ জন এবং প্রতি থানায় প্রায় লক্ষ লোকের বাস।

এই উপবিভাগগুলির মধ্যে যশোহর, খুল্‌না ও বাগেরহাট সহর ভৈরব নদের উপর; মাগুরা ও ঝিনাইদহ নবগঙ্গার উপর; নড়াইল চিত্রানদীর উপর ও বনগ্রাম ইচ্ছামতীর উপর অবস্থিত। সাতক্ষীরা কোন নদীর উপর সংস্থিত নহে। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের সেণ্ট্রাল বা মধ্যবিভাগে বনগ্রাম, যশোহর ও খুল্‌না তিনটি প্রধান ষ্টেশন; খুল্‌না হইতে ষ্টীমারে নড়াইল, মাগুরা ও সাতক্ষীরায় যাওয়া যায়; নূতন যশোহর-ঝিনেদহ লাইট রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেশন ঝিনাইদহ। খুল্‌নার অন্তর্গত আলাইপুরে আঠারবাঁকী ও ভৈরবের সঙ্গম স্থল হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত ১৫।১৬ মাইল পথে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে; জোয়ারের সময় অতি কষ্টে এ পথে নৌকা যায় কিন্তু ভাঁটার সময় হাঁটিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। খুল্‌না হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাবনা চলিতেছে।

---

* যশোহর ও খুল্‌না উভয় জেলায় পৃথক্ কালীগঞ্জ ও মাগুরা আছে। খুল্‌নার কালী-গঞ্জ দক্ষিণদেশে, উহার সন্নিকটে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। যশোহরের কালীগঞ্জ উত্তর ভাগে, ইহার সন্নিকটে নলডাঙ্গা রাজবাটী।

নামের উৎপত্তি।—যশোহর নামের উৎপত্তি লইয়া অনেক কথা আছে; এখন যে সহরকে যশোহর বলে, তাহা হইতে প্রাচীন যশোহর নগরী বহুদূরে অবস্থিত। প্রাচীন সেই প্রকৃত যশোহর এখন খুল্‌নার মধ্যে। সে যশোর এক প্রাচীন স্থান এবং সেস্থান যে রাজ্যের মধ্যে সংস্থিত, তাহারও নাম যশোর। ইহার নাম যশোর হইল কেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আরবী জসর বা যশোর শব্দে সেতু বুঝায়। যশোর জলবহুল দেশ বলিয়া এই অর্থে তাহার নামোৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ কানিংহাম সাহেবের ধারণা। * কিন্তু মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব হইতে যশোর নামের উল্লেখ দেখা যায়। যশোর একটি পীঠস্থান; পীঠস্থানের তালিকায় যশোরের নাম আছে। † অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যেখানে যশোর রাজ্যের প্রসঙ্গ আছে, সেখানে 'যশোর' নামই দৃষ্ট হয়; "যশোহর" নাম নাই।‡ প্রতাপাদিত্য এই যশোর রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কালীগঞ্জ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁহার রাজধানী ছিল। সে রাজধানীর নামও যশোর।§ এই রাজধানীর অন্তর্গত ঈশ্বরীপুর নামক স্থানে এখন যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠমন্দির ও মূর্ত্তি আছে।¶ প্রতাপাদিত্যের পিতা

---

* "The name of *Jasar*, the bridge, shows the nature of the Country which is completely intersected by deep water course." Cunningham's Ancient Geography p. 502.

† "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"
— তন্ত্রচূড়ামণি

‡ "উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষুচ॥"
—কবিরামকৃত "দিগ্বিজয়প্রকাশ" পুঁথি।

"যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে
ধূমঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"
—ভবিষ্যপুরাণ

§ "যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।" —ভারতচন্দ্র কৃত অন্নদামঙ্গল।

¶ যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ লইয়া যান বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা মিথ্যা কথা। যথাস্থানে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে প্রথম 'যশোহর' নাম হয়। যশোরে বনস্থলী আবাদ করিয়া তথায় নগরী স্থাপনাকালে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত সুকবি বসন্তরায় যশোরকে যশোহর করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য এবং এইরূপ প্রবাদও প্রচলিত রহিয়াছে।

বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদসাহ মোগল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার সময় রাজধানী গৌড় ও তাণ্ডার অধিকাংশ রাজকীয় ধনরত্ন বিক্রমাদিত্যের হস্তে সমর্পণ করেন। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে নবপ্রতিষ্ঠিত যশোরনগরী এইরূপে গৌড়ের যশঃ হরণ করে বলিয়াই উহার নাম হইয়াছিল—যশোহর। * আবার কেহ বলেন যে গৌড়ের সহিত তুলনা না করিয়াই কোন ব্যক্তি এ রাজ্য "অত্যধিক যশস্বী"—এই অর্থে "যশোহর" নাম দিয়াছিলেন। † কিন্তু যশোহর নাম নূতন দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্বে ইহার একটা নাম ছিল এবং সে নাম যশোর। রামরাম বসুর মতে "দক্ষিণ দেশে যশহর নামে এক স্থান" ছিল। যাহা হউক, এই নাম যশোর বা 'যশোহর' যাহাই থাকুক, উহাতে বিশেষ অর্থ হইত না। এজন্য বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উহাকে বিশুদ্ধ ও অর্থসঙ্গত করিবার জন্যই উহার 'যশোহর' এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। তখন হইতে পণ্ডিত ও কুলাচার্য্যগণের উক্তিতে যশোহর নাম দেখা যায়। ‡ তবুও তদবধি যশোর ও যশোহর শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রতাপের পতনেরপর বিজয়ী মানসিংহ বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় বা রাঘবকে 'যশোরজিৎ' উপাধি দেন। অল্পদিনে তাঁহার বংশীয়গণের রাজত্ব ফুরাইলে, যশোর রাজ্যশাসনের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন। উঁহাকে যশোরের ফৌজদার বলিত। তিনি স্বাস্থ্যহানির ভয়ে সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করিয়া, কপোতাক্ষ-কূলে ত্রিমোহিনীতে বাস করেন। এই সময়ে চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় যখন ক্রমে

---

* হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার-কৃত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত।"

† "It was intended to express the idea "Supremely glorious" West-land's Report of Jessore, p. 23.

‡ পণ্ডিত-রচিত কবিতায়:—
"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।"
ঘটক কারিকায়—"সেনাপতিরূপা সা যশোহরসুরক্ষকা।"
অন্যত্র—"রাজবিপ্লবেন গৌড়াৎ যশোহরং সমাগতঃ।"

নানাসূত্রে যশোর রাজ্যের অধিকাংশ পরগণার জমিদার হইলেন, তখন নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে যশোরের ফৌজদারের পদ উঠিয়া গেল। তবুও চাঁচড়ার রাজবাটীর সন্নিকটে বলিয়া মুড়লীতে যশোরের একটি ফৌজদারী কাছারী রহিল। কিন্তু মনোহর রায়ই তখন যশোরের প্রকৃত রাজা ছিলেন।

ইংরাজেরা রাজ্যাধিকার করিয়া যখন দেওয়ানী বিভাগ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনিলেন, তখন যশোহর রাজ্যেরও একজন রাজস্বসংগ্রাহক বা কালেক্টরকে এই মুড়লীতে পাঠাইয়া দিলেন (১৭৭২)। কিন্তু দুই বৎসর পরে এ ব্যবস্থা উঠিয়া গেলেও, ১৭৮১ অব্দে শান্তিরক্ষার জন্য পূর্ব্বকালীয় ফৌজদারের মত একজন শাসক বা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তখন যে আফিস-আদালত হইল, তাহাকে লোকে মুড়লীর কাছারীও বলিত, যশোরের কাছারীও বলিত। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে এই সকল কাছারী পার্শ্ববর্ত্তী কস্‌বা বা সাহেবগঞ্জে স্থানান্তরিত হইল, তখন হইতে ঐ স্থানের নাম হইল—যশোর Jes ore ।

বর্ত্তমান যশোহর সহরের নামের ইহাই উৎপত্তি। এক্ষণে লোকে সাধারণ কথায় ইহাকে যশোর বলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ করিয়া যশোহর লেখা হয়। 'যশোর' প্রাচীন কথা; 'যশোহর' বিশুদ্ধ বা অর্থসঙ্গত হইলেও আধুনিক কথা। আমরা এ পুস্তকে অনেকস্থানে বিশেষ কোন পার্থক্য না ধরিয়া উভয় নামই ব্যবহার করিব। প্রাচীন রাজ্যের প্রসঙ্গ হইলে তাহাকে সাধারণতঃ যশোরই বলিব, যশোহর বলিব না; আধুনিক জেলাকে যশোর বা যশোহর বলিব এবং আধুনিক সহরকে সাধারণতঃ যশোহরই বলিব, যশোর বলিব না।

খুল্‌না।—যশোহরের মত খুল্‌না নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ কতই আছে বটে, কিন্তু কোন প্রবাদেরই বিশেষ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবুও প্রবাদগুলির দুই একটি আলোচনা করা উচিত। পূর্ব্বকালে এখানে সুন্দরবনের ভীষণ জঙ্গল ছিল। ইংরাজ আমলেও খুল্‌নাকে নয়াবাদ বা নূতন আবাদ বলিত; অথচ উত্তর পারে "সেনের বাজার" প্রাচীন স্থান। সেই পূর্ব্বকালেও লোকে কাঠ কাটিতে সুন্দরবনে যাইত; তখন এদেশের ব্যবহারোপযোগী যাহা কিছু কাঠ সুন্দরবন হইতেই আসিত। পশ্চিমদেশে বা বিদেশে বাণিজ্যার্থ যাইতে হইলে, সুন্দরবনের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। নয়াবাদেই বসতির শেষ এবং বনের

আরম্ভ। দিবাশেষে নৌকার বহর নয়াবাদের নিম্নে আসিয়া রাত্রিবাস করিত, রাত্রিতে কেহ নৌকা খুলিতে সাহসী হইত না। লোকে বলে যে, রাত্রিতে কোন দুঃসাহসিক মাঝি নৌকা খুলিতে গেলে জঙ্গলের মধ্য হইতে বন-দেবতা তাহাকে বারণ করিয়া বলিতেন "খু'লো না, খু'লো না।" যেস্থান হইত এই "খু'লো না" শব্দ হইত বা কোন একবার হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়া গেল—খুল্না। হয়ত খুল্না শব্দের অক্ষর-বিন্যাস হইতে কল্পনা-কৌশলেই এইরূপ ব্যুৎপত্তি বাহির হইয়াছে।

"কবিকঙ্কণ" কৃত চণ্ডীকাব্য হইতে জানি যে পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় অজয় নদের তটে—উজানি (উজ্জয়িনী) নামে নগর ছিল। এইস্থানে এক সাধু বা সওদাগর বাস করিতেন; তাহার নাম ধনপতি। তিনি শুধু নামে ধনপতি নহেন; বঙ্গ ভরিয়া বাণিজ্য করিয়া, তিনি প্রকৃত কাজেও ধনপতি হইয়াছিলেন। ধনপতির দুই স্ত্রী—লহনা ও খুল্লনা। যেমন সর্ব্বত্র হয়, দুই স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ও প্রকৃতির পার্থক্য যথেষ্ট ছিল; জ্যেষ্ঠা লহনা ক্রূরা ও হিংসাপরায়ণা, কনিষ্ঠা খুল্লনা সাধ্বী ভক্তিমতী আদর্শ স্ত্রী। একদা ধনপতির অনুপস্থিতি কালে লহনা তাহার সতা খুল্লনাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছিল। উহাতে খুল্লনার চরিত্র পরীক্ষিত হইল এবং স্বামী ফিরিয়া আসিলে, অচিরে তাহার সুখের দিনও ফিরিল। খুল্লনা তখন স্বামি-হৃদয়ের ষোল আনা অধিকার করিয়া আদরিণী হইয়া বসিল। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে এই খুল্লনা নাম হইতেই 'খুল্না' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে বণিক্গণের বাণিজ্যতরী সর্ব্বদেশে ফিরিত। তাহারা স্বদেশী পণ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "ডিঙ্গা" সাজাইয়া দেশে বিদেশে সমুদ্রপারে বহুস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত এবং বিদেশের অর্থে দেশের ধনবৃদ্ধি করিত। এক সময়ে এই বণিক্দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, চাঁদ বা চন্দ্রধর সওদাগর। ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধকালে তাঁহারই চরণে প্রথম অর্ঘ্য দিয়াছিলেন।* চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী না যাইত, এমন স্থান নাই। বঙ্গের দক্ষিণকূলে প্রধান প্রধান সমস্ত বন্দর বা বাজারের সহিত তাঁহার কারবার চলিত। সেই সকল স্থানে নানাভাবে তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন থাকিয়া যায়। উহারই পরিচয়ে আজ্ বহুজেলার লোকে বাড়ীর কাছে চাঁদ সওদাগরের বসতিস্থান ছিল বলিয়া দাবি

---

* "সবার অধিক বটে চাঁদ মহাতেজা;" তাই ধনপতি "আগে জল দিল চাঁদবেণের চরণে" কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ, ১৮০ পৃষ্ঠা।

করিতেছেন।* ধনপতিও এই একই প্রকার সওদাগর, 'চাঁদবেণের' মত তাঁহারও বিস্তৃত কারবার ছিল। দক্ষিণদেশে যেখানে বসতির শেষ ও বনের আরম্ভ, সেইরূপ অনেক স্থানে ইঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। খুল্‌না জেলায় কপিলমুনি এক অতি পুরাতন স্থান। সেখানে প্রাচীন কাল হইতে মুনির আশ্রম ও কপিলেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। ধনপতি সেখানে বাণিজ্যার্থ আসিয়া উহার দক্ষিণে লহনা-খুল্লনার নাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এখনও কপিলমুনি হইতে দক্ষিণ মুখে কাটিপাড়া যাইবার পথে বর্ত্তমাম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায় এক স্থানে 'লহনা খুল্লনার' পুল ও বিল আছে।

সম্ভবতঃ ধনপতি সওদাগর কপিলেশ্বরী নামের অনুকরণে নয়াবাদের প্রান্তে ভৈরবকূলে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে খুল্লনেশ্বরী নামে চণ্ডীদেবীর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। খুল্লনা দ্বারাই প্রথম বণিক্ সমাজে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। এই খুল্লনেশ্বরী হইতেই খুল্‌না নামের উৎপত্তি হইয়াছে বোধ হয়।

কোম্পানীর আমলে রেণী নামক † এক সৈনিক ঘটনাচক্রে বর্ত্তমান খুল্‌নার পূর্ব্ব পারে তালিমপুর গ্রামে আসিয়া খুল্লনেশ্বরীর মন্দিরের সন্নিকটে নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন ‡ এবং নীল, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য খুলেন। যথাস্থানে ইহার পৃথক্ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী প্রবল জমিদার শিবনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার ভীষণ বিবাদ হয়, শান্তিরক্ষার জন্য কোম্পানি কর্ত্তৃক তখন রেণী ও শিবনাথের বাড়ীর মধ্যস্থানে "নয়াবাদের থানা" স্থাপিত হয়।§

অচিরে যখন ঐ বিবাদ রীতিমত যুদ্ধ বিদ্রোহে পরিণত হয়, তখন খুল্‌না নামে এইস্থানে একটি সব্‌ডিভিসন্ স্থাপিত হয় (১৮৪২ খৃঃ) বঙ্গদেশের মধ্যে খুল্‌নাই প্রথম সব্‌ডিভিসন্; তদবধি এই নাম চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে রূপসা একটি ক্ষুদ্র খাল ছিল; উহা এক্ষণে প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ করিয়া নয়াবাদ ও প্রাচীন খুল্লনাকে বর্ত্তমান খুল্‌না সহর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছে।

* শ্রীযুক্ত রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ১৭৪ পৃষ্ঠা।

† William Henry Sneyd Rainey of the 3rd Buffs.

‡ বর্ত্তমান খুল্‌না সহরের পূর্ব্বপারে তা লমপুরে রেণীসাহেবের নূতন বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে নদীকূলে আমরা বিখ্যাত খুল্লনেশ্বরীর মন্দির দেখিয়াছি। উহা আজ ৩০ বৎসর হইল নদীগর্ত্তস্থ হইয়াছে। এক্ষণে খুল্লনেশ্বরী কালিকা আরও কিছু পূর্ব্বদিকে গ্রামের কোণে পূর্ব্ববৎ পূজিত হইতেছেন।

§ এখনও তালিমপুরে রেণী সাহেবের পুরাতন বাড়ী ও শ্রীরামপুর গ্রামের মাঝখানে একটি উচ্চভিট্টি ও 'থানার পুকুর' আছে। ঐস্থানে নয়াবাদের থানা ছিল।

লহনা-খুল্লনার পুল।

৮ পৃঃ।
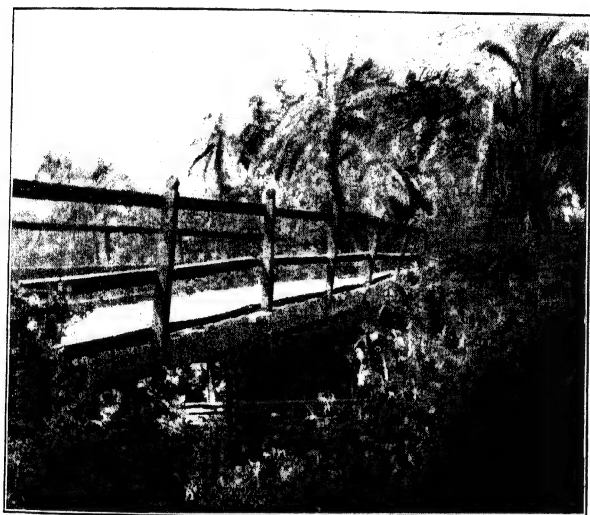
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বাহ্যিক প্রকৃতি ও বিভাগ।

সাগরাভিমুখিনী গঙ্গা যেস্থান হইতে বামে পদ্মা ও দক্ষিণে ভাগীরথী নামক দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থান হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত এই উভয় শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ একটি ত্রিভুজাকৃতি ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে গঙ্গার একটা বিশেষত্ব আছে; হিমালয়ের মত বহুবিস্তৃত, উচ্চতম, চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালার সহিত গঙ্গারমত এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অন্য কোন নদীর নাই। হিমালয়ের গাত্রধৌত জলরাশি শত শত নির্ঝরিণীপথে গঙ্গার দেহপুষ্টি করে এবং অপরিমিত পর্ব্বতরেণু লইয়া তাহাকে উপহার দেয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন অধিক পর্ব্বতরেণুও অন্য কোন নদী বহন করে না; এবং এমন ভূমিগঠনের ক্ষমতাও অন্য নদীর নাই। এই রেণু-সমষ্টি জলসংযোগে পলিমাটী হয়; গঙ্গা ও তাহার শাখাসমূহ সেই পলিমাটী বহন করিয়া স্রোতের পথে দুই পার্শ্বে রাখিয়া রাখিয়া ভূমি বৃদ্ধি করিতে করিতে চলিয়া যায়। সেই পলি দিয়াই গঙ্গা স্বীয় বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ ভূভাগ গঠন করিয়াছে। উহাকে আমরা ইংরাজীর অনুকরণে ব'দ্বীপ বলি; এই ব'দ্বীপকে গঙ্গোপদ্বীপ বলাই সঙ্গত। পদ্মার বাম ভাগে ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানাস্থিত প্রদেশ এবং ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগ এই একই প্রকার পলি দ্বারা গঠিত। এই সমগ্র ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা ও প্রকৃতি একই প্রকার ধরা যাইতে পারে।

উক্ত ব'দ্বীপ যে কেবলমাত্র পদ্মা ও ভাগীরথী বেষ্টিত, তাহা নহে। উহার মধ্যভাগেও অনেকগুলি নদী উক্ত উভয় শাখা হইতে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে এবং তাহারা এই গঙ্গোপদ্বীপকে পূর্ব্বপশ্চিমে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে গৌরী-মধুমতী, মধ্যস্থানে মাথাভাঙ্গা-কপোতাক্ষ, পশ্চিম দিকে যমুনা-ইচ্ছামতী উক্ত পদ্মা বা ভাগীরথী হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে।* এক্ষণে মধুমতীর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত এবং গৌরী-মধুমতী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী অংশকে প্রেসিডেন্সী বিভাগ বলে। এই প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে আবার যে অংশ প্রধানতঃ

---

* গৌরীকে সাধারণতঃ গোরাই, গড়াই বা গড়ই বলে।

যমুনা-ইচ্ছামতী ও মধুমতীর মধ্যবর্ত্তী তাহাই আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্‌না।

এই যুক্ত জেলাকে নদীর প্রবাহ দ্বারা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ভাবে তিনটি বিভাগ করা যায়। পূর্ব্বসীমা মধুমতী, তাহা হইতে কুমার-নবগঙ্গা-চিত্রা প্রভৃতি নদীশ্রেণী পর্য্যন্ত একভাগ, উক্ত নদীশ্রেণী হইতে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং কপোতাক্ষ হইতে যমুনা-ইচ্ছামতী পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। প্রধানতঃ এই চারিটি নদীমালা দ্বারা উভয় জেলার জল-নিঃসরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই তিন-টির প্রত্যেকভাগে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমশঃ লোক সংখ্যা কমিয়াছে।

আবার পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘভাবেও এই ভূভাগকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। যশোহরের উত্তর সীমা হইতে প্রধানতঃ ভৈরব নদ পর্য্যন্ত উত্তর ভাগ; চব্বিশ পরগণা জেলার বসুরহাট হইতে খুল্‌নার বাগেরহাট পর্য্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা টানিলে, ভৈরব নদ হইতে সেই রেখা পর্য্যন্ত মধ্যভাগ এবং সেই রেখা হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাগ। ইহার মধ্যে উত্তর ভাগ প্রায় সবই যশোহর জেলার মধ্যে পড়িয়াছে; মধ্যভাগ যশোহর ও খুল্‌না উভয় জেলার মধ্যে প্রায় তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়াছে; এবং দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ সুন্দরবনাংশ সমস্তই খুল্‌না জেলার অন্তর্ভুক্ত।

এই তিন ভাগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তরভাগে জমি অত্যন্তউচ্চ, লোকসংখ্যা অধিক, উদ্যান যথেষ্ট, আম কাঁঠাল খেজুর তাল প্রভৃতি ফলবৃক্ষ খুব বেশী এবং তাহাতে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ফল দেয়; কিন্তু এ অংশে শস্যক্ষেত্র, বা মৎস্যপূর্ণ বিল ঝিল অধিক নাই; শস্যক্ষেত্র যাহা আছে, তাহাতে ধান্য অপেক্ষা নানাবিধ কলাই ও সরিষা, ধনিয়া প্রভৃতি রবিশস্য অধিক জন্মে। মধ্যভাগে জমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, উদ্যানভাগ অধিক নহে; তাল, খেজুর, সুপারি, নারিকেল বেশ জন্মে বটে, কিন্তু আম কাঁঠাল ভাল ফলে না। বিশেষতঃ আমে পোকা ও অম্লাধিক্য জন্য উহা এক প্রকার অখাদ্য। এ অঞ্চলে ধান্যক্ষেত্র অধিক, এবং যেখানে জমি বারমাস জলপ্লাবিত না থাকে, সেখানে স্বল্পায়াসে প্রচুর ধান্য হয়। কিন্তু কলাই প্রভৃতি ফসল এ অঞ্চলে একপ্রকার হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে যেমন বিল ও জলা জমি বেশী, তেমনি

মৎস্যাদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণভাগে জমি অত্যন্ত নিম্ন, বৎসরের অধিকাংশ সময় জলমগ্নই থাকে; লোকসংখ্যা অতি সামান্য, প্রবল নদীর দুই কূলে ব্যতীত অন্যত্র প্রায় লোক বাস করিতে পারে না এবং সেরূপ লোকের বসতিও বড় অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। এ ভাগের অধিকাংশ ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলকে সুন্দরবন বলে। সুন্দর বনের বৃক্ষের প্রকৃতি অন্যস্থান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এ অঞ্চলে লোকালয়ের পরিচয় দিতে নারিকেল জাতীয় দুই চারিটী বৃক্ষ ব্যতীত অন্য উদ্যান-বৃক্ষ জন্মে না বলিলেও চলে। যাহা আছে, সকলই শক্ত এবং জ্বালানি কাঠের গাছ। তবে যেখানে স্থান একটু পলির বলে উচ্চ হয়, সেখানে মনুষ্যে বল ও কৌশলে শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে আত্মরক্ষা করিয়া 'বাদা' বা জঙ্গল কাটিয়া 'আবাদ' বা শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। এবং সেই বহুযুগের পতিত নবাবিষ্কৃত অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিলে, শস্যের স্বর্ণবৃষ্টি হয়। এইরূপে সোণা ফলাইবার লোভে লোকে সেই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অঞ্চলে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করে।

উত্তরভাগে নদী মরিতেছে, জমি 'জলগণ্ড' বা বদ্ধজলে দূষিত এবং দেশ 'অজন্মা' হইতেছে। নানাবিধ রোগে ও মহামারীতে স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছে, অধিবাসিগণ প্রাণের ভয়ে দূরে সহরে পলায়ন করিতেছে, ফলে লোক সংখ্যা কমিতেছে। বহুদিন হইতে যশোহর জেলার এই লোকক্ষয় দেখিয়া সকলেই শঙ্কাকুল হইয়াছেন। মধ্যভাগে পূর্ব্বাংশের কিছু উন্নতি ও পশ্চিমাংশের কতকটা অধঃপতন অলক্ষিত না থাকিলেও, মোটের উপর বিশেষ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায় না। দক্ষিণভাগে জমি 'উঠিতেছে'; শস্যক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিতেছে, উত্তর দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সুন্দরবন যেন ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। নূতন রোগপীড়া নাই, হিংস্রের উৎপাত দিন দিন কমিতেছে; শস্যের লোভে বসতির আয়তন ও লোক সংখ্যা প্রবল বেগে বাড়িয়া চলিতেছে।

সকল দেশের একটা প্রকৃতি এই দেখা যায়, যেস্থানে বহুদিন লোকের বাস ছিল, মানব-সমৃদ্ধি যেথানে বহুদিন লীলা করিয়াছে, সেস্থান কালে দূষিত হয়, জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসতির অযোগ্য হয়, মানুষ কতক ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্ট চলিয়া যায়। সমৃদ্ধ পল্লী বা সহর শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়া পড়ে। প্রকৃতি-দেবী বড় পরিবর্ত্তনপ্রিয়। আলোচ্য যুক্ত জেলায় ইহা বেশ দেখা যায়। উত্তরভাগে

যেখানে রাজপাট, প্রাচীন সহর বা সভ্যতার স্থান ছিল, হঠাৎ কোন দৈব দুর্য্যোগ বা মহামারী উপস্থিত হইয়া, প্রায়ই ভীষণ জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে এবং ব্যাঘ্র ও বন্যশূকরের বাসভূমি হইয়াছে, আর দক্ষিণভাগে যেখানে জঙ্গল ছিল, মানুষ গিয়া সেখানে বন কাটিয়া, আবাদ করিয়া, বাসাবাটী প্রস্তত করিতেছে। নদীগুলিও গতি পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ নূতন নূতন স্থানকে প্রতিপত্তি দান করিতেছে। মহম্মদপুর, সেখহাটি, বেনাপোল, অভয়নগর, পয়গ্রাম কস্‌বা বা হাবেলী-বাগের-হাট প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে ভীত ও বিস্মিত হইতে হয়, আবার নড়াইল, কালিয়া, খুল্‌না, সেনহাটি, বনগ্রাম, মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উন্নত অবস্থা দেখিলে আনন্দের উদয় হয়।

গঙ্গার সমস্ত উপদ্বীপ বিভাগই নদী-মাতৃক দেশ। বিশেষতঃ যশোহর ও খুল্‌না। এ অঞ্চলে নদীই সব। নদীই দেশকে বাসোপযোগী করিয়া সভ্যতা আনিয়াছে, বাণিজ্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যাবাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, উদ্যান ও শস্য-ক্ষেত্রের হরিৎ ছটায় সমৃদ্ধ পল্লীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দেহে যেমন শিরা ও ধমনী, এ দেশে তেমন নদনদী। শিরা বিকল হইলে যেমন দেহ-যন্ত্র অচল হয়, নদীর গতি রুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত হইলেও দেশে নানা বিকৃতি উপস্থিত হয়। তবে প্রভেদ এই দেহের শিরা সহজে বিকল হয় না; কিন্তু এদেশের নদনদী অবিরত পরিবর্ত্তনশীল। যে কোন নদী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা বুঝা যায়। নদী যেখানে স্থান বা গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার চিহ্ন সেখানে নানাভাবে বর্ত্তমান আছে। খাতের পর খাত, এমন ভাবে ক্রমান্বয়ে ৬।৭টি খাতও কোন স্থানে দৃষ্ট হইবে। আজ নদী একস্থানে বহিতেছে, লোকেরা উভয় কূলে বসতি করিয়াছে; আবার নদী সরিয়া গেল, খাত রহিয়া গেল কিন্তু বসতি গেল না; নূতন স্থানে নদীর কূলে আর এক সারি বসতি হইল। এইরূপে একসারি বসতি, তৎপরে একটি খাত, তাহাতে বর্ষাকালে জল হয়, বর্ষান্তে ধান্য হয়; সে খাতের পর পুনরায় বসতি, পুনরায় খাত। পাড়ায় পাড়ায় এইরূপ খাত সকল উচ্চ নীচ জমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যমুনা, ভৈরব, কপোতাক্ষ ও নবগঙ্গা এমন যে কত গতি পরি-বর্ত্তন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার জন্য ঐতিহাসিককে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। যেখানে একদিন যোজন-বিস্তৃত নদী-প্রবাহ পণ্য-বীথিকার মালা পরিয়া দেশকে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত করিয়াছিল, আজ হয়ত সেখানে এক ক্ষীণ বদ্ধ

জলের খাল মানুষের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া, অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সে দেশের লোককে কূপমণ্ডূক করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে দুই তিনটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম পাশাপাশি থাকিয়া কোন রাজা বা শক্তিশালী পুরুষের প্রাচীন আবাসের মহিমাঙ্কিত হইয়াছিল, আজ এক বিপুল নদী-স্রোত উহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সে সকল গ্রামকে এমনভাবে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে যে, তথাকার কোন পূর্ব্ব তত্ত্ব স্থির করিবার উপায় নাই। অনেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী উদ্ঘাটন করিতে গিয়া এইরূপ অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে।

নদীসমূহ আপনারা যেমন কালের গতিতে বাঁক ফিরিয়া নানা পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, মানুষের কৃত্রিম হস্তক্ষেপও তেমনি অনেক স্থানে অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। অনেকস্থলে এবিষয়ে মানুষের বুদ্ধির অপরিপক্কতা পরীক্ষিত হইয়াছে। হয়ত একস্থানে কেহ দেখিলেন, একটি নদী অনেকদূর ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনস্থানে তাহার দুই অংশ এমন নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, যে ঐ স্থানে সামান্য দূর পর্য্যন্ত একটা খাল কাটিয়া দিলে, মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম ও সংক্ষিপ্ত হয়। অমনি রাজা বা জমিদার তাহাই করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে এক বিস্তৃত অঞ্চল যেন নদীশূন্য হইয়া পড়িল, অথবা বিপরীত দিক্ হইতে স্রোত আসিয়া প্রকৃত নদীকে অচিরে ভরাট করিয়া দিয়া দেশের এক বিষম অনর্থ সাধন করিল। বাগের হাটের নিকটে খাল কাটিয়া এইরূপে ভৈরবের দুর্দ্দশা হইয়াছে। দক্ষিণভাগে কোন কোন স্থানে এইরূপে খাল কাটিয়া পথ সোজা করিতে গিয়া দেশে লোণাজল প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শস্য ও পানীয়ের ক্ষতি হওয়াতে, "খাল কাটিয়া লোণাজল ঢুকান" কথাটা দেশের লোকের একটা অব্যক্ত অনুতাপকে ভাষান্তরিত করিয়াছে।

গঙ্গোপদ্বীপে নদ নদীর কার্য্য দুইটি; প্রথমতঃ জলনিঃসরণ ও দ্বিতীয়তঃ জমির উচ্চতা এবং উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা। বিপরীত জলস্রোতে নদীর বেগ শ্লথ হইলে, স্থির জলে পলি পড়িয়া ভূমি নির্ম্মাণ কার্য্যটা অত্যন্ত সত্বরতার সহিত সম্পন্ন করে। অনেক নদী এইভাবে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জমির উচ্চতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে করিতে আপনার খাতই পলি সঞ্চয় দ্বারা এত উচ্চ করিয়া ফেলে, যে অবশেষে নদীকে নিজের আনীত পলির বোঝায় নিজেই মজিয়া গিয়া আত্মঘাতী

হইতে হয়; তখন প্রথম উদ্দেশ্য বা জল নিষ্কাশন কার্য্য বন্ধ হওয়াতে, নদী দেশের মধ্যে অনিষ্টকারক হইয়া পড়ে। অনেক নদী এইরূপে মজিয়া মরিয়া গিয়া "মরাগাঙ্গ" নামে খ্যাত রাখিয়া গিয়াছে। গঙ্গা নামটি বঙ্গদেশে লোকের নিকট এতই মধুর যে তাহারা গঙ্গা বলিতে প্রধানতঃ ভাগীরথীকে বুঝিলেও সকল নদীকেই গঙ্গা বা "গাঙ্গ্" বলে। আর নদী যেখানে শীর্ণকায় হইয়া পড়ে, সেখানে তাহার নাম হয় কালিন্দী বা কালীগঙ্গা। এমন কত শত কালীগঙ্গা যে যশোহর খুল্‌নার যেখানে সেখানে আছে, এবং প্রাচীন নদ নদীর বিস্তৃতির স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে, তাহা বলিবার নহে।

ভূমি নির্ম্মাণ করাই গঙ্গা বা তাহার শাখা সমূহের প্রধান কার্য্য। সে কার্য্যের ক্ষেত্র ও মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তিত হয়। কোন এক সময় স্থানবিশেষে কতকগুলি নদী মিলিয়া এই জমি নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করে। তখন কতক-গুলি নদী প্রবলবেগে সেই দিকে বহে। বামে দক্ষিণে পলি রাখিয়া দেশের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে, নদীগুলি সরিয়া সরিয়া কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লয়। এইরূপে একস্থানের কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইলে সেদিকে নদী মজিয়া যায়, স্রোতের জল পায়না। অন্যদিকে পুনরায় কার্য্যারম্ভ হয়। এই ভাবে দেখিলে যেন দেখা যায় যে যশোহর জেলার পশ্চিমাংশে ও খুল্‌নার উত্তরাংশে এই পলি-সঞ্চয় কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন যশোহরের পূর্ব্বপ্রান্তে এবং খুল্‌নার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমাপর্য্যন্ত প্রবল বেগে কার্য্য চলিতেছে। এযুগে মধুমতী ও নবগঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারিণী। মধুমতী খুল্‌নার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে সুন্দর বন আবাদ করিতেছে। *

এই সকল অবস্থার একটা ধারণা করিতে হইলে এই নদী-মাতৃক দেশের প্রধান সম্পত্তি নদীসমূহের গতিবিধির বিষয় জানা প্রয়োজনীয়। এজন্য উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে।

---

* Thus the whole river system has been changed; the many rivers that used to flow from north-west to south-east have now their heads closed and the Modhumati sends its waters accross their paths, changing the cross streams into principal streams and determining a general south-westward flow of the river currents.

Westland's Reports on Jessore p. 10.

শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র-কৃত
যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের জন্য
যশোহর-খুল্‌নার
মানচিত্র
প্রাচীন যশোর-রাজ্য —
পুরাতন যশোহর জেলা —
বর্ত্তমান যশোহর জেলা —
খুল্‌না জেলা —
কৃষ্ণনগর
মহেশপুর
বনগাঁ
কলিকাতা
সাতক্ষীরা
বসিরহাট
কচুয়া
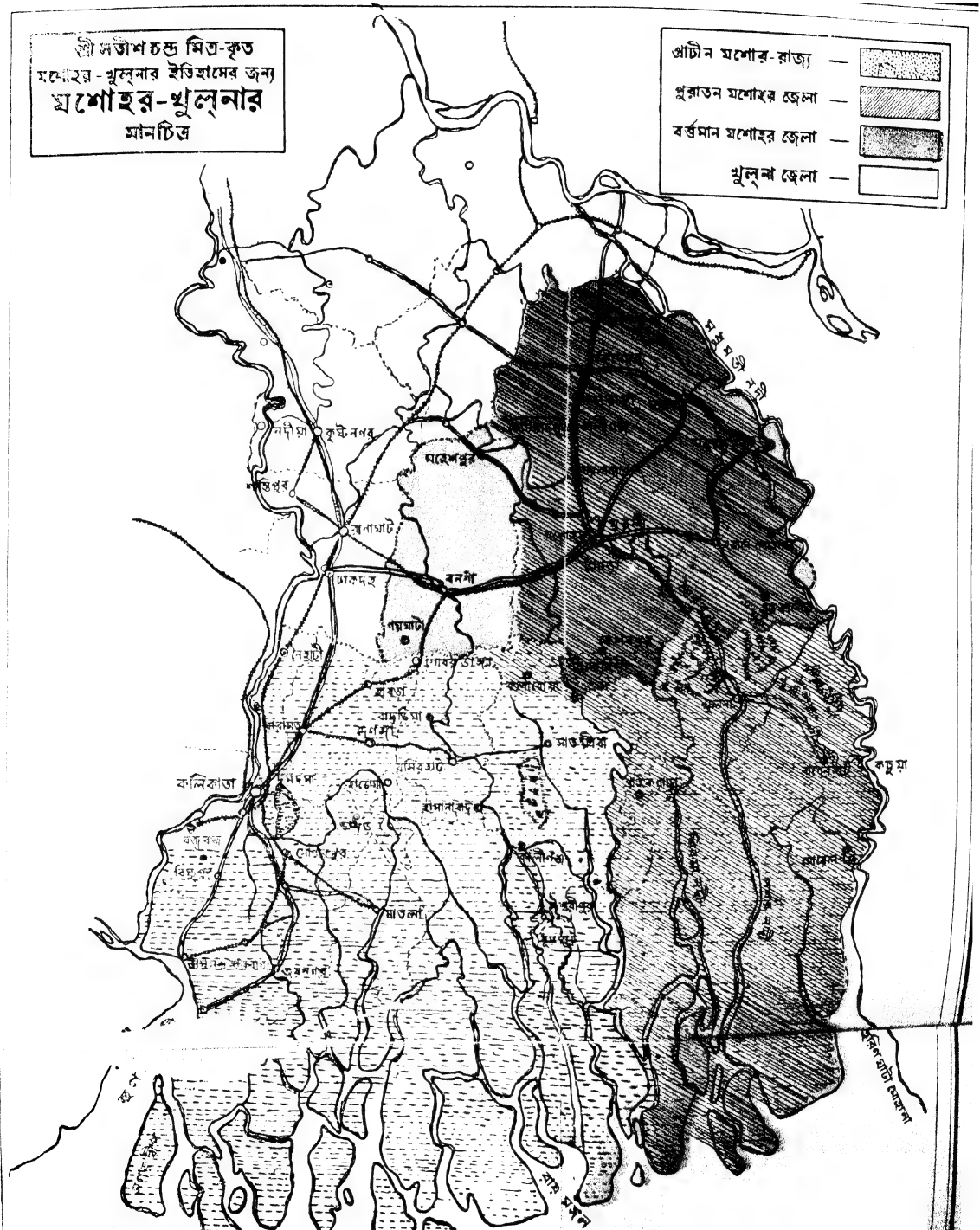
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নদী-সংস্থান।

যশোহর খুল্‌নার সমতল ভূমি ক্রমে দক্ষিণদিকে নিম্ন। সুতরাং জলের গতি সর্ব্বত্রই দক্ষিণদিকে। নদীগুলির মধ্যে অধিকাংশই দক্ষিণবাহিনী। যে দুই চারিটি নদী পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত আছে, তাহারা বহুধা বিভক্ত হইয়া শুধু দক্ষিণমুখী শাখাসমূহের দেহপুষ্টি করে। পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে দেখা যায়, কুষ্টিয়ার সন্নিকটে গৌরী, গোরাই বা গড়ই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নদীয়া জেলা দিয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদের সহিত মিশে এবং পরে কুমারের শাখা বারাসিয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কালে গৌরীর জলপ্রবাহ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে বারাসিয়া হইতে এলেংখালি নামে একটি পৃথক্ শাখা বাহির হইয়া যায়। পূর্ব্বে বারাসিয়ার নিম্নে মধুমতী নাম ছিল, এখন এই এলেংখালিও বিস্তারলাভ করিয়া মধুমতীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনেক দূরে আসিয়া যেখানে মাণিকদহের সন্নিকটে মধুমতী ডানদিকে আঠারবাঁকী শাখা প্রসারিত করিয়াছে, সেখান হইতে ইহা খুল্‌না জেলার পূর্ব্বসীমা ধরিয়াছে। ক্রমে যাইতে যাইতে ইহার বিস্তার ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে মধুমতী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বলেশ্বর হইয়াছে। কচুয়ার সন্নিকটে ভৈরব আসিয়া এই বলেশ্বরে মিশিয়াছে। বলেশ্বর ক্রমে বিষখালি, পানগুচি, কচা, ভোলা, পাঁকাসিয়া প্রভৃতি বহুনদীর জলস্রোত লইয়া হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহানায় সমুদ্রের আকারে বঙ্গোপসাগরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

গৌরী পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন কি ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার জলোচ্ছ্বাস ইহাকেই প্রধান পথ করিবে বলিয়া আশঙ্কাও হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ পদ্মার গতি-পরিবর্ত্তন জন্য সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে। অধিকন্তু গৌরী এক্ষণে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা বাকীছিল, কুষ্টিয়ার নিকট রেলওয়ে লাইনের সেতু নির্ম্মাণ হওয়াতে, তাহাও হইয়াছে। এক্ষণে গৌরী স্থানে স্থানে মজিয়া আসিতেছে; বৎসরের কতক সময়ে বড় বড় নৌকা চলাচলেরও অসুবিধা উপস্থিত হয়। তবুও গৌরী মধুমতীই যশোহর খুল্‌নার মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল নদী।

গৌরীর পশ্চিমদিকে মাথাভাঙ্গা নামক শাখা পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছে। নদীয়ার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে, এই মাথাভাঙ্গা হইতেই কুমার নদ প্রবাহিত হইয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে মাথাভাঙ্গার মূলস্রোত দুর্ব্বল হওয়াতে কুমারের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য উহার মুখে বাঁধদিয়া বা অন্যোপায়ে স্রোতের গতি ফিরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু নদী আপন পথ লয়, পরের বাধা মানে না। সুতরাং চেষ্টা সফল হয় নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত কুমার বৎসর ভরিয়া সুপেয় সলিলপূর্ণ থাকিয়া সর্ব্ববিধ তরণীর গমনপথ হইত। কিন্তু এখন আর ইহার সে অবস্থা নাই।

কুমারের পর মাথাভাঙ্গা হইতে আর একটি শাখা বাহির হইয়াছিল, তাহার নাম নবগঙ্গা। কিন্তু সেই মুখের কাছে, চুয়াডাঙ্গার পূর্ব্বদিকে এক বিলের মধ্যে পড়িয়া কালে মূল মাথাভাঙ্গার সহিত উহার সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তথা হইতে নদী মজিয়া জলজবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া রুদ্ধগতি হইয়াছে। মাগুরা নগরের উত্তরাংশে মুচিখালি নামক একটি খালের দ্বারা নবগঙ্গার সহিত কুমারের মিলন হইয়াছিল। কুমার এই সংযোগের ফলে নবগঙ্গাকে পুনর্জীবিত করিয়াছে। কুমার পূর্ব্বমুখে গৌরীতে মিশিয়া গিয়াছে এবং অপর পার হইতে বাহির হইয়া চন্দনা নামক পদ্মার অন্য শাখার সহিত ইহার সংযোগ হইয়াছে। কুমার পুনরায় আত্ম প্রকাশ করিয়া ফরিদপুর জেলায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। নবগঙ্গা কুমারের জলে সঞ্জীবিত হইয়া স্বচ্ছসলিলে উভয়কূলে সোণা ফলাইয়া, যশোহর জেলার উত্তরাংশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। মাগুরা, বিনোদপুর, সত্রাজিৎপুর, নহাটা, সিঙ্গিয়া, নলদী, রায়গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলি নবগঙ্গার ক্রীড়াভূমির ফল। মাগুরা হইতে ৩।৪ মাস কাল এবং বিনোদপুর হইতে লোহাগড়া পর্য্যন্ত বারমাস সমভাবে নবগঙ্গায় নৌকার যাতায়াত চলে। ইহার "সুধাসম স্বাদুনীর" স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপাদেয়। ইহার তীরভূমিতে অপরিমিত শস্য ফলে। খাদ্য দ্রব্যের দুর্গতি সর্ব্বত্র হইলেও এখনও নবগঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকে মৎস্য দুগ্ধের তেমন অভাব অনুভব করে না। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা সোজা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছিল, কিন্তু সে অংশ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে, কারণ বাণকাণা নামক একটি শাখা এই স্থান হইতে নবগঙ্গার জল লইয়া কালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী কালীগঙ্গায় মিশাইতেছে।

এবং কালীগঙ্গা গাজির হাটের নিকট আতাই নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আতাই গিয়া খুল্‌নার নিকট ভৈরবে পড়িয়াছে।

নবগঙ্গা যেখানে মাথাভাঙ্গা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহারই ২।৩ মাইলের মধ্যে, জয়রামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরে চিত্রা নামক আর একশাখা বাহির হয়। ভাগ্য উভয়েরই এক। নবগঙ্গার মত চিত্রাও মাথাভাঙ্গার জল-স্রোতে বঞ্চিত হইয়া, আঁকাবাঁকা ভাবে পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অন্যদিকে ঝিনাইদহের উত্তর পশ্চিম কোণে মথুরাপুরের সন্নিকটে ব্যাঙ্‌ নামক এইটি ক্ষুদ্র স্রোত নবগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া নলডাঙ্গার পার্শ্ব দিয়া কিছুদূরে আসিয়া ফটকী * বা যত্নখালি নাম ধারণপূর্ব্বক চিত্রার সহিত মিশিয়াছে। ঘোড়া-খালি † নামক একটি খনিতখাল নলদীর নিম্নে নবগঙ্গাকে নড়াইলের উত্তরস্থিত চিত্রা ও ফটকীর সম্মিলিত প্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। এতদূরে আসিয়া চিত্রা নবগঙ্গার স্রোতঃ-সলিলে সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছে এবং বিস্তীর্ণ নদীরূপে নড়াইলের পার্শ্বদিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূরে আফরার খালদ্বারা চিত্রার সহিত ভৈরবের সংযোগ হইয়াছে এবং মূল চিত্রা গিয়া গাজীরহাটের সন্নিকটে আতাই নদীতে মিশিয়াছে। এইরূপে চিত্রা ও কালীগঙ্গার দ্বারা নবগঙ্গার জলভার বহন করিয়া এই প্রাচীন মালুয়ারখাল বা আতাই নদী কতকজল মুজদখালি নামক সোজাপথে ভৈরবকে দিয়াছে এবং অবশিষ্ট জলভার লইয়া গিয়া নিজে সোলপুরের নিকট ভৈরবে বিলীন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক এই যে কত নদী আসিয়া যে ভৈরবে মিশিতেছে, সে ভৈরবের গতি বা অবস্থা কি।

ভৈরবই এতদঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান সুদীর্ঘ নদ। "সিন্ধু-ভৈরব-শোণ" একত্রযোগে নদ-পর্য্যায়ে পড়িয়া ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ইহা একটী তীর্থনদ। কত নদীর নামে অন্য নদীর নাম আছে, কিন্তু ভৈরবের নামে অন্য কোন নদ ভারতবর্ষে নাই। এক সময়ে ইহা নামের অনুরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। উপদ্বীপে বড় নদীগুলি প্রায়ই মোটামুটি দক্ষিণমুখী। ভৈরব তাহা নহে। সুতরাং

---

* ফটকীকে কেহ কেহ কটকী (Westland) কেহ নটকী (Deare) করিয়াছেন। See westland's Report, P. II.

† এই খালের সন্নিকটে পূর্ব্বে এক বণিক্ পরিবার বাস করিত। তাহাদের বহুবাণিজ্যতরী ছিল। তাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে এক রাত্রিতে এই খাল কাটিয়া দেয়, এরূপ প্রবাদ আছে।

যাইতে যাইতে বহুনদীর সহিত ইহার সম্মিলন হইয়াছে। ভৈরব নানাস্থানে নানা নদীর সহিত আত্মাহুতি দিতে দিতে, নিজে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভৈরবের আর সেদিন নাই।

মালদহের মধ্য দিয়া আসিয়া শ্রুতকীর্ত্তি মহানদ যেখানে পদ্মায় পড়িয়াছে, তাহারই অপর পারে যেন সেই নদই ভৈরব নাম ধারণপূর্ব্বক বাহির হইয়াছে। অনেক দূর আসিয়া ইহা পদ্মার অন্য একটি দক্ষিণবাহিনী শাখা জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। যুক্তপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া ভৈরব পুনরায় মেহেরপুরের পশ্চিম-দিয়া বর্ত্তমান জয়রামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে পদ্মার আর একটি শাখা মাথাভাঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বর্ত্তমান দর্শনা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃত্তাকার বাঁকে এই যুক্তপ্রবাহ ঘুরিয়াছিল। ঐ বাঁকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে ভৈরব মাথাভাঙ্গা হইতে বিচ্যুত হইয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ক্রমে কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে আসিয়া পরে দক্ষিণমুখী হইয়াছে। ৫।৭ মাইল আসিয়া চৌগাছার উত্তরে তাহিরপুর নামক স্থানে ভৈরব দক্ষিণদিকে কপোতাক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া, নিজে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে উভয়নদী অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। যশোহর-খুল্‌নার আর্য্যসভ্যতা এই দুই নদী পথে প্রবাহিত হইয়া উভয়ের কূলে কূলে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানালোক দীপ্ত-পল্লীর সৃষ্টি করিয়াছে।

ভৈরব ক্রমান্বয়ে বামে দক্ষিণে বারবাজার, মুড়লী কস্‌বা (বর্ত্তমান যশোহর), বসুন্দিয়া, সেখহাটী (জগন্নাথপুর), আলিনগর (নওয়াপাড়া), পয়গ্রাম (কস্‌বা), ফুলতলা, দৌলতপুর, সেনহাটী, খুল্‌না, সেনেরবাজার, আলাইপুর (চাঁদপুর), ফকিরহাট, পাণিঘাট, বাগেরহাট (খলিফাতাবাদ) ও কচুয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান রাখিয়া বলেশ্বরে মিশিয়াছে। এদিকে কপোতাক্ষ বামে দক্ষিণে গুয়াতলী, চৌগাছা, গঙ্গানন্দপুর বোধখানা, লাউজানি (ব্রাহ্মণনগর) ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ি, কুমিরা, তালা, কপিলমুনি, রাড়ুলি কাটিপাড়া, চাঁদখালি, বড়দল, আমাদি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের উদ্ভবসাধন করিয়া সুন্দর বনের মধ্যে খোলপেটুয়ার সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থানেই বর্ত্তমান কপোতাক্ষ ফরেষ্ট ষ্টেশন। তথা হইতে যুক্তনদী বিশাল বিস্তার লাভ করিয়া আড়পাঙ্গাসিয়া নামে মালঞ্চ মোহানায় বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক সময় আপাততঃ প্রয়োজনীয় একটা সুবিধার জন্য কোন সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ একটা খাল কাটিয়া বিষম অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছেন। ভৈরবের ভাগ্যে এভাবে নানা বিপত্তি হইয়াছে। পদ্মার ২।৩ টি প্রধান শাখার সহিত ভৈরবের সংযোগ বলিয়া, ইহাতে যথেষ্ট পার্ব্বত্য স্রোত প্রবেশ করিবার সুবিধা ছিল। কিন্তু ভৈরব তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যেখানে ভৈরব হইতে কপোতাক্ষ বাহির হইয়াছিল, ১৭৯৪খৃঃ অব্দে ঐস্থানে চর পড়িতেছিল। যশোহরের কালেক্টারের চেষ্টার ফলে বাঁধদ্বারা কপোতাক্ষ-স্রোত বন্ধ করিয়া যশোহর প্রভৃতি সহরের জন্য ভৈরবকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্দ্দান্ত স্রোতে সে চেষ্টা মানিল না। তাহিরপুরের নিকট বাঁধটা বাদ দিয়া মুলস্রোত পুনরায় দক্ষিণমুখে কপোতাক্ষে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলে ভৈরব দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। দর্শনা ষ্টেশনের কাছে ভৈরব-মাথাভাঙ্গার চক্রাকৃতি বাঁকের কথা বলা হইয়াছে। ২০।২৫ বৎসর পরে নদীয়ার কালেক্টর সেক্‌স পীয়র সাহেব * একটি ক্ষুদ্র খাল কটিয়া ঐ বাঁকে মাথাভাঙ্গার পথ সোজা করিয়া দেন। বাঁকের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে ভৈরব বাহির হইয়াছিল। সোজা পথ পাইয়া সমস্ত জল মাথাভাঙ্গায় চলিতে লাগিল, বাঁধ মজিয়া ভৈরবের সম্বন্ধ একপ্রকার রহিত করিয়া দিল। পদ্মার জল এপথে বড় একটা আসিত না; যাহা আসিত, তাহাও প্রায় সব টুকু কপোতাক্ষ টানিয়া লইত। ফলে ভৈরব অচিরে মরিয়া গেল; বসুন্দিয়ার নিম্নে যেখানে আফরার খালের দ্বারা চিত্রার জল ভৈরবে আসিয়া পড়িতেছিল, সেই পর্য্যন্ত ভৈরবে নৌকার চলাচলও বন্ধ হইয়া গেল। আফরার খালের মুখ হইতে আলাইপুর পর্য্যন্ত ভৈরব বেশ বিস্তৃত রহিল। এখনও সেইরূপ আছে। কারণ মুজদখালি, আতাই, আঠারবাঁকী দিয়া পার্ব্বত্য স্রোত উহার পুষ্টি সাধন করিতেছিল। এবং এই জলোচ্ছ্বাস লইয়া ভৈরব ভীষণ বিক্রমে আলাইপুর হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

পশর একসুন্দর বনের নদী। উহার সহিত কোন দিকে পার্ব্বত্য জলের সংযোগ ছিল না; ইহাতে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলিত মাত্র। পশর তখন খুলনার পূর্ব্বদিকে বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার সহিত ভৈরবের কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিল পাবলা হইতে "শ্মশান ঘাটের খাল" নামক ক্ষুদ্র নদী খুলনার দক্ষিণে মৈয়ার গাঙ্গে

* Westland's Report P. 5.

মিশিয়াছিল। এবং এই মৈয়ারগাঙ্গ কাঁচিপাতা নামক প্রবল শাখা দিয়া ঘুরিয়া পশরে পড়িয়াছিল। শ্রীরামপুরের ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামনারায়ণ ঘোষ * স্বনামে "নারায়ণ খালির" খাল কাটিয়া কাঁচিপাতার সহিত পশরের সোজা সংযোগ করিয়া দেন। সেই সংযোগস্থান হইতে ভৈরব নদ মাত্র ৩ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল। রূপসাহা † নামক এক ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া ভৈরবের সহিত কাঁচিপাতার সংযোগ সাধন করে। সেই ক্ষুদ্র খাল অচিরে ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ভৈরবের জল পথ পাইয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত হইয়া ক্ষুদ্রখালকে প্রবল নদী করিয়া দিল। উহাই এখনকার রূপসা নদী। একে দক্ষিণ দিকের সোজাপথ, তাহাতে পশরের মত বিস্তৃত সমুদ্রগামী নদী। আঠার-বাঁকী ও ভৈরবের জল আলাইপুর পার না হইয়া অধিকাংশই রূপসা পথে ছুটিল। জোয়ারের জল রূপসা হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে উভয়মুখে ভৈরবে ও কতক আঠার-বাঁকীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। সুতরাং আলাইপুর পার হইয়া সে মুখে অধিক জল যাইত না। সেদিকে ভৈরব তেমন বেগবান্ রহিল না। তখন ভৈরব সে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ নদী ছিল। এখন যাহাকে আলাইপুরের খাল বলে, তাহা প্রাচীন ভৈরবের সূক্ষ্মরেখা মাত্র।

যাত্রাপুরের কাছে ভৈরবে উত্তরাবর্ত্তে একটি বৃত্তাকার বাঁক ছিল। উহার প্রাচীন খাত এখনও বর্ত্তমান। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ঐস্থানে অল্পদূর খাল কাটিয়া পথের সংক্ষেপ করা হয়। পুনরায় বাগেরহাটের সন্নিকটে দড়াটানার খাল কাটিয়া দক্ষিণদিকে আর একটি সংযোগ সাধিত হয়। এইরূপে বাগেরহাটের দক্ষিণদিকে জোয়ারের জল আসিয়া কতক আলাইপুরের দিকে, কতক কচুয়ার দিকে যাইতে লাগিল। একদিকে কচুয়া হইতে মধুমতীর জোয়ার ও অন্যদিকে আলাইপুর দিয়া রূপসার জোয়ার ভৈরবে প্রবেশ করিয়া দুইদিকে নদীকে দোটানা

---

* শ্রীরামপুরের ঘোষ বংশে রামনারায়ণের পর ৬।৭ পুরুষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৭৬০ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে নারায়ণখালি খনিত হয়।

† রূপচাঁদ সাহা নামক একজন সৌলুক বংশীয় বণিক্ খুলনার কাছে নেমকের কারবার করিত। সে দক্ষিণ দেশীয় লবণের ভার কাঁচিপাতা মোহানা হইতে সোজা পথে ভৈরবের তীরে আনিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র খাল খনন করিয়া দেয়। উহা প্রথমে এত ক্ষুদ্র ছিল যে লাফ দিয়া পার হওয়া যাইত। নড়াইলের উত্তরে ধোন্দা নামক স্থানে রূপচাঁদের বাস ছিল।

করিয়া ফেলিল। ফলে কচুয়া হইতে আলাইপুর পর্য্যন্ত ভৈরবের সমস্তটাই মজিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে দুইবার অপরিমিত অর্থব্যয়ে এই নদী কাটাইবার ব্যবস্থা করায়ও বিশেষ ফল হয় নাই। প্রকৃত রোগ না সারিলে সাময়িক উপ-শান্তিতে কাজ হয় না। যশোহর খুল্‌নার সর্ব্ব প্রধান নদী ভৈরব এই ভাবে নানা স্থানে ভরাট হইয়া গিয়া দুইজেলার কত যে অপকার করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। কপোতাক্ষে শৈবাল জমিয়া জলজ উদ্ভিদাদির জন্য শীর্ণকায় হইলেও তাহাতে এখনও নৌকাদি চলে, ঝিকারগাছা হইতে দক্ষিণ দিকে ষ্টীমারও যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু ভৈরবের মাত্র বসুন্দিয়া হইতে আলাইপুর পর্য্যন্ত ৩০মাইল পথে রীতিমত নৌকা পথ আছে।

কপোতাক্ষের মত বেতনা (বেগবতী বা বেত্রবতী) ভৈরবের একটি শাখা। ইহা যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুরের সন্নিকটে ভৈরব হইতে বাহির হইয়া, বর্ত্তমান রেলষ্টেশন নাভারণ (যাদবপুর), উলসী, সামটা, বাঘআঁচড়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বদিয়া খুল্‌নার সীমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং "বুধহাটার গাঙ্গ" বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে নিম্নে আসিয়া খোলপেটুয়া হইয়াছে। খোলপেটুয়া নানা-দিক্ হইতে গালঘেসিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় শাখার সহিত যুক্ত হইয়া বিশাল বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ১৬ মাইল এই ভাবে গিয়া কপোতাক্ষে মিশিয়াছে। তথা হইতে সম্মিলিত প্রবাহের নাম আড়পাঙ্গাসিয়া।

কপোতাক্ষ হইতে হরিহর ও ভদ্র নামক আর দুইটি শাখা পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত ছিল। এক সময়ে হরিহরের কূলে লাউজানি, মণিরামপুর ও কেশবপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান শোভা পাইত। হরিহর গিয়া ভদ্রে মিশিয়াছিল, কিন্তু ভদ্রের আশ্রয়েও মৃত্যুর হাতে নিস্তার পায় নাই। কারণ ভদ্রনদ নামে ভদ্র হইলেও তখন কাজে বড় অভদ্র ও তরঙ্গসঙ্কুল ছিল। মঙ্গলবারের মত ভদ্রনদও নামে এক, কাজে অন্য বুঝাইয়া দিত। প্রাচীন কালে এই ভদ্রই ছিল যশোর রাজ্যের উত্তর সীমা। ভদ্রের সহিত কপোতাক্ষের সঙ্গম স্থানে ত্রিমোহিনী ও মীর্জ্জানগরে মোগল ফৌজদারের রাজধানী ছিল, সেখান হইতে ভদ্র কেশবপুর ঘুরিয়া গৌরী-ঘনা, ভরতভায়না প্রভৃতি স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিয়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সামাজিক কায়স্থ ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিল। আজ ভদ্র ডুমুরিয়া পর্য্যন্ত প্রদেশকে কাণা করিয়া নিজে এক প্রকার মজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ডুমুরিয়া ছাড়িয়া

ভদ্র সুন্দরবনের নদী—এখনও পূর্ব্ববৎ অভদ্র। নানা শাখা বিস্তার করিয়া অবশেষে ভদ্র শিবসা ও পশরে মিশিয়া গিয়াছে। শিবসাও একটি রীতিমত সুন্দর বনের বড় নদী। ইহাও পশরের মত সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। সমুদ্রে পড়িবার পূর্ব্বে ইহার নাম হইয়াছে মর্জ্জাল। উপর হইতে ঢাকি, ভদ্র, মেনস ও কয়রা প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় নদী শিবসার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ঢাকি ইহাকে পশরের সহিত মিশাইয়াছে, এবং মেনস ও কয়রা ইহাকে কপোতাক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা ভৈরব কপোতাক্ষ ছাড়িয়া পশ্চিম দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পারি। ভৈরব কপোতাক্ষ যেমন দেশ জুড়িয়া বহুনদীর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছে, এ দিকে ইচ্ছামতী-যমুনাও তেমনি বহু বিস্তৃত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মাথাভাঙ্গা ভৈরব ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আসিয়া কৃষ্ণগঞ্জের কাছে চূর্ণীনাম ধারণ করিয়াছিল। সেইস্থান হইতে উহার একটী শাখা বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে আসিয়াছে, তাহার নাম ইচ্ছামতী। ইচ্ছামতী এখনও মরে নাই, সে এখনও পদ্মার জল লইয়া স্বচ্ছ-সলিলে গভীরখাতে প্রবাহিত হইতেছে। ইচ্ছামতী বর্ত্তমান বনগ্রাম রেলষ্টেশনের পূর্ব্বদিক্ দিয়া আসিয়া, গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে টিপি নামক স্থানে যমুনার সহিত মিশিয়াছে।

এ যমুনা সেই যমুনা। যে যমুনার তটে ইন্দ্রপুরীতুল্য রাজপাট বসাইয়া কুরু-পাণ্ডবে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরে রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছিল, যে কালিন্দী-তটে বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্ম্মের অপূর্ব্ব লীলাভিনয় হইয়াছিল, যে যমুনার তীরে দিল্লী-আগ্রায়, মথুরা-প্রয়াগে, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, মোগল-ইংরাজ, শত শত রাজরাজেশ্বর সমগ্র ভারতের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন, এবং এখনও করিতেছেন, এ সেই একই যমুনা। সেই তমালকদম্বপরিশোভিত, কোকিল-কূজন-মুখরিত, নির্ম্মল সলিলে প্রবাহিত "তটশালিনী সুন্দর যমুনা।" সকলেই জানেন যমুনা ও সরস্বতী বিভিন্ন পথে আসিয়া প্রয়াগ বা এলাহাবাদের নিম্নে গঙ্গার সহিত মিশিয়া গিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রয়াগের নাম যুক্তত্রিবেণী। সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা সেই যুক্তপ্রবাহে বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গভূমিতে ভাগীরথী নামে সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেখানে আসিয়া সরস্বতী দক্ষিণে ও যমুনা বামে বিমুক্ত হইয়া

পড়িয়াছে। * এজন্য সপ্তগ্রামের নিকট সেই সঙ্গমস্থলের নাম মুক্তত্রিবেণী। এই ত্রিবেণী হইতে যমুনা কিছুদূর পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া এবং তৎপরে চব্বিশ পরগণা ও যশোহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যমুনা যেখানে ভাগীরথী হইতে প্রথম উঠিয়াছে, তথাকার সেই দুরবস্থ প্রাচীন খাত সাধারণের নিকট বাঘের খাল বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যমুনা ক্রমে চৌবেড়িয়া, জলেশ্বর, ইচ্ছাপুর ও গোবরডাঙ্গা ঘুরিয়া, দক্ষিণ দিকে পদ্মা নামক শাখা বিস্তার করিয়া, অবশেষে চারঘাটের কাছে টিপির মোহানায় ইচ্ছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার যেন একটা স্বভাব এই যে, সে অধিক দূর পর্য্যন্ত একক অগ্রসর হইতে পারে না ; একবার যেমন গঙ্গায় ডুবিয়াছিল, এবার তেমনি ইচ্ছামতীতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের নাম বিলুপ্ত করিয়া দিল। ইচ্ছামতী সোজা দক্ষিণ দিকে চলিল। বসুরহাট (বসিরহাট), টাকী, শ্রীপুর, দেবহট্ট, বসন্তপুর ও কালীগঞ্জ দিয়া একেবারে ইচ্ছামতী ৺যশোরেশ্বরীর পীঠমন্দিরের সন্নিকটে যশোর নগরের পাদদেশে পৌঁছিল। সেখানে আবার যমুনা পৃথক্ হইল, সে ডানদিকে আসিয়া দক্ষিণ মুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে, এবং ইচ্ছামতীও বামভাগে গিয়া কদমতলী, মালঞ্চ প্রভৃতি নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সাগরে মিশিয়াছে। এই "যমুনেচ্ছা-প্রসঙ্গমে" প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোহর ও ধূমঘাটের রাজধানী ছিল। যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

বসন্তপুর হইতে এই যমুনা একদিন যে ঐশ্বর্য্য, প্রতিভা ও রণরঙ্গ দেখিয়াছিল, আজ তাহার চিহ্নগুলিও বিলুপ্তপ্রায়। যে যোজনবিস্তীর্ণ নদী প্রতাপের যশোরদুর্গের সমীপে অসংখ্য নৌবাহিনীর মাস্তুলসজ্জায় কণ্টকিত দেখা যাইত, আজ সে অভিশপ্ত নদী একগাছি শীর্ণকায় খালের মত বদ্ধজলপূর্ণ রহিয়াছে। কালের বিপর্য্যয়ে যমুনার অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য খুল্‌নার দক্ষিণাংশবাসী লোকসমূহের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। বসন্তপুরের উত্তরাংশে যমুনা-ইচ্ছামতী হইতে কালিন্দী

---

* প্রদ্যুম্ননগরাদ্‌যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে
তদ্দক্ষিণে প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা

রঘুনন্দনকৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব

নামক একটি ক্ষুদ্র শাখা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় উহা সাধারণ খালের মত ছিল, বিশেষ প্রবল নদী ছিল না। ইংরাজ আমলে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইহা হইতে একটি খাল. কাটিয়া বড় কলাগাছিয়া নদীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে সাহেবখালি বলে। ইচ্ছামতীর ভাটার জল অনেক পরিমাণে এই পথে সরিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে কালিন্দী ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বে গুডল্যাড সাহেব যখন চব্বিশ পরগণার কালেক্টর, তখন কালীগঞ্জ হইতে একটি খাল কাটিয়া যমুনাকে বাঁশতলী নদী দিয়া খোল পেটুয়ার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়; ইহাকে কাঁকশিয়ালীর খাল (বা Goodlad creek) বলে। পূর্ব্বদেশীয় নদীসমূহ এই খাল দিয়া কালিন্দীপথে সহজে কলিকাতায় আসিতে পারিত। সেই জলপথকে আরও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য ১৮৩০ খৃঃ অব্দে হাসনাবাদের খাল খনিত হয়। এই তিনটি খালের জন্য বসন্তপুর ও ঈশ্বরীপুরের মধ্যে যমুনা-ইচ্ছামতীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। এমন সময় ১২৭৪ সালের ১৬ই কার্ত্তিক (১৮৬৭ ১লা নভেম্বর) তারিখে এতদঞ্চলে এক ভীষণ ঝড় হয়। উহাতে সুন্দর বনে এক রাত্রিতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া ছিল। তাহার পর দিনই দেখা গেল, যমুনার স্রোতের ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বালি জমিয়া যমুনার গতি অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হওয়ায়, কালিন্দীর জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করিয়া উহাকে দোটানা করিয়া দিল। ইহাতে অল্পদিন মধ্যে যমুনা ভরাট হইয়া এক প্রকার শুষ্ক হইয়াছে। যমুনার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও ভীষণ অবস্থা বহু প্রাচীন তথ্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এতক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রকৃত সুন্দরবনের নদীগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে, কেবলমাত্র গৌরী-মধুমতী, নবগঙ্গা-চিত্রা, এবং ইচ্ছামতী-কালিন্দী গঙ্গার পার্ব্বত্য স্রোত বহন করিতেছে। এই তিনটি মাত্র নদীস্রোত মিষ্টজল আনিয়া দেশের শোভা সমৃদ্ধি ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে এবং ইহারাই চিরানুগত প্রথায় গঙ্গার ভূমিগঠন কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। কোন প্রকারে ইহাদের গতিরুদ্ধ হইলে, দেশের যে কি গতি হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

ব'দ্বীপের প্রকৃতি—বিল, বাঁওড়, খাল, দিয়াড়া।

গাঙ্গেয় ব'দ্বীপের প্রধান প্রকৃতি এই, উহা জলকে স্থল করে, স্থলকে উন্নত ও উর্ব্বর করিয়া চলিয়া যায়। প্রথমে নদী নালা থাকে না; থাকে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত অসীম সাগর। তাহাতে গঙ্গা প্রভৃতি নদীস্রোত পড়ে, পলি সঞ্চিত হয়, অবশেষে জল ছাড়িয়া ভূমি উত্থিত হয়। মাঝে মঝে নদী নালা থাকিয়া যায়। কিছুদিন মধ্যে নদী বেশ উচ্চ, বনাকীর্ণ বা মনুষ্যাকীর্ণ হয়, তখন নদী খালের বিস্তৃতি কমিতে থাকে। ক্রমে জলধারাসমূহ নানাভাবে গতি পরিবর্ত্তন করে, মধ্যে চড়া বা চর রাখিয়া যায়; উহাকে দিয়াড়া, দিয়া, দহ, মাদিয়া বা দ্বীপ বলে। শেষে এই নবোত্থিত দ্বীপ ও প্রাচীন ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী জলখাত বেগহীন হইয়া মজিয়া মরিয়া যায়; এবং খাত ভরাট হইয়া জমিভুক্ত হয়, দ্বীপ শুধু নামে মাত্র থাকে। ব'দ্বীপের কার্য্য আরও দূরে সরিয়া চলিতে থাকে। কিছুদিন পর্য্যন্ত বিল, ঝিল, বাঁওড় প্রভৃতি নামে নিম্ন ভূমিতে জল সঞ্চিত থাকে। আবাদ হইতে লাগিলে কালে তাহাও থাকে না। এইরূপে গঙ্গার মোহানা ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্ব্ব-দিকে সরিতেছে। বঙ্গের আয়তন বাড়িতেছে, বঙ্গোপসাগরের আয়তন কমিতেছে। খরবেগে কাজ চলিলে, এতদিন বঙ্গভূমি আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত নহে। সাগরবেলান্ত বনভাগ মধ্যে মধ্যে বসিয়া গিয়া কার্য্যে কিছু বিলম্ব করিয়া দিতেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মোহানার নিকট প্রায় ৪০০ফুট পলি* ও বালি জমিয়াছে, কিন্তু তবুও উহা পার্শ্ববর্ত্তী সিন্ধুবারি হইতে কয়েক ইঞ্চির অধিক উচ্চও নহে।

পার্ব্বত্যতরঙ্গিণী আর্য্যাবর্ত্তের সমতলে পড়িয়া ক্রমশঃ মন্দগতি হইয়াছে। ইহার ১৬০০ মাইল দীর্ঘ গতিপথের মধ্যে শেষ ৩৩০ মাইল গঙ্গা নিম্নবঙ্গে প্রবেশ

---

* "Four hundred feet of delta deposit now covers this island built up by the three rivers of Bengal and yet its surface is often but a few inches above the sea." Imperial Gazetteer of India, Vol. I, p. 25.

করিয়াছে। সেখানে ইহার গতি মৃদু বলিয়া সমুদ্রে পড়িবার পূর্ব্বে গঙ্গা পলির বোঝা নামাইয়া যায়।* উহা হইতে জমি উদ্ভূত হইলে মধ্যবর্ত্তী জলভাগ পার্ব্বত্য স্রোতের সংযোগ সাধন করিবার জন্য নদী হইয়াছিল। সে সব আঁকাবাঁকা নদী-পথে পলি বাহিত হয়। উহাদ্বারা তীরভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। নদী হইতে দূরবর্ত্তী অংশ সে ভাবে উচ্চ হয় না; নদীতীর উচ্চ ও তাহার পরবর্ত্তী স্থান নিম্ন থাকে। বৃষ্টির জলধারা ভূমিপৃষ্ঠ ধৌত করিয়া নদীতে প্রবাহিত হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ বোধ হয় তাহা হইলে নিম্নভূমি উচ্চ হইবার আর উপায় থাকে না। বৃষ্টিজল সেই নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে ভূমিভাগ ধুইয়া লইয়া গেলেও সেখানে যথেষ্ট জল জমে। এই জল নদীতে আনিবার জন্য স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রণালীর প্রয়োজন হয়। ইহাই খাল বা নালা। যেখানে স্বাভাবিক খাল থাকে না, সেখানে মনুষ্যে খাল কাটিয়া জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করে। যেখানে মনুষ্য-হস্ত তত সবল নহে, সেখানে মধ্যভাগে জল জমিয়া জলাভূমি হয়। উহার নাম বিল। এক নদীর উচ্চ পাহাড় হইতে অন্য নদীর উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত এই সব বিল বিস্তৃত থাকে। যেখানে দুই নদীর দূরত্ব অধিক, সেখানে বিলও খুব প্রকাণ্ড।

পলি দ্বারা জমি জমাইয়া উচ্চ করিতে পারিলেই নদীর কর্ত্তব্য শেষ হয়; তখন নদী ক্রমশঃ শীর্ণকায় হইয়া গত হয় বা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য স্থানে কার্য্য করিতে থাকে। যেখানে নদী মরিয়া যায়, বা সরিয়া যায়, উভয় স্থানেই খাত থাকে। সে খাতে জল জমে। এইরূপে জলপূর্ণ প্রাচীন খাতকে বানোড় বা বাঁওড় বলে; কোন কোন স্থানের লোক ইহাকে "গোগ" বা "ঘোগ" বলে। শুধু বিল বাঁওড় নহে, নিম্ন জলাভূমিকে অনেক স্থানে "ঝিল," "দোহা" প্রভৃতি নামেও আখ্যাত করে। এইরূপ বিল, ঝিল, খাল, বাঁওড় গাঙ্গেয় উপদ্বীপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যশোহর-খুল্‌না জেলায় এই বিল বাঁওড়ের অভাব নাই। যেখানে নদী আছে, তাহারই পার্শ্বে বিল, বাঁওড় বা গোগ্‌ আছে। আর এ নদীমাতৃক দেশে নদী নাই এমন স্থান নাই। যশোহর জেলায় মরা নদীই হউক, আর খুল্‌নার বেগবতী নদীসমূহই হউক, নদী সর্ব্বত্র আছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে

* "When the Ganges reaches its delta in Lower Bengal, the fall of the river is so slight, that the current seldom sufficient to enable it to carry its burden, deposs its sit." *Ibid.*

গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বিল বাঁওড়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। বিল যেখানে উচ্চ হইয়া শস্যক্ষেত্রের উপযোগী হয়, তখন তাহা প্রান্তরে পরিণত হয়। প্রান্তরকে এদেশীয় লোকে "ডহর" বা ডর বলে।

যশোহর-খুল্‌নায় কোন হ্রদ নাই। অনেক স্থানে এই বিল, ঝিল ও বাওড়গুলি হ্রদের মত বারমাস জলপূর্ণ থাকে। নদী হইতে বিল বাঁওড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাস করাই এদেশের সাধারণ বসতির পদ্ধতি। লোকের অবস্থার সঙ্গে এই বসতির স্থান ভেদেরও একটা রীতি আছে। পাড়াগাঁয়ে সে রীতি অধিকাংশ স্থলে এখনও প্রায় একভাবে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ অঞ্চলে নদীর পাহাড়গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। যে নদী যত প্রবল, যাহার মাটী যত পলিময়, তাহার পাহাড় তত অধিক উচ্চ। মধুমতীর মত উচ্চ পাহাড় কোন নদীর নাই। মনে করা যাউক, উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি নদী আছে। উভয়ই পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। উত্তরবর্ত্তী নদীর দক্ষিণ পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, উহা হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিক্ নিম্ন হইয়া গিয়া একটি বিল হইয়াছে। বিলের ভিতর কতকটা এবং অব্যাহিত উপরে কিছুদূর পর্য্যন্ত বর্ষার পরেও বেশ জল পায়, এজন্য সেখানে বেশ ভাল আমন বা হৈমন্তিক ধান্য হয়। তাহারই উপর উত্তরদিকে, শুধু বর্ষাকালে যেখানে জল পায়,সেখানে আউস ধান এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কলাই সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মে, তরকারীর ক্ষেত হয়, গরুতে ঘাস খায়। ইহার উপরই কৃষকদিকের বাড়ী। কৃষকেরা বাড়ীর ধারে চাষ করে, গরু চরায়। নিকটে বিল, উহা দামদল শৈবালাদিতে সমাকীর্ণ। তবুও তাহা গভীর হইলে কৃষকেরা তাহারই জল খায়; সেখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরে; গরুর জন্য ঘাস কাটে। তালের ডোঙ্গায় সেখানকার যাতায়াত চলে। এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে ধান থাকে, জমিতে কলাই হয়, সরিষা বা তিল ভাঙ্গাইয়া তৈল করে, বিল হইতে প্রচুর মাছ ধরিয়া খায়, হাটের দিন বস্ত্রলবণাদির জন্য কিছু ধান্য বা তরকারী মাথায় করিয়া হাটে যায় এবং মাছের গল্প, ভূতের গল্প ও জমির গল্প দ্বারা যে উদর পূর্ণ ছিল, তাহা খালাস করিয়া আসে। আর তাহাদের পশ্চাতে বড় নদীর কূলে সভ্য শিক্ষিত, ধনী, বিষয়ী, উচ্চশ্রেণীর লোক উদ্যানশোভিত বাটীতে দালান কোঠায় বা ভাল ঘরে বাস করে, নৌকায় পাল্‌কীতে দূরবর্ত্তী স্থানের সহিত সম্বন্ধ রাখে, পোষ্টাফিসে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া চীন তুরস্কের ভাগ্যগণনা করে,

আর সর্ব্বদা বাজার বা ডাক্তারের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া যাহা আয় করে,তাহাই খরচ করিয়া ঋণগ্রস্ত হয়। নদীকূলে নিত্যনূতন মুক্ত সভ্যতার স্রোত, আর বদ্ধ বিলের পার্শ্বে সেই অনাড়ম্বর অপরিবর্ত্তনীয় প্রাচীন পদ্ধতি। নদীতে ও বিল বাঁওড়ে এইটুকু প্রভেদ। তবে দেশের যেমন গতি, তাহাতে সকল নদীই বাঁওড় হইবে; তখন আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ প্রাণের জন্যও হয়ত সেই প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনীয় হইবে।

এইরূপে বিলের এ পারেও যেমন, ও পারেও তেমনি। বিলের পরে শস্যক্ষেত্র, ক্ষেতের পাশে কৃষকের বসতি, তাহার পরে বাগান, ধনীর বসতি ও সর্ব্বশেষে নদী। হয়ত নদীর অপর পার হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় এইভাবে লোকের বাস। যেখানে নদী হইতে বিল বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, সেখানেও ২।৩ মাইলের অধিক দূরে যায় নাই। নদীতে পারাপারের সুবিধা থাকে, সুতরাং এপারের সহিত ওপারের সম্বন্ধ যায় না। কিন্তু বিল যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে এ পারে ওপারে সম্বন্ধ পর্য্যন্ত থাকে না, চলাচলের পথ থাকে না। প্রয়োজন হইলে বহুদূর ঘুরিয়া নদীপথে আসিয়া বিলের উভয় পারে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

যশোহর-খুলনায় প্রায় প্রত্যেক দুইটি করিয়া বড় নদীর মধ্যে বিল দেখা যায়। তবে স্থান বহুদিনের পুরাতন হইলে, বিলের অস্তিত্ব লোপ পায়। বিল ক্রমশঃ শস্যক্ষেত্র হয়, শস্যক্ষেত বসতিস্থান হয়। পুরাতন যশোহরে বিলের সংখ্যা খুব কম। যশোহরের লোকেরা যে পর্য্যাপ্ত মৎস্য পায় না এবং তজ্জন্য খুলনার মুখাপেক্ষী হয়, তাহার কারণ এই। খুলনায় বিল অত্যন্ত অধিক; এজন্য যশোহর অপেক্ষা খুলনায় অধিবাসীর সংখ্যা কম। খুলনার অর্দ্ধেক প্রায় সুন্দর বন। তাহার কথা এখানে ধরিব না। সুন্দর বনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা পৃথক্ ভাবেই আলোচিত হইবে। কিন্তু সে সুন্দর বন ছাড়িয়া দিলেও খুলনার উত্তরার্দ্ধও অসংখ্য বিলে পরিপূর্ণ। আবার যশোহরের বিলগুলি ছোট, এবং ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু খুলনার বিলগুলি যত দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই বিস্তৃত, ততই প্রকাণ্ড। অবশেষে সমস্ত সুন্দরবনই একটি প্রকাণ্ড বহুবিস্তৃত বিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দুই নদীর মাঝখানে গ্রাম-মালার পশ্চাতে সর্ব্বত্রই বিল আছে। দৃষ্টান্তক্রমে মাত্র উহার কয়েকটি প্রধান বিলের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ গোরাই মধুমতী ও নবগঙ্গার মধ্যে মাগুরার উত্তর যোগিনী বিল এবং নলদীর পূর্ব্বে ইচ্ছামতী বিল। নবগঙ্গা ও চিত্রার মধ্যে কালিয়ার উত্তর আগরহাটি বিল, চিত্রা ও ভৈরবের মধ্যে যশোহরের উত্তরে জলেশ্বর বিল। বড় বড় বিল সমস্তই খুল্‌নার মধ্যে। মধুমতী ও ভৈরবের মধ্যে পূর্ব্বদিকে গজালিয়া নরনিয়া, কাতলি; আতাই, ভৈরব ও আঠার বাঁকীর মধ্যে বিল কোলা ও বাসুখালি; ভৈরব ও ভদ্রের মধ্যে বিল পাবলা ও ডাকাতিয়ার বিল বিশেষ বিখ্যাত। ভদ্রের দক্ষিণে যে সমস্ত বিল তাহা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে সাতক্ষীরার পশ্চিমে দাঁতভাঙ্গা বিল ও দক্ষিণে বয়রার বিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

প্রায় সকল নদীর পার্শ্বেই বাঁওড় আছে। কারণ সকল নদীই কোন না কোন কালে পথ পরিবর্ত্তন করিয়া খাত রাখিয়া গিয়াছে। কোন নদী মরিয়াছে, কোন নদী এখনও সজীব আছে। সকলেরই খাতের চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে যে খাত ভরাট হইয়া এখনও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই, যাহাতে এখনও জল থাকে, তাহাকে বাঁওড় বলে। নদীর গভীরতা সর্ব্বত্র সমান থাকে না। দুই দিক্ মরিয়া গেলে মধ্যবর্ত্তী এক গভীর স্থানে প্রচুর জল থাকে। সে বাঁওড়ে মৎস্য জন্মে, সময় সময় নৌকা চলাচল করে। অনেক বাঁওড়ের জল অতি সুন্দর, উহা পার্শ্ববর্ত্তী লোকে পানীয়রূপে ব্যবহার করে। যশোহরে অধিকাংশ নদী মরিয়া অসংখ্য বাঁওড়ের সৃষ্টি করিয়াছে, খুল্‌নার বাঁওড় তত অধিক নহে। বাঁওড় ও ঝিল একই কথা। যে বাঁওড়ে যথেষ্ট জল থাকে, কতকটা পরিষ্কৃত, থাকে তাহাই সাধারণতঃ ঝিল নামে কথিত হয়।

কোটচাঁদপুর হইতে যশোহর পর্য্যন্ত ভৈরব নদ, নলডাঙ্গার নিকট বেগু নদী, বেনাপোলের পার্শ্বে নাওভাঙ্গা নদী এক প্রকার বাঁওড়েই পরিণত হইয়াছে। চৌগাছার দক্ষিণে বেড়গোবিন্দপুরের চারিধারে, চৌবেড়িয়ার চতুর্দ্দিকে যমুনার খাতে, ঝিকারগাছার দক্ষিণে ঝাপাগ্রামের তিন দিকে, তাহিরপুর ও বারবাজারের মধ্যে ভৈরবের উত্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁওড় রহিয়াছে। খুল্‌নাজেলার সেন হাটি গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে ৬।৭টি খাতে, বসুন্দিয়ার দক্ষিণ-পারে জগন্নাথ পুরের মাঝে, ফকিরহাটের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ রাঙদিয়ার নিম্নদিয়া, মরানদীতে জল পূর্ণ বাঁওড় দেখা যাইবে।

নদী মরিয়া এইরূপে নানাস্থানে ঝিল বা বাঁওড় হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৰ্দ্ধিত বা নবীভূত হইতেছে না। ভৈরব, কপোতাক্ষ ও যমুনা মরিয়া যাওয়ায় যশোহর জেলা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ১৮৮১ অব্দ হইতে ইহার লোকসংখ্যা প্রতিবৎসর কমিতেছে। ১৯১১ অব্দের লোকগণনার বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে যে যশোহর জেলায় গত ত্রিশ বৎসরে মোট প্রায় ৫৫০০০ হাজার লোক কমিয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৩ জনেরও অধিক লোক কমিতেছে। অনুসন্ধানে দেখা যাইতেছে যে, যশোহরের সকল উপবিভাগে লোকসংখ্যা কমিয়াছে, কেবল নড়াইলে কমে নাই, বরং বাড়িতেছে। এবং এই একমাত্র নড়াইলে চিত্রার মত বেগবতী মিষ্টসলিলা নদী আছে, অন্য সব উপবিভাগেই অধিকাংশ স্থলে নদী মরিয়া গিয়াছে। ঝিনাইদহে যেখানে সব নদীগুলিই শুষ্কপ্রায়, সেই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মরিয়াছে। এই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রধান উৎপত্তিস্থল মৃতনদীগুলির বদ্ধজলপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ও পূতিগন্ধময় প্রাচীন খাত। সুতরাং লোকক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে, নদীগুলির পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়। কোথায়ও খাত কাটিয়া, কোথায়ও গতি ফিরাইয়া কোন কোন নদীকে প্রবহমান করিতে হইবে। কিন্তু নদীর গতি আপনি না ফিরিলে ফিরান কঠিন। তবে মানুষের বৈজ্ঞানিক চেষ্টায় যে কতক না হয়, তাহা নহে। তাহা না হইলে পশ্চিমাঞ্চলে বা উড়িষ্যায় নদীর মুখে কপাট এবং আনিকট (anicut) বা বাঁধের ব্যবস্থা করিয়া শুষ্কনদী জলপূর্ণ করত ষ্টীমার চালান বা বিস্তীর্ণ ভূভাগে ক্ষেত্রের জন্য জল সঞ্চারের উপায় হইত না। এই জন্য যশোহরবাসী প্রজাবৃন্দ সহৃদয় এবং শক্তিসমৃদ্ধিসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু প্রার্থনা করে।

সকলেই ভাবিতেছে নদীসংস্কার ব্যতীত এ বিপদ্ হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। যমুনার সংস্কার বা ভৈরবের পুনরুদ্ধার জন্য উভয় নদীর শোচনীয় অবস্থার বিষয় কয়েকবার রীতিমত ভাবে গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করা হইয়াছে। খুল্‌নার জনসাধারণ-সভাও গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সাড়ার সন্নিকটে পদ্মার উপর বিরাট্ লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে চালাইবার

জন্য বহুকোটী মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এজন্য পদ্মার বেগ কমাইয়া সেতুকে সুদৃঢ় করিবার জন্য উভয় পারে বারমাইল করিয়া তীরভাগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও কীর্ত্তিনাশা পদ্মার বেগ কমিবে কিনা বলা যায় না। তবে এক প্রকারে বোধ হয় এ বেগ কমান যাইতে পারে। যেখানে সেতুনির্ম্মিত হইতেছে, তাহার অনেক উপরে পশ্চিম-দিকে পদ্মা হইতে মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী ও ভৈরব বাহির হইয়াছে। এই সব নদীর মোহানাই অল্প বিস্তর মজিয়া গিয়াছে, ভৈরব একবারেই মজিয়াছে; কারণ ইহার মোহানা হইতে পদ্মাই অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেই মোহানার নিকট কিছুদূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র একটি খাত খনন করিয়া দিলে ভৈরব পুনরায় ভীম বিক্রমে বহিতে পারে। ভৈরব বহিলে, কপোতাক্ষও বেগবান্ হইবে। তখন যশোহর-বাসী ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রোগাপহৃত মস্তিষ্ক ফিরাইয়া পাইবে, দেশের গতি ফিরিবে, আবার যশোহর পরের যশঃ হরণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। ভৈরব কপোতাক্ষ উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে আর একটি ফল হইবে। এই দুই নদী দিয়া মিষ্টজল সুন্দরবনে যায় না বলিয়া বৃক্ষাদির অবস্থা খারাপ হইয়াছে। লবণাক্ত জলের সহিত মিষ্টজল না মিশিলে সুন্দরবনে সুন্দরী, পশূর প্রভৃতি ভাল বৃক্ষ জন্মে না। মধুমতী দিয়া মিষ্টজল যায়, এজন্য হরিণঘাটা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট সুন্দরীগাছ জন্মে। সেখান হইতে যত পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, জল ততই নিরবচ্ছিন্ন লবণাক্ত, এজন্য বৃক্ষের অবস্থা খারাপ; চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে শুধু গরাণবনই হইতেছে, ভাল কাষ্ঠ হয় না।*

সুন্দরবনে উৎকৃষ্ট কাঠ উৎপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রভূত লাভ হইবে; হয় ত বহুকাল পরে ব্যয়িত অর্থের পুনরুদ্ধারও হইতে পারে। না হইলেও অসংখ্য প্রজার জীবন রক্ষার মত রাজার মহৎ কার্য্য আর থাকিতে পারে না।

---

* "Owing to its saline character this tract (Sunderbons situated in the 24 Pargannahs District) does not produce a large quantity of the best timber and fuel trees." Khulna Gazetteer, p. 87 See. also p. 82.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—অন্যান্য প্রাকৃতিক বিশেষত্ব।

মৃত্তিকা—যশোর-খুল্‌নায় কোন পর্ব্বত বা পাহাড় নাই। রাঢ় বা পশ্চিমাঞ্চলের মত এখানকার মাটী রক্তাভ বা কঙ্করময় নহে। গঙ্গার গৈরিকবর্ণ পলিমাটী অল্পাধিক বালুকামিশ্রিত হইলে যে ঈষৎ পাটলবর্ণ হয়, এ অঞ্চলের মাটীর তাহাই সাধারণ রঙ্। যতদূর পর্য্যন্ত মিষ্টজল যায়, বা পূর্ব্বে যাইত, ততদূর এই মাটীর রঙ্ আছে এবং ততদূর পর্য্যন্ত পরিমাণে বালুকা দেখা যায়, নদীর তলে, কূলে বা চরে শ্বেতবর্ণ বালুকা—উহার জন্য জল পরিষ্কৃত এবং নদীতীরে কর্দ্দম থাকে না। কিন্তু দক্ষিণে লবণাক্ত নদীর কূলে ভীষণ কর্দ্দম, তাহাতে পা দিলে কর্দ্দমে মানুষ ডুবিয়া যায় এবং সে গাত্রলিপ্ত কর্দ্দম সহজে ধৌত হইতে চাহে না। সুন্দরবনে বৃক্ষাদি পচিয়া অনেক স্থানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাটী হয়, তাহাই জোয়ারে বাহিত হইয়া উত্তরদিকে পার্ব্বত্য পলিকে কৃষ্ণাভ করিয়া দেয়। এ দেশের মাটী উদ্যান বা শস্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু উহা প্রাচীরাদি নির্ম্মাণে ভাল নহে। এজন্য মৃত্তিকার প্রাচীরবেষ্টিত গৃহের সংখ্যা খুব কম। পশ্চিমাঞ্চলে ইষ্টক গৃহ ব্যতীত সব গৃহই যেমন মৃত্তিকার প্রাচীর-বিশিষ্ট, এদেশে তাহা নহে। যাহা অল্পসংখ্যক আছে, তাহা উত্তমভাবে লেপিয়া জলবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হয়। দক্ষিণভাগে মাটী অত্যন্ত লবণাক্ত, তদ্দ্বারা প্রাচীর গাঁথিলে অচিরে খসিয়া পড়ে। ইষ্টক প্রভৃতিরও ভাল রঙ্ খুলে না এবং তেমন শক্ত হয় না। পূর্ব্বে যখন ভৈরব প্রভৃতি নদ নদী দিয়া পার্ব্বত্য মিষ্টজল নামিত, তখন মাটী এত লোণা ছিল না; ইট, প্রাচীরও ভাল হইত। পাঠান আমলের বা পঞ্চদশ শতাব্দের যে ইট দেখা যায়, তাহা মোগল আমলের বা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দের ইট অপেক্ষা অনেক ভাল।

গৃহ—দৈশিক অবস্থান অনুসারে মানুষের গৃহনির্ম্মাণের উপাদানও পৃথক্ হইয়া থাকে। মাটীর প্রকৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইষ্টক বা মৃন্ময় প্রাচীরের গৃহ বোধ হয় এ দেশের লোকের অবস্থার অনুরূপ নহে। যশোহর-খুল্‌নায় বিশেষতঃ খুল্‌নার দক্ষিণাংশে যেমন স্বল্পব্যয়ে, গৃহনির্ম্মাণ করা যায়, এমন বোধ হয় কুত্রাপি হয় না। যশোহরে ও খুল্‌নার উত্তর ভাগে

যথেষ্ট উলুখড় পাওয়া যায়, আর খুল্‌নায় সুন্দরবনে পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা। সুতরাং ঘরের ছাউনী প্রায় খড় বা গোলপাতা দ্বারা হয়। গোলপাতা সস্তা বলিয়া সাধারণের তাহাই ব্যবস্থা। এ অঞ্চলে বাঁশের অভাব নাই, এবং সে বাঁশও ভাল এবং শক্ত। কাঁটাল, সোণালি ও তালগাছে খুঁটি হয়, তাহা ছাড়া সুন্দরবন হইতে সুন্দরী, পশূর, আমুর বা গরাণ প্রভৃতি খুঁটির জন্য আমদানী হয়। পূর্ব্বে যত হইত, এখন তত আসে না বটে, কিন্তু তবুও কিছু কিছু আসে; লোকে পয়সার বলে শাল সেগুণের দিকে অধিক দৃষ্টি না দিলে আরও আসিত। বাঁশের কাঁচ্‌নী বা ছিঁটে এবং নলের দড়মার বেড়া ভাল, অভাবে অল্প খরচে হোগলা-পাতার ব্যবহার হয়। দক্ষিণদেশীয় বিলের মধ্যে নল এবং লবণাক্ত নদীর ধারে হোগলা অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। এই সকল সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ঘর তাহাদের শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর নহে।

বায়ু—এ দেশে শীতকাল ভিন্ন সময়ে দক্ষিণদিক্ হইতে বাতাস বহে। শীতকালে উত্তরের বাতাস আসে, উহা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ঝড় উত্তর ও পশ্চিমদিক্ হইতে অধিক হয়, এজন্য বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময় ঐ দুই দিকে আড়ালের ব্যবস্থা আছে। এ দেশে বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণ বায়ুকোণই বটে, এবং পশ্চিমাঞ্চলের মত পশ্চিমদিক্ হইতে স্নিগ্ধ বাতাস আসে না। বাড়ী প্রস্তুত করিবার বিষয়ে একটা সাধারণ উপদেশ আছে :—

দক্ষিণে ফাক্, উত্তরে বাগ
পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।

অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ফাক বা খোলাস্থান রাখিতে হইবে, উত্তরে ফল বৃক্ষের উদ্যান হইবে, পূর্ব্বদিকে পুকুর হইবে এবং তাহাতে হাঁস চরিবে, পশ্চিমে বাঁশঝাড়ে প্রাচীরের কাজ করিবে। এ প্রণালীতে দক্ষিণদ্বারী বাড়ী করিতে হয়, এ দিকে দক্ষিণে খোলা না থাকিলে বাতাস পাওয়াই যায় না। পূর্ব্বদিকে পুকুর থাকিলে, সে দিকেও অনেকটা খোলা থাকিল এবং প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ-মালা পাওয়া গেল এবং পুকুরও অন্দর এবং বাহিরের কাজে লাগিল এবং পশ্চিমপারে ঘাটে বসিয়া হিন্দুদিকের পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করা চলিল। উত্তরদিকে ঘনবিন্যস্ত বাগানে শীত বায়ু এবং ঝড় হইতে রক্ষা করিল। এই দেশ-প্রচলিত সাধারণ কথাটা এ অঞ্চলের বায়ু চলাচলের প্রকৃতি বুঝাইয়া দেয়। এ দেশের হাওয়া অত্যন্ত

লবণাক্ত এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ। তজ্জন্য দেশের সমস্ত জিনিষই যেন বারমাস কেমন সিক্ত থাকে, শুষ্ক বা খট্‌খটে ভাবের একপ্রকার অভাব বলিলেই হয়। এখানে রৌদ্রে কাপড় শুকাইতে বিলম্ব হয়, গ্রীষ্মকালে মানুষের গায়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, এবং ঘামাচি, খোস পাঁচড়া ও দাদ্ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ কিছু বেশী। লোণা হাওয়ায় মানুষের শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হয়, তজ্জন্য মানুষকে অলস করিয়া ফেলে। এ দেশে শীতকালে লোকে বেশী খায়, বেশী হজম করে এবং অধিক কাজ করে, কারণ তখন লোণা হাওয়া থাকে না। গ্রীষ্মকালে তেমন খাইতে পারে না, কাজ করিতে পারে না, শুধু দিবানিদ্রাই সার হয়। লোণা হাওয়ার ক্রিয়া কমাইবার জন্য লোকে স্নানের পূর্ব্বে গায়ে প্রচুর পরিমাণে তৈল মর্দ্দন করে। *

জল—লোণা হাওয়া যেমন খারাপ, লোণা জলও তেমনি। ইহা পানীয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু স্নানে দোষ নাই; বরং লোণা জলে স্নান করিলে শরীর ভাল থাকে। এই জন্যই স্বাস্থ্যের জন্য সমুদ্রস্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। লোণাজলে চর্ম্মরোগ একটু বাড়ে বটে, কিন্তু অন্য রোগ খুব কম হয়। যশোহরে বদ্ধজলে ম্যালেরিয়া বাসা করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে দক্ষিণাঞ্চলে যাইতে অনেকটা ভয় পায়। লোণা জল হাওয়ায় মানুষের শরীরের রঙ্‌ তাম্রবর্ণ করিয়া দেয়, গঙ্গার তটবর্ত্তী সে কমকান্তি এই সুন্দরবনের রাজ্যে নাই। লোণা হাওয়ার মত লোণা জল সর্ব্বত্র যায় নাই; উত্তরে ভৈরব পর্য্যন্ত লোণা জল গিয়াছে, তাহার উত্তরে নদীর জল মিষ্ট। চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার বা গোরাই নদীর জল অতীব উপাদেয়। ভৈরবের দক্ষিণে নদীপথে যাইতে হইলে যেমন পানীয় জল সঙ্গে লইতে হয়, উত্তরদিকে তেমনি শুধু জলেই মানুষকে তৃপ্তি দেয়। নবগঙ্গা প্রভৃতি নদীর তলে ও চড়ায় বালুকা অধিক, এজন্য জল স্ফটিকবৎ দেখায়। কপোতাক্ষের জল এখনও উত্তরাংশে কপোত-চক্ষুর মত নির্ম্মল। একপ্রকার রুদ্ধগতি হইলেও যমুনা এখনও উত্তরাংশে নির্ম্মলসলিলা। দক্ষিণদেশীয় নদীমাত্রে শুধু কর্দ্দম, জল ঘোলা, নদীর কূলে কোথায়ও বালুকা নাই, এজন্য সে অঞ্চলে স্নান করিয়াও তৃপ্তি নাই।

---

* তৈলমর্দ্দনের বিশেষত্ব বিষয়ে Elphinstone বলেন :—

"They (the Bengalese) have the practice, unknown in Hindusthan, of rubbing their limb with oil after bathing, which gives their skin a sleek and glossy appearance-and protects them from the effect of their damp climate." History of India, p 187

পূর্ব্বে দক্ষিণ অঞ্চলে লোণাজল জ্বালাইয়া প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত। সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপ হইতে শত শত জাহাজ লবণ বোঝাই করিয়া বিদেশে যাইত। এখন দেশীয় লোকের ব্যবসায় নাই, এমন কি নিজেদের ব্যবহারোপ-যোগী লবণটুকুও প্রস্তুত করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় হাতে লইয়াছেন। এখন লোকে পরের লবণই খায়, তবুও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে।

জীব জন্তু—জীব-জন্তু বা বৃক্ষলতা সম্বন্ধে সুন্দরবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এজন্য তাহার বিশেষ বিবরণ পৃথক্ ভাবে প্রদত্ত হইল। এস্থলে উত্তর ভাগের কথাই আমাদের আলোচ্য। যশোর-খুল্‌নার লোকালয়ে গো, ছাগ, কুকুর ও বিড়াল গৃহপালিত পশু। মেষ ও মহিষ যশোরের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে আছে বটে, কিন্তু ইহারা খুল্‌নার পূর্ব্ব দক্ষিণে দীর্ঘজীবী হয় না। এমন কি যশোর অঞ্চল হইতে খুল্‌নার কৃষকগণ বর্ষার প্রাক্কালে হালে চষিবার জন্য বলদ কিনিয়া লইয়া যায়; কিন্তু লবণাক্ত ও কর্দ্দমময় দেশে, অনভ্যস্ত খাদ্যের জন্য উহারা প্রায়ই বর্ষান্তে মরিয়া যায়। অনেকে এরূপ ঠকিবে জানিয়াও গরু কিনে, কারণ তাহা না হইলে জমি পতিত থাকে। সুন্দরবনের আবাদের জন্য এইভাবে অনেক গো-হত্যা হয়। ভৈরবের দক্ষিণে বলদ বা গাভী উভয়ই খারাপ। যশোরের গাভীতে দুগ্ধ অধিক হয়, তাহাদের শরীর ভাল ও দীর্ঘজীবী হয়। সঙ্গতিসম্পন্ন ও উদ্যোগি-লোকে এক্ষণে বৈদেশিক গাভী ও বলদ আনিয়া পুষিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ এক্ষণে আর গরু পুষিবার আদর নাই। গোষ্ঠ নাই। বলদের দোষে গরুকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধের বৃষোৎ-সর্গের পর ষাঁড় ছাড়িয়া দিত, উহারা অত্যাচার করিলেও লোকে কিছু বলিত না, কারণ তাহারা একভাবে দেশের উপকার করিত; লোকে দধি দুগ্ধ ঘৃতের লোভে সে উপকার বুঝিত।

বনে জঙ্গলে শিয়াল, খাটাস, বনবিড়াল, গ'লো এবং মাঝে মাঝে কেঁদো ও নেকড়ে বাঘ দেখা যায়। পুরাতন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বন্য শূকরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। খরগস ও সজারু অলক্ষিত ভাবে ফসলের ক্ষতি করে। রাঢ় বা পশ্চিম বঙ্গের মত হনুমান্ বা সুন্দরবনের মত বানরের উৎপাত এ অঞ্চলে নাই। যশোরের দুই এক স্থান ব্যতীত এ প্রদেশের সর্ব্বত্র কাঠবিড়ালীর হাতে নিস্তার পাইয়াছে।

খুল্‌নার সীমার মধ্যে প্রত্যেক প্রবহমান নদীতেই কুমীরের অত্যাচার আছে। এজন্য স্নানের জন্য নদীতে লোকে ঘাট ঘিরিয়া লয়। যশোরের সীমায় কুমীর যায় নাই। খাঞ্জালীর দীঘিতে কয়েকস্থানে পোষা কুমীর আছে, তাহারা মানুষ খায় না। মধুমতীতে "ভেঁসাল" নামে একজাতীয় কুমীর আছে, উহারাও মানুষকে খাদ্যগণ্ডী-ভুক্ত করে নাই। দুই একটি নদীতে হাঙ্গর বা কামট দেখা যায়; উহারা পাঙ্গাস মাছের মত, কিন্তু প্রকাণ্ড এবং ৬।৭ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, উহাদের তিনপাটি সুতীক্ষ্ণ দাঁতে জলের ভিতর কখন্ মানুষের হাত পা কাটিয়া লয়, তাহা বুঝা যায় না। তবে ভাগ্যক্রমে দুই একটি প্রবল নদীতে ব্যতীত এ উৎপাত নাই। শুশুক গভীর নদীমাত্রেই আছে। নানাবিধ কচ্ছপ নদীতে ও খালে দেখা যায়। উহাদের মধ্যে যাহারা মড়া খায় এবং আকারে প্রকাণ্ড;তাহাদিগকে "ঢালীয়ান" বলে। সম্ভবতঃ ইহাদের গাত্রাবরণে ঢাল প্রস্তুত হইত, তজ্জন্য এরূপ নাম। এক সময়ে এই সকল কচ্ছপের খোলা বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। সে ব্যবসায় অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে; কারণ বিদেশে যাওয়ার নাবিক যে মুসলমানগণ, কচ্ছপ স্পর্শ করাও তাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। নদীতে আর যে একপ্রকার ছোট কচ্ছপ বা কাটাদুর এবং বিলে ও পুষ্করিণীতে "সুন্ধি" কচ্ছপ জন্মে,তাহা এদেশীয় অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুতেও তুষ্টির সহিত খায়।

দক্ষিণাংশ হইতে চিংড়ি, ভেট্‌কী, পাশিয়া, ভাঙ্গান প্রভৃতি মৎস্য ও কাঁকড়া প্রভূত পরিমাণে খুল্‌না জেলায় আমদানী হয়। আজ কাল বড় বড় কারখানা হইতে শুক্‌না চিংড়ি-মাছ ভারে ভারে বিদেশে যাইতেছে। মধুমতী, রূপসা ও ভৈরবে যথেষ্ট ইলিশ মাছ পড়ে; মধুমতীর ইলিশ অপরিমিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুল্‌নার ইলিশের মত সুস্বাদু নহে। যশোর খুল্‌নার নদীতে উত্তরভাগে রোহিত (রুই), কাত্‌লা, মৃগেল, বাউস, চিতল, সিলিন্দা ও আইড় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বড় মৎস্য এবং বিল ও বাঁওড়ে কই, মাগুর, সিঙি, শইল, বাইন, পুঁটি, খলিসা, ফলই, পাব্‌দা, রয়না, টেংরা প্রভৃতি বহুবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। এদেশের খাদ্যোপকরণের প্রধান মৎস্য, এবং মৎস্যের মধ্যে "যশুরে কই" বহু বিদেশেও পরিচিত ছিল। তেলিহাটি পরগণা পূর্ব্বে যশোরে ছিল, এখন ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেখানে ব্যতীত তেমন বড় কই এখন আর যশোরে পাওয়া যায় না, যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও অত্যল্প। এখন "যশুরে কই" নাই,

"কশু'রে যই" আছে। ডিম ছাড়িলে কইমাছ শীর্ণকায় হইয়া মস্তকসর্ব্বস্ব থাকে। তাহারই সহিত তুলনায় এখন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত যশোরবাসীই বিদেশে "কশু'রে যই" বলিয়া উপহসিত হয়। কিন্তু এই মস্তকসর্ব্বস্ব রুগ্ন যশোরবাসীর মস্তক যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোর খুল্‌নায় পক্ষীর সংখ্যা অল্প নহে। হাড়গিলে, শকুনি, গৃধিনী, নানা জাতীয় চিল, বাজ, বক, ও পেচক, মাংসাশী পক্ষী। দাঁড়কাক এবং যশোরের উত্তরাঞ্চল বাসী পাতি কাক, উভয়েই সর্ব্বভুক। পেঁচা ও ভুতুম্ (হুতোম পেঁচা) অমঙ্গলজনক ও নিশাচর। উত্তরভাগে বাদুড় স্থানে স্থানে লাখে লাখে একত্র বাস করে এবং রাত্রিকালে দেশের ফলবৃক্ষের উপর রাজত্ব করে। কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার "চোকগেল" বুলি, তা'ড়োর "ইষ্টকুটুম" ধ্বনি, দয়েল বা শ্যামার শীস্, চাতকের "ফটিকজল" ও "বউকথা কও" পাখীর চীৎকার কানন ও প্রান্তর মুখরিত করে। মানুষে শালিক ও টিয়া পুষিয়া থাকে; ময়না বা লালমোহন এ দেশের পাখী নহে। হাঁস, পায়রা ও কুক্কুট গৃহপালিত পক্ষী। ঘুঘু, চড়ুই, বাবুই, টুনি, ঝুটকুলি প্রভৃতি জঙ্গলে থাকে। যশোরের উত্তরভাগে বিল বাওড়ে কা'ন, সরাইল, পানি কুমড়ী ও গয়াল প্রভৃতি ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে এবং লোকে উহাদিগকে মারিয়া খায় ও বিক্রয়ার্থ খুল্‌না অঞ্চলে আনে। ডাহুক ও মাছরাঙ্গা সর্ব্বত্র জলের ধারে থাকে।

বৃক্ষ-লতা—ফলের বৃক্ষের মধ্যে পূর্ব্বভাগে সুপারি, নারিকেল, মধ্যভাগে তাল ও খেজুর, উত্তরাংশে আম ও কাঁটাল ভাল হয়। বাগেরহাট অঞ্চলের সুপারি ও যশোর নলডাঙ্গার আম বিখ্যাত। লিচু, জামরুল বেশীদিন আসে নাই, তবে লিচু আমের সহিত মিত্রতা করিয়া যশোরে ভাল হয়। আগে ছিল বরই (বদরী বা টেপা কুল) এবং গ'য়ে আম (গয়ার আম বা পেয়ারা), এখন তাহারাও আছে, তবে ভাল কুল ও পেয়ারার কলম আসিয়া তাহাদের পশার মাটী করিতেছে। গোলাপ ও কালো জাম, বেল, তেঁতুল, চালিতা ও নানাবিধ লেবু সর্ব্বত্র ফলে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত যশোরে তেঁতুলের আদর কিছু অধিক। হুগলীর মত এখানকার লোকেও তেঁতুল কিছু ভালবাসে এবং ভাবে ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারক। যেখানে জল বায়ু উভয়ই অপকারক, সেখানে তেঁতুলের অতিরিক্ত আদর দেখিয়া এক কবি লিখিয়াছেন :—

"জীবনং জীবনং হন্তি প্রাণান্ হন্তি সমীরণঃ।
যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদুতিকা।"

যমদুতিকা শব্দের এক অর্থ, তেঁতুল।

পূর্ব্বে কলা কয়েকপ্রকার মাত্র ছিল, যথা জিন বা ঠ'টে (লম্বীর), দয়া কলা (বীচিযুক্ত), চাঁপা এবং সবরী (মর্ত্তবান), এখন চিনিচাঁপা, কাবুলী, রামকেলি, কানাইবাঁশীর চাষ হইতেছে। ২।৩ রকম কাচকলা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কতকগুলি বিদেশী ফল এদেশে আসিয়াছে, যথা মর্ত্তবান কলা (মার্ত্তাবান দ্বীপ), বাতাপি লেবু (ব্যাটাভিয়া সহর), পেঁপে (পাপুয়া দ্বীপ), কলম্বো লেবু (কলম্বো সহর), তন্মধ্যে ডাক্তারের প্রশংসা পত্র পাইয়া পেঁপের কিছু পশার হইয়াছে। মূল্যের লোভে লোকে যত্ন করিয়া ইহা লাগাইতেছে। দেশে লোণা আসিয়া আতা ও ডালিম উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু লোণা দেশে নোনা মন্দ হয় না। আনারস পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ফল ছিল না কিন্তু ইহা অতি মুখরোচক। দৌলতপুরের আনারস বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত কেফল ডউয়া ও নানাজাতীয় আমড়া অম্লের জন্য ব্যবহৃত হয়।

রাস্তায় অশ্বত্থ, বট, বাদাম, কদম্ব, অর্জ্জুন, শিরীষ, আম, জাম, কাঁটাল ও (যশোরে) বাব্‌লা ছায়াদান করে। ঝাউ ও কৃষ্ণচূড় দেবমন্দির, বিদ্যালয় বা বারোয়ারী স্থানে প্রহরিস্বরূপ। তাল, সোণালি ও কাঁটাল গাছে খুঁটি এবং আম, জাম, কাঁটাল, পুইয়া, শিরীষ, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষে তক্তা হয়। রয়না, মাটাম, জিওল, ছাতেনী (সপ্তপর্ণী), সাড়া, জিয়াপতি প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষ অসংখ্য। বাঁশের বাস যে কোথায় নাই, তাহা বলা যায় না। ভালুকা, জাবা ও তল্লা এই তিনপ্রকার বাঁশ এদেশে পাওয়া যায়। বাঁশের মত বেতও সর্ব্বত্র। বেতসকুঞ্জ কাহাকে বলে দেখি নাই, তবে বেতের ঝোপে হিংস্রের নিবাস ইহা সকলে জানে এবং বেতসীবৃত্তি বা অনুকরণ প্রবৃত্তিটা বাঙ্গালীর স্বভাবগত হইয়া পড়িতেছে।

তরকারীর মধ্যে শিম, বেগুণ, কলা, মূলা, আলু, কচু, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, পটোল প্রধান। ভৈরবের দক্ষিণে ডুমুরিয়া প্রভৃতি স্থানের বেগুণ, ফকিরহাটের নিকটবর্ত্তী বাগ্‌দিয়া প্রভৃতি স্থানের মূলা, যশোহর সহরের নিকটে ভাল ওল ও কচু, উত্তরাংশে বোরোধান্যের ভূমির আইলের উপর প্রচর পরিমাণে কুমড়া

এবং গাজীরহাটের পটোল ও উচ্ছে বিখ্যাত। মেটে আলু পূর্ব্বে খুব বেশী হইত; এখনও হয়, লোকে বড় একটা খায় না। অনেকে অন্য বিলাতী জিনিষের মত আমড়া, বিলাতী আলু (গোল আলু) পছন্দ করিতেছে। মিষ্ট কুমড়াও একপ্রকার এখনও বিলাতী বলিয়া পরিচিত হয়। কুমড়া বা কুষ্মাণ্ড বলিতে চাল-কুমড়া বুঝাইত, উত্তর দিকে ইহাই ভূমির উপর হইয়া গেমি-কুমড়া নাম ধারণ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত নানা জাতীয় ডাটা, পালংশাক, কাকরোল, পানিকচু, শাক-আলু (মিঠে বা মৌ-আলু) সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। তালা প্রভৃতি স্থানের লঙ্কা ও ডুমুরিয়ার পালংশাক বিখ্যাত। নানাবিধ কপি, শালগম ও গোল আলুর চাষও এদেশে অনেকস্থানে হইতেছে। চই পূর্ব্ববঙ্গের একটা বিশেষত্ব। অনেকে এই গাছ মসল্যার কথা জানেন না। ইহাতে গোলমরিচের মত ঝাল, সুন্দর গন্ধ এবং ইহা শ্লেষ্মা কাশির ঔষধ। ইহা বরিশালে খুব অধিক, তন্নিম্নে খুল্‌নায় পাওয়া যায়, যশোরে তেমন নাই।

এ প্রদেশের প্রধান খাদ্য চাউল। ময়দা যাহা ব্যবহৃত হয়, সকলই বিদেশ হইতে আসে। যশোহর অপেক্ষা খুল্‌নায় ধান্য ভাল হয়। যত দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যাওয়া যাইবে, ধানের চাষ ততই সুন্দর। অর্থাৎ যে অঞ্চলে নদীসমূহ উপদ্বীপের স্বাভাবিক গঠনকার্য্যে লিপ্ত, ধান্য সেইদিকে ভাল হয়। বরিশাল জেলা বঙ্গে চাউলের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাকে বঙ্গের শস্যভাণ্ডার বলিয়া থাকে। খুল্‌নার বাগেরহাট মহকুমার অধিকাংশ এই শস্য-ভাণ্ডারের অন্তর্গত। এক খুল্‌না জেলায় বিভিন্ন নামে সহস্র প্রকার ধান্য জন্মে। স্থানান্তরে উহার একটি সাধ্যমত তালিকা প্রদত্ত হইবে। বরিশালে ও বাগেরহাটে একপ্রকার সরু পাতলা ধান জন্মে; উহা হইতে সুন্দর ভাবে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তদ্দেশীয় লোকে জানে। এই সিদ্ধ চাউল "বালাম" নামক একপ্রকার তদ্দেশীয় নৌকায় বোঝাই হইয়া দেশে দেশে বিক্রয়ার্থ যাইত, তজ্জন্য ঐ চাউলের নামই বালাম চাউল হইয়াছে। খুল্‌নার দক্ষিণে ভাটিরাজ্যে অর্থাৎ সুন্দরবন বিভাগে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার সাদা মোটা আতপ চাউল প্রস্তুত হইয়া খুল্‌না যশোরে বিক্রীত হয়, উহাকে লোকে "ভাটি-য়াল" চাউল বলে। এই সিদ্ধ বালাম ও আতপ ভাটিয়াল চাউলই যশোর খুল্‌নার উৎকৃষ্ট খাদ্য। যশোরে নবগঙ্গা ও মধুমতীর কূলে মটর, খেসারী,

ছোলা, মুগ, মসুর প্রভৃতি কলাই এবং ধ'নে, সরিষা, রাঁধুনী, কালজিরা, গুয়া-মৌরি প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র হাট-বাজারে যায়। যশোরে ও খুল্‌নায় ধান্য ও কলাইয়ের বিনিময় হইত। এখন যশোরবাসী পাট বা কোষ্ঠা বেচিয়া অর্থের লোভে উদরান্নের চাষ অনেকটা বন্ধ করিয়াছে, কাজেই ধন আসিলেও সে ধনে পেট ভরিতেছে না এবং দেশের দুর্ভিক্ষ ছাড়াইতেছে না। ভাগ্যক্রমে খুল্‌নার লোকে পাটের ব্যবসায় এখনও তেমন বুঝে নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই ব্যবসায়-বুদ্ধি দেশ হইতে লুপ্ত হউক।

নদী হইতে সুন্দরবনের দৃশ্য।
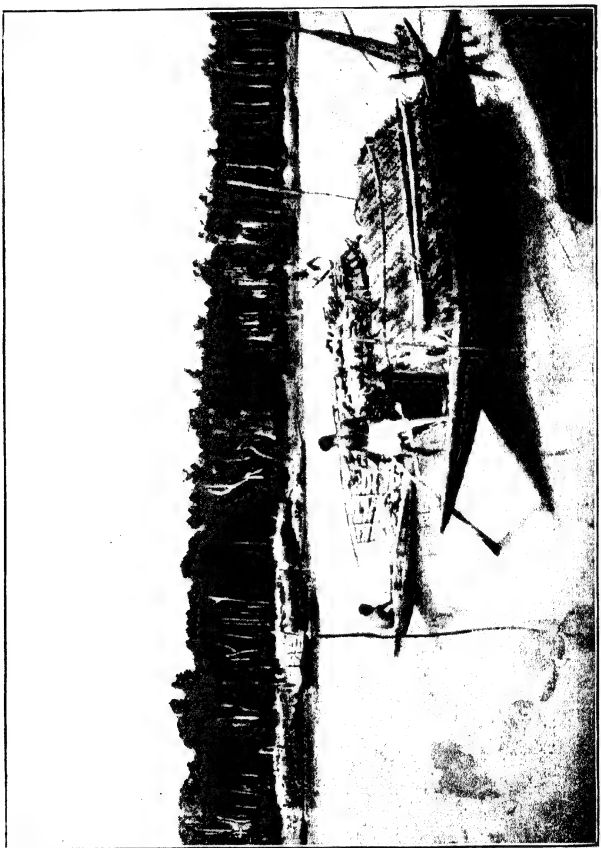
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।—সুন্দরবন।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-সীমায় অবস্থিত সমুদ্র-কূলবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগকে সুন্দর-বন বলে। নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহুশাখা বিস্তার করিয়া, সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য-বৃক্ষগুল্ম-সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ইহা পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহানা হইতে পূর্ব্বে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ মেঘনার মোহানার ও পূর্ব্বে অর্থাৎ নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার এবং হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বনভাগকেও সুন্দরবনের অন্তর্গত মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা ও মেঘনার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগই সুন্দরবন। ইহা বর্ত্তমানকালে চব্বিশ-পরগণা, খুল্‌না এবং বাখরগঞ্জ এই তিনটি জেলার অন্তর্গত এবং এই তিনটি জেলার যে অংশ চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের স্বত্বাধীন, তাহার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বপশ্চিমে সুন্দরবনের দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল, এবং উত্তর দক্ষিণে ইহার প্রস্থ পশ্চিমদিকে ৭০ মাইল হইতে পূর্ব্বদিকে ৩০ মাইলের অধিক হইবে না। গড়ে বিস্তৃতি ৫০ মাইল ধরিলে, সুন্দরবনের পরিমাণফল ৮০০০ বর্গমাইল হয়। তন্মধ্যে খুল্‌না জেলার মধ্যে ২৬৮৮ বর্গমাইল; তাহারও ৫০০ বর্গমাইল জলভাগ। পশ্চিমে ভাগীরথী হইতে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণা, কালিন্দী হইতে মধুমতী নদী পর্য্যন্ত খুল্‌না জেলা এবং মধুমতী হইতে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত বরিশাল জেলার অন্তর্গত।

সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মত আছে। সুন্দর বনে সুন্দরী (Heritiera minor) নামক এক প্রকার বৃক্ষ বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার কাষ্ঠ দেখিতে পরিষ্কার লাল বর্ণ, তজ্জন্য সুন্দর। এই নিমিত্ত ইহাকে সুন্দরী বা সুন্দর বৃক্ষ বলে। এই বৃক্ষের আধিক্য বশতঃই বনভাগের নাম সুন্দরীবন বা সুন্দরবন হইয়াছে। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ

এবং প্রবল মত। কেহ বলেন, এরূপ নামকরণ হওয়া উচিত নহে, কারণ এই বনে অনেকস্থলে সুন্দরী গাছ নাই, অথচ সর্ব্বত্রই ইহাকে সুন্দরবন বলে। তাহাদের মতে সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্রবন শব্দের অপভ্রংশ; সাধারণ লোকে সমুদ্র বলিতে সমুন্দুর বলিয়া থাকে।* বাখরগঞ্জের ইতিহাস-লেখক মহাপণ্ডিত বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে ঐ জেলার সুন্ধা নদী হইতে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাখরগঞ্জে সুগন্ধা নামে একটি প্রবল নদী ছিল। এই নদীর কূলে একটি পীঠস্থান আছে; সতীদেহ ছিন্ন হইলে এইস্থানে ৺ মায়ের নাসিকা পতিত হয়; তদনুসারে স্থান ও নদীর নাম সুগন্ধা হইয়াছিল। সুগন্ধাকেই সাধারণ লোকে সুন্ধা বলে। বাখরগঞ্জের একাংশ পূর্ব্বে সুন্ধার কূল বলিয়া উল্লিখিত হইত। বাখরগঞ্জের সভ্যতা ও প্রতিভা এই সুন্ধার কূলেই প্রথম বিভাসিত হইয়াছিল। এই কূলবর্ত্তী বনভাগ সুন্ধারবন বা সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে।† কিন্তু এরূপ ধরিলে, অন্যান্য জেলার অন্তর্গত বনভাগ যে সুন্ধার বন বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে সুন্দরী বৃক্ষ অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকল বনেই আছে; এবং উহাই সুন্দর বনের প্রধান, স্থায়ী ও মূল্যবান কাষ্ঠ। ইহার গাছে খুব সার হয়; কাষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী; গাছগুলিতে অধিক ডাল হয় না বলিয়া, ইহাতে লম্বা কাঠ পাওয়া যায়; গৃহের সরঞ্জাম, নৌকার উপাদান প্রভৃতিরূপে এই কাষ্ঠে অসংখ্য রকম প্রয়োজন সিদ্ধি করে। এজন্য সুন্দরী কাষ্ঠ সুন্দর বনের কাঠের রাজা এবং তাহারই নামানুসারে সুন্দরবন নাম হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে, পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল; চন্দ্রদ্বীপের বনভাগকে চন্দ্রদ্বীপবন বলিত। সেই চন্দ্রবন হইতেই সুন্দরবন হইয়াছে। আবার কেহ বা চণ্ডভণ্ড নামে এক বন্য জাতির সহিতও এই নামের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা

* Revenue History of Sunderbans, F. E. Pargiter, B. A., I. C. S. (1885) *and* Calcutta Review, Sunderbans vol. 89 p. 280 (1889).

† The District of Bákarganj, its History and statistics by H. Beveridge, B. C. S. p. 24 (note) and pp. 70-71.

করিয়াছেন। এই জাতির কথা বাখরগঞ্জের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, সুন্দরবন নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্ব্বে এই প্রদেশকে ভাটি প্রদেশ বলিত। নদীমাতৃক বঙ্গের ভাটা দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া সমুদ্রকূলবর্ত্তী দক্ষিণ প্রদেশকে ভাটিদেশ বলিত এবং এক সময়ে এই সকল প্রদেশীয় বারজন রাজার প্রাধান্য জন্য বাঙ্গালা দেশেরই নাম হইয়াছিল —"বারভাটি বাঙ্গালা"।* মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ভাটিনামেই এই দেশের বর্ণনা করিয়াছেন।†

কিন্তু নাম যাহাই থাকুক, সুন্দরবন চিরকাল আছে। হয়তঃ ইহা পূর্ব্বে যেখানে ছিল, এখন সেখানে নাই, কিন্তু ইহা আছে চিরকাল। গঙ্গা বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যেখানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই বেলা-ভূমির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হয়। ভগীরথ আনীতা গঙ্গা পূর্ব্বকালে যেখানে সমুদ্রে পতিত হন, সেস্থান হইতে বর্ত্তমান গঙ্গাসঙ্গম বহুশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গঙ্গা হিমালয় শীর্ষ হইতে অত্যধিক পরিমাণে গৈরিক মৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে লইয়া যান। এই গিরিমাটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ভগ্ন বা ক্ষয়িত ভূমিভাগ পলিমাটীরূপে মোহানার সন্নিকটে সঞ্চিত হইয়া, ক্রমশঃ ভূভাগের সৃষ্টি করে এবং প্রথমতঃ দ্বীপাকারে ও পরে জঙ্গলা-কীর্ণ হইয়া নিবিড় বনে পরিণত হইয়া যায়। গঙ্গানীতা পলিমাটী ও সুমিষ্ট জলের সহিত সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংযোগে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষগুল্মের সমুদ্ভব করে। উহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব। এইরূপে গঙ্গার মোহানা যত দক্ষিণদিকে সরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনও তত দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ প্রদেশ বা সমতট সমুদ্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমতটের আকার ক্ষুদ্র ছিল; ক্রমে দক্ষিণবর্ত্তী তট-

---

* "Always included under the local description of Bhatty with all the neighbouring low lands overflowed by the tides."—Grant's *Analysis of the finances of Bengal.*

† "Esan Afghan carried his conquests towards the east into a country called Bhatty which is reckoned a part of this Soobah (Bengal)." Gladwin's *Ayeen Akbari* Part I. p. 298.

ভাগ বৰ্দ্ধিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন সরিয়া যাইতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা সমতটের ভূগর্ভ খনন করিয়া নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ সহরের সন্নিকটে ভূগর্ভ খনন করিবার সময় সুন্দরবনের বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানার সঙ্গে সুন্দর বনও যে ক্রমে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের যে কোন স্থানে জলাশয়াদি খনন করিবার সময় দেখা যায়, মৃত্তিকার স্তরবিভাগ প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে।* খুল্‌না সহরের পশ্চিম পার্শ্বে এবং কলিকাতা শিয়ালদহের নিকট পুষ্করিণী খননকালে উভয় পুষ্করিণীতে মৃত্তিকা স্তরের একই প্রকার অবস্থা দেখা গিয়াছে। উভয়স্থলে মৃত্তিকানিম্নে যে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়, তাহা সুন্দরী বৃক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।† সুতরাং সমতটের সৰ্ব্বত্র যে সুন্দর বন ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আর কোন একস্থলে ভাগীরথীর উভয় পারের মৃত্তিকা খনন করিলে, পশ্চিম পারের বা রাঢ়ের মৃত্তিকার প্রকৃতি সমতটের মৃত্তিকার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সমতটের মৃত্তিকা যে ক্রমে পলি সংযোগে গঠিত হইতে হইতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।‡

সুন্দরবন বাস্তবিকই অতি সুন্দরবন। এ বনে ফল বৃক্ষ নাই; দুই একটি ফলবান বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যের কোন ফল নাই, কারণ উহার ফল অধিকাংশই মনুষ্যের অভক্ষ্য। এ বনে স্নিগ্ধচ্ছায় বহুবিস্তৃত অশ্বত্থাদি বিটপী নাই; সুন্দরবনের বৃক্ষগুলি প্রায়ই দীর্ঘ হইয়া উঠে, অধিক শাখা প্রশাখা হয় না। এ বনে পুষ্পোদ্যান নাই; ফুল ফুটে বটে, কিন্তু মনুষ্যোদ্যানের মত সযত্নবৰ্দ্ধিত সুরভি পুষ্পতরু এখানে দুষ্প্রাপ্য। আবার যাহা

---

* J. R. A. S. No. XXXIV of 1864, Mr. H. F, Blanford.

† "The trees in question were pronounced by Dr. Anderson (Superintendent of the Botanical Gardens) to be Sundri"—Gastrell's *Statistical Reports of Jessore, Faridpur and Bakerganj* p. 27.

‡ "The whole of the country including Sunderbans proper lying between the Hughly on the west and the Meghna on the east is only the delta caused by the deposition of the debris carried down by the rivers Ganges and Brahmaputra and their tributaries"—Dr. Thomas Oldham, quoted in the *Khulna Gazetteer* P. 4.
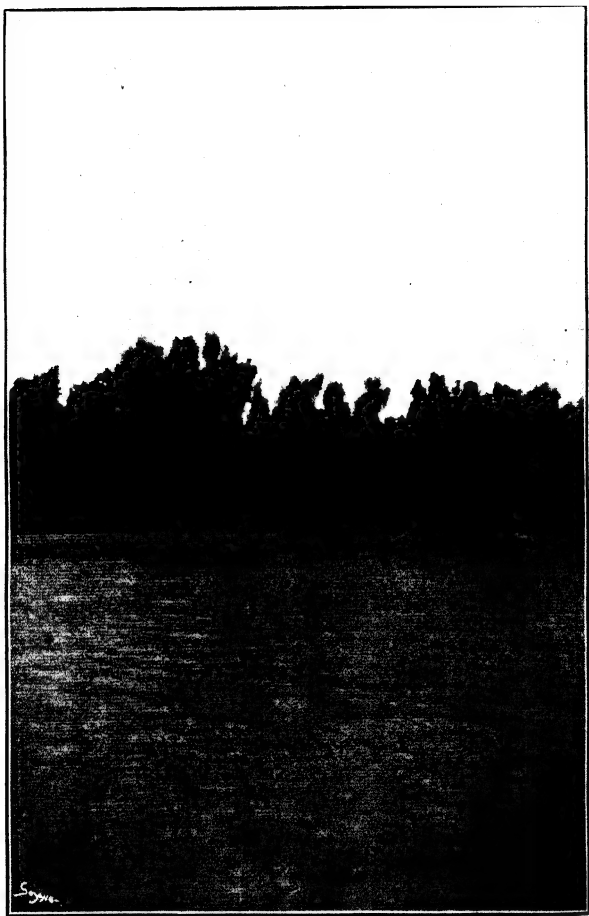
সুন্দরবনের চড়া।

(মালঞ্চ ও আড়াইবাঁকীর মোহানা)

[৪৫ পৃঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

কিছু আছে, তাহাও মনুষ্যের উপভোগের বিষয় নহে। কারণ বন এতই নিবিড়, এতই কণ্টকাকীর্ণ, এতই কর্দ্দমাক্ত এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বত্র এরূপ দুর্দ্দান্ত হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল যে এ বনে মানুষের বিহার করিবার সাধ্য নাই। তবুও সুন্দরবন বড়ই সুন্দর। এ স্থানে বন-প্রকৃতির বন্য শোভা যিনি নিজ চক্ষুতে না দেখিয়াছেন, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশই নদীমাতৃক, সুন্দরবন ততোধিক। কোনও ক্ষীণকায় নদীস্রোত যতই দক্ষিণ দিকে সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, ততই বিস্তৃত, ততই প্রশস্ত, ততই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ হইয়া, অবশেষে সাগরোপমকায়ে সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যাইতে যাইতে প্রত্যেক নদী পথের পার্শ্বে কত শাখা প্রশাখা, খাল নালা বিস্তার করিতে করিতে গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। নদী সমূহের পার্শ্বে কোথায়ও বলার ঝোপ এবং বন্য সুন্দরী ও হেন্তাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছ সমূহ স্রোতের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া, তীর ভূমি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও সুন্দরী, পশুর, গর্জ্জন বা আমুর প্রভৃতি বৃক্ষের দীর্ঘ শিকড়সমূহ বহু বিস্তৃত হইয়া প্রবল প্রবাহ হইতে বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া—ভগ্নতীরের সহিত জড়াজড়ি করিতেছে। কোথায়ও বা নদী হইতে খাল উঠিয়া আঁকা বাঁকা ভাবে বনের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, উহার দুই পার্শ্বে গোলগাছের সারিগুলি সুড়ঙ্গ পথের প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, এক অতি অদ্ভুত অথচ মনোরম বন্যশোভা বিস্তার করিয়াছে। এইরূপে নানা শোভা দেখিতে দেখিতে, নদীর স্রোতে কোন ত্রিমোহানা বা বাঁকের মুখে পৌঁছিলে দেখা যায়—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—দুই পার্শ্বে বিস্তৃত চড়া – চড়ার উপর হরিদ্বর্ণ কেওড়া বৃক্ষের শ্রেণী এবং তাহার অন্তরালে বনস্থলী। কোথাও সে চওড়া চরের উপরে কেওড়াতলায় সুন্দর ছায়ায় হরিণ চরিতেছে, কোথায়ও বা বৃক্ষের ডালে বানর নাচিতেছে এবং ডাল পাতা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হরিণ ডাকিতেছে। ভাগ্যবশে এইরূপ চড়ার সন্নিকটে পৌঁছিবার সুযোগ ঘটিলে, তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা অতি সহজ, কিন্তু ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতে কেহই পারে না। এইরূপে কোন মোহানায় কোনদিন নদীর স্থির-তরঙ্গে কেন্দ্র স্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন দিকে অকূল জলরাশি ধূমাকারে ধূ ধূ করিতেছে, কোনদিকে নব নির্ম্মিত বেলা ভূমির উপরিস্থিত চরে উচ্চ

কেওড়া বৃক্ষ সমূহের ঘনপত্রে কে যেন হরিদ্বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছে, কোনদিকে বা নদীর উচ্চ পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সুন্দর বনের বৃক্ষ সমূহের শিকড়রাশির প্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিতেছে আর তাহার নিকট দিয়া 'রূপার সূতার মত' খালগুলি সবুজ বনস্থলীর মধ্যে বঙ্কিম ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এ দৃশ্য যিনি হৃদয় ও চক্ষু লইয়া দর্শন করিয়াছেন, তিনি কখনও ভাবহীন কর্কশ ভাষায় বলিতে পারেন না যে সুন্দরবনের দৃশ্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই। * তবে একই প্রকার পদার্থ বহুবার ও বহুক্ষণ দেখিলে সকলেই বিরক্ত হয়। এজন্য বৈদেশিক ভ্রমণকারী সুন্দরবনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একই প্রকার নদী নালা, একই রকম বনস্থলী, চর ও নদীতীর দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং যতদিন না উত্তরদিগ্বর্ত্তী সেই যতদূর নয়ন যায় ততদূর বিস্তৃত, কখনও শ্যামায়মান, কখনও স্বর্ণবর্ণ, ধান্য ক্ষেত্র সমূহ দেখিতে না পান, ততদিন তাহাদের নয়নে ও মনে তৃপ্তি আসে না। † সুন্দর বনের বাদা বা বনভূমি যেমন নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আবাদ বা ধান্য ভূমি সেইরূপ পরিষ্কৃত ও শস্যাস্তরণে আবৃত হইয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে।

---o---

* "The scenery in the Sunderbans possesses no beauty. The view even from a short distance is a wide stretch of low forest with an outline almost even and rarely broken by a tree rising above dull expanse",—F. E. Pargiter, "The Sunderbans", *Calcutta Review* vol. 89 p. 281.

হয়তঃ লেখক কোনও দিন সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে কোন ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে দ্রুতগামী ষ্টীমার হইতে গরাণবন দেখিয়া, একটি বদ্ধমূল শুষ্কভাববশে নির্দ্দয় সমালোচকের মত সমস্ত সুন্দরবনের উপর লেখনী চালনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনকে সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত বলিলে নিসর্গসুন্দরী প্রকৃতির প্রতি কশাঘাত করা হয়।

† 'Most travellers in passing through this labyrinth of interminable forest, mud and water, become exceedingly wearied with the monotonous appearance of the banks and creeks and are only too glad when they escape into the open and cultivated northern parts of the delta where all the breadth of the land is one vast sheet of rice cultivation." *Calcutta Review*, march 1859.

সপ্তম পরিচ্ছেদ—সুন্দরবনের উত্থান ও পতন।

সুন্দরবন চিরকালই সমতট বা গাঙ্গোপদ্বীপের বর্ম্মস্বরূপ। শতমুখী গঙ্গা ভূমিগঠন করিতে করিতে উপদ্বীপ সীমা যতই দক্ষিণদিকে সরাইয়া লইতেছেন, সুন্দরবনও তত দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু সুন্দরবনের সেই দেশরক্ষা কার্য্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেশের জলবায়ু এবং ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার উপর বনভাগের বিশেষ আধিপত্য আছে। জলই বনের প্রাণ; এজন্য বনভাগ স্বভাবতঃ সর্ব্বত্রই মৃত্তিকার নিম্নে বর্ষার জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং বনবৃক্ষসমূহ সেই সঞ্চিত জল হইতে উৎপন্ন রসাংশ পত্রসমূহের ভিতর দিয়া বায়ুতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ইহাদ্বারা আকাশের বায়ু-শৈত্য রক্ষিত হয়। বসন্তাগমে বনভূমিতে যে পত্রপ্রাচুর্য্য দেখা যায়, তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী গ্রীষ্মের কঠোরতা—কমাইয়া দিয়া থাকে। এবং দেখা গিয়াছে যেখানে গাছের পাতা সরস থাকে, সেখানে গ্রীষ্মের গরম কষ্টদায়ক হয় না। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে অতিবৃষ্টিতে ভীষণ অনিষ্ট উৎপাদন করে। বৃক্ষহীন উলঙ্গপ্রদেশ ভাসিয়া যায়; সেখানকার মৃত্তিকা যথেষ্ট জলগ্রহণ করিতে পারে না; অথচ সে জল-প্রবাহ দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকামধ্যে জলাংশ এবং বায়ুস্তরে জলীয় বাষ্প কমিয়া যাওয়ায় আবশ্যকীয় শস্যাদির সমধিক ক্ষতি হয়। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যদেশে অতিবৃষ্টির অনিষ্ট নিবারণ জন্য কৃত্রিম চেষ্টায় জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। দক্ষিণ বঙ্গে কিন্তু জঙ্গলের আধিক্যে স্বভাবতঃ সে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এইরূপে স্বভাবের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে জঙ্গলের অস্তিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

জঙ্গলে যেরূপ নিজ দেহের শৈত্য হইতে বায়ুস্তরের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে করিতে মেঘেরও অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকে, মেঘ প্রস্তুত হইয়া সঞ্চালিত হইলে, জঙ্গলে আবার তাহাকে নিজের-দিকে আকর্ষণ করিয়া, দূরে যাইবার পথে অন্তরায় হয়। বঙ্গের দক্ষিণে সাগরকূলে যদি বিশাল অরণ্য না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের মেঘসমূহ উত্তর মুখে দূরে চলিয়া গিয়া,

হিমালয়ের উপত্যকায় বারিবর্ষণ করিত; তখন দক্ষিণ বঙ্গ বালুকা প্রান্তরে পরিণত হইয়া একপ্রকার মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। এখন যেমন ভাটিরাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে, প্রথমে পদ্মার প্রবল প্রবাহ, পরে নদীমাতৃক উচ্চদেশে মানুষের বসতি, তাহার পরে মানুষের খাদ্যের জন্য নিম্নতল উর্ব্বরক্ষেত্রে ধান্যের প্রাচুর্য্য এবং সর্ব্বশেষে দুর্ভেদ্য প্রাকারের মত সুন্দরবনের এই নিবিড়জঙ্গল শ্রেণী—এমন দৃশ্য আর দেখা যাইত না।

জঙ্গলের জন্য আরও অনেক বিপদ হইতে দেশ রক্ষা হইতেছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস একান্ত প্রবল হইলেও সম্পূর্ণভাবে দেশ ভাসাইতে পারে না; সমুদ্রের ঝটিকাবর্ত্ত বা বায়ুপ্রবাহ বসতি স্থান সমূহ উৎখাত করিতে পারে না। পুরী-প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের বায়ুপ্রবাহ বা বালুকাময় আবর্ত্ত হইতে সহর রক্ষা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অসংখ্য ঝাউগাছ দিয়া সমুদ্রোপকূল ঢাকিয়া রাখিতে হইয়াছে। অনেক সভ্যদেশে আজকাল এইরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থায় জঙ্গল প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক সময়ে সমস্ত সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত স্থান আবাদ করিবার কল্পনা চলিতেছিল; অনেক বিষয় ভাবিয়া পরে সে প্রস্তাবনা স্থগিত করা হইয়াছিল। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে। জঙ্গল রক্ষা করিবার অনুকূলে যে সমস্ত কারণ আছে, উপরোক্ত কয়েকটি কথাও তাহার অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবন আবাদ করিবার কল্পনা করিলেই যে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা নহে। এ জঙ্গলের জমি নিজে না উঠিলে তাহাকে উঠান যায় না। যে স্থানে জমি নিম্ন থাকে, সেখানে তাহার প্রকৃতিই এইরূপ যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার জঙ্গল ধ্বংস করা যায় না। জঙ্গল কাটিলে আবার হয়, জঙ্গলের বীজ মাটীর সঙ্গে মিশিয়া থাকে, জলপ্রবাহ ও পলির সঞ্চয় তাহার সাহায্য করে। ক্রমে যখন আপনা হইতে জমি উন্নত হইতে থাকে, অমনি জঙ্গল আপনি কমিয়া আসে; তখন মানুষের হস্তকৌশলের সাহায্য পাইলে, আবাদের উপযোগী ক্ষেত প্রস্তুত হইতে পারে। তখন আবার তাহাতে ধান্যাদি হয়, বৎসরে বৎসরে স্বল্পায়াসে প্রচুর শস্য জন্মায়। ক্রমে জমি আরও উচ্চ হয়, তখন ধান্যোৎপাদনের উর্ব্বরতা লুপ্ত হইতে থাকে। উচ্চ জমি পাইয়া মানুষে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করে। বসতির পার্শ্বে ফলের বাগান প্রস্তুত

হয়। তখন সুন্দর বনের স্মৃতি লুপ্ত হয়। কেবল মাত্র পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিবার সময়ে, মৃত্তিকার নিম্নে কোথায়ও জোব মাটী, কোথায়ও সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গুঁড়ি, কখন কখন বৃহৎ পাটুলি প্রভৃতি নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীন কালের পরিচয় প্রদান করে।

এইরূপে ভাটিরাজ্যের জমি ক্রমে দক্ষিণ দিকে নিম্ন হইতে হইতে, সমুদ্রের সহিত সমতল হইয়াছে। যখন সমুদ্রে প্লাবন উঠে, তখন তাহাতে নিম্ন প্রদেশ প্রতিপক্ষে কয়েকদিন জলে ডুবিয়া থাকে। পক্ষে পক্ষে এইরূপে ডুবে এবং সমস্ত জঙ্গলের ভূমি-পৃষ্ঠ কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই আবার সুন্দরী প্রভৃতি বন্যবৃক্ষের জীবন ধারণ পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সাধারণতঃ সুন্দরবনের এই অবস্থা চলিতেছে।

কিন্তু সময় সময় এক একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। কখনও কখনও ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া, বহুবৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল এরূপ দুর্ভেদ্য ও ভয়সঙ্কুল হয় যে লোকের পক্ষে আবাদ করা বা কাষ্ঠ সংগ্রহ করা উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল ঝটিকার সময় নদীর গতি দুই একস্থলে এমন বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয় যে, কোন প্রকাণ্ড নদী বালুকা-মণ্ডিত হইয়া প্রবাহশূন্য হয় এবং নিকটবর্ত্তী অন্য একটি ক্ষুদ্র খাল সামান্য পয়ঃপ্রণালী হইতে প্রবল নদীতে পরিণত হয়। কোনস্থান বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হয় এবং অন্য কোন স্থান কারণবিশেষে দ্রুতবেগে উন্নত হইবার সুযোগ পায়।

ঝটিকা ব্যতীত অন্য কারণেও যে সুন্দরবনের জমি বসিয়া যায়, তাহা জানা গিয়াছে। হঠাৎ কোন সুন্দরবনের অঞ্চল বিশেষ এমন ভাবে ডুবিয়া যায় যে, ঐ প্রদেশে যে সমস্ত লোকের বসতি ছিল বা অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই অধোগত বা জলমগ্ন হইয়া লোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ও মনুষ্যের সভ্যতা চিহ্ন ফেলিয়া রাখিয়া, প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে যায়। নিম্ন জমিতে জঙ্গল বৃক্ষসমূহ পূর্ণস্ফূর্ত্তিতে বাড়িয়া উঠে; ইষ্টকগৃহ থাকিলে, তাহা জঙ্গলাবৃত হইয়া অমাবস্যা পূর্ণিমার জলপ্লাবন কালে ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থান রূপে পরিণত হয়; এবং ভবিষ্যতে কোন অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারীর বিস্ময় উৎপাদন করে।

সুন্দরবনের এরূপ অল্প বিস্তর উত্থান পতন যখন তখন হইয়া থাকে। কিন্তু

বহু বৎসরের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সুন্দরবনে ২।৩ বার ভীষণ অবনমন (Subsidence) হইয়াছিল। * স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে দেখা গিয়াছে যে ৩০ ফুট নিম্নতল পর্য্যন্ত গেলেও সুন্দরবনের চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান খুলনা সহরের পশ্চিমধারে এবং কলিকাতা শিয়ালদহে পুষ্করিণী খননকালে নিম্নস্থ ভূ-পঞ্জরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার দুইটি প্রতি-

খুলনার পুকুর
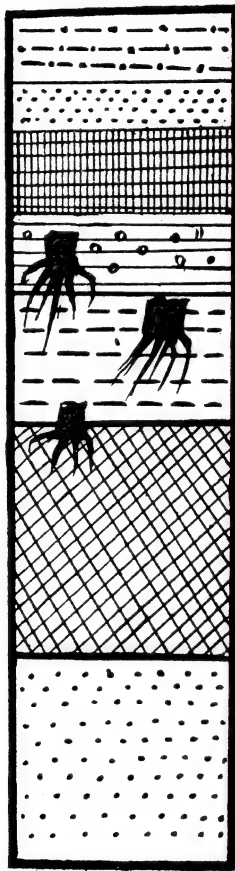
দো-আস্‌লা মাটী।

৪′—৪″ বালুকা।

৭′—৪″ কর্দ্দমাক্ত বালি ক্রমে নিম্নে কঙ্করময় শক্ত কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে।

১৮′ জোব মাটী ও কর্দ্দম।

২৫′ বালুকামিশ্রিত কর্দ্দম।

৩৯′ বালুকা।

---

* 'That a general subsidence has operated over the whole extent of the Sundorbans, if not of the delta entire, is, I think, quite clear from the result of examination of cuttings or sections made in various

কৃতি প্রদত্ত হইল।* খুল্‌নার পুকুর হইতে দেখা যাইতেছে যে, ৪´-৪´´ ইঞ্চি দো-আসলামাটীর নিম্নে ৩´ফুট বালুকা পরে ৯´-২´´ বালি সংযুক্ত মাটী ও পরে পরিষ্কার কর্দ্দম। তাহার নিম্নে জোব মাটী বাহির হয়, উহার মধ্যে অর্থাৎ ১৮´ ফুটের নিম্নে প্রথম সুন্দরীগাছের গুঁড়ি দেখা যায় এবং ২৫´ফুট পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য গুঁড়ি বর্ত্তমান ছিল। দৌলতপুর কলেজ-প্রাঙ্গণে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের তত্ত্বাবধানে খুল্‌না-ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড দ্বারা যে বড় পুষ্করিণী

শিয়ালদহের পুকুর
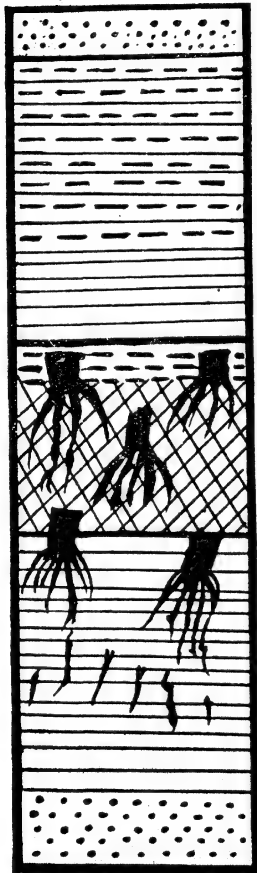
পরিষ্কৃত বালুকা

দো-আস্‌লা মাটী

আটাল মাটী

২০´ জোবের মধ্যে
২১´ বৃক্ষের গুঁড়ি

বালি মিশ্রিত আটাল মাটীর মধ্যে বৃক্ষের
৩১´ গুঁড়ি

বৃক্ষের সহিত সম্বলিত নীলবর্ণ কর্দ্দম

৪৬´ কাল অঙ্গারাক্ত বালুকা

parts where tanks were being excavated." *Gastrell's Statistical Report of the Districts of Jessore, Faridpur and Backerganj*, p. 29.

* J. A. S. B. No. XXXIII of 1864. Gastrell's Report, Appendix IV.

খনিত হয়, তাহাতে ৯ ফুটের নিম্নে সামান্য জোবমাটী, পরে একটু বালি এবং ক্রমে ২১´ ফুট পর্য্যন্ত পরিষ্কার আটালমাটী। তাহার নিম্নে পুনরায় ২।৩ ফুট জোবমাটী এবং সঙ্গে সঙ্গে ২৬´ ফুট পর্য্যন্ত সমস্ত তলভাগটি অসংখ্য সুন্দরী প্রভৃতি গাছের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়িদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই গুড়ি গুলির নিম্নে কিছুদূর পর্য্যন্ত দু'ধে মাটী (শ্বেতাভ অত্যন্ত আটাল মাটী) পাওয়া যায়। ২৯´ ফুটের পর পুনরায় জোবমাটী ও বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল। এ পুকুরে ৯´ ফুট হইতে ৪০´ ফুট পর্য্যন্ত কোন বালিস্তর দেখা যায় নাই। কলিকাতা শিয়ালদহের নিকট খনিত পুষ্করিণীর ৩০ ফুট নিম্নে অসংখ্য গুঁড়ি পাওয়া যায়। * এই সকল পরীক্ষা হইতে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলের একটা সাধারণ মৃত্তিকার অবস্থা জানা যায়, এবং সর্ব্বত্র যে একটা সাধারণ নিমজ্জন হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হয়।

মাতলা নামক স্থানে একটি পোর্ট বা বন্দর খুলিবার পর যখন সেখানে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়, তখন দেখা গিয়াছিল যে ৮।১০ ফুট মাটীর নিম্নে একটু সংকীর্ণ স্থানে ৪০টি সুন্দরীবৃক্ষ সোজা দণ্ডায়মান রহিয়াছে; খুল্‌না বা শিয়ালদহে যেমন বৃক্ষগুলির গুঁড়িমাত্র পাওয়া গিয়াছিল, মাতলায় কিন্তু বৃক্ষগুলি প্রায় সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান ছিল। নিমজ্জন ব্যতীত আর কোন কারণে এরূপ হইতে পারে না। কি কারণে বা কতবার এইরূপ অবনমন হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খুল্‌না ও শিয়ালদহে ভগ্ন বৃক্ষের গুঁড়ি ও উপরে জোব মাটি দেখিয়া বোধ হয় যে ভূমির নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবল ঝটিকা বা জলোচ্ছ্বাস ছিল এবং মাতলার অবস্থায় বোধ হয় শুধুই নিমজ্জন হইয়াছিল, তখন কোন ঝটিকা বা আবর্ত্ত উঠে নাই। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন কারণে জমি বসিয়া গিয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

কি কারণে এইরূপ অবনমন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন বঙ্গোপসাগরের মালঞ্চ মোহানা ও রায়মঙ্গল হইতে দক্ষিণ দিকে একস্থানে অতলস্পর্শ (Swatch of No Ground) আছে, উহা ২১°

* The part of chief interest in the Sealdah section is the occurrence of tree stumps *in situ* at the depth of 30ft. and the evidence afforded thereby of a general depression of the delta"—H. F. Blanford A. R. S. M., F. G. S. in J. A. S. B. No. XXXIII.

হইতে ২১°—২২' অক্ষরেখার মধ্যবর্ত্তী। এইস্থানের চারিদিকে জলের গভীরতা ৫০।৬০ ফুট, কিন্তু অতলস্পর্শের গভীরতা হঠাৎ একেবারে ১৭।১৮ শত ফুট হইবে। * ফার্গুসন সাহেব বলেন যে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব পশ্চিমদিক্ হইতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাত জন্য ঐ স্থানে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং তথায় কোন প্রকার মাটী পড়িয়া জমিতে পারে না। † ঘূর্ণিত মৃত্তিকা কতক সুন্দরবনের দক্ষিণোপকূলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চর বৃদ্ধি করে, কতক সাগরের মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া দ্বীপ গঠন করিতেছে। বঙ্গোপসাগরে পড়িবার কালে সকল নদীরই গতি এই অতলস্পর্শের দিকে প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য সুন্দরবনের দক্ষিণে নদীমুখে যে সকল চর পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের অগ্রভাগই—অতলস্পর্শাভিমুখে রহিয়াছে। পূর্ব্বদিক্‌স্থ চরের মুখ পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিমদিক্‌স্থ চরের মুখ পূর্ব্বাভিমুখে আছে। সুন্দরবনের ভূপঞ্জরের নিম্নদেশ হইতে † কর্দ্দমবৎ মৃত্তিকা অবিরত অল্পে অল্পে ধুইয়া ধুইয়া স্রোতের গতি অনুসারে এই অতলস্পর্শের গহ্বরে পড়িতেছে; এইরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত নিম্নস্থ মৃত্তিকা সরিয়া যাওয়ায় সুন্দরবনের উপরিস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের অতিরিক্ত গুরুভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে একস্থানে বসাইয়া দেয় ‡; জমি নিম্ন হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জলপ্লাবনে সে দেশ ডুবিয়া যায়, এবং সেই জলের সহিত মিশ্রিত পলি ক্রমে স্থির হইয়া নিম্নে পড়িতে থাকে ও জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলস্পর্শের জন্য এইভাবে সুন্দরবনের উত্থান পতন হয়। § সুতরাং এই অতলস্পর্শই সুন্দরবনের অবনমন ও তজ্জন্য উহার সাময়িক ধ্বংসের প্রথম ও প্রধান কারণ। ¶

---

* "In the sea outside the middle of the delta there is a singularly deep area known and marked on the charts as the "Swatch of No Ground," in which soundings which are from 5 to 10 fathoms all round, change almost suddenly to 200 and even to 300 fathoms."—R. D. *Oldham's "Manual of Geology"*

† Mr. J. Fergusson in his paper on the delta of the Ganges published in the Quarterly Journal of the Geographical society for 1863. see also "*Khulna* Gazetteer" p. 199.

‡ Calcutta Review, *the Gangetic delta* 1859.

§ বঙ্গদর্শন ২য় ভাগ ১২৮০ "অতলস্পর্শ" প্রবন্ধ। ২১৪ পৃঃ।

¶ The present desolate condition of the Sunderbans may be due to a subsidence of the land and that this may have been contemporaneous with formation of the submarine hollow known as the "Swatch of No Ground"—*Beveridge's "History of Bakarganj"* p. 169.

এই অতলস্পর্শ যেমন এইরূপ ধ্বংসনামা বা অবনমনের কারণ, তেমনি ইহাকে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনার মূল বলা হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে সমস্ত স্থানে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সময়ে সময়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে কামানের শব্দের মত এক প্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শুনা যায়। খুল্‌না যশোহর বা চব্বিশ পরগণায় এই শব্দ বরিশালের দক্ষিণাংশ হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়; এ জন্য সাহেবেরা ইহাকে "Barisal guns" বা বরিশালের কামান বলিয়া থাকেন। বরিশালের নিম্নশ্রেণীর লোকে বলে ইহার নাম "গাইবী আওয়াজ" বা দৈব শব্দ। এ সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলে লঙ্কাদ্বীপে রাবণের বিশাল তোরণদ্বার খোলা বা বন্ধ করিবার সময়ে এইরূপ শব্দ হয়; মুসলমানেরা বলে তাহাদের ইমান আসিতেছেন, তাঁহারই যুদ্ধোদ্যমের জন্য কামানের শব্দ শ্রুত হয়। কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ বলেন, ইহা বিবাহাদি সমারোহের জন্য বন্দুকের শব্দ, কেহ ভাবেন ইহা সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত শব্দ, * কেহ মনে করেন ইহা সেইরূপ তরঙ্গাভিঘাতে জলনিক্ষিপ্ত ভূমিখণ্ডের পতন শব্দ। কিন্তু ইহার কোন কারণই বিশ্বাস করা চলে না; কারণ, শব্দটি মাত্র বর্ষাকালে শুনা যায়, এবং উহা এতদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসে যে, সাধারণ পরিজ্ঞাত কোন শব্দ ততঃ দূরে যায় না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বদর্শীদের মধ্যে কেহ অনুমান করেন যে বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শ হইতেই এই শব্দ সমুত্থিত হয়। † বর্ষাকালে যখন নদীসমূহের জলবাহুল্যে সমুদ্রে স্রোতোবেগ বৃদ্ধি করে, তখন উক্ত অতলস্পর্শ স্থানে জলপতন শব্দ হইতে এই ভীষণ নিনাদ উত্থিত হয়। যখন এতদঞ্চলের অনেক স্থান হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এবং বিশেষতঃ কোন একটি প্রবল বৃষ্টির পর এই শব্দ অতি স্পষ্টভাবে শুনা যায়, তখন বর্ষা বা জলপ্রবাহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে, এরূপ স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। তবে একটি কথা আছে, শব্দটি খুল্‌না জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং বরিশালের ঠিক দক্ষিণে শুনা যায়; তাহা হইলে বরিশালের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে উহার স্থান হওয়া উচিত, কিন্তু অতলস্পর্শের স্থানটি রায়মঙ্গলের মোহানার

* Opinion of Mr. Pellew, Superintendent of Survey at Barisal. see J. A. S. B. vol. 36, p. 118 &c.

† Beveridge, History of Bakarganj, p. 14.

সন্নিকটে অর্থাৎ খুল্‌না চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত। সেখান হইতে শব্দ আসিলে খুল্‌নার দক্ষিণে ও বরিশালের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শব্দ শুনা উচিত। শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব বরিশালের দক্ষিণস্থিত কুক্‌রি মুক্‌রি দ্বীপে ভ্রমণসময়ে তথাকার বিশ্বস্ত মগজাতীয় অধিবাসিগণের নিকট অবগত হন যে, তাহারা দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এই তিন দিক্‌ হইতে শব্দ শুনিতে পায়। * দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু উত্তর দিক্‌ হইতে কিরূপে শব্দ আসিতে পারে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। বাবু গৌরদাস বসাক বলিতেছেন যে সমুদ্রের দিক্‌ হইতে শব্দ আসিলে, খুল্‌না বরিশালে যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে, শব্দ ততই উচ্চতর হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। তিনি মোরেলগঞ্জের পথে টাইগার পয়েণ্ট (Tiger point) পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু শব্দ উচ্চতর হয় নাই। † কেহ কেহ বলেন এই ভীষণ শব্দ গভীর সমুদ্রে তরঙ্গাভিঘাত জন্য হইয়া থাকে। যখন প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তখন জলোচ্ছ্বাস প্রথমে উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠে, পরে হঠাৎ গা ছাড়িয়া দিয়া ভীমবেগে নিম্নে পতিত হয়। ঐ পতন সময়ে একটা ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে, তাহাই "বরিশাল গান"। এই শব্দটি সাগরের মধ্যে নানা সময়ে নানাস্থানে হয়, এজন্য কখনও পূর্ব্ব-দক্ষিণ, কখনও দক্ষিণ এবং কখনও বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শুনা যায়। কিন্তু তরঙ্গ-সম্ভূত শব্দ হইলে প্রত্যেক সমুদ্রকূলে এ শব্দ শুনা যাইত। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী অংশ ব্যতীত অন্য অংশে এ শব্দ শুনা যায় না। সুতরাং "বরিশাল গানের" প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা কঠিন। বহু গবেষণার পর মহামতি বিভারিজ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা বায়ুমণ্ডলের কোন বৈদ্যুতিক ব্যাপার হইতে সম্ভূত। ‡ কেহ কেহ অনুমান করেন, আরাকাণের উপকূলে ভূগর্ভে একটি আগ্নেয় গিরির শ্রেণী আছে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অগ্ন্যুদ্গমের সহিত "বরিশাল গানের"

---

* Beveridge's Bakargunj pp. 167-8.

† Babu Gourdas Basak's "Antiquities of Bagerhat", J. A. S. B. 1867-8.

‡ "The conclusion which I come to is that the sounds are atmospheric and in some way connected with electricity" *Beveridge's Bakargunj* p. 168.

শব্দোৎপত্তির সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা একটি অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। *

যাহা হউক, "বরিশাল গান" বা অতলস্পর্শ এই উভয়ের ভিতর কার্য্যকারণ-সম্পর্ক আছে কিনা, অথবা উভয় ঘটনারই পৃথক্ পৃথক্ মূলকারণ কি কি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এদিকে বৈজ্ঞানিক বা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তবে উভয়ই যে সত্য ঘটনা তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই এবং এই অতলস্পর্শের সহিত যে সুন্দরবনের অবনমনের একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল, এই অতলস্পর্শ সুন্দরবনের অবনমনের প্রধান কারণ। সুন্দরবনের নিম্নস্থিত মৃত্তিকার কর্দ্দম-প্রকৃতি অবনমনের দ্বিতীয় কারণ এবং ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব উৎপাত তাহার তৃতীয় কারণ। অবনমনের আরও কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু যে কারণেই হউক, বহুবার সুন্দর বনে এইরূপ অল্পবিস্তর অবনমন হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা যে সুন্দরবনের অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অবনমনকেই আমরা সুন্দরবন ধ্বংসের প্রথম কারণ ধরিতে পারি।

সুন্দরবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবন। অতি প্রাচীনকালে কি হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গত চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কয়েকবার ঝটিকা ও জলপ্লাবনাদিতে সুন্দরবনের যে অসংখ্য প্রাণিহত্যা ও অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। বাদসাহ আকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে এক দিন অপরাহ্নে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায়; উহাতে অল্প সময়ের মধ্যে এমন জলপ্লাবন হয় যে সমস্ত বাক্‌লা সরকার বা চন্দ্রদ্বীপ জলমগ্ন হইয়া যায়। ক্রমাগত ৫ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছিল; সমুদ্র উত্তালতরঙ্গ তুলিয়া রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ঘরবাড়ী, নৌকা জাহাজ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় এবং প্রায় দুই লক্ষ লোক

---

* "The "Barisal Guns" prove that there is some volcanic action going on below the land or the Bay"—G. D. Bysack's letter to the *Englishman* 17-6-1897.

"Whether this volcanic action contributes in any thing to cause the sounds popularly known as the "Barisal Guns" has yet to be established"—H. J. Rainey.

মৃত্যুমুখে পতিত হয়।* এতদ্দ্বারা খুলনার দক্ষিণস্থিত সুন্দরবনেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। উহার জন্যই মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় রাজধানীর দক্ষিণে যমুনা ও আড়পাঙ্গাসিয়ার নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশে এবং উত্তরে কালীগঞ্জ হইতে পূর্ব্বমুখে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত ও পশ্চিমমুখে ভাগীরথী তীরে রায়গড় পর্য্যন্ত মৃত্তিকার বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বাঁধের অনেকাংশ এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

পরবর্ত্তী ভীষণ ঝটিকা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হয়। উহাতে সাগরদ্বীপে ৬০ হাজারেরও অধিক লোক মারা গিয়াছিল।† প্রতাপাদিত্যের যুগ পর্য্যন্ত সাগরদ্বীপের উন্নতির সময় ছিল। প্রতাপকে সাগরদ্বীপের শেষ নৃপতি বলিয়া থাকে। প্রতাপের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দরবনের একটি অবনমন হয়, তজ্জন্য অল্পদিন মধ্যে উহার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তখন হইতে একশত বৎসর পর্য্যন্ত সাগরদ্বীপের কিছু সৌষ্ঠব ছিল, এই ঝটিকাই তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এক প্রকাণ্ড সাইক্লোন বা ঝটিকাবর্ত্ত সুন্দরবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। উহাতে বৃক্ষাদি ও মনুষ্যজীবনের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। সুন্দরবন বা সন্নিহিত প্রদেশে যাহারা অধিবাসী ছিল, তাহারা সকলে স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে পলায়ন করিতেছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভয়ানক ঝড় হয়। তদ্দ্বারা ইংরাজদিগের কলিকাতা বা হুগলী-স্থিত কারখানা সমূহের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ঝড়ের পর সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের আবাসশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে ত্রিশ হাজার লোক মরে এবং গঙ্গার জল ৪০ ফুট উঠিয়াছিল।‡ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৪ মে (১২৬৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ) যশোর-খুলনা ও সুন্দরবনে প্রবল ঝড় হয়, উহাতেও কম ক্ষতি করে নাই, ইহার নাম বিখ্যাত "জ্যৈষ্ঠ ঝড়"। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর একটি ঝড় ও তৎসহ প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইয়া কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহের

---

* *Ain-i Akbari* Book III. Gladwin's Edition p. 304.

† *Imperial Gazetteer* Vol XII p. 110.

‡ *Gentleman's Magazine* of 1838-39; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for December, 1868. অনেকে এ বিবরণী অতি রঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। see H. B. H's. letter to the *Englishman* 2-7-1897.

ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক বড় জাহাজ, লক্ষ লক্ষ নৌকা ও অগণিত মনুষ্যজীবন নষ্ট হয়।* ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর (১২৭৪ সালের ১৬ই কার্ত্তিক) আর একটি বিখ্যাত ঝড়ে সাগরদ্বীপ হইতে পাবনা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যায়। খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নদীতে তীরের উপর ৪ হাত জল হইয়াছিল; আরও দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে ৯ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত জল হয়। ইহাদ্বারা যমুনা নদী কালীগঞ্জের দক্ষিণে একেবারে মরিয়া যায়। তাহা না হইলে প্রাচীন যশোর রাজধানীর আজ এ দুর্দ্দশা হইত না। এই "কার্ত্তিকে ঝড়ে" সুন্দরবনের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বহু বৎসরে পূরণ হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টবর সুন্দরবনের পূর্ব্বাঞ্চল অর্থাৎ সন্দীপ, হাতিয়া দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া বরিশাল পর্য্যন্ত এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও সামুদ্রিক প্লাবন প্রবাহিত হয়। ইহাতে দৌলতখাঁ উপবিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছিল। উচ্চ বৃক্ষাগ্র পর্য্যন্ত জল উঠিয়া গৃহাদি ও জীবজন্তু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি অঞ্চলেই দশলক্ষ লোক গৃহশূন্য হয় ও দুই লক্ষের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা অগণিত। এই সময় হইতেই সুন্দরবনের পূর্ব্বভাগ বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়ে।

সুন্দরবন ও খুল্‌না প্রভৃতি জেলা বঙ্গসাগরের নিকট থাকিয়া সর্ব্বদাই ঝড়ের অত্যাচার সহ্য করে। সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝটিকাবর্ত্তের হিসাব দেওয়া যায় না। গত বিংশাধিক বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ঝড় হইয়াছিল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (বা ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন)। এ ঝড় খুল্‌না অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা দেশের এবং বিশেষতঃ সুন্দরবনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইহার পরে সুন্দরবনে প্রাচীন বা বড় বৃক্ষ প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। ভগ্নবৃক্ষের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখায় সুন্দরবনের নিবিড় বন এখনও সম্পূর্ণ দুর্গম হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে বারংবার ঝটিকা, জলস্তম্ভ, প্রবল প্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক উৎপাতে সুন্দরবনের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহাকে মনুষ্যাবাসের পক্ষে অযোগ্য করিয়া

* Bengal under Lieutenant-Governors, vol I- pp. 298-302.

তুলিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাই নহে, ভূমিকম্পকেও তাহার ধ্বংসের অন্যতম বা তৃতীয় কারণ ধরা যাইতে পারে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল তারিখে একটি ভূমিকম্প আরাকাণ হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা দিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা দ্বারাও সুন্দরবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাতে সুন্দরবন এক প্রকার ডুবিয়া গিয়াছিল, কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার জলও ৬ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে।* ১৮১০ ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গোপদ্বীপে দুইটি ভূমিকম্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা তত গুরুতর নহে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর যে ভূমিকম্প হয়, তাহাই অত্যন্ত গুরুতর, উহা দ্বারা গঙ্গোপদ্বীপ হইতে আফগানিস্তান পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। ২৪পরগণা বা যশোহরের মধ্যে কোন স্থানে এই ভূকম্পন প্রথম আরম্ভ হয়।† বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ভীষণ শব্দের সহিত জমি উচ্চ হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা সুন্দরবনেও অশেষ ক্ষতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে। ইহাতে আসাম হইতে সাহাবাদ ও সিকিম হইতে পুরী অর্থাৎ সমস্ত বঙ্গ বিলোড়িত হয়। ইহা দ্বারা রাজসাহী বিভাগ, কুচবেহার ও ঢাকা ময়মনসিংহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইলেও পদ্মার দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপদ্বীপেও নিতান্ত কম ক্ষতি হয় নাই।‡

সুন্দরবন ধ্বংসের চতুর্থ বা শেষ কারণ মগ ও ফিরিঙ্গিদিগের§ অমানুষিক অত্যাচার। সময় সময় প্রদেশ বিশেষের অবনমনে, বঙ্গসাগরোপকূলের চিরসহচর

---

* Report of the Rev. William Hirst M. A., F. R. S. sent to the Royal Society, 1762.

† Opinion of Lieutenant Baird Smith. See *"Friend of India"* 17-11-1842.

‡ The Earthquake in Bengal and Assam", 1897; Bengal under Lieutenant Governors vol. II. p. 1001.

§ ফিরিঙ্গি (Feringi, Firingi, Feringee বা Feringhee) শব্দ ফরাসী ফ্রাঙ্ক (Frank) কথা হইতে উৎপন্ন। আরব ও পারসিকদিগের সহিত ধর্ম্মরাজ্য প্যালেষ্টাইন লইয়া সংঘর্ষের (crusade) সময় সমস্ত ইয়োরোপীয় খৃষ্টানগণ ফ্রাঙ্ক নামে অভিহিত হইতেন। ঐ সময়ে সকলের বোধগম্য যে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহার নাম Lingua Franca বা ফ্রাঙ্ক ভাষা। এই ফ্রাঙ্ক কথা পারসীক ও আরবীয়েরা ফেরঙ্গ (Ferang, *Per.* Frang

ঝটিকা, প্লাবন ও ভূমিকম্পে সুন্দরবন ধ্বংসের যাহা বাকী ছিল, এই আরাকানবাসী মগ ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ফিরিঙ্গি জাতীয় জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্যে তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে হারমাদও বলিত।† ইহারা গঙ্গাসাগর-সমীপবর্ত্তী প্রদেশকে উৎসন্ন করিয়া—"ফিরিঙ্গির দেশ" করিয়া লইয়াছিল এবং মগেরাও সুন্দরবনের অনেক স্থান লোক শূন্য করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী

Ar. Firanji) উচ্চারণ করিত। উহারই অপভ্রংশে ফিরিঙ্গি হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশকে ফিরঙ্গ দেশ ও তদ্দেশবাসীকে ফিরঙ্গি (পুং) এবং ফিরঙ্গিণী (স্ত্রী) বলা হইত [শব্দকল্পদ্রুমে ২৮০৪পৃঃ ও বাচস্পত্যে ৪৫৫৫ পৃঃ "ফিরঙ্গ" শব্দ দেখ] ইহাদের আনীত রোগ বিশেষকে ফিরঙ্গব্যাধি ও এক প্রকার রোটিকাকে ফিরঙ্গ রুটি বা পাঁউরুটি বলে। ইংরাজী কোন কোন অভিধানে (*Webster's, Annandale's, Slang Dictionary*) হিন্দুরা ইয়োরোপবাসিগণকে ফিরিঙ্গি বলে এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন কোন অভিধানে (Chambers' &c.) ইংরাজদিগকেই ফিরিঙ্গি বলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ প্রভৃতি কোন উচ্চবংশীয় জাতি এদেশীয়দিগের দ্বারা ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত হইতে অপমানিত বোধ করেন। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। পর্টুগীজেরাই প্রথম পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখান হইতে পর্টুগীজ বা অন্যজাতীয় দুর্ব্বৃত্তগণ কোন অপরাধ করিয়া শাস্তির ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিত, কেহবা দস্যুবৃত্তি উদ্দেশ্য করিয়াই এদেশে আসিত। এই সকল পলায়িত বা দলচ্যুত পর্টুগীজ প্রভৃতি জাতীয়গণ এদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত হইত। "Franguis (I mean these fugitive portugals and other straggling christians that had put themselves in the service of the king (of Arracan)"—*Berinier's Travels.* আইন-ই-আকবরিতে ও ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" ফিরিঙ্গি বলিতে পর্টুগীজদিগকেই বুঝায়। এক্ষণে ইয়োরোপীয়দিগের সংশ্রবে উৎপন্ন বর্ণসঙ্করকে ফিরিঙ্গি বলে। ("The mixed descendants of Europeans"—*See* Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 203 *Note*)

† The word Harmad is evidently Armad, a corruption of armada. Armad is used in the sence of fleet in 'Kalimat-i-taiyabat—

Prof. J. N. Sarkar. Anecdotes of Aurangzeb, p. 202. J. A. S. B., June, 1907, p. 425.

"ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে,
রাত্রিতে বাহিয়া যায়, হারমদের ডরে।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

মেজর রেনেল-কৃত গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মানচিত্র।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র - প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য
মামুদসাহী
কিনাদহ
নলডাঙ্গা
মহম্মদপুর
মহেশপুর
খাজুরা
কাল্‌না
যশোর
নীলগঞ্জ
মুড়লী
দাউদপুর
বামডী
কালিয়া
বনগ্রাম
শ্রীনগর
চাঁদপাড়া
মির্জানগর
সোনাবাড়িয়া
রামচন্দ্রপুর
খুলনা
বাগেরহাট
বামুনদিয়া
বরাহনগর
দমদম
কলিকাতা
মাজেতপুর
টাকি
হাসনাবাদ
বালিয়া
বড়িশা
আমাদি
চিংড়াখালি
রায়মঙ্গল
কুমারখালি
মাতলা
যমুনা নদী
রায়মঙ্গল নদী
হরিণঘাটা নদী
মারজাটা নদী
বড়পাঙ্গা নদী
মালঞ্চ নদী
রায়মাতলা নদী
কাঁকিয়া নদী
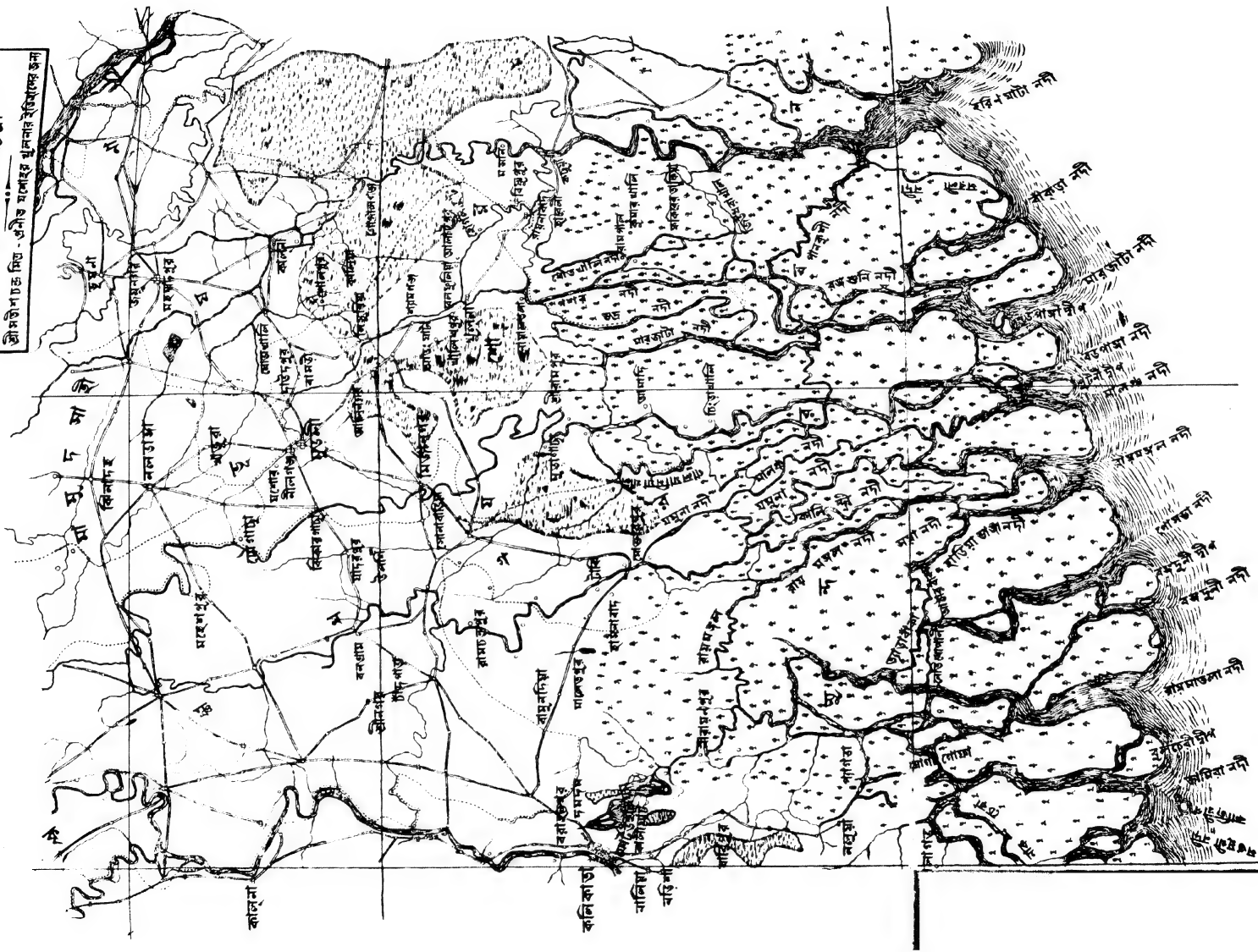
দেশে এক ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া "মগের মুল্লুক" করিয়া লইয়াছিল। স্থানান্তরে এই অত্যাচারকাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হইবে। সুন্দরবনের অনেক স্থানে পূর্ব্বে লোকের বসতি ছিল। এখন আর সে বসতি নাই বটে কিন্তু বসতি-চিহ্নের অভাব নাই।

—:o:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ—সুন্দরবনে মনুষ্যাবাস।

আমরা দেখিয়াছি, সুন্দরবন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। তবে ইহার সীমা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত ব্লকম্যান সাহেব টোডরমল্লের রাজস্ব-তালিকা হইতে দেখাইয়াছেন যে গত ৩।৪ শত বৎসরের মধ্যে সুন্দরবনের উত্তর সীমার পরিবর্ত্তন হয় নাই।* কারণ রাজস্বের পরিমাণ একরূপই ছিল। কিন্তু ১৫৮২ খৃঃ অব্দে এই রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত হইবার পর, প্রতাপাদিত্যের দুর্জ্জয় প্রতিভা বর্দ্ধিত হয়, এবং নব নব রাজ্যাংশ তাঁহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। যেখানে জঙ্গল কাটিয়া বিক্রমাদিত্যের যশোর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতাপাদিত্য তাহার বহুদূর দক্ষিণে গিয়া ধূমঘাট পত্তনে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তজ্জন্য উত্তরে বসন্তপুর হইতে দক্ষিণে ধূমঘাট পর্য্যন্ত ২২।২৩ মাইল দীর্ঘ এবং আড়পাঙ্গাসিয়া হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ১৫।১৬ মাইল প্রশস্ত বিস্তৃত প্রদেশ সম্পূর্ণ জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে চকশ্রী প্রভৃতি দ্বীপ নৌবাহিনীর আড্ডা হওয়ায় লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। বেদকাশীতে তখন লোকের বসতি থাকায় প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে সেখানে বসন্তরায় কর্ত্তৃক মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং টোডরমল্লের হিসাব প্রস্তুত হওয়ার পর সুন্দরবনের উত্তর সীমা যে অনেক দূর দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার প্রতাপাদিত্যের পতনের পর হঠাৎ জমি নিম্ন হইয়া জলপ্লাবনে প্রতাপের রাজধানী প্রভৃতি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িতে থাকে; ক্রমে ক্রমে অধিবাসীরা সরিয়া সরিয়া উত্তরদিকে যাইতেছিল; এমন কি হঠাৎ দৈশিক অবস্থা

* H. Blochmann, Geography and History of Bengal, *J. A. S. B* 1873, *p.* 231.

পরিবর্ত্তনে তাহাদিগকে টোডরমল্লের সময়ের সুন্দরবনের উত্তর সীমা হইতে আরও উত্তরদিকে যাইতে হইয়াছিল। এতৎসঙ্গে আরও একটি কথা বিবেচ্য। রাজস্বের পরিমাণ ঠিক থাকিলেই, দেশের পরিমাণ ঠিক থাকে না। বিক্রমাদিত্য যে রাজ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবেন স্থির হইয়াছিল, তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি হইলেও সে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রতাপাদিত্যের সময় রাজস্ব বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যের সীমা নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুন্দরবনের উত্তর সীমা অনবরত উত্তরে দক্ষিণে সরিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার দেখিতেছি, উক্ত উত্তর সীমার গতি দক্ষিণ দিকেই চলিয়াছে, অর্থাৎ জমি ক্রমশঃ জঙ্গলশূন্য ও শস্যোপযোগী হওয়ায় আবাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বসতিও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সুন্দরবনের উত্থান, পতন বা সীমা পরিবর্ত্তন মানুষের কোন ইচ্ছার অধীন নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভাগীরথীর মুখে ভূমি-গঠন কার্য্য বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং সুন্দরবনের সেই পশ্চিমাংশ পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা অনেক দক্ষিণদিকে অগ্রবর্ত্তী ছিল। সাগরদ্বীপ অতি পুরাতন স্থান। এখন পূর্ব্বাংশে ভূমিসঞ্চয়কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিমাংশের দক্ষিণ সীমা গত কয়েকশত বৎসরের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ঐ দিকে দক্ষিণোপকূল হইতে অতল-স্পর্শ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্বদিকে কিন্তু এই দক্ষিণ সীমা অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রকূলবর্ত্তী অনেক প্রাচীন স্থান ভিতরে পড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উভয়াংশে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমা প্রায় একই রেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ রেখা সম্ভবতঃ অতলস্পর্শের জন্য আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

এই অতলস্পর্শ বর্ত্তমান থাকিলে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমা স্থির থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অতলস্পর্শের প্রকোপে দেশে পুনরায় অবনমন সম্ভাবিত হইতে পারে। তাহা হইলে উত্তর সীমা আবার উত্তরদিকে সরিবে, এবং অনেক স্থান হইতে মনুষ্যাবাস আবার উঠিবে। কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে অতল-স্পর্শই পলিরাশিতে পুরিয়া উঠে বা সরিয়া যায়, তাহা হইলে সুন্দরবনও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিক্ হইতে লোকের বসতি

আরও দ্রুতবেগে দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া সুন্দরবনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতে পারে। তখন এই গঙ্গোপদ্বীপের এক অপূর্ব্ব গৌরবের দিন আসিবে। হয়ত আবার সমুদ্রকূলে প্রসিদ্ধ নগরী ও বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতলস্পর্শের বয়স চারি পাঁচশত বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এই সময় মধ্যে সুন্দরবন সমুদ্রদিকে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। পূর্ব্বে সুন্দরবন ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; চর যত দক্ষিণদিকে রহিয়াছে, বনও তত সরিয়া গিয়াছে এবং উত্তরাংশে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। এই উন্নত ভূভাগে শস্যের ক্ষেত্র ও লোকের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে সুন্দরবনের অগ্রবর্ত্তিতার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বসতিও তত সরিয়া গিয়াছে। আজ যেখানে বসতি, পূর্ব্বে তথায় সুন্দরবন ছিল; আজ যেখানে সুন্দরবন, ক্রমে সেখানে বসতি হইবারই সম্ভাবনা। সুন্দরবন একস্থানেও কোন দিন থাকে নাই, সুন্দরবনের অবস্থাও চিরদিন একরূপ ছিল না। যশোহর-খুল্‌নার নিম্নস্থিত ভূপঞ্জরের অবস্থা হইতে আমরা পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং সুন্দরবনে যে পূর্ব্বে বসতি ছিল না, এরূপ কল্পনা করা সমীচীন নহে।

সুন্দরবনে মনুষ্যের বসতি ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে ২টি মত আছে। প্রথম মত, দেশীয়দিগের মত। তদনুসারে সুন্দরবনে পূর্ব্বে বসতি ছিল, সুন্দর নগরীসমূহ ছিল; বহুকারণে ঐ সকল নষ্ট হইয়াছে। আমরা এই মতের পরিপোষক এবং তাহার অনেকগুলি কারণের বিষয় পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মত, বৈদেশিক মত। তদনুসারে সুন্দরবন কখনও সুন্দর বাসভূমি ছিল না। কখনও কখনও দুঃসাহসিক লোকে ইহার আবাদ করিতে বা বসতি পত্তন করিতে অনর্থক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কখনও ইহার ভাল অবস্থা ছিল না।* বিভারিজ, ব্লকম্যান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ এই মতাবলম্বী। বিভারিজ সাহেব এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।† তিনি স্বীয় মতের

---

* "I do not believe that the gloomy Sundarbans or the seaface of Jessore and Bakarganj were ever well-peopled or the sites of cities." *History of Bakarganj, pp. 179-80.*

† "Were the Sunderbans inhabited in ancient times?"—an article by Mr. Beveridge originally published in *J. A. S. B. vol. XLV, 1876* and afterwards incorporated in his *History of Bakarganj*, pp. 169-180

পরিপোষণ জন্য যে সকল কারণ উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরা প্রথমতঃ সেই গুলির সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের মত স্থাপন জন্য বিবিধ চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ সুন্দরবনের পূর্ব্বাংশে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার মধ্যে সন্দ্বীপ ও আরও কয়েকটি দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপে প্রাচীনকালে বহুপরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। ডু জারিকের বিবরণীতে দেখা যায় এই দ্বীপ সমগ্র বঙ্গে লবণ সরবরাহ করিতে পারিত।* লবণের উৎপাদন জন্য যথেষ্ট কাষ্ঠের প্রয়োজন। সুতরাং সন্দ্বীপে যথেষ্ট জঙ্গল ছিল।

সন্দ্বীপে জঙ্গল থাকিতে পারে। জনাকীর্ণ সন্দ্বীপে এখনও স্থানে স্থানে জঙ্গল আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় না যে সন্দ্বীপে বসতি নাই। বসতি না থাকিলেই বা লবণ প্রস্তুত করিত কে? ডু জারিকই বলিতেছেন যে সন্দ্বীপে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, এবং পর্টুগীজ আধিপত্যের সময়েও তথা হইতে দুইশতের অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইত। যাহারা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করিয়া স্বকীয় জাহাজে বিদেশে প্রেরণ করিত, তাহারা অসভ্য নহে। সন্দ্বীপ বা স্বর্ণদ্বীপ অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ এই, বঙ্গেশ্বর আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভরশূর চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে এখানে বারাহী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারই অধস্তন বংশধর লক্ষ্মণ মাণিক্য নোয়াখালীর অন্তর্গত ভুলুয়ায় রাজ্যস্থাপন করিয়া বারভুঞার অন্যতম হইয়াছিলেন। সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া মগ, পর্টুগীজ ও ভুঞারাজগণের সহিত বহু যুগ ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সন্দ্বীপে দুর্গ ছিল, উহার কয়েকটির ভগ্নাবশেষ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সন্দ্বীপের সাগরবেলা অন্ততঃ ১৫।১৬ বার বিখ্যাত জলযুদ্ধ সমূহের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। সে দীর্ঘ কাহিনী এখানে বক্তব্য নহে।†

---

* "Histoire Des Indes Orientales" by Sep. Peirre Du Jarric, 1610. এই পুস্তকের ৩২তম অধ্যায়ে সন্দ্বীপের বিবরণ আছে। উহার অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য", ৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্. এ প্রণীত "শোণাদ্বীপের বিবরণ"—"নবনূর" পত্রিকা, মাঘ, ১৩১২।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সীজর ফ্রেডারিক নামক এক জন ভিনীসীয় ভ্রমণকারী ভীষণ ঝটিকায় সন্দ্বীপের কূলে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে সন্দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে একটি সাতিশয় উর্ব্বর স্থান। ইহা শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ এবং ঘনসন্নিবেশে লোকাকীর্ণ। এখান হইতে প্রতি বৎসর দুই শত জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশে যায়। এতদ্দেশে জাহাজ নির্ম্মাণের উপাদান এত অধিক যে তুর্ক সুলতান আলেকজেন্দ্রিয়া অপেক্ষা এখান হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া সুলভ মনে করিয়াছিলেন।* যে স্থানের এইরূপ প্রতিপত্তি সুদূর ইউরোপেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যে সুন্দরবনের অসভ্য জাতির আবাস স্থান, এরূপ বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মিশনরী র‍্যালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) যখন ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলা পরিদর্শন করেন, তখন এ দেশকে উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বিভারিজ সাহেব তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই; কারণ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে বরিশালে যে ঝটিকা ও প্লাবন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা দিতে ভুলিয়াছিলেন।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাকলা অঞ্চলে ভীষণ ঝটিকা হইয়াছিল, এবং ২।১ বৎসরে তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ তাহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াই বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকের বর্ণনায় অপ্রত্যয় করা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু এস্থলে অবিশ্বাস করিলেও মিশনরী যেখানে এ দেশের লোক প্রায় উলঙ্গ এবং তাহারা কেবলমাত্র কটীতে সামান্য একটু কাপড় পরিধান করে, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে কিন্তু মিশনরীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, মহামতি বিভারিজ এদেশীয় লোককে অসভ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশীয় লোকে আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের বস্ত্র-ব্যবহার দেখিয়া, এখনও এদেশীয় লোককে উলঙ্গ বলিয়া থাকেন। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থাকে আদর্শ করিয়া লয়। কিন্তু সব দেশে সব আদর্শ খাটে না। আমরা লাপল্যাণ্ডের লোকের চর্ম্মসাজ দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত হই, তাহারাও আমাদের দেশের বস্ত্রাল্পতা দেখিয়া সমভাবে বিস্মিত হয়। আবার বিভারিজ বাকলাকে

* Noakhali District Gazetteer.

সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ধরেন নাই। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় দনুজমর্দ্দন নবোত্থিত সমুদ্রকূলসঞ্জাত দ্বীপে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন * এবং সে রাজ্য সভ্যতামণ্ডিত ছিল। সুতরাং সুন্দরবনের পূর্ব্বাংশ যে এক সময়ে সভ্যতাস্পর্দ্ধী জাতির ক্রীড়া ক্ষেত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুরের তাম্র-শাসনে এক "চণ্ডভণ্ড" নামক অসভ্য জাতির উল্লেখ দেখা যায়।† উহাতে এতদঞ্চলে যে সভ্যতা ছিল, এমন প্রমাণ হয় না। এ কথার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে বিস্তৃত সুন্দরবনের কোন কোণে অসভ্য জাতির বাস থাকিলেই এরূপ ধারণা করা উচিত নহে যে, এতদঞ্চলে কোন সভ্যজাতির বাস ছিল না। ইদিলপুরে যখন অসভ্যজাতির বসতি ছিল, তখনই যে কপোতাক্ষ-কূলে, বিস্তীর্ণ যশোহর রাজ্যে, সমৃদ্ধ অবস্থার বিকাশ থাকিতে পারে না, এমন নহে। বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এই চণ্ডভণ্ডজাতিকে লবণ প্রস্তুতকারী মোলঙ্গীদিগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্রকূলে লবণ হয়, উহা প্রস্তুত করিবার ভার অপেক্ষাকৃত অসভ্য শ্রমজীবীর উপর থাকা অসম্ভব নহে। তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে নিকটে সভ্যতর জাতি ছিল না।

চতুর্থতঃ, ১৫৯৯ ও ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জেসুইট মিশনরীগণ বাকলা হইতে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে যাইবার পথের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উহা জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবনের পথ বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এ প্রদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং তথায় কোন লোকের বসতি ছিল না। এ কথারও উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সুন্দরবনের সব স্থানে একই সময়ে সমৃদ্ধ পল্লী বা বিস্তৃত বসতি কোনকালে ছিল না; থাকিতেও পারে না এবং সে কথা লইয়া কেহ বাদানুবাদও করে না। কিন্তু তাই বলিয়া সুন্দরবনে লোকের বসতি ছিল না, এরূপ একটা সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। মিশনরী সাহেবেরা কোন্

---

* "গৌড়দেশং পরিত্যজ্য জগাম সমুদ্রকূলং
তস্থাবত্র নবোত্থিতং সমুদ্রকূলসঞ্জাতং
দ্বীপমেকং সুবিস্তৃতং নানাবৃক্ষোপশোভিতম্ ॥"
বটুভট্টকৃত অপ্রকাশিত "দেব বংশ" পুঁথি।

† *J. A. S. B, (1868).*

পথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা একেবারে বাহিরের নদীপথে আসিতে পারেন। সে পথে তখনও বসতি স্থাপিত হয় নাই। যে পথে তখন সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গের নৌকা আসিত, সে পথে আসিলে মিশনরী-গণ পথে আর কোনও স্থান না দেখুন, খলিফাতাবাদ, পাণিঘাট, চকশ্রী, কুড়ল-তলা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া আসিতে পারিতেন।

সুন্দরবনে চিরদিন বসতি হইতে পারে নাই। এক সময় হয়ত সুন্দরবন উঠিয়াছে, দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত উহার আবাদ ও বসতি স্থাপন কার্য্য চলিয়াছে; পরে হঠাৎ পুনরায় উহা বসিয়া গিয়াছে, আবার জঙ্গল জন্মিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে আবার অনেক দিন লাগিয়াছে। কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, মিশনরীগণ এইরূপ কোন পতনের যুগে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় না; কারণ তাঁহাদের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্ত দক্ষিণ বনে যেখানে সেখানে নদীর মোহানায় প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিহর্ম্ম্য-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাগরদ্বীপে, ধূমঘাটে, বেদকাশী বা চকশ্রীতে এবং আরও কত স্থানে প্রতাপাদিত্যের যে দুর্গ ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। সে সকল দুর্গ ব্যতীত অন্য নানাবিধ কীর্ত্তিচিহ্নও সুন্দরবনের নানা স্থানে নানা ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথায়ও ভগ্ন অট্টালিকা, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকস্তূপ, পুকুর বা রাস্তার অংশবিশেষ, পুকুরের বাঁধা ঘাট, পরিচিত গ্রাম্য বৃক্ষ, মাটীর ঢিপি বা ভিট্টা, মনুষ্যব্যবহৃত মৃন্ময় পাত্রাদি বা তাহার ভগ্নাংশ প্রভৃতি নানা স্থানে ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে দর্শকমাত্রকে চমকিত করে। ইষ্টক গৃহ পাইলে ব্যাঘ্রে আশ্রয় লয়, পুকুরের পার্শ্বে শূকর থাকে, উচ্চ ভিট্টার উপর গাব বা জাম গাছের ছায়ায় হরিণে বিশ্রাম লাভ করে ও তাহাদের লোভে ব্যাঘ্র আসে এবং ইষ্টকস্তূপে বনের কাল সর্পে বাসা করে। সুতরাং সাধারণতঃ জলমগ্ন অরণ্যভাগ অপেক্ষা উচ্চ কীর্ত্তিস্থান সমূহ অধিকতর বিপজ্জনক।

সুন্দরবনের সমস্ত স্থান দেখা এক জীবনের কাজ নহে। বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা মানুষের অগম্য এবং বনবিভাগীয় শাসনের বহির্ভূত। সে সব স্থানে জমি এত নিম্ন, বন এত নিবিড় এবং পার্শ্ববর্ত্তী নদী সমূহ এত বহুবিস্তৃত ও তরঙ্গ-সঙ্কুল যে, সে সকল স্থানের পথও অজানিত

বলিয়া শিকারীরাও সে দিকে যায় না। সমুদ্রের দিক্ হইতে এ সব স্থান নিকটবর্ত্তী বলা যায়, কিন্তু সে দিক্ হইতে ষ্টীমার লইয়া নয়ন চরিতার্থ করিবার অভিলাষে এই বনে ভ্রমণ করিবার প্রবৃত্তি বা সুযোগ অতি অল্প লোকেরই হইতে পারে। সাধারণতঃ সেখানে শিকারী যায় না, কাঠুরিয়া যায় না, সুতরাং সে প্রদেশের সংবাদ সংগ্রহ করা অতীব কঠিন। সুন্দরবনের এই অজানিত প্রদেশ পার হইতে পারিলে সমুদ্রের কূলে যাওয়া যায়; তখন সেই তরঙ্গাহত বেলা-ভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্যে মানবমাত্রের চিত্ত পুলকিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে বিভিন্ন দেশীয় মৎস্য-ব্যবসায়িগণের অসংখ্য আবাস-শ্রেণী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

পরের মুখের কথা শুনিয়া কোনও স্থানেরই বিশেষ বিবরণ দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ সুন্দরবনের। সেখানে যাহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহারা নিরক্ষর কাঠুরিয়া। তাহারা কোন স্থানই চক্ষু লইয়া দেখে না। যাহা দেখে, তাহাও এত অতিরঞ্জিত করিয়া, অসম্ভব কথায় ও অপদেবতার গল্পে পূর্ণ করিয়া বলে যে, তাহাদের কথা বিশ্বাস করা অতীব কঠিন। সুন্দরবন এক মন্ত্র-তন্ত্রময় রাজ্য; কাষ্ঠদেবতা, বনদেবতা, বনবিবি এ দেশের রাজ্যেশ্বরী; গাজী কালুর কথা, চম্পাবতীর কথা, পাঁচপীরের কথা, এমন কত উপকথায় যে এ অঞ্চলের ইতি-কথা বিষমভাবে বিজড়িত, তাহা বলিবার নহে। সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে নানা অবান্তর ও অবাস্তব কথায় অবিরত "হুঁ" দিতে না পারিলে সত্য মিথ্যা কোন গল্পই শুনিতে পারা যায় না। সংযত শ্রোতাকে বহু কথা শুনিয়া অবশেষে তুষরাশির মধ্য হইতে তণ্ডুলকণা সংগ্রহের মত, বহুকষ্টে কিছু কিছু সার সংগ্রহ করিতে হয়। অনেকস্থলে আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইয়াছে। তবে সেভাবে যে তথ্য পাইয়াছি স্বচক্ষে পরীক্ষা না করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করি নাই। আমরা যে সকল তথ্য প্রকাশ করিব, তাহার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিবার ফল, অবশিষ্ট বিশেষ সতর্কতার সহিত বিশ্বস্ত শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত। প্রকাশিত বিবরণী পর্য্যাপ্ত নহে সত্য, কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের বিশ্বাস এই যে সুন্দরবনে দীর্ঘকালব্যাপী বসতি ছিল। সে বসতির চিহ্ন এখনও আছে। সুন্দরবনের এক গৌরবের দিন ছিল,

তাহার নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তবে সমগ্রবনে বা তাহার প্রান্তভাগে কোথায় কোন্ কীর্ত্তি আছে, তাহা সমস্ত বিবৃত করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। যতদূর সম্ভব, আমরা পশ্চিমদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি কীর্ত্তিচিহ্নের সংবাদ প্রদান করিতেছি। সাগরদ্বীপে ২।১টি প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান আছে। উত্তরে হাতিয়াগড় অতি পুরাতন স্থান। বৌদ্ধযুগে হাতিয়াগড়ে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ছিল। সমতটে—চীনদেশীয় ভ্রমণকারী যে সকল বিহার দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাহাদের অন্যতম। এখানকার অম্বুলিঙ্গ শিব ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। ধনপতি সদাগর "হাতে ঘরে" অম্বুলিঙ্গ ও নীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন। * হাতিয়াগড়ের পূর্ব্বে মণিনদী, পশ্চিমে (২৬ নং লাটে) রায়দীঘি ও কঙ্কণদীঘি নামে দুইটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ প্রকাণ্ড জলাশয় এখনও বর্ত্তমান আছে। † উহাদের পূর্ব্ব পার্শ্বে (১১৬ নং লাটে) প্রসিদ্ধ জটার দেউল। ইহা একটি উত্তুঙ্গ মন্দির; ৫০।৬০ হাত উচ্চ হইবে, বহুদূরে নদী হইতে দেখা যায়। ইহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, জানা যায় না। ইহা প্রতাপাদিত্যের আমলের কোন জয়স্তম্ভ কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ইহা হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণে কিছু দূরে পরাণ-বসুর খাল। এই খাল মাতলানদী হইতে বিদ্যা নদীতে মিশিয়াছে। এই খালের দক্ষিণে ১২৭নং লাট। তন্মধ্যে খালের ধারে "বিরিঞ্চির মন্দির" নামে এক বৃহৎ ইষ্টকস্তূপ আছে। খালের উত্তরপারে ১২৮নং লাটের মধ্যে একটি স্থানকে "ভারতগড়" বলে। সেই গড় বা দুর্গ পরিখাবেষ্টিত ছিল, স্থানে স্থানে তাহার ইষ্টকপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। খাল হইতে ৭।৮ শত হস্ত দূরে একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ এখনও ভরতরাজার মন্দির বলিয়া কথিত হয়। পুরাকালে সুন্দরবনপ্রদেশে ভরত নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, নানাস্থানে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। খুলনা জেলার দৌলতপুর হইতে ১২।১৩ মাইল দক্ষিণে ভদ্রনদের কূলে যে প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ এখনও 'ভরতরাজার দেউল' বলিয়া কথিত হয়, যে স্থানের নাম এখনও

---

* কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২০২ পৃঃ (এলাহাবাদ সংস্করণ)।

‡ সুন্দরবন জরিপ করিয়া ইংরাজ আমলে যে ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে উহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া, এক একটি অংশে এক একটি নম্বর দেওয়া হইয়াছে। এই অংশকে Lot বা লাট বলে। সুন্দরবনের ম্যাপে এই লাট নম্বর আছে।

ভরতভায়না, এবং নিকটবর্ত্তী গোরীঘোনা গ্রামে একটি ইষ্টকময় স্থানকে এখনও যে ভরতরাজার বাটী বলিয়া গল্প আছে, সে ভরতরাজার সহিত এই ভরতরাজার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা কে বলিবে?

মাতলা বা ক্যানিং সহর হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া মাতলানদীর পূর্ব্বাংশে ১২৯ নং লাটে, হাড়ভাঙ্গা আবাদে ২০।২২ বিঘা পরিমিত এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। উহার পূর্ব্বদিকে ১৩০নং লাটে একটা ছোট পোস্তবাঁধা * পুকুর আছে, উহাকে "গলায় দড়িয়ার" পুকুর বলে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রেভারেণ্ড লং সাহেব মাতলার অনতি দূরে টার্ডা (Tarda) নামক একটি বড় পর্টুগীজ বন্দর দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার পূর্ব্বে উহাই তাহাদের প্রধান বন্দর ছিল। এখন উহার কোন ভগ্নাবশেষ নাই। †

মাতলা হইতে সোজা উত্তরে গেলে বালাণ্ডা পরগণায় প্রাচীন বালাণ্ডা নগরের একটু উত্তরে হাড়োয়া নামক স্থানে পীর গোরাচাঁদ বা গোরাই গাজির সমাধি-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হাড়োয়ার বাৎসরিক মেলা বিখ্যাত। বালাণ্ডা অতি পুরাতন স্থান। এখানে বঙ্গের পঞ্চবিভাগের অন্যতম বাগ্‌ড়ী বা বাল-বল্লভীর ‡ প্রধান নগরী ছিল বলিয়া বোধ হয়।

কালীগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী গড় মুকুন্দপুরের অপর পারে অর্থাৎ কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে, ১০১নং লাটে বাঁকৃড়া নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরে যশোহরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হেঙ্কেল সাহেব স্বীয় নামে হেঙ্কেলগঞ্জ (হিঙ্গুলগঞ্জ) নাম দিয়া, সুন্দরবন আবাদের জন্য একটি প্রধান নগর স্থাপন করেন। তাহার উত্তরাংশে বাঙ্গাল-পাড়া নামক স্থানে যে এক সময়ে বহুলোকের বাস ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়

---

* যে পুকুরের খাতের চতুঃপার্শ্ব ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত, তাহাকে পোস্তবাঁধা পুকুর বলে।

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for December, 1868.

‡ Introduction to Sandhyakara Nandi's Ramcarita by M. M. Hara Prasad Sastri M. A. Memoir of the Asiatic Society, vol, III. No 1, p. 14.

রহিয়াছে। বাঁকড়ার পূর্ব্বপারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির দণ্ডায়মান আছে এবং পার্শ্বে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। *

যমুনা ও ইচ্ছামতীর মধ্যস্থলে ১৬৫ নং লাটে ধূমঘাট। ইহাতে ১০।১৫ মাইল ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রান্তে যশোর নগর, দুর্গ ও ৺যশোরেশ্বরীর মন্দির এবং দক্ষিণ প্রান্তে ধূমঘাট দুর্গ ছিল। মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগে এক বিপুল নগরীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রাজধানীর উপনগর পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান তেরকাঠির জঙ্গল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খোলপেটুয়া ও কদমতলীর মধ্যবর্ত্তী ১৬৯ নং লাটে তেরকাঠি বা তেজকাঠি অতি ভীষণ জঙ্গল। উহার পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী খোলপেটুয়া ও চুণার গাঙ্গ হইতে তেরকাঠির খাল, নৈহাটির খাল, নৈহাটির দোয়ানিয়া, † মোড়লখালি, ও পোদখালি প্রভৃতি কতকগুলি খাল ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইসব খাল দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে যে বহু বসতিচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সম্ভবতঃ তিওর ও পোদ জাতীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রথমতঃ এস্থান আবাদ করিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহা হইতে তেরকাঠি বা তিওর কাঠি এবং পোদখালি প্রভৃতি নাম হইয়াছে। জঙ্গলের ভিতর বহু সংখ্যক উচ্চ ভিট্টা, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, এবং বটগাছ, পিত্তরাজ (রয়না) গাছ, সোণাইল গাছ, সাড়া, বনলেবু, ক্ষুদেজাম, আমজুম, সঁটি বা আমআদা, দাঁতন (আশ সেওড়া), পিঠানী, ছালানী (পেত্নীচিড়ে), নিম, কুঁচ, দয়ারগুড়া লতা, খড়বন, স্থানে স্থানে পরিষ্কার দূর্ব্বাবন, দুই একটি বকুল এবং লক্ষ লক্ষ গাবগাছ দেখা যায়। এ বন সর্ব্বত্রই খুব উচ্চ, জোয়ারের জল উঠিতে পারে না, সুন্দরী বৃক্ষ কম, কিন্তু জঙ্গল বড় নিবিড় ও অত্যন্ত দুর্গম। দুই একখানি ইষ্টকখণ্ড নানাস্থানে দেখা যায়, এবং ২।১ স্থানে ক্ষুদ্র ইষ্টকস্তূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পোদখালির পশ্চিমে দীঘি ও দালান আছে। পশ্চিম দিক্

---

* ডামরেলীর মন্দির এবং কালীগঞ্জ হইতে ধূমঘাট দুর্গ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের যে অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

† যে খালের দুইদিক্ হইতে জোয়ার ভাটা হয়, তাহাকে দোয়ানিয়া খাল বলে।

হইতে রাস্তার পরিষ্কার চিহ্ন পাওয়া যায় এবং সেদিকে একটি গুম্বজওয়ালা মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে।

ইচ্ছামতী বা কদমতলী দক্ষিণে গিয়া আড়াই বাকীর মোহানা পার হইয়া, মালঞ্চ নাম ধারণ করিয়াছে। মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়া নদীর মাঝে হরিখালি নামক একটি সুদীর্ঘ খাল উভয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। এই হরিখালির দক্ষিণ-তীরে এক স্থানে ১৭৯ নং লাটে নদীর গায়ে ভগ্ন বাটীর প্রাচীর আছে। সম্ভবতঃ তথায় লবণের কারখানা ছিল। হরিখালি হইতে দক্ষিণ দিকে একটি পাশখালির পার্শ্বে একটু দূরে এক প্রকাণ্ড ভগ্ন বাটীর প্রাচীরাদি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গুরুচরণ দাস নামক এক সন্ন্যাসী এই ভগ্ন বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়া সাধন ভজন করিতেন। ইনি পূর্ব্বে কিছুদিন তেরকাটির জঙ্গলে ছিলেন। সেখানে একটি খালের কূলে যেস্থানে তিনি বৃক্ষতলে আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। তিনি অনেকদিন ব্যাঘ্রসঙ্কুল হরিখালির জঙ্গলে ছিলেন, এবং জানি না কি কৌশলে বা সাধনবলে ব্যাঘ্রের করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা হরিখালির জঙ্গলে যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে এক ভীষণ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইতে হইয়াছিল। মালঞ্চ নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে, তাহার পশ্চিম ধারে রায় মঙ্গল মোহানার সন্নিকটে ১৮৭ নং লাটে ইষ্টকগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। মালঞ্চের পূর্ব্ব পার্শ্বে টিপ্‌নের মাদিয়া (দ্বীপ)। তাহার পূর্ব্বে সেজি-খালি নদী। এই সেজিখালির পূর্ব্বতীরে ১৮৮ নং লাটে কাশীয়াডাঙ্গা নামক স্থানে বড় জামগাছ ও পুঞ্জীকৃত ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে।

মালঞ্চ হইতে আড়াইবাঁকী নামক এক সুবৃহৎ দোয়ানিয়া আড়পাঙ্গাসিয়ায় মিশিয়াছে। এই আড়াইবাঁকীর উত্তরাংশে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট দুর্গ ছিল। তাহারই সন্নিকটে ১৭৩ নং লাটে নৌসেনাপতির বাস-গৃহাদি ছিল। উহার বিলুপ্ত ভগ্নচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। আড়পাঙ্গাসিয়া দিয়া উত্তর দিকে আসিলে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষের সঙ্গম স্থলে পতিত হওয়া যায়। এই খোল-পেটুয়া ও কপোতাক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতাপনগর ও গড় কমলপুর। কমলপুরে প্রতাপাদিত্যের একটি প্রধান দুর্গ ছিল। উহার উত্তরে এখনও এক প্রকাণ্ড মৃত্তিকার গড় আছে, তাহার পার্শ্বে খোলপেটুয়া নদীর ধারে একটি

৺কালী-খালাস খাঁ দীঘি
বেদকাশী।

[৭৩ পৃঃ

পুরাতন পুষ্করিণী। এ পুষ্করিণীর জল অতি মিষ্ট। এখন সুন্দর বনের কোন কোন স্থানে শাসনকেন্দ্র (coupe) স্থাপন করিয়া, সেখানে আফিস ও কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান স্থির করিতে গিয়া, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোথাও পুষ্করিণীতে ভাল জল হয় না। অথচ উপরোক্ত পুষ্করিণীতে উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যাইতেছে; বহুদূর হইতে লোক আসিয়া এ পুকুর হইতে জল লয়। গ্রীষ্মকালে লোকে নৌকায় করিয়া জল লইয়া যায়। এইরূপে চাঁদখালির হেঙ্কেল পুষ্করিণী, বেদকাশীর দীঘি, আমাদির কালিকা দীঘি প্রভৃতি প্রাচীন জলাশয়গুলির জল সুমিষ্ট। ইহা হইতে দুইটি অনুমান হয়; সম্ভবতঃ (১) সুন্দর বনের মৃত্তিকারই সাধারণ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, (২) অথবা তখন লোকে পরীক্ষা করিয়া স্থান দেখিয়া পুষ্করিণী খনন করিত। এই দ্বিতীয় অনুমান ঠিক নহে; কারণ বহুস্থানে লোকের বসতি চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে; পানীয় জলের ব্যবস্থা না হইলে বসতি হয় না; প্রকৃত পক্ষে যেখানে লোকের বসতিছিল, সে খানেই পুষ্করিণীর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে, সুতরাং সুন্দরবনের সাধারণ অবস্থা-বৈপরীত্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না।

প্রতাপ নগর হইতে উত্তরে ভালুকা পরগণার মধ্যে বিছট নামক গ্রাম। এখানে খোলপেটুয়া নদীর উপরই একটি প্রকাণ্ড ডক (dock) বা জাহাজ-নির্ম্মাণস্থান রহিয়াছে। এই জাহাজ ঘাটা কোন্‌কালে কাহার দ্বারা খনিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। দুইপার্শ্বে দুইটি ১০।১২ হাত উচ্চ সুবিস্তৃত মাটীর ঢিপি এবং মধ্যস্থলে নদীর সহিত সম্মিলিত খাত রহিয়াছে। মাটীর ঢিপি দুইটির দৈর্ঘ্য এখনও প্রায় ১২৫০ ফুট আছে। এই ডকের ভিতর উত্তর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে একটি ৩০ হাত প্রশস্ত রাস্তা প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী "বাণিয়াপুকুর" নামক একটি ৯ বিঘা জলাশয়যুক্ত দীঘির কূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সম্ভবতঃ এখানে বণিক্‌ বা সওদাগর জাতীয় ব্যবসায়িগণের নিবাস ছিল এবং ডকে তাহাদের জাহাজ নির্ম্মাণ হইত। পুকুরের সন্নিকটে কয়েক স্থানে ইষ্টকের চিহ্ন পাওয়া যায়। ডকের ভিতর হইতে যে খাল বাহির হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে এককালে নানাজাতীয় তরণী সজ্জীভূত থাকিত। এই খালের নাম কুমারখালি। পার্শ্বে ডকের উত্তরপূর্ব্ব পাহাড়ের নিম্নে বহুদূর পর্য্যন্ত রাশীকৃত চাড়া বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশদ্বারা কুম্ভকারদিগের বাড়ীর পরিচয় আছে। এই

বিছট অতি পুরাতন স্থান; ইহারই সন্নিকটে বাসুদেবপুরে দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা পাইয়াছিলাম। প্রতাপনগর হইতে পূর্ব্বদিকে কপোতাক্ষ পার হইলে বর্ত্তমান ২১২ নং লাটের ভিতর গাদিগুমা ও দমদমা ছিল। প্রতাপাদিত্যের কপোতাক্ষ দুর্গের প্রসঙ্গে উহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

উক্ত দমদমা প্রভৃতি স্থান হইতে দক্ষিণ মুখে গিয়া কাশীখাল পার হইলে, বর্ত্তমান ২১১ নং লাটে পড়িতে হয়; ঐস্থানে কপোতাক্ষের পূর্ব্বপারে সুবিদিত বেদকাশী আবাদ। ইহা অতি পুরাতন স্থান। এখানে একটি সুবিস্তৃত দীঘি আছে; দীঘিটি পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ; দৈর্ঘ্য ৭০০ হাত এবং প্রস্থ ৪০০ হাতের অধিক হইবে। দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি ইটে গাথা মঞ্চে ৺কালীর স্থান আছে এবং তাহার পার্শে খালাস খাঁ পীরের আস্তানা। এজন্য জলাশয়টির নাম হইয়াছে—"কালী-খালাস খাঁ" দীঘি। সম্ভবতঃ পাঠান আমলে খালাস খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সাধু বা পীর এখানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং দীঘি তিনি খনন করেন। মোগল আমলে বা প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। দীঘিটির জল খুব ভাল; ইহার উপরে এমন দামদল জন্মিয়াছে যে, শীতকালে মানুষে স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে। দীঘির উত্তরপূর্ব্ব কোণে কিছুদূরে একটি প্রকাণ্ড বাটীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখনও উহার বেষ্টন-প্রাচীরের কতকাংশ এবং ৭০।৮০ বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া এক গড়খাই বর্ত্তমান আছে। ইহা খালাস খাঁর দুর্গ কিংবা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। তবে পাঠান আমলে মস্‌জিদের যেরূপ প্রাচুর্য্য দেখা যায়, দুর্গের তেমন নিদর্শন নাই। তবে প্রতাপাদিত্যের সময় নিশ্চয়ই এস্থানে সমৃদ্ধ পল্লী ছিল; নতুবা মহারাজ বসন্তরায় এখানে উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতেন না। রাজধানী যশোহরপুরীকে কাশী বলা হইত; সে রাজধানীর বিস্তৃতি উপনগর সমেত পূর্ব্বদিকে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে; বারাণসীর অপর পারস্থ বেদকাশীর অনুকরণ কপোতাক্ষের অপর পারস্থ স্থানকে বেদকাশী বলা হইয়াছিল। বসন্তরায়ের যে কবিপ্রতিভা যশোরকে যশোহর করিয়াছিল, তাহাই বেদকাশী নামের ও উৎপত্তির কারণ। এই বেদ-কাশীতেও শিবমন্দির হইয়াছিল, তাহাতে শিলালিপি ছিল। সে মন্দির এক্ষণে

কামারবাড়ীর ভগ্নবাটী ও পুকুর।

[৭৫ পৃঃ

নাই, আছে কেবল তাহার ৬৭৭টি সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ। উহা দেখিবার জিনিস, খুল্না জেলার একটি পরম গৌরবের জিনিস কিন্তু সে স্তম্ভসমূহ কোন্ যুগে কোথা হইতে কে আনিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বেদকাশীর পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে যেখানে শিবসা নদীর দ্বিধাবিভক্ত প্রবাহদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া মর্জ্জাল নাম ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রমুখী হইয়াছে, সেই ত্রিমোহানার পূর্ব্বধারে প্রায় আধ্ মাইল পরিমিত স্থানে শিবসা নদীর কূল দিয়া খাতের মধ্যে অসংখ্য ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত কোন নদীকূলবর্ত্তী প্রাচীন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্রোতোবেগে ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথবা তীর হইতে দূরে এককালে যে সমস্ত বসতিস্থান ছিল, তথাকার ভগ্ন অট্টালিকাসমূহের ইট কেহ নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবার সময় নদী-তীরে ইট ফেলিয়া গিয়াছে। সে ইটগুলি খুব ভাল; বহুদিন ধরিয়া লোণা জল বা বাতাসে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারে নাই। বাস্তবিকই এইস্থানে উপরে বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জাঁকজমক-শালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিয়াগণ "কামার বাড়ী" বলে, কারণ কোনকালে নাকি সেখানে কামারদিগের লোহা পিটান একটি 'নোহাই' পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র; দ্বিতল একটি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী বলিয়া মনে হয়। একটি বিস্তৃত দ্বিতল গৃহের অত্যুচ্চ ইষ্টকস্তূপের সহিত সংলগ্নভাবে স্থানে স্থানে মৃত্তিকার ঢিপি ও অন্য ইষ্টকস্তূপ বাটীর অন্যান্য গৃহাদির পরিচয় দেয়। এই সকল স্তূপ এক্ষণে প্রকাণ্ড বিষধর সর্পগণের আবাসস্থান হইয়াছে। বাড়ীর পার্শ্বেই একটি পোস্তবাঁধা পুকুর; উহারও চতুঃপার্শ্ব এক সময়ে ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে সে প্রাচীরের অংশবিশেষ দণ্ডায়মান আছে। বিস্তৃত বাড়ীর এক ধারে নদী ও তিন ধারে গড়খাই ছিল; ঐ গড়খাই একদিকে পুকুরে আসিয়া মিশিয়াছে বলিয়া, নদীর মৎস্য আসিয়া পুকুরে রাশীকৃত হইয়াছে।

এইস্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম মুখে একটু অগ্রসর হইলেই বামে সেখের খাল। উহার কূলে গোল গাছ খুব ভাল হয়; তজ্জন্য বহু নৌকা গোল কাটিতে এই খালের মধ্যে আসে। মর্জ্জাল নদী হইতে একটি খাল পূর্ব্বমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। এই সেখের খাল ও কালীর

খালের মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিবিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে সেখের টেক বলে। উহা ২৩৩ নং লাটের অন্তর্গত। এখানে সুন্দরী গাছ যথেষ্ট, হরিণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আমদানীও বেশী। সুতরাং আমাদিগকে এক-প্রকার প্রাণ হাতে করিয়া এ বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সেখের খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডানদিকে চতুর্থ পাশখালির পার্শ্বে এক স্থলে ইষ্টক-গৃহের ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি গাবগাছ দেখা যায়। তথা হইতে উঠিয়া বনের মধ্যে প্রায় একমাইল গেলে, একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাওয়ালীরা ইহাকে "বড় বাড়ী" বলে। সম্ভবতঃ ইহাই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ। দুর্গের অনেকস্থানে উচ্চ প্রাচীর এখনও বর্ত্তমান। অন্যত্র ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে। এই দুর্গের উত্তর পূর্ব্ব বা ঈশানকোণে একটি শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সেখান হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে অগ্রসর হইলে, যেখানে সেখানে পুকুর ও পরে ২।৩টি ইষ্টকবাড়ী ও অসংখ্য বসতিভিট্টা পাওয়া যায়। বাড়ীগুলির মাটীর ঢিপি শত শত গাবগাছে ঢাকা রহিয়াছে। তাহা হইতে বাহির হইলে, একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখি নাই।

ইহার খিলানগুলি গোল নহে, পরন্তু মুসলমান-স্থাপত্যানুগত খিলানের মত ত্রিকোণ। হিন্দুরাও ত্রিকোণ খিলান ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। * মন্দিরের অন্যান্য প্রকৃতি দেখিলে ইহা যে মোগল আমলে কোন হিন্দুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা সহজ হয়। যদিও মন্দিরের গুম্বজ ছাদ আছে, কিন্তু চূড়া নাই, কারণ শীর্ষদেশ জঙ্গলসমাকীর্ণ হইয়াছে, তবুও ইহা মুসলমানের মস্‌জিদ নহে, ইহা স্থির। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দরজা আছে, পূর্ব্বে ও উত্তরে কোন দরজা নাই। মুসলমানের কোন মস্‌জিদে পশ্চিমদিকে কোন খোলা দ্বার থাকে না, এবং উহা সাধারণতঃ পূর্ব্বদ্বারী হইয়া থাকে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে জঙ্গল খুব নিকটবর্ত্তী

* Havell's Indian Architicture pp. 52-56. "The Bengali buildero being brick layers rather than stone:masors had learnt to use the radiating arch whenever useful for constructive purposes long before the Mahomedans came there"

সুন্দরবনের ভগ্ন শিবমন্দির।

[৭৭ পৃঃ

হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকে এখনও প্রশস্ত পরিষ্কৃত জমি আছে, এবং তাহা বেশ উচ্চ। মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নাই; তবুও অনুমান করা যায় যে প্রতাপাদিত্য তাঁহার দুর্গের সন্নিকটে এই কালিকা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তজ্জন্য মন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত খালটি "কালীর খাল" নামে অভিহিত হইয়াছে। সরকারী ম্যাপেও এখন কালীর খাল নাম বিলুপ্ত হয় নাই। যশোরেশ্বরীর মন্দিরের মত ইহারও পশ্চিম দিকে সদর বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সঙ্গে যে এক বাবু খাঁ বাওয়ালী ছিল, সে ২৫।৩০ বৎসর সুন্দরবনে আসিতেছে; সে বলিল ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে কোন একদল বিশিষ্ট ভদ্র লোক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আসিয়া, মহাসমারোহে এই মন্দিরে ৺কালী পূজা দিয়া গিয়াছিলেন। বাবু খাঁ সে সময়ে এই জঙ্গলে আসিয়াছিল। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ঐ পূজায় বলি হয়। ঠিক যে স্থানে সে বলি হইয়াছিল। বাবু খাঁ সে স্থানটি আমাদিগকে প্রদর্শন করিল। কিন্তু এমন জীবন্ত দর্শক সাক্ষী পাইয়াও আমরা তাহার বর্ণনায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহি; কারণ নিরক্ষর গল্পরসিক বৃদ্ধ বাওয়ালী গল্পের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে যে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, তাহা দেখিয়াছি।

এই মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার ভিতরের মাপ ১০′–৬″×১০′–৬″ এবং বাহিরে ২১′–৩″×২১′–৩″; ভিত্তি ৫′–৩″। ভিতরের উচ্চতা ২৫′–৬″। মন্দিরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দরজা আছে; পশ্চিম দ্বার ৫′–৪″×২′–৬″, উপরে খিলানের উচ্চতা ১′–৮″; দক্ষিণ দ্বার ৫′–৬″×২′–৬″, খিলানের উচ্চতা ১′–৯″। উত্তরের দিকে ভিতরের ৪′ ফুট উচ্চস্থানে একটি কুলুঙ্গ বা সংবদ্ধ জানালা আছে, উহার মাপ ৩′×২′ এবং খিলানের উচ্চতা ১′–৬″। পূর্ব্বদিকে এরূপ কোন কুলুঙ্গ বা জানালার খাত নাই। মন্দিরের বাহিরের ইষ্টকে, দেওয়ালের কার্ণিসে নানা কারুকার্য্য আছে। উত্তর দিকে দেওয়ালে ইষ্টক দ্বারা এক প্রকার জাল বা ঝাজ্‌রী প্রস্তুত করা আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে জমি অনেক বসিয়া গিয়াছে, সেজন্য জঙ্গল হইয়াছে এবং জোয়ারের জল মন্দিরের মূল পর্য্যন্ত আসে। সুতরাং সে দিকে মন্দিরের গায়ে একটু লোণা ধরিয়াছে। অন্য সবদিকে জমি উচ্চ আছে, জল উঠে না; এজন্য লোণা ধরে নাই। মন্দিরের শিরোভাগে কতকগুলি গাছ জন্মিয়াছে, কালে

উহাতেই এই অপূর্ব্ব স্থাপত্য নিদর্শন বিলুপ্ত করিবে। এজন্য আমি এই মন্দিরের রক্ষণার্থ ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মন্দিরের পশ্চিম দিক্ হইতে উহার ফটো লওয়া হইয়াছিল। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জঙ্গল এত ভীষণ যে ফটোগ্রাফারের প্রাণরক্ষার্থ চারিদিকে সতর্ক বন্দুকধারী দণ্ডায়মান রাখিতে হইয়া ছিল।*

সেখেরটেক হইতে মর্জ্জাল নদী দিয়া দক্ষিণ দিকে গেলে, ডানদিকে আল্‌কী নদী মর্জ্জাল হইতে বাহির হইয়া, পুনরায় কিছু দক্ষিণে সে নদীতেই পড়িয়াছে; সেই মোহানায়, আল্‌কী নদী ও মর্জ্জালের মধ্যস্থলে, ১৯৮ নং লাটে, আল্‌কীর কূলে ইষ্টকস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ স্থানে পূর্ব্বে নেমক খালাড়ী বা লবণ প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল বলিয়া বোধ হয়। আরও দক্ষিণে গেলে মর্জ্জালের নাম মার্জাটা হইয়াছে, পশর আসিয়া দুইবার তাহাতে মিশিয়াছে, আবার পূর্ব্বদিকে পশরের এক শাখা বাঙ্গড়া নামে সমুদ্রে পড়িয়াছে। বাঙ্গড়ার মোহানার বহু পূর্ব্ব-দিকে মধুমতী বা বলেশ্বরের মোহানা—ইহাকেই বিখ্যাত হরিণ ঘাটা মোহানা বলে। ঐ মোহানার উত্তরাংশে সুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশন। সুপতির মত এত দক্ষিণে, এত সমুদ্রসান্নিধ্যে, কোন ফরেষ্ট আফিস নাই। সুপতি এত দক্ষিণে গেল কেন, তাহার একটা কারণ আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বলেশ্বর দিয়া পার্ব্বত্য জল বহে, এবং বলেশ্বর স্বকীয় জলের বলে এত বলী, যে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত সে স্বীয় প্রকৃতি রক্ষণ করিয়াছে। সুপতির সন্নিকটে বলেশ্বরের জল বৎসরের অধিকাংশসময় মিষ্ট থাকে; পৌষমাস পর্য্যন্ত তথাকার জল লবণাক্ত হয় না। এখান হইতে মর্জ্জালের মোহানা পর্য্যন্ত অনেক স্থানে সমুদ্রকূলের সন্নিকটে মিষ্ট জলাশয় আছে। মর্জ্জালের মোহানা হইতে সমুদ্রকূল বাহিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে, ফুলজুরী জঙ্গলের নিকটে এক মিষ্ট জলের পুকুর আছে; নাবিকেরা ইহার সন্ধান রাখে এবং এদিকে আসিলেই এই পুকুর হইতে পানীয় সংগ্রহ করে। এই স্থান হইতে

* এ মন্দিরের ফটো এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মন্দির দর্শনের সংবাদ পাওয়ার পর খুল্‌নার তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রাডলীবার্ট মহোদয় এই মন্দির দেখিতে যান। কিন্তু তিনি যে ফটো লইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তিনি আমার নিকট হইতে একখানি ফটো লইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তাহার কোন সদ্ব্যবহার করিয়াছেন কি না, জানি না।
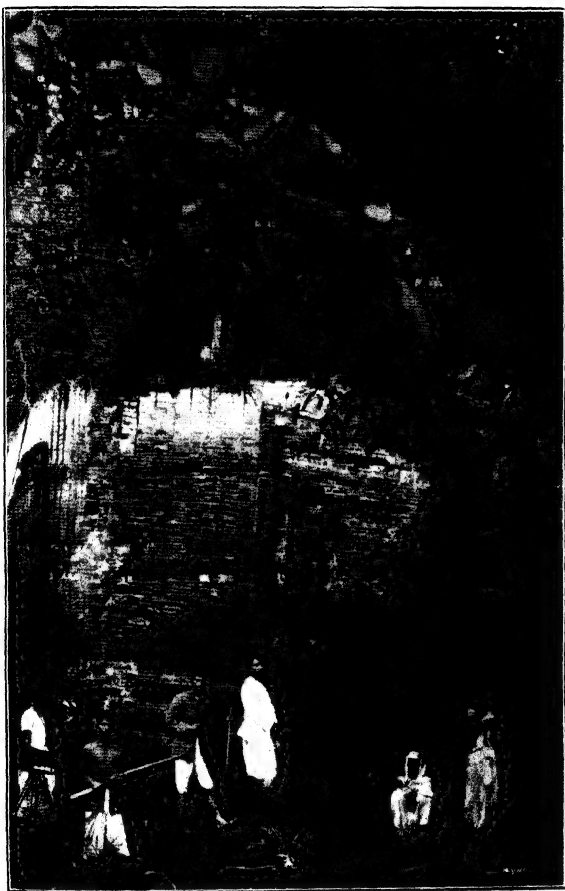
সুন্দরবনের অভগ্ন হিন্দু মন্দির।

[৭৮ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

পূর্ব্বদিকে গেলে বালুকার চড়ায় যেখানে খনন করা যায়, সেখানেই মিষ্টজল পাওয়া যায়। এজন্য এখানে লোকের বসতি ও ব্যবসায় করিবার সুবিধা হইয়াছে। উক্ত মিষ্ট পুকুরের পূর্ব্ব দিকে ফুলজুরী বা মেহেরালির খাল। আধুনিক সময়ে মেহের আলি নামক এক সারঙ্গের নামে উহার নাম মেহের আলি হইয়াছে। এই খালের আরও পূর্ব্বদিকে মাণিকদিয়া বা মাণিকখালি নদী। এই নদী পশর হইতে উঠিয়া সাগরে পড়িয়াছে। এই মাণিকদিয়া নদীর মধ্যে চট্টগ্রামের মৎস্যজীবিগণ এক সুন্দর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। নদীর দুইধারে জালিয়া-দিগের বাড়ী, তাহারা রাশি রাশি মৎস্য ধরে এবং উহা শুকাইয়া বিদেশে চালান দেয়। সে স্থানে জালিয়াদিগের এমন বিস্তৃত উপনিবেশ বসিয়াছে, যে তাহাদের অভাব পূরণ জন্য নানা স্থান হইতে ব্যবসায়িগণ আসিয়া তথায় বাজার বসা-ইয়াছে। শুক্না মৎস্যের দুর্গন্ধে নদীর মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, কিন্তু ব্যবসায়ের লোভে সেই নদীর মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী নৌকার মধ্যেই স্থায়ী দোকান খুলিয়া—বাজার বসাইয়াছে। যশোহর জেলারও কত দোকানদার এখানে ব্যবসায় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছে।* মিষ্ট জল পায় বলিয়া এসব লোক তথায় স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। সেই কারণে এ অঞ্চলে অনেক স্থলে পূর্ব্বে নেমক খালাড়ী ছিল। পশর হইতে একটি খাল পশ্চিমমুখে আসিয়া মর্জ্জাটায় মিশিয়াছে; এই খালের নাম ভেদাখালি। ইহার উত্তর কূলে এবং নিকটবর্ত্তী দুবলা ভারানীর খালের উত্তরাংশে বহুসংখ্যক নেমক খালাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বাঙ্গড়া নদীর মোহানার উত্তরাংশে একটি খাল আসিয়া দক্ষিণমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে; এই খালের মোহানার একটা স্থানে লাল ও কালো পাথর প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কিরূপে কখন্ এখানে পাথর আসিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। তবে এসব নিদর্শন যে মানুষের প্রাচীন বসতি প্রভৃতির প্রমাণ দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু মাণিকদিয়া নদীর মধ্যে নহে, বাঙ্গড়ার মোহানা হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত মোরাদিয়া খালের মধ্যেও জালিয়াগণের একটা প্রধান আড্ডা হইয়াছে।

---

* একজন বড় দোকানদারের নাম নিকুঞ্জবিহারী সাহা, সাং কোলা দিগলিয়া, যশোহর। এই নদীর মধ্যে ও কূলে নৌকা ও গৃহগুলি চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ প্রভৃতির প্রথাক্রমে বাঁশের খোলায় ছাওয়া। সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।

এ সব ত আধুনিক যুগের কথা। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগেও এ অঞ্চলে মনুষ্যাবাস ছিল। এ অতি সুন্দর স্থান, বহুদেশের মধ্যে, বহুনদীর সঙ্গমে, সাগর-কূলে এস্থানের অতি সুন্দর অবস্থান; এস্থানে দাঁড়াইলে মনে হয় বঙ্গ যেন বাহু-বিস্তার করিয়া একদিকে রাঢ় ও কলিঙ্গ এবং অন্য দিকে চট্টল ও আরাকাণকে আকর্ষণ করিত, এবং এই সকল দেশের পণ্যভার বঙ্গসাগরের এই শীর্ষভাগে আসিয়া নানা নদীপথে শত জনপদের অভাব মোচন করিতে যাইত। বিশেষতঃ যখন পশরে ও বলেশ্বরে পার্ব্বত্য স্রোত প্রবাহিত হইত, তখন এস্থানের অবস্থা আরও উন্নত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য ডিঙ্গা দেশে বিদেশে ব্যবসায় চালাইত, তাহা এখানেও অসিয়াছিল। হরিণঘাটার মোহানা হইতে "চাঁদের আড়া" নদী পশ্চিমমুখে আসিয়াছে; উহার পার্শ্বে এখনও পুকুর, কলাগাছ, রাস্তার ভগ্নাবশেষ এবং ইষ্টকস্তূপসমূহ আছে। এই চাঁদের আড়ায় চাঁদ সওদাগরের পোতাশ্রয় ছিল। আর একটু পশ্চিমে আসিয়া "কালী-দহের খাল" তাহার আরও সাক্ষ্য দিতেছে। হরিণঘাটার পশ্চিম কোণে একস্থানকে Tiger point বা বাঘের কোণা বলে। তাহার সন্নিকটে যে ইষ্টক-স্তূপাদি আছে তাহা কোন প্রাচীন বন্দরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। পর্টুগীজ ঐতিহাসিকেরা সুন্দরবনের যে পাঁচটি বিনষ্ট নগরীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে তাঁহার একটির অবস্থান ছিল বলিয়া মনে হয়। * কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীকাব্যে যে সকল বাঙ্গাল মাঝি লইয়া ধনপতি প্রভৃতি সওদাগরগণের সিংহল গিয়া বাণিজ্য করিবার বর্ণনা আছে, তাহাদিগকে সম্ভবতঃ এই অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হইত। †

পশর নদী দিয়া উত্তরমুখে আসিলে দেখা যায় "নন্দবালা" ও "কুমুদবালা" নামক দুইটি খাল পশর হইতে উঠিয়া সেলা নদীতে পড়িয়াছে। ঐ নন্দবালার উত্তরপারে ২৪৮ নং লাটে এক জঙ্গলের মধ্যে বকুলবৃক্ষ-বেষ্টিত পুকুর রহিয়াছে। আরও উত্তর মুখে আসিলে একস্থানে ভদ্র ও পশরের মধ্যস্থানে ২২৬ নং লাটে করমজলীর খাস জঙ্গলে পশরের পশ্চিম পারে, রাস্তার চিহ্ন, পুকুর, বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং ভগ্ন দেওয়াল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। করমজলীর উত্তরে ২২৫ নং

* Five "lost towns" on the maps of De Barros (in his Da Asia), Blaeve and Van den Broucke.

† কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাকোই বাকোই"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

লাটে লাউডোব আবাদ। এখানে জমি বন্দোবস্ত ও রীতিমত বসতি হইতেছে। পশর হইতে "লাউডোবের খাল" পশ্চিমমুখে গিয়াছে; ঐ খাল হইতে যে আর একটি খাল উত্তরবাহী হইয়াছে, তাহার নাম "কালিকাবাড়ীর খাল।" এই কালিকাবাড়ীর খালের পার্শ্বে বর্ত্তমান সময় শ্রীহরিচরণ দে নামক এক প্রজার জমির উত্তরে প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ পাওয়া গিয়াছে। এখানে কোন ৺কালীবাড়ী ছিল বলিয়া বোধ হয়; তদনুসারে সম্ভবতঃ খালের নাম হইয়াছে। ৺কালীবাড়ী এ অঞ্চলে আরও অনেক আছে; তন্মধ্যে ডাকৃরার ৺কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ। ইহা রামপালের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কুমারখালি নদীর উপর অবস্থিত। এখনও বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকে এই সুন্দরবনের কালীবাড়ীতে ৺পূজা দিতে আসে এবং এখানকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক গল্পকথা প্রচলিত আছে। কতকাল পূর্ব্বে কাহার দ্বারা এই পূজার স্থান ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। পশ্চিমদিকে কপোতাক্ষের কূলে কপিলমুনি নামক স্থানে অনেক প্রাচীন নিদর্শন আছে। এখানে একটি পুকুর কাটিতে যে কয়েকটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটি এক্ষণে নিকটবর্ত্তী প্রতাপকাঠি গ্রামে শ্রীরসিকলাল হালদার মহাশয়ের বাটীতে পূজিত হইতেছেন। এ দুইটি বৌদ্ধ-মূর্ত্তি, কিন্তু এক্ষণে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বলিয়া পূজিত হন। আরও দক্ষিণে কপো-তাক্ষের কূলে প্রসিদ্ধ আমাদিগ্রাম। এখানে এক "পরীমালা" দেবী আছেন। আমাদির দক্ষিণেই সুন্দরবন। কয়ড়ানদীর অপর পারে নারায়ণপুর নামক স্থানে বহুকালপূর্ব্বে মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এটি চতুর্ভুজা চামুণ্ডামূর্ত্তি। এখনও ইহার নিত্য পূজা হয়। আমাদিগ্রামে "কালিকা দীঘি" নামে প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৮০০ হাত × ৭০০ হাত হইবে। দীঘিটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; উহার উপর এরূপ ভাবে দাম দল হইয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ ও গরু স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া যাইতে পারে। তথাপি পুকুরের জল অতি মিষ্ট এবং উহা এখনও তৎপ্রদেশের বহুলোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। খুল্‌নার পূর্ব্বভাগে রামপালের সন্নিকটে হুড়কা নামক স্থানে এইরূপ আর একটি সুপেয় সলিলপূর্ণ জলাশয় আছে। ইহাকে "ঝলম'লে দীঘি" বলে। এ দীঘি কতকাল পূর্ব্বে কবে কাহার দ্বারা খনিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। ইহার জল কখনও শুকায় না এবং ইহাতে বিশেষ

দামদল নাই। রামপালেও এক প্রকাণ্ড পুরাতন "রামপাল দীঘি" আছে উহা এক্ষণে খুল্‌না ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। রামপাল ও আমাদি প্রভৃতি স্থান বহুদিন সুন্দরবনের গ্রাস হইতে জাগে নাই।

স্বরণখোলা ফরেষ্ট ষ্টেশনের সম্মুখে পশ্চিমদিকে মরা ভোলা নদীর উপর প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাড়ী আছে; উহার ভগ্ন প্রাচীর এখনও দ্রষ্টব্য। চাঁদপাই ফরেষ্ট ষ্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সেলা নদী হইতে বহির্গত সোণামুখী খালের পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে এখনও একটি সুস্পষ্ট ইটের পাঁজা বর্ত্তমান রহিয়াছে। খুল্‌না জেলার পশ্চিমভাগে আশাশুনি পুলিশষ্টেশন। উহার পশ্চিমদিকে গুতিয়াখালি নদী,—তাহার পশ্চিমপারে সাঁইহাটি গ্রাম। এস্থান পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি আবাদ হইয়াছে। জঙ্গলের পূর্ব্ব হইতে এখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল; তন্মধ্যে তিনটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-প্রান্তে যেটি, তাহাই দণ্ডায়মান আছে। উহা নানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর মন্দির। সাঁইহাটি গ্রামের মধ্যে এক অংশের নাম উজিরপুর। সেখানে এখনও একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ উজিরের বাড়ী বলিয়া খ্যাত।

এতক্ষণে আমি সুন্দরবনের প্রাচীন বসতিচিহ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শেষ করিলাম। ইহার অধিকাংশ স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছি এবং কতকগুলি বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত দর্শকের নিজের মুখের বিবরণী হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; অনেকস্থলে তাহাদিগকে উদ্যোগী করিয়া এসব বিষয় স্থিরভাবে দেখিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠক স্বচক্ষে দেখিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই সকল বিবরণের সাক্ষ্য হইতে বোধ হয় স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি, যে সুন্দরবন এক সময়ে মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত ছিল; ইহার ভূমি তখন শস্যভারে হাস্যময়ী হইত; ইহার নগরীসমূহ হর্ম্ম্যমন্দিরে সমৃদ্ধ এবং জন-কোলাহলময় ছিল। অনেকবার সুন্দরবনের উত্থান পতন হইয়াছে; ইহা বৌদ্ধযুগের শেষভাগে পড়িয়াছিল এবং হিন্দুরাজত্বে পুনরায় জাগিয়াছিল; সেই হিন্দুর সময়ে পড়িয়াছিল আবার পাঠানযুগে জাগিয়াছিল। পরে মোগলের মধ্যযুগে পড়িয়াছে, আর উঠে নাই। মোগল আমলের প্রথমভাগে পাশ্চাত্য যে সকল জাতি বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা সুন্দরবনকে

এমন পতিত, অগম্য, হিংস্রসেবিত এবং অরণ্যাবৃত দেখেন নাই। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। এমন আশ্চর্য্য পতন সুন্দরবনে ভিন্ন অন্য কোথায়ও হয় না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশন হয়। উহাতে খুল্‌নার রেণীসাহেবের মধ্যম পুত্র (H. J. Rainey) সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, রেভারেণ্ড লং (Rev. J. Long) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন প্যারিস সহরে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অনুসন্ধান-পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত * তাঁহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্টুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা তখন হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ মোগল রাজত্বের মধ্যযুগে প্রস্তুত। ঐ মানচিত্রে সুন্দরবন সমুর্ব্বর দেশ ও তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যারোস (De Barros) প্রণীত এসিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন ম্যাপ এবং ভ্যানডেন ব্রুকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা যায় যে সুন্দরবনের সমুদ্রকূলে প্যাকাকুলি (Pacaculi) কুইপিটাভাজ (cuipitavaz), নলদী (Noldy), ডাপারা (Dapara) এবং টিপারিয়া (Tiparia) নামক পাঁচটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। যদিও ব্লকম্যান সাহেব, এই সকল ম্যাপে কিছুই প্রতিপন্ন করে না বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, † তবুও আমরা তাঁহার পন্থানুসরণ করিতে সম্মত নহি। যাঁহারা মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কোন স্থানের নামের প্রকৃত উচ্চারণ ভুল করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কাল্পনিক কতকগুলি স্থান বসাইয়া দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা অনুমান করি সুন্দরবনে এমন অনেক সহর ছিল, তন্মধ্যে পর্টুগীজ আমলে যে পাঁচটি সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ঐ সকল ম্যাপে তাহারই উল্লেখ আছে।

ব্লকম্যান সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইলে, দেখান উচিত যে এই

---

* "Monsieur Jomard, the head of the Geographical Department of the Bibliotheque Royale"

† "The old Portuguese and Dutch maps prove nothing"—Geography and History of Bengal, J.A.S.B Vol XLII, 1873 (P. 231)

কয়েকটি সহর কোথায় ছিল এবং ইহাদের প্রকৃত নাম কি। গ্রীক ও পর্টুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিকগণ এদেশীয় স্থানের নামকে এত বিকৃত করিয়াছেন যে তাঁহাদের বর্ণনা দেখিয়া সহজে কোন প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। প্যাকা-কুলি বা পেঁচাকুলি একই কথা; পেঁচাকুলি চব্বিশপরগণা জেলার চব্বিশটি পরগণার মধ্যে অন্যতম।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই পরগণাগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট হইতে জমিদারীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মীরজাফরের প্রদত্ত সনন্দের অনুবাদের পেঁচকুলি ইংরাজীতে বিকৃত হইয়া Patcha kolla হইয়াছে।* পেঁচকুলি পরগণা প্রথমতঃ সেলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল। মীরজাফরের প্রদত্ত পরগণার পরোয়াণা একবৎসর পরে বাদসাহের সনন্দে পরিণত হয়; তদনুসারে কোম্পানি যে সাতাইশ মহল পাইয়াছিলেন, তাহাতে পেঁচকুলির উল্লেখ আছে। † বর্ত্তমানে এই পেঁচকুলি ডায়মণ্ড হারবার সবডিভিসনের অধীন, ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান স্থান চাঁদপাল, রাজারামপুর, ফলতা প্রভৃতি; ‡ ফলতা ভাগীরথীর উপর, ইহা ইংরাজ আমলেও একটি প্রধান স্থান হইয়াছিল। ইহাই সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে পেঁচাকুলি ছিল।

কুইপিটা ভাজ যে খলিফাতাবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই ¶। খলিফাত হইতে কুইপিট এবং আবাদ হইতে "আভাজ' হইয়াছে। ভ্যানডেন ব্রুকের § কুইপিটাভাজ, পাঠান আমলের খালিফাতাবাদ ও বর্ত্তমান বাগেরহাট একই স্থান বুঝাইতেছে। সমুদ্র হইতে উঠিয়া গেলে জনপদের সীমান্তে এই স্থান এক কালে পাঠানদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খাঁ জাহান আলির ইতিহাসে খলিফাতাবাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

মেঘনার মোহানায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর এক্ষণে যেরূপ দক্ষিণে ও পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। রেণেল, মার্টিন ও রিচার্ডস্

* Collection of Treaties &. (1812)
† Fifth Report from the Select Committee of the House of Cowfons.
‡ ঐতিহাসিক চিত্র, চৈত্র, ১৩১১ সাল। ৩৫২ পৃঃ
¶ Khulha Gzetteer P. 29
§ Van Den Broucke's Map of 1660.

সাহেবদিগের জরিপে ১৭৬৪ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ম্যাপ প্রস্তুত হইয়াছিল, * তাহাতে দক্ষিণ সাহবাজপুর একটি দ্বীপ মাত্র ও উহার পশ্চিম দিকেও মেঘনা নদী প্রবাহিত ছিল। মেঘনা হইতে একটি ক্ষুদ্র শাখা পশ্চিমোত্তর মুখে বহিয়া পুনরায় মেঘনায় পড়িয়াছিল। মেঘনার এই অংশ পরে তেতুলিয়ানদী নাম ধারণ করিয়াছে এবং উক্ত শাখা কালুয়া নদী হইয়াছে। মেঘনা ও হরিণঘাটা মোহানার মধ্যে রাবণাবাদ বা গলাচিপা নামক একটি নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে; এই রাবণাবাদ ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী অংশ রাবণাবাদ নামে খ্যাত; ইহা চতুর্দ্দিকে নদী বেষ্টিত একটি দ্বীপ। রেণেলের ম্যাপে রাবণাবাদের ও হরিণঘাটার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ "মগদিগের দ্বারা উৎসন্ন" বলিয়া লিখিত আছে। এই রাবণাবাদে দুইটি মৃন্ময় দুর্গ ও নানা ভগ্নাবশেষ ছিল। উহার চিহ্ন এখন নাই। † ঐ রাবণাবাদের উত্তর সীমায় কালুয়ানদীর দক্ষিণ কূলে দাসপাড়া (Duspara) নামক একটি সহর ছিল। উপরোক্ত ম্যাপে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহাই পর্টুগীজ ডাপাড়া (Dapara) সহর। ইহা দাসপাড়া বা দেবপাড়া এইরূপ কোন নামের অপভ্রংশ হইবে।

অপর দুইটি নগরী সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন অন্যোপায় নাই। নলদী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান নলুয়া বা নলদিয়া হইতে পারে। ইহা উত্তর হাতিয়াগড়ে মথুরাপুরের সন্নিকটে নলুয়া নদীর উপর। এখনও কলিকাতা হইতে দক্ষিণদেশীয় আবাদে যাইতে হইলে, মগরাহাট ষ্টেশন হইতে জয়নগর দিয়া নলুয়ায় পৌঁছিতে হয়, তথা হইতে নৌকাযোগে নানাদিকে যাওয়া যায়। নলুয়ার সন্নিকটে মণির টাট ও নলগড়া আবাদ; এইস্থানে এক প্রাচীন দুর্গের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ পাওয়া

---

* Map of "the provinces of Krishenagar, Jesore, Boosnah and Mahmudshahi with part of Dacca and Raujeshy surveyed by Rennel, Martin and Richards between the years 1764 and 1772." attached to Colonel Gastrell's Geographical and Statistical Report of Jessore, Fureed Pore and Backerganj.

† "The mud forts entered on Rennel's map on the banks of the Rabanabad or Gallachipa River do not exist now a days; nor Would we glean any information regarding them."

Colonel Gastrell's Report P. 25.

যায়। এই দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তেই বিখ্যাত জটার দেউল। তদ্বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ প্রদেশে ঠাকুরাণী নদীর সন্নিকটে প্রাচীনকালে কোন বিখ্যাত স্থান ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। টিপুরিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরবন পদ্মা-মেঘনা পার হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ—সুন্দরবনের বৃক্ষলতা।

সুন্দরবনের সবই বিচিত্র। এখানকার বৃক্ষলতা, জীবজন্তু সবই নূতন ধরণের এবং সবই এক বিচিত্রতার পরিচয় দেয়। এখানে পাতলা পলির কর্দ্দমের উপরে অতি শক্ত কাঠের সুন্দরী, পশুরী প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে এবং আর্দ্র, জলসিক্ত ও লোণাদেশে গণ্ডার ও ব্যাঘ্রের মত ভীষণ জীবের আবাসভূমি হয়। হরিণগণ সুখসেবিত সুন্দর জীব, তাহারা কর্দ্দম মোটেই ভালবাসে না, কিন্তু এই কর্দ্দমাক্ত সুন্দরবনের জঙ্গলেই তাহারা পালে পালে থাকে। এখানে মাছে গাছ বাহিয়া উঠে, কুমীরে ডাঙ্গায় আসিয়া জীবজন্তু ধরে, এবং ব্যাঘ্র কখনও বৃক্ষডালে বিশ্রাম করে, কখনও বা সাঁতার দিয়া সাগরের মত ভীষণ নদী পার হইয়া যায়। এখানে স্থানের অবস্থান গুণে একই খালে দুইদিকে বিভিন্ন প্রবাহ বহে এবং একই নদীতে অবস্থার গতিকে দুইস্থানে দুইপ্রকার ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এখানে বিষাক্ত বাষ্পে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ, তথাপি হাতীর মত প্রকাণ্ড গণ্ডার, মহিষের মত প্রকাণ্ড বাঘ, বাঘের মত প্রকাণ্ড শূকর, গরুর মত প্রকাণ্ড হরিণ এবং নৌকার মত প্রকাণ্ড কুমীর এই দেশে জন্মে। *

সুন্দরবন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই নিবিড় বনে যেমন অসংখ্য বৃক্ষলতা, তেমনই বহু জীবজন্তু বাস করে। কিন্তু এখানে সব বৃক্ষলতা জন্মে না, সব

---

* We must still view it as a curious and anomalous tract, for here we see a surface soil Composed of black liquid mud supporting the huge rhinceros, the sharp-hoofed hog, the mudehating tiger and the delicate and fastidiously clean spotted deer, and nourishing and upholding large timber trees; We see fishes climbing trees, tides running in two directions in the same creek and at the same moment,—An article on the *Gangetic Delta*, C. R. 1859.

জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। সুন্দরবনের স্বাভাবিক অবস্থান ও প্রকৃতির জন্য প্রত্যেক বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব আছে। আমরা প্রথমে বৃক্ষলতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিব।

সুন্দরবনে বহু বৃক্ষলতা পাওয়া যায়। তবে পার্ব্বত্য-প্রদেশে উদ্ভিদের যেরূপ সংখ্যাধিক্য, এখানে তত নহে; কারণ সকল গাছ সুন্দরবনে জন্মিতে পারে না। এখানে বাতাস, জল, মৃত্তিকা সকলই লবণাক্ত। এই লবণ যাহারা সহ্য করিতে পারে, জলীয়বাষ্প সম্বলিত সামুদ্রিক বাতাসে যাহাদের তৃপ্তি হয়, প্রবল বায়ুবেগে যাহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, এবং মূলদেশ জলপ্লাবিত হইলে যাহারা মরে না, সেই সকল বৃক্ষলতাই সুন্দরবনে জন্মে। এখানে বৃক্ষমাত্রেরই মূলদেশ অবিরত জোয়ারের জলে ধৌত হওয়ায় উন্মুক্ত হইয়া পড়ে; প্রবল বায়ুবেগে বৃক্ষকুল অবিরত আন্দোলিত হয় এবং নদীতীরে জলস্রোতে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বৃক্ষমূল উৎপাটিত করিয়া দেয়, এজন্য সুন্দরবনের প্রত্যেক গাছেরই শিকড় অত্যন্ত অধিক। ঐ সকল শিকড় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এক বৃক্ষের শিকড় অন্য বৃক্ষের শিকড়গুলিকে জড়াইয়া ধরে; যে সকল বৃক্ষের উপরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার সুযোগ না হয়, তাহারা মৃত্তিকার নিম্নে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করে এবং সকলে জুটিয়া সম্মিলিত বলে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। সুন্দরবনে মাটির নিম্নে কিছুদূর পর্য্যন্ত শুধুই শিকড়ময়। যেখানে মূলদেশ ধুইয়া যায়, তথায় দেখা যায়, শিকড়গুলি নানাদিক্ হইতে টানা দিয়া কেমন সুন্দরভাবে বৃক্ষগুলিকে সোজা করিয়া রাখে। গর্জ্জন প্রভৃতি বৃক্ষের অধিকাংশ শিকড় মাটির উপরই থাকে। বটগাছের বোয়ার মত এই সকল শিকড় বৃক্ষকাণ্ড হইতে চতুর্দ্দিকে টানা দিয়া বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করে। সুন্দরবনের বৃক্ষসমূহের যেমন শিকড়ের পরিমাণ অধিক, তেমন সেই সকল শিকড়ের বায়ু সেবনের প্রয়োজনও অধিক। মূলদেশ জলে প্লাবিত থাকিলে, শিকড় গুলির বায়ু সেবনের সুবিধা হয় না; এজন্য শিকড় হইতে ঊর্দ্ধদিকে অসংখ্য শূলের মত ক্ষুদ্র সূচল শিকড় উত্থিত হয়, উহাদিগকে শূল বা শূলো (blind root-suckers) বলে। সুন্দরবনের প্রায় সকল বৃক্ষেরই শূলো হয়, কাহারও সরু, কাহারও মোটা, কাহারও দীর্ঘ, কাহারও ছোট; তবে সুন্দরী গাছের শূলগুলি সংখ্যায়ও অধিক এবং আকারেও

বড়। * জোয়ারের জল যেখানে অধিক সঞ্চিত হয়, শূলোগুলিও সেখানে অধিক দীর্ঘ হয়।

সুন্দরবনের গাছগুলি প্রায়ই লম্বা হইয়া উঠে। বন্যবৃক্ষ মাত্রই দীর্ঘ হয়; তাহার একটি কারণ এই যে সেখানে অনেক গাছ অযত্নসম্বর্দ্ধিত হইয়া একত্র জন্মে, তাহারা প্রত্যেকে ছড়াইয়া থাকিবার অবসর পায় না। বীজ হইতে উৎপন্ন গাছমাত্রই দীর্ঘ হয় এবং কলম প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে যত্নে প্রস্তুত বৃক্ষমাত্রই অনুন্নত এবং বিস্তৃত হয়। যে সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা দীর্ঘ হওয়াই ভাল। শাখা প্রশাখা বাড়িতে গেলে গ্রন্থি বা গাঁইট বেশী হয় বলিয়া কাঠ ভাল হয় না। এজন্য স্বভাবতঃই পাহাড়ী শাল সেগুণ এবং সুন্দর-বনের সুন্দরী পশুর প্রভৃতি বৃক্ষ দীর্ঘ হইয়া উঠে।

এক্ষণে আমরা সুন্দরবনের বৃক্ষলতাদির মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির নাম ও তাহাদের বিশেষত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয় ক্রমে ক্রমে নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

সুন্দরী বা সুন্দর গাছ (Heritiera Minor, *Roxburgh*, Heritiera Fomes, *Brandis*) ইহার পাতাগুলি ছোট, লবঙ্গের পাতার মত, উপরে মসৃণ এবং নিম্নে ধূসর বর্ণ, বাতাসে নিম্নভাগ সুন্দর দেখায়। ইহাতে ছোট ছোট হরিদ্রাবর্ণ ফুল হয়। গাছগুলি সাতিশয় দীর্ঘ হয়, এবং স্থূল হয় বটে কিন্তু বট-গাছ প্রভৃতির মত স্থূল হয় না। ইহা আম গাছের মতও বড় হয় না। ইহার দীর্ঘোন্নত ভাব গ্রাম্য জাম গাছের সহিত তুলনা করা যায়। অল্পবয়স্ক সুন্দরী গাছগুলিও বাঁশের মত দীর্ঘ ও সরল হইয়া উঠে। উহাদিগকে "ছিট" বলে; সুন্দরীর ছিটে নৌকার লগা প্রস্তুত হয়। গাছের গায়ের উপরিভাগের পাতলা আবরণ উঠাইলে ভিতরে গাবগাছের মত লাল রঙ্‌ বাহির হয়।

ইহার কাঠও গাঢ় লাল বর্ণ, যেমন শক্ত, তেমনি সুন্দর; এবং সুন্দর বলিয়াই ইহাকে সুন্দর বা সুন্দরী কাঠ বলে। এই কাঠে তক্তা হয় এবং ইহার কাষ্ঠ

---

* "The Sundri tree has the peculiarity of sending up from its roots small prongs or spits a foot or more in height which are sometimes as thickly placed as to leave little room for walking"—F.E. Pargiter, *Calcutta Review* (1889) P. 300. একথা ঠিক নহে। সুন্দরবনের অধিকাংশ বৃক্ষেরই শূলো আছে। তবে সুন্দরীর শূলোগুলি কিছু দীর্ঘ ও শক্ত।

নদীতটে শূঁলো ও গোলগাছ,
(সুন্দরবন) ৮৮ পৃঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

বিশেষ মূল্যবান্ এবং স্থায়ী, এবং বহু প্রয়োজনে লাগে। দক্ষিণবঙ্গ নদীপ্রধান দেশ, নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের উপায় নাই। এক সময়ে সুন্দরীকাঠ নৌকা নির্ম্মাণের প্রধান এবং সহজলভ্য উপাদান ছিল ; * কিন্তু এক্ষণে আর তেমন সুন্দর কাঠ পাওয়া যায় না। ইহার কয়েকটি কারণ আছে ; প্রথমতঃ শুধু লবণাক্ত জলে সুন্দরীগাছ ভাল জন্মে না। যেখানে নদীস্রোত দ্বারা উপর হইতে মিষ্ট জল আসে, এবং জলে অধিক পরিমাণ পলি মিশ্রিত থাকে, সেই স্থানে সুন্দরীগাছ ভাল উৎপন্ন হয়। নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীগুলি পূর্ব্বে গঙ্গার শাখা প্রশাখা ছিল, সুতরাং সব নদী দিয়া পার্ব্বত্য জলস্রোত আসিত। পলিমিশ্রিত সেই মিষ্টজল লবণাক্ত সমুদ্রজলের সহিত মিশিয়া সুন্দরীগাছের জন্য উপযুক্ত উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দিত। এজন্য সুন্দরবনের সকল অংশে পূর্ব্বে ভাল সুন্দরীগাছ জন্মিত। এক্ষণে পশ্চিম ভাগের যমুনা, ইছামতী, কপোতাক্ষ ও ভৈরব প্রভৃতি সমস্ত নদীগুলির সহিত গঙ্গার সংযোগ-স্রোত এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং পদ্মার জল কেবলমাত্র মধুমতী প্রভৃতি নদী দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত হয়। এজন্য পূর্ব্বভাগে যেরূপ সুন্দরীগাছের বৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্য আছে, পশ্চিমভাগে তাহা নাই। অতি নিরবচ্ছিন্ন লবণাক্ত স্থানে শুধু সুন্দরী কেন, অন্য ভাল কাষ্ঠের বৃক্ষও জন্মে না। † সে অঞ্চলে কেবল গরাণ ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন সুন্দরীগাছ যাহা ছিল, তাহা কাঠুরিয়ার অস্ত্রমুখে পতিত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। সুন্দরবনের অন্তর্গত বাদা বা জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া যত আবাদ বা

---

* "The Sundri forests supply wood for boat-building to the 24-Pergannahs, to Jessore, to Backergunj, to Noakhali and other districts and also furnish wood for many purposes of domestic architecture "—Sir Richard Temple, Lieutenant Governor of Bengal who personally visited the Sundarbans in 1874.

†" which(Sundari) deteriorate gradually towards the west and south as the water of the rivers becomes more and more saline

L. S. S. O'Malley's *Khulna Gazetteer*, pp 82,87.

শস্যক্ষেত্রের সীমাবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং বন্দুক প্রভৃতির সাহায্যে লোকের সাহস-বৃদ্ধির সহিত হিংস্রজন্তুর বিনাশে কাঠ যতই অধিক কর্ত্তিত হইতেছে, সুন্দরীগাছ ততই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কঠোর শাসন দ্বারা সুন্দর-বনের অনেক স্থান রিজার্ভ বা রক্ষিত বনে পরিণত করিয়া, সুন্দরী শিশুকে পূর্ণাবয়ব হইবার অবসর দিতেছেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ পাইবার আশা আছে।

পশুর (Maliaccoe class)—সুন্দরী ব্যতীত অন্য সমস্ত কাঠের মধ্যে ইহা প্রধান ; এমন কি ঘরের খুঁটিরূপে ইহা সুন্দরী অপেক্ষাও ভাল কাজ করে। গাছ বড় হয়, পাতাগুলি একটু প্রশস্ত, কতকটা কাঁটালের পাতার মত। ইহাতে খুঁটি ও তক্তা হয়।

বাইন (Abicennia officinalis)—কাঠের শক্তি ও স্থায়িত্বের হিসাবে ইহাকে সুন্দরবনের তৃতীয় বৃক্ষ ধরা যায়। গাছগুলি খুব বড় হয় এবং অনেক-কাল থাকে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে পুরাতন বাইন গাছের গুঁড়ি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা ইহার গুঁড়ির পরিধি ২০।২৫ ফুটও দেখিয়াছি। অধিক-দিন হইলে গাছের গুঁড়ি শূন্যগর্ভ হয়। ইহাতে ভাল তক্তা হয়।

ধোন্দল (Gamur) অথবা গামুর—অনেকটা পশূর গাছের মত। ইহাতে মিষ্ট বা বিলাতী কূমড়ার মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল হয়। ফলে কোন কাজ হয় বলিয়া জানি না। পরিপক্ক হইলে ফলগুলি ফাটিয়া যায় ; তখন তাহার ভিতর হইতে তালের আঁটির মত কতকগুলি বীজ বাহির হয় এবং তালের গাছের মত অঙ্কুরিত হইয়া উহা হইতে গাছ গজাইয়া থাকে। এ গাছে কাঠ ও তক্তা হয়।

কেওড়া (Sonneratia opetala)—প্রায়ই নদী বা খালের তীরে এবং চরভূমিতে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়। সুন্দরবনের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গাছ। চরের উপরে প্রায়ই একস্থানে বহুসংখ্যক গাছ সারিবদ্ধ হইয়া নদীর বাঁকে মধুর শোভা বিস্তার করে। পাতাগুলি জিওলের পাতার মত সরু সরু ; উহা বানর ও হরিণের খাদ্য। কেওড়ার ফল অম্লাস্বাদ-যুক্ত, উহা মানুষেরও আহার্য্যোপকরণরূপে সুন্দরবনে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু হরিণের নিকট এই ফল পরম উপাদেয় খাদ্য। কেওড়া তলাতেই হরিণ-

শিকার করিবার স্থান এবং এখানেই বহু হরিণ মারা পড়ে। ইহাতেও তক্তা এবং ব্যবহারোপযোগী অন্যপ্রকার কাঠ হয়।

গরাণ (Ceriops Candolleana)—হরিদ্রাভ পুরু গোলাকার পাতাযুক্ত গাছ। গাছ খুব বড় হয় না এবং প্রায়ই ১০।১২ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। এক এক ঝাড়ে অনেকগুলি গাছ হয়। অত্যন্ত লোণাস্থানেও গরাণ জন্মে। এজন্য পশ্চিমের বাদায় গরাণের অত্যন্ত প্রাধান্য। ইহা ছোট কাঠের মধ্যে বেশ শক্ত কাঠ। ইহাতে ঘরের খুঁটি, চালের রুয়া, বেড়া, ঘিরিবার খুঁটা বা পোষ্ট এবং নৌকার লগি (log) প্রস্তুত হয়। ইহার দ্বারা হুকার নল্‌চেও হইয়া থাকে। ইহার পাকা গাছের বেধ ৫।৬ ইঞ্চির অধিক প্রায়ই হয় না। কাঠের গাত্রের খোসায় একটা সুন্দর লাল রঙ্‌ আছে।

গেঁয়ো (Excoccaria Agallocha)—এগাছ সোজা হইয়া উঠে। গাছের গায়ে একপ্রকার বিষাক্ত দুগ্ধবর্ণ আঁটা আছে। পশ্চিমের বাদায় কেওড়া না থাকিলে, গেঁয়ো গাছই সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা হয়। ইহার কাঠ খুব পাতলা। সে কাঠে ভাল কয়লা ও তাহা হইতে টিকে প্রস্তুত হয়। বড় কাঠের গুঁড়ি হইতে ঢোলক, তবলা প্রভৃতির খোল হয়। সাধারণতঃ ইহা জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গর্জ্জন (Diptero Carpus Turbinatus)—সুন্দরবনের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পশ্চিমভাগে অধিক জন্মে। প্রায়শঃই নদী বা খালের কূলে গর্জ্জন-গাছ দেখা যায়। বটগাছের বোয়ার মত চতুর্দ্দিকে ইহার শিকড় বিস্তৃত হইয়া গাছগুলিকে সোজা করিয়া রাখে। ইহার ছোট ফুল হয় ও তাহা হইতে বকফুল বা সজিনার মত লম্বা খাঁড়া নির্গত হয়। পাতাগুলি রবার গাছের পাতার মত পুরু। গর্জ্জনের তৈল হয়। প্রতিমা বা পুতুলের গায়ে রঙ্‌ ফলাইবার জন্য গর্জ্জন তৈল ব্যবহার করে। এই তৈল কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগে মহোপকারী। ইহার কাঠ রক্তাভ ধূসরবর্ণ এবং স্থায়ী নহে।*

হেন্তাল—ছোট সরু খেজুর গাছের মত। বোধহয় যেন আমাদের পাড়াগাঁয়ের খেজুর গাছ বনে আসিয়া লবণ খাইয়া হীনবীর্য্য হইয়াছে।

* "Heart wood reddish grey, not durable ; yields wood-oil." See Brandis, *Indian Trees*, p. 65.

একস্থানে অনেকগুলি একত্র ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। গাছগুলি ৮।১০ ফুট হইতে ১৫।১৬ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এ গাছ বাঁশ অপেক্ষা অধিক মোটা হয় না, সাধারণতঃ সরু বাঁশের মতই মোটা হয়। ইহার সরু গাছে লাঠি এবং ঘরের চালের রুয়া হয়। হেঁতালের নড়ি বা ছড়ির কথা "মনসার ভাসানে" আছে। হেঁতালবন ব্যাঘ্রের একটি প্রধান আড্ডা, কারণ ইহার ভিতরে পরিষ্কৃত এবং উপরে ঢাকা থাকে।

সুন্দরবনে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর লুকাইয়া থাকিবার উপযোগী, হেঁতাল ব্যতীত বলা, বলাসুন্দরী এবং হ'দো নামক আরও তিন প্রকার গাছ আছে। বলাগাছের গোল গোল পাতা ও হরিদ্রাবর্ণ পুষ্প হয়, গাছগুলি ঝোপসা বাঁধিয়া একস্থানে বহুদূর লইয়া নদী বা খালের ধারে জুড়িয়া থাকে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি জলপিপাসু হিংস্রজন্তু ঐ ঝোপের মধ্যে সুন্দর ছায়ায় বসিয়া শিকার অন্বেষণ করে। হ'দোগাছ খড় প্রভৃতির ন্যায় একটু উচ্চ শুষ্কস্থানে জন্মে। এই সকল গাছ ভিন্ন শিঙ্গড় বা সিঙ্গুর, গ'ড়ে বা গড়িয়া, ওড়া, কাঁকৃড়া, খলসী ভাণ্ডার বা ভাঁড়ার, করঞ্জ এবং হিঙ্গে এই আট প্রকার কাঠের গাছ বনস্থলী জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া রাখে এবং সকলগুলিই জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়। সিঙ্গুড় ও কাঁকৃড়া কিছু শক্ত, ওড়া প্রভৃতি কাঠ খুব নরম। হিঙ্গের কাঠ খুব পাতলা; ইহাদ্বারা পাল্‌কীর বাঁট হয় এবং দক্ষিণ দেশীয় লোকে পাঙ্গাসমাছ প্রভৃতি ধরিবার জালগুলি জলে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য হিঙ্গে দ্বারা "ভাসান কাঠ" প্রস্তুত করে। অল্প লোণাতেও ওড়াগাছ জন্মে; এমন কি ভৈরব, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদীতে পার্ব্বত্যস্রোতের সংযোগ বন্ধ হওয়ার পর যত লোণাজল উপরে উঠিতেছে, ততই সেই সকল স্থানে নদীর ধারে ওড়াগাছের অবির্ভাব দেখা যায়। ওড়ার পাতা পচিয়া সেইস্থান হইতে চিংড়িমাছ ও অন্যান্য পোকার উদ্ভব হয়। এইজন্য লোণাস্থানে অধিক পরিমাণ চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্য জন্মে।

এতদ্ব্যতীত জলের কূলে হরগোজা নামক কাঁটা গাছ, বিস্তৃত চরে ওড়াধান, খোলাজায়গায় খড়জাতীয় কাশা ও তুলাটেপারী, বালুকার চরে বন ঝাউ এবং দৈবাৎ কোনস্থানে সাধারণ ঝাউ ও বনলেবু দেখা যায়। সুন্দরবনের মধ্যে যেখানে প্রাচীন বসতির চিহ্ন আছে, উচ্চভিটা বা ইষ্টকগৃহের ভগ্নাবশেষ

যেখানে দেখা যায়, তাহার সন্নিকটে প্রচুর পরিমাণে গাবগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দুই একটি গ্রাম্য বৃক্ষের বন্য সংস্করণ যে না আছে, তাহা নহে, তবে প্রাচীন বসতির চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে গাবগাছ প্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজ করিয়া বনস্থলীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। অশ্বত্থবট এক নূতন জাতীয় বৃক্ষ হইয়াছে, হরিদ্রার গাছ শটি হইয়া গিয়াছে, নানাপ্রকার লেবু বন্যপ্রকৃতি পাইয়াছে, কিন্তু গাবগাছ অবিকৃত আছে—সেই কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষগাত্র, সেই পত্রপ্রাচুর্য্যে ছায়া-বাহুল্য, সেই নবকিশলয়োদ্গমে রক্তবর্ণের ছড়াছড়ি, এবং গাছভরিয়া সেই একই গ্রাম্যাস্বাদযুক্ত ফলের ভার—বনে যাইয়া গাবগাছ শুধু বন্য হয় নাই, বরং ঐতিহাসিকের মত প্রাচীনত্বের নিদর্শনসমূহ রক্ষা করিয়া লোকের কাছে সাক্ষ্য দিতেছে। মানুষেও গাবগাছের কাছে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে!

গোলগাছ—ইহা নারিকেল জাতীয় গাছ (Palm); তবে অধিক উচ্চ হয় না। নদী বা খালের কূলে জলের মধ্যে বা ধারে জন্মে; গাছ যত বড় হয়, ততই নিম্নাংশ উচ্চ হইয়া না উঠিয়া গাছের মূলে সাপের মত জড়াইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ নিম্ন দিক্ হইতে ক্ষয় পাইতে থাকে। নারিকেলের পাতার মত ইহার পাতাগুলি খুব বড় হয়, উহা নিম্নবঙ্গে খড়ের মত ঘর ছাইবার সুন্দর উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি সপ্তাহে সুন্দরবন হইতে অসংখ্য নৌকায় গোল বোঝাই করিয়া লইতেছে। সুতরাং গোলগাছ হইতে গবর্ণ-মেণ্টের যথেষ্ট আয় হয়। গোলের ডাঁটা খুব শক্ত, শীষগুলি কাঠের মত। গোলগাছে তালের মত ফলের কান্দি হয় এবং তালশাঁসের মত গোলফল খাওয়া যায়। পাকিলে ফল অভক্ষ্য হয়।

গিলে লতা ও বেত—সুন্দর বনের ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে বহুকাল হইতে লতা জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে গিলেলতা এরূপ দীর্ঘ ও সারবান হয় যে দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অনেক সময়ে বড় গাছের গুঁড়ির মত লতার দীর্ঘতনু দেখা যায়। বনের মধ্যে বেতও এইরূপ খুব বড় হয়। এই বেত গ্রাম্যজীবনে নানা কাজে লাগে।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরবনের জীবজন্তু।

প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করিলে সুন্দরবনে জীবজন্তুমাত্রের অবনতির ও নির্ব্বীর্য্যতার কল্পনা করা যায়। আবার জীবজন্তুর অবস্থা দেখিয়া যদি স্বাস্থ্যের প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে সুন্দরবন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান অপেক্ষা স্বাস্থ্যের হিসাবে নিকৃষ্ট বলা যায় না। সুন্দরবনের সুন্দর গাছ ও প্রকাণ্ড লতা, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর, সুন্দরবনের মহাকায় সর্প ও সবল পক্ষী স্বাস্থ্যহীনতার পরিচয় দেয়ই না, বরং এক প্রকার আভ্যন্তরিক বীর্য্য ও সবলতার সম্পূর্ণ নিদর্শন প্রদান করে। কেহ বলেন, বাঙ্গালীর মত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ জাতি আর নাই; আবার কেহ বলেন, যে দেশের জলবায়ু বঙ্গ-ব্যাঘ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং প্রতাপাদিত্যের যুগে যে দেশের কোণে কোণে বহু নরব্যাঘ্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশ কখনও নির্ব্বীর্য্যতার কালিমা-মণ্ডিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর চরিত্রে কলঙ্কের রেখা থাকিতে পারে; কোন্ জাতির বা সেরূপ কিছু নাই? তবে সে কলঙ্কের সহিত কাপুরুষতার যে কোন অনিবার্য্য সম্বন্ধ আছে, এরূপ কল্পনা করা সমীচীন নহে।

সুন্দরবনের বিশাল অরণ্য ও বিরাট্ নদীসংস্থান সর্ব্বত্রই তাহাকে ভীষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্থলভাগে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল এবং জলে কুম্ভীর এই ভীষণতাকে ভীষণতর করিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের লোকে মনে করে যে, যে দেশে "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ" সে দেশে লোকে বাস করে কিরূপে? এই বিশেষত্বের কথা মনে করিয়া নিম্নবঙ্গের প্রসঙ্গমাত্র অন্যান্য লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

বাস্তবিকই সুন্দরবনের স্থলজন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র (Tigris Regalis) সর্ব্বপ্রধান। নানা দেশে নানাজাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুন্দর-বনের ব্যাঘ্রের মত হিংস্র, এমন বলবান্, এমন দর্পশালী, এমন ভীমমূর্ত্তি এবং এমন শিকারকুশল বন্যজন্তু আর দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য

ইয়োরোপীয়েরা ইহাকে "রয়াল বেঙ্গল" ব্যাঘ্র (Royal Bengal Tjger) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্য দেশীয় ব্যাঘ্রের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ ইহার হরিদ্রাবর্ণ গাত্রে লম্বা লম্বা কালো ডোরা (Stripe) দেওয়া থাকে; অন্য প্রকার ব্যাঘ্রের গায়ে কোথায়ও কালো ফোঁটা বা বড় গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু কালো লম্বা ডোরা আর কাহারও নাই। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র লেজ সমেত ১০।১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৩।৪ ফুট উচ্চ হয়। সাধারণ পূর্ণাবয়ব ব্যাঘ্র ১০ ফুট দীর্ঘ ও ৩ ফুট উচ্চ হয়। ইহাদের সম্মুখের পা দুইটি বেশ মোটা এবং অত্যন্ত সবল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ দেখিলে তেমন কিছু বোধ হয় না। বড় বাঘে গো-মহিষগুলিকে স্বচ্ছন্দে স্কন্ধে ফেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহাদের মাথাগুলি প্রকাণ্ড ও গোলাকার এবং চক্ষুদ্বয় খুব বড় ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। জগতে বোধ হয় এমন কোন জীব নাই যাহারা ইহার চক্ষুর রোষকষায়িত তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া আত্মহারা না হয়। গ্রাম্য বিড়ালের গতিবিধি ও শিকার-কৌশল দেখিলে বাঘের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এই জন্য গ্রাম্যলোকে বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলে এবং বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাঘ্রকে বিড়াল শ্রেণীভুক্ত (feline species or cat tribe) করেন। রাজকীয় ব্যাঘ্র অত্যন্ত রক্ত-পিপাসু এবং হিংস্র, উহারা শিকারের সময়ে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। জীবজন্তু মারিয়া ফেলিলে ব্যাঘ্র প্রথমে তাহার স্কন্ধ ভেদ করিয়া যথেষ্ট রক্তপান করিয়া লয়। শিকারের সন্ধানে ইহারা অতি অল্পস্থানে সঙ্গোপনে দেহ লুকাইয়া রাখে এবং সুযোগ পাইবামাত্র ভীম বিক্রমে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক শিকারের উপর পড়ে। বাঘিনী ২ হইতে ৪টি পর্য্যন্ত ছানা প্রসব করে। প্রসবকাল হইতে সে ছানা লইয়া বাঘ হইতে দূরে থাকে। কারণ বাঘে ছানা দেখিলে খাইয়া ফেলে।

সুন্দরবনের প্রধান জন্তু চারিটি;—ব্যাঘ্র, হরিণ, বন্যশূকর ও বানর। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বভাগে বন্য মহিষ এবং দক্ষিণদিকে সমুদ্রোপকূলে গণ্ডার আছে।* কেহ কেহ বলেন সুন্দরবনে গণ্ডার এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও গণ্ডারহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যে মারিয়াছিল সে

* Calcutta Review, Vol- 89 P. 299.

জীবিত নাই।* কিন্তু তৎপরে আর গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই এবং আছে বলিয়াও বোধ হয় নাই।† বন্য মহিষ পশ্চিমভাগে কখনও দেখা যায় না, পূর্ব্বাংশে স্থানে স্থানে এখনও আছে। লোকে পূর্ব্বভাগে কুকুরিয়া মুকুরিয়া প্রভৃতি দ্বীপে মহিষ চরাইবার জন্য লইয়া যায়, সেখান হইতে অনেক পোষা মহিষও পলাইয়া বন্য হইয়া যায়। হাতিয়া, সন্দ্বীপ, চর ম্যাকফারসন্ প্রভৃতি স্থানে সুন্দরবনের চিহ্ন আছে, কিন্তু নিবিড় বন নাই। সুতরাং ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু একেবারেই নাই।

সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বনের যে কোন স্থানে যাওয়া যায়, সেখানেই হরিণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুন্দরবনে জন্তুর গমনাগমনের জন্য যে বনপথ দেখা যায়, তাহা হরিণের পদচিহ্নে মণ্ডিত। হরিণ পালে পালে চরে, পালে পালে বিশ্রাম করে। হরিণ বড় আরাম ভালবাসে; একটু উচ্চ ছায়াবহুল স্থান দেখিলে রৌদ্রের সময় হরিণগণ তথায় বিশ্রামসুখ ভোগ করে; পায়ে একটু কাদা লাগিলে, হরিণ বিরক্ত হইয়া পা ঝাড়িতে থাকে। যাহাদের সৌন্দর্য্য আছে, তাহাদিগকে উহা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিও ভগবান্ দিয়াছেন। হরিণের মত চঞ্চল জন্তু আর নাই; জগদীশ্বর ইহাদের আকর্ণবিস্তৃত সুন্দর চক্ষু এবং দীর্ঘ সরু সরু পাগুলিকে চঞ্চলতার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুন্দরবনের বাঘ ও হরিণের প্রধান রঙ্ একই প্রকার; উভয়ই রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ (rufous yellow); বাঘের বেলায় এই রঙ্গের উপর কালো কালো লম্বা ডোরা, তেমন আর পৃথিবীর মধ্যে কোন জন্তুর নাই এবং হরিণের বেলায় ইহার উপর ছোট ছোট শাদা ডোরা। হিন্দুশাস্ত্রে ৯ প্রকার মৃগের কথা আছে।‡ তন্মধ্যে হরিণজাতীয় মৃগই সুন্দরবনে পাওয়া যায়।

---

* ঢাকী ফরেষ্ট ষ্টেশনের সন্নিকটে নলিয়ানের আবাদে কালাচাঁদ শিকারী ছিল। সে শেষ গণ্ডার হত্যা করিয়াছিল। তাহার পুত্র ওমর শিকারী জীবিত আছে।

† রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী ১৮৮৫ অব্দে শেষ বার স্বচক্ষে গণ্ডারের পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন।

‡ শম্বরো রোহিতো ন্যঙ্কো জম্বুকশ্চ শশো রুরুঃ
এণশ্চ হরিণশ্চেতি মৃগো নববিধা স্মৃতাঃ।

কালিকাপুরাণ।

সুন্দরবনের ডোরা বা চিতা হরিণ

৯৭ পৃঃ

সুন্দরবনে দুই প্রকার হরিণ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ডোরা হরিণ বা চিতা হরিণ (Axis maculatus, spotted deer.) এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটি মাত্র কুকুরে হরিণ (cervalus aureas, Barking deer or rib faccd deer) দেখা যায়। ডোরা হরিণের গলা, পেট ও লেজের নিম্নে শাদা, ঊরুর নিম্নভাগ ও কাণের ভিতর শ্বেতাভ। গালটি কালো, মাথার উপর পাটল বর্ণ। ইহাদের নানাপ্রকার আকার দেখা যায়। বড়গুলি ৪।৫ ফুট দীর্ঘ এবং প্রায় ৩ ফুট উচ্চ হয়। এই বড় চিতা হরিণ শুধু সুন্দরবনে কেন, ভারতবর্ষের সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে দেখা যায়; হিমালয়ের পাদদেশে, মধ্যভারতের জঙ্গলে, নর্ম্মদানদীর উভয় কূলে এবং দক্ষিণ ভারতের ঘাটপর্ব্বতশ্রেণীতে এই জাতীয় হরিণ অসংখ্য পরিমাণে দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের পরপারে বা পঞ্জাব প্রদেশে এ হরিণ নাই। অনেকে বলেন, এই হরিণ যে যে স্থানে পাওয়া যায়, সর্ব্বত্রই এক জাতীয়, কিন্তু হগসন্ (Hodgson) প্রভৃতি কেহ কেহ উহাদের মধ্যে প্রকারভেদ করেন। বিলাতী Fallow deer or Dun-deer of Robin hood এই হরিণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি।

কুকুরে হরিণের গায়ে কোন ডোরা নাই। ইহারা লাল কুকুরের মত এক রঙ্গা এবং আকারে ডোরা হরিণ অপেক্ষা অনেক ছোট, একটি বড় ছাগের ন্যায়। সাহেবেরা বলেন ভারতবর্ষে যত প্রকার হরিণ আছে তন্মধ্যে ইহার মাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জনৈক ইংরাজ লেখক (Mr. W. S. Burke) তাহার এক খান শিকারবিষয়ক পুস্তকে (Indian Field Shikar Book) সুন্দরবনে আরও এক জাতীয় হরিণের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ হরিণকে Swamp deer বলে। কিন্তু এদেশীয় প্রধান প্রধান শিকারিগণও এরূপ হরিণের অস্তিত্বের সন্ধান পান নাই।

সুন্দরবনের হরিণে ছাগের মত গাছের পাতামাত্রই খায়। তবে কেওড়া গাছের ফল ও পাতা কিছু অধিক ভালবাসে। এই জন্য জোয়ারের জল সরিয়া যাওয়া মাত্র যখন কেওড়ার তলা জাগিয়া উঠে, তখনই পালে পালে হরিণ সেই কেওড়া তলায় আসে। এই কেওড়াতলে শিকারীদিগের দ্বারা অসংখ্য হরিণ মারা পড়ে। অনেকে "গাছাল" দিয়া অর্থাৎ কেওড়া গাছে লুকাইয়া থাকিয়া হরিণ শিকার করে। হরিণের মাংস ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজাতীয় লোকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ

পূর্ব্বক খায়। হরিণের মাংস খাঁটি রক্তবর্ণ, উহাতে চরবি খুব কম, খাইতে বিশেষ কোন তৈলাক্ত আস্বাদন নাই। তবে উদর পুরিয়া খাইলেও কোন অপকার করে না এবং "বাসি" করিয়া অর্থাৎ যে দিন হরিণ মারা পড়ে, তাহার ২।১ দিন পরেও মাংস ভক্ষণ করা যায়। অনেকে বলেন হরিণের মাংস একটু "বাসি" না হইলে ভাল লাগে না। একটি হরিণে আধমণ হইতে দেড়মণ পর্য্যন্ত মাংস হয়। আমাদের দেশে চিরদিনই হরিণের মাংসের আদর চলিতেছে। বীরনৃপতিগণ প্রধানতঃ এই মৃগমাংসের জন্যই মৃগয়া করিতেন। তখন মৃগয়া ক্ষত্রিয়ের একটি প্রধান ধর্ম্ম ছিল। যাঁহারা জীবহিংসা করিতে সর্ব্বদা বিরত থাকিতেন, তাঁহারাও মৃগয়া করিতে উদ্যোগী হইতেন। পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে মৃগমাংসের মত কোন মাংসেরই আদর ছিল না। এখনও যাঁহারা মৃগশিকারের আনন্দানুভব করিয়াছেন এবং মৃগমাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বহুকর্ম্মের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মৃগশিকারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন।

সুন্দরবনের সর্ব্বত্র বন্যশূকর পূর্ণ রহিয়াছে। হরিণ এবং শূকর ব্যাঘ্রের প্রধান খাদ্য। কিন্তু তন্মধ্যে হরিণ শিকার করা কঠিন; হরিণ বড় চঞ্চল ও সতর্ক; কোন প্রকার একটু পত্রের মর্ম্মর শব্দ হইবা মাত্র সাবধান হয় এবং দৌড়িয়া, লাফাইয়া ব্যাঘ্র কখনও হরিণের সঙ্গে পারে না। এজন্য যখন অন্য শিকার জুটে না, তখন শূকরই ব্যাঘ্রদিগের প্রধান অবলম্বন। প্রকাণ্ড বরাহ হনন করা যে নিতান্ত সহজ কার্য্য তাহা নহে, তবে দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের সহিত বরাহ পারে পারে না। এই বরাহগুলি (Sus Indicus) প্রায় ৪।৫ ফুট লম্বা হয়, লেজ ১ফুট হইতে পারে, উচ্চতা ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের রঙ ঈষৎ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ (brownish black)। ঘাড়ের লোম, বুকের ও পেটের লোম গোড়ায় কালো এবং অগ্রভাগে শাদা হয়। সুন্দরবনের শূকর প্রায়শঃ খুব বড় হয়; মস্তকের খুলির দৈর্ঘ্য ১৪।১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয় এবং বড় দন্ত দুইটি ৭½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। আমরা সুন্দরবনে শূকরের খুলি হইতে বাহির করিয়া যে দন্ত সংগ্রহ করিয়া ছিলাম, তাহাও ৭ ইঞ্চির কম হইবে না।

সুন্দরবনের বানর সাধারণ বঙ্গীয় বানর (Inuus rhesus); ইহারা হনুমান নহে। পূর্ণাবয়বের শরীর প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ হয়, লেজ উহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহারা অনেক স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে এবং স্বজাতির

অনুরূপ নানাবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়া প্রদর্শন করে। সুন্দরবনে ইহারা হরিণের অভিভাবকের মত ভঙ্গী করে। কেওড়া গাছে উঠিয়া নিজেরা যেমন পাতা ও ফল খায়, গাছের তলে সমাগত হরিণদিগকেও সেইরূপ ডাল ভাঙ্গিয়া দেয়। কোন শিকারী দেখিবামাত্র দূর হইতে প্রথমে মুখভঙ্গী পরে চীৎকার করিয়া উঠে, উহা শুনিবামাত্র হরিণগণ শশব্যস্ত হইয়া পলায়ন দ্বারা জীবন রক্ষা করে। বানরগুলা কখনও বা হরিণের পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়ায়। বানরের বান্দরামি সর্ব্বত্র সমান।

এই সকল জন্তু ছাড়া সজারু, বনবিড়াল প্রভৃতিও সুন্দরবনে দেখা যায়। বনবিভাগে শৃগাল বা শিয়াল থাকে না। বড় শিয়াল অর্থাৎ ব্যাঘ্রের ভয়ে ক্ষুদ্র জন্তুমাত্রেই বন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তবুও সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে জীবের অভাব নাই। ডাঙ্গায় বাঘ এবং জলে কুমীর ব্যতীত ডাঙ্গায় অসংখ্য প্রকার সর্পের সমুদ্ভব হওয়াতে সুন্দরবনের ভীষণত্ব আরও বাড়িয়াছে। প্রায় সকল প্রকার সর্পই সুন্দরবনে আছে। তন্মধ্যে কেউটা, গোখুরা, পাতরাজ ও নানাবিধ বোড়া সাপই অধিক। ইহারা ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ; কারণ বন্দুকে, বৃক্ষারোহণে, পলায়নে ব্যাঘ্রের হাতে হয়ত প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে চক্ষের অন্তরালে অকস্মাৎ এই সকল ভীষণ সর্পের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নহে।

যশোহর খুল্‌নার লোকালয়ে এবং সুন্দরবনে অসংখ্য প্রকার সর্প দেখা যায়। তদ্বিষয়ে একটু সাধারণ জ্ঞানের অভাবেও অনেক সময়ে অনেক বিপদ্ অনিবার্য্য হয়। এজন্য সর্প সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অনর্থক বা অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রেণীবিভাগবিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র কয়েকটি সর্পের নাম করিলেই কিছু বুঝা যায় না।

সর্পের মধ্যে কতক বিষধর, অন্যগুলি বিষহীন। বিষধর সর্পকে প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যায়; (১) চৌসাপা, (২) বোড়া ও (৩) বীজজড়ী। কেউটা, গোখুরা, আইরাজ ও কানড় এই চারি প্রকার সর্পই চৌসাপা সংজ্ঞা-ভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ রহিয়াছে।* কেউটার

* কেউটা আট প্রকার:—(১) কাল কেউটা (আকারে ছোট, চোপ্ কালবর্ণ, রঙ কালো) (২) আ'ল কেউটা (নীলবর্ণ) (৩) তেতুলিয়া কেউটা (লালবর্ণ, জলবোড়া সর্পের মত)

মস্তকে পদ্ম বা গোলাকার চিহ্ন এবং গোখুরার মস্তকে U চিহ্ন আছে। কেউটা, গোখুরা ও আইরাজের ফণা আছে, কানড় ফণাহীন। এই চারি প্রকার সর্পই অত্যন্ত বিষধর, ইহাদের বিষ অতিশয় তীব্র এবং সাংঘাতিক। আঘাতের প্রকৃতি দেখিয়াও ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারা যায়।* তবে ইহাদের আঘাত হইতে আরোগ্যলাভের কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে আমাদের এদেশে এখনও অনেক গুণী বা ওঝা আছেন, যাঁহারা মন্ত্রবলে ও ঔষধাদি প্রয়োগে অনেকের জীবন-দান দিয়া থাকেন। কেউটা ও গোখুরা লোকালয়ে এবং আইরাজ সুন্দরবনের মধ্যে দেখা যায়। কেউটা জলাভূমিতে এবং গোখুরা শুষ্কক্ষেত্রে, ভগ্নগৃহে বা উচ্চস্থানে দেখা যায়। চৌসাপা ব্যতীত অন্য বিষধর সর্পের মধ্যে বোড়া প্রধান। ইহাদের ফণা নাই, আকারে বড়, বিষ তত তীব্র না হইলেও সাংঘাতিক। ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রকার ফণাহীন অথচ বিষধর সর্প বীজজড়ী

---

(৪) ঘিতে ভাঙ্গা বা শামুক ভাঙ্গা, (৫) পদ্ম কেউটা বা তারাফুটকী (মাথায় পদ্ম সুস্পষ্ট দেখা যায়), (৬) বাঁশবুনে কেউটা (শাদা শাদা ডোরা), (৭) দু'ধে খরিষ (শাদার উপর শাদা পদ্ম) এবং (৮) খ'য়ে কেউটা। গোখুরা ৫ প্রকার :—(১) কালী গোখুরা (কালো রঙ) (২) পদ্ম গোখুরা (সোণার মত রঙ্), (৩) খ'য়ে গোখুরা, (৪) হল্‌দে গোখুরা ও (৫) নাগরাজ গোখুরা (কালোর উপর ডোরা)। আইরাজ ৮।৯ প্রকার :—(১) পাতরাজ (ফণা আছে, মাথায় কোন চিহ্ন নাই), (২) দুধ্‌রাজ (শাদা), (৩) মণিরাজ, (৪) ধনীরাজ, (৫) ভীমরাজ (এই তিন প্রকারই কালো রঙ্ বিশিষ্ট), (৬) শঙ্খচূর (হরিদ্রাভ, সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক) ইহা ব্যতীত মণিচূর, নাগরচাঁদ ও শঙ্কাবতী নামক আরও তিন প্রকার আইরাজ আছে। কানড় ৪ প্রকার :—(১) পাথুরে কানড় (অনেকটা আ'ল কেউটার মত), (২) শাখামুটী (বাঁশবুনে কেউটার মত) (৩) রক্ত কানড় (ইহাদের পেটের দুই পার্শ্বে মাথা পর্য্যন্ত দুইটি লাল দাগ আছে), (৪) কালাজ (কালো রঙ্, ঘাড়ের কাছে একটি চৌকা দাগ আছে)।

* কেউটার কামড়ে কন্‌কনে যন্ত্রণা হয়, আহত ব্যক্তি হাত পা ছুড়িতে থাকে ও মুখে গোজলা বা ফেন উঠে। ইহারা বিলে বা জলা জায়গায় কামড়ায় এবং ইহাদের বিষে শরীর নীলবর্ণ হয়। গোখুরার আঘাতে জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক এবং অসহ্য। ইহারা কখনও জলে কামড়ায় না। ইহাদের বিষেও শরীর নীলবর্ণ হয় এবং গুরুতর আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আইরাজের দাঁত বড়, উহাতে ক্ষত অধিক হয়। বিষ কেউটার মত, তবে বিষের গতি একটু ধীর। কানড়ের কামড় বুঝিতেই পারা যায় না, জ্বালা করে না, কেউটার আঘাতের মত দেহ নীলবর্ণ হয়, বিষ খুব মন্দগতি। ইহারা বিছানায়ও কামড়ায়।

শ্রেণীভুক্ত।* বিষহীন সর্পের মধ্যে কতকগুলিকে কালাই সাপ বলে, এবং দাঁড়াস প্রভৃতি অন্য গুলির কোন বিশেষ নাম দেওয়া যায় না। বরাহচিতে বা ময়াল (python) প্রভৃতি কালাই মাঝে বড় বড় জন্তুকে উদরসাৎ করিয়া থাকে। সাপের মধ্যে কতকগুলি সাপ দেখিতে এক প্রকার অথচ উহাদের কোন কোনটির ফণা নাই অথচ বিষ আছে, তাহাদিগকে গড়া'চ বলে। আবার নানা-জাতীয় সর্পের পরস্পর সঙ্গমে (Cross-breeding) শঙ্কর বা দোরোখা সাপের উৎপত্তি হয়। সুন্দরবনের জঙ্গলে কেউটা বা গোখুরার সহিত আইরাজের সম্মিলনে উৎপন্ন অনেক শঙ্কর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের নদীমাত্রই কুম্ভীরে পূর্ণ। "ভাসাল" নামক এক জাতীয় কুমীর মধুমতী প্রভৃতি নদীতে দেখা যায়; শুনিয়াছি উহারা মনুষ্য শিকার করে না। কিন্তু সুন্দরবনের নদীতে এরূপ বৈষ্ণব কুমীর নাই; সুন্দরবনের কুমীর অত্যন্ত হিংস্র। বড় কুমীরগুলি ১০।১৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। কুমীর শিকার করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, ছোট বড় অসংখ্য কুমীর নদীর চড়ায় উঠিয়া রৌদ্র সম্ভোগ করিতেছে; গরু প্রভৃতি মড়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলে তৎসঙ্গে অনেক সময়ে দেখা যায়, ২।৩টি কুমীর মাংস খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিতেছে। বন্দুকের ভিতর প্রকাণ্ড গুলি বা জালের লৌহ কাঠি পূরিয়া লইয়া, কুমীরের পায়ের নিম্নে বা চক্ষের কোমল স্থান লক্ষ্য করিয়া কুমীর শিকার করিতে হয়। সুন্দরবনে কোথায়ও নদীতে নামিয়া স্নান করা

---

* বোড়া ৬৪ প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম জানা গিয়াছে, যেমন চক্রবোড়া, চন্দ্রবোড়া, টিয়েবোড়া, তুতলবোড়া, অমলবোড়া, ধবলবোড়া, গেছোবোড়া, জলবোড়া, হরিণবোড়া, ও বিঘতেবোড়া প্রভৃতি। এতন্মধ্যে চক্রবোড়া ও চন্দ্রবোড়ার পেটে ছানা হয় এবং ইহারা অত্যন্ত সর্পভক্ষক। ইহারা লম্বা অধিক হয় না, কিন্তু মাথা সরু এবং দেহ বেশ মোটা হয়। ইহাদের কামড় বড় সাংঘাতিক, কামড়াইলে চোক, মুখ, নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। বিঘ'তে বোড়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। হরিণেবোড়া খুব দীর্ঘ এবং মোটা; ইহারা হরিণ বা তদ্রূপ বড় জন্তুকে সশরীরে উদরস্থ করে। বীড়াজড়ী সাপেরও অনেক প্রকার আছে:— কালনাগিনী, উদয়কাল, রুদ্রকাল, মহাকাল, নিকেনী নাগ, বঙ্করাজ, বাঁকাল, ছাঁতারে, সীতাহার, চন্দ্রভাগ, সূর্য্যভাগ ও সূতাসঙ্কার প্রভৃতি। এতন্মধ্যে বঙ্করাজ খুব বড়, ৫।৬ হাত লম্বা হয়, ফণাধর সর্পের মত যখন ছোঁ মারিবার জন্য উচু হইয়া উঠে, তখন ইহাদের গায়ে ৪।৫টি ভাঁজ পড়ে, উহাতে দেখিতে বড় সুন্দর হয়। বাঁকাল সাপ ত্রিশির বলিয়া দেখিতে বড় রহস্য। কালনাগিনীর কালো গায়ে লাল ফুল দেওয়া থাকে। উদয়কাল বহুরূপী, উহাতে অনেক রঙ ধরে।

কঠিন, সর্ব্বদা প্রাণের আশঙ্কা থাকে। জীবজন্তু বা মানুষ সাঁতার দিয়া নদী বা খাল পার হইতে গেলেও কুমীরের হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তবে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রগুলি বিস্তৃত নদীসমূহ আবশ্যকমত সাঁতার দিয়া পার হইয়া থাকে, তাহাদিগকে কুমীরে ধরিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এরূপও শুনা যাইয়া থাকে যে কুমীর তীরে উঠিয়া গরুর দড়ি ধরিয়া জলে পড়ে এবং জল হইতে টানিতে টানিতে গরুকে জলে লইয়া ধরিয়া বসে এবং কখনও বা লেজের আঘাতে মানুষকে ছোট নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া শিকার করে। হাঙ্গরও প্রচুর পরিমাণে সুন্দরবনে আছে এবং এমন কি উত্তরদিকে নদীতে অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া লোকালয়ের ভীতিসঞ্চার করিয়াছে। উহারা নিঃশব্দে একজনকে ধরে এবং এক প্রকার অজ্ঞাতসারে তাহার হাত পা কাটিয়া লইয়া যায়। বড় হাঙ্গরগুলি ৬।৭ হাত দীর্ঘ হয়, দেখিয়াছি। ইহাদের গালে উপরে ২ পাটি ও নিম্নে ১ পাটি মোট ৩ পংক্তি দাঁত। দাঁতগুলি মাংসের পুটুলি দ্বারা এক প্রকার আবৃত; এজন্য হাঙ্গরে যখন কাহারও গাত্রে মুখ দেয়, তখন সে প্রথমে জানিতেই পারে না, পরে চাপ দেওয়া মাত্র অতি সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কঠিন অস্থি পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। হাঙ্গরের মূর্ত্তি অনেকটা পাঙ্গাস মাছের মত। সুন্দরবনের নদীতে শিশুকের অভাব নাই। অবিরত তাহারা মৎস্য শিকারের জন্য জলমধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে এবং মাঝে মাঝে জলের ভিতর হইতে মাথা উচু করিয়া নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে নাসিকাগর্জ্জন দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে।

সুন্দরবনের অন্যান্য বিশেষত্বের মত মৎস্যেরও বিশেষত্ব আছে। সে সকল মৎস্য অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য, এমন কি তাহাদের অনেকগুলির নাম পর্য্যন্ত অন্য স্থানের লোকে জানে না। ভেক্‌টী বা ভেট্‌কী এবং গল্লা বা গল্‌দা চিংড়ি বঙ্গোপসাগরের শাখানদীসমূহ হইতে ধৃত হইয়া কলিকাতা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী সহরে গিয়া বিক্রীত হয়; উহা সাহেবগণ এবং সহরবাসী লোকের অতি উপাদেয় খাদ্য। ছোটগুলিকে ভেট্‌কী বলে এবং খুব বড় আকারের ঐ জাতীয় মৎস্যকে এতদ্দেশে ভ্যাকট বা ভেকট্ বলে। সেরূপ মৎস্য বলেশ্বর, পসর বা শিবসাতেই পাওয়া যায়। সুন্দরবনের চিংড়ি অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে যেগুলি সম্মুখের পদ দুইখানি খুব দীর্ঘ এবং নীলবর্ণ হয়, তাহাকে

গল্‌দা বলে, আর এক জাতীয় চিংড়িকে লোণা বা বাগ্‌দা চিংড়ি * বলে, উহা অত্যন্ত দুষ্পাচ্য। চিংড়ি মৎস্য এক প্রকার পোকা জাতীয়, উহা সুন্দরবনের ওড়া প্রভৃতি বৃক্ষের পচা পাতা হইতে জন্মে। চিংড়ির জীবাণু সকল অদৃশ্যরূপে লোণাজলে মিশ্রিত থাকে। খুল্‌না জেলার দক্ষিণভাগে নানাস্থানে এক্ষণে যথেষ্ট চিংড়ি মৎস্য ধরিয়া সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বস্তায় বস্তায় বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। সুন্দরবনের পার্শিয়া এবং ভাঙ্গান মৎস্য অত্যন্ত তৈলাক্ত এবং সুস্বাদু। ইহা উর্দ্ধসংখ্যা ২।০ সের পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু সেরূপ বড় মাছ পাইলে তাহা তৈলাধিক্যবশতঃ উদরে পরিপাক করা কষ্টকর। খরশূল্যা মাছের আদিস্থান ভাটি অঞ্চল, কিন্তু আজকাল উহা অনেক সৌখীন ভদ্রলোকের পুষ্করিণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। শিবসা প্রভৃতি নদীর মধ্যে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নানাবর্ণে চিত্রিত চিত্রা, রেখা, রুচা ও দাঁ'ত্‌নে প্রভৃতি মৎস্য অসংখ্য দেখা যায়। চিত্রাগুলি গোলাকার ও অতি সুচিত্রিত, শ্বেতবর্ণ ও বৃহচ্চক্ষুরেখা দেখামাত্র তৃপ্তি হয়, ঈষৎ ধুসরাকৃতি রুচা মৎস্যাশী মাত্রেরই রুচি বৃদ্ধি করে। রসনায় পরীক্ষা ব্যতীত ইহাদের গুণব্যাখা শুনিয়া লাভ নাই। সুন্দরবনের ছোট ছোট খালে নদীসংলগ্ন ডোবায় অনেক সময় মৎস্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; জাল দিয়া মারিতে গেলে মৎস্যের ভারে জাল টানিয়া উঠান কঠিন হয়। ভোলা, বা জাবা বা পোয়া মাছ সর্ব্বত্র সহজলভ্য, তবে দেখিতে বা খাইতে ভাল নহে। বড় জাতীয় এক প্রকার ভোলাকে কৈভোল বলে। ছোট মাছের মধ্যে নানাজাতীয় ট্যাংরা, ফ্যাসা এবং গাঙ্গ্‌খয়রা বা চাপ্‌লিয়া মাছ সর্ব্বদা পাওয়া যায়; সিলিন্দা, পাঙ্গাস এবং আইড় ছোট বড় সব রকম অনেক সময়ে মৎস্যের বাজারের সৌন্দর্য্য ও পসার বৃদ্ধি করে। এতদ্ব্যতীত কর্কট বা কাঁকড়া এবং কাঠাদুর বা এক জাতীয় কচ্ছপ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং অনেক লোক লোলুপ-জিহ্বার সাহায্যে উদরস্থ করে। মৎস্য যে শুধু মানুষে খায়, তাহা নহে; অন্য শিকার না মিলিলে ব্যাঘ্রগণ ভাঁটার সময়ে খালে নামিয়া অপরিমিত মৎস্যের দ্বারা মাংসের অভাব পরিপূর্ণ করে এবং অবিরত অসংখ্য প্রকার পক্ষী মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকা

---

* যে বকদ্বীপ বা বগ্‌দি কথা হইতে জাতিবাচক "বাগ্‌দী" শব্দের উৎপত্তি, সেই কথা হইতেই চিংড়ি মাছের এই স্থানবোধক বাগ্‌দা নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

নির্ব্বাহ করে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে যেমন মৎস্যাশী মনুষ্য, মৎস্যবহুল সুন্দরবনে তদ্রূপ মৎস্যশিকারী অসংখ্য প্রকারের পক্ষী আছে।

সুন্দরবনবাসী পক্ষিগণের মধ্যে নানাজাতীয় কুল্যা, চিল, বক ও কাঁক প্রধান।* মাছাল (Buzzard) এবং মাছরাঙ্গাও (king-fisher) সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মৎস্যাশী; সকলেরই ঠোঁট লম্বা ও অগ্রভাগে ঈষৎ বাঁকান, গলা লম্বা এবং পা দুইখানি সরু ও দীর্ঘ; কারণ এরূপ না হইলে মৎস্য শিকার করিতে পারে না। নদী বা খালের কূলে জলের অতি সন্নিকটে অতি ধীর স্থিরভাবে বক ও কাঁক বসিয়া থাকে, মাছাল ও চিল কখনও বৃক্ষাগ্রভাগে বসিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করে এবং কখন দলে দলে জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় এবং মাছরাঙ্গা জলের উপর পতিত ডালের উপর বসিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে শিকারের সন্ধান করে ও সময় বুঝিয়া তীরবেগে উড়িয়া পড়িতে গিয়া বিচিত্র পক্ষ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে এবং প্রায়ই অব্যর্থ সন্ধানে মৎস্য ধরিয়া খায়। চাতক খাদ্যের লোভে জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায় ও উৎকট চীৎকারে দেশ মাতায়। কিন্তু নৌকা বা ষ্টীমার দেখিলে এই সকল পাখী সকলেই দলে দলে উড়িয়া গিয়া দূরে সরিয়া বসে, এইরূপে নৌকার অগ্রে অগ্রে বহুদূর চলিয়া যায়। এই সকল ব্যতীত "মদনা" বা মদনটাক, ভস্মকায় "শামখোল," কৃষ্ণবর্ণ "মাণিক" ও ঝাঁকে ঝাঁকে "গয়াল" সুন্দরবনের নদী-পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে। বনের প্রান্তে বালিহাঁস দেখা যায়, প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় বন্যকুক্কুটের তীব্রস্বর নিস্তব্ধ বনস্থলীকে মুখরিত করিয়া তুলে। কুক্কুট জনস্থানে হিন্দুর নিকট নিস্তার পাইলেও বনে গিয়া হিন্দুশাস্ত্রের হাতে অব্যাহতি পায় নাই; হিন্দুদিগের বন্য-কুক্কুট খাইবার ব্যবস্থা আছে এজন্য তাহার উগ্র চীৎকার "কাণের ভিতর দিয়া

---

* কুল্যা খুব বড় পাখী, ইহা দুই প্রকার:—শ্বেত কুল্যা এবং দেশী বা কালো কুল্যা। সুন্দরবনে তিন প্রকার চিল দেখা যায়:—মাটিয়া চিল, শঙ্খ চিল এবং গাঙ্গচিল। তন্মধ্যে গাঙ্গচিলগুলি ধবধ'বে সাদা (a kind of petrel); বক পাঁচ প্রকার:—(১) কুঁচি বক (ইহাদের পাখার উপর মাটিয়া রঙ), গোবক (stork); একটু বড়, রঙ্‌ সাদা এবং পায়ের বর্ণ হল্‌দে। (৩) চালি বক আকারে বেশ বড়, ইহাদের রঙ খুব সাদা এবং পা দুইখানির বর্ণ কালো। (৪) নল ঘোগা বককে বাক্‌চোও বলে, ইহাদের রঙ্‌ কালো; (৫) রাজাবক বা কাণা বকের রঙ্‌ লাল। কঙ্ক বা কাঁক কালো (Heron) ত্রিবিধ:—(১) শ্বেতকাক সাদা রঙ্‌, গলা খুব লম্বা; (২) কালো কাঁক, কতকটা রঙ্‌, গলা একটু লাল; (হট্টিটি চাতক জাতীয়। গ্রাম্য কাকের সহিত এই কঙ্কের কোন সাদৃশ্য নাই।

মরমে পশিয়া” নৈশ অন্ধকারের মধ্যে শিকারিমাত্রের নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঘুঘু, দ'লো, দয়েল, হল্‌দে পাখী, ফিঙ্গে এবং নানাজাতীয় বাটাং * প্রায়ই দেখা যায়; তবে আর যে তিন প্রকার পক্ষী দেখা যায়, তাহাদের রূপের তুলনা নাই। বৈকুণ্ঠ পক্ষীর (bird of paradise) মত ইহাদেরও দেহের কিছু বাহার আছে। দুধরাজ ছোট পাখী, শ্বেতবর্ণ, সরু সাদা লেজ খুব লম্বা; রক্তরাজ ঠিক ঐরূপ, কেবল রঙ্‌টি রক্তবর্ণ এবং ভীমরাজও ঐ একজাতীয়, বর্ণটি গাঢ় কালো। ভীমরাজ জনশূন্য বনের পাখী, কিন্তু সে নাকি বনে থাকিয়াও মানুষের মত কথা কয়, সে কথা শুনিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই; তবে ময়নার মত শিক্ষা পাইলে, তাহারা যে পাখীর ঠোঁটে মানুষের বুলি ফুটাইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ—সুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ।

ভ্রমণের পক্ষে সুন্দরবনের মত অনুপযুক্ত স্থান আর নাই। সুবিস্তৃত এবং তরঙ্গসঙ্কুল অসংখ্য নদী, নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গল, ভীষণ হিংস্র জন্তুসমূহের অত্যাচার, প্রতিনিয়ত জলপ্লাবনে অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত ভূপৃষ্ঠ, আবাস, আশ্রয় বা ভ্রমণচিহ্নিত পথের অভাব, এবং আরও শত প্রকার উৎপাত সুন্দরবনকে মনুষ্যের পক্ষে অগম্য করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ সুন্দরবনের স্থানীয় অবস্থাদির বিবরণ বা শিকারের গল্প কাহারও জানিবার বিশেষ উপায় নাই। ইয়োরোপীয় শিকারী ভারতবর্ষের অন্যান্য নানা স্থানে শিকারোপলক্ষে তথাকার স্থানীয় অবস্থা ও জীবজন্তু প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুন্দরবন সম্বন্ধে তাঁহারা একপ্রকার নির্ব্বাক্। হিমালয় বা মধ্যভারতীয় পার্ব্বত্য প্রদেশের শিকার সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সুন্দরবন সম্বন্ধে তাহার শতাংশের একাংশও নহে। প্রকৃত কথা এই, শিকার একটা আমোদজনক ব্যাপার; সুন্দরবনে শিকার করিতে

---

* (১) হটুটিটি বাটাং সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য, (২) ডুবকোবাটাং আকারে খুব বড় এবং (৩) চিড়ে বাটাং অতি ক্ষুদ্রকায়।

গেলে আমোদ উপভোগের কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে হিংস্রজন্তুর এত উৎপাত যে প্রাণ হাতে করিয়া বাহির হইতে হয়, জঙ্গলের নিবিড়তা ও পথের অগম্যতা লক্ষ্য সন্ধানের কোন বাহাদুরীর পরিচয় দিতে দেয় না; আবার খোলা বাতাস নাই, লোণাজল আছে; আশ্রয় নাই কিন্তু অকূল সমুদ্রোপম নদীপথে পথভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; সাধারণ স্বাস্থ্য যেমন খারাপ, চিকিৎসকের সাহায্যের প্রত্যাশা সেইরূপ সুদূরপরাহত। এই জন্য পাশ্চাত্য শিকারিগণ এ প্রদেশে আসেন না, আসিলেও ষ্টীমার হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন না; সুতরাং সাধারণতঃ কেহ এ বিষয়ে লেখনী চালনা করেন না, যদি কেহ কোন সামান্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা অনুমান ও কল্পনা-বলে পুষ্ট করিয়া প্রকৃত তথ্য হইতে দূরস্থ করিয়া ফেলেন। সরকারী রিপোর্টে সুন্দরবনের আয় ব্যয় বা বিলিবন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ থাকে, ইহার ঐতিহাসিকতা, প্রাচীনতা, বা সাধারণ অবস্থাদি সম্বন্ধে তাহাতে কোন উল্লেখযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য তথ্য থাকে না। দূরে বসিয়া বাওয়ালী ও কাঠুরিয়াদিগের মুখে কিছু কিছু গল্প শুনা যায় বটে, কিন্তু সে সকল গল্পের মূল কথা বন হইতে জনস্থানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে এত অতিরঞ্জিত হইয়া যায় যে, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা কঠিন। এই সকল কথা বুঝিয়া, আমরা স্বচক্ষে সুন্দরবনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকবার একপ্রকার প্রাণ হাতে করিয়া দুর্গম জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রদেশের স্বাস্থ্যে অনভ্যস্ত বিদেশীয়গণের পক্ষে সেরূপ ভ্রমণ করা বোধ হয় সম্ভবপরই নহে। আমাদের ভ্রমণপ্রণালীর সামান্য বর্ণনা হইতে বনভাগের অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেকবারেই রাড়ুলিনিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় আমাদের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক হইতেন। তিনি বম্বে মেডিক্যাল কলেজে ৬বৎসর অধ্যয়নের পর ডাক্তার হইয়া বাড়ী আসেন, তদবধি গত ২২ বৎসর যাবৎ অবিরত সুন্দরবনে ভ্রমণ ও শিকার করিতে করিতে তৎসম্বন্ধীয় এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ বনবিভাগের খাল-নালা, পথ-ঘাট, ভাবভাষা, প্রত্নকীর্ত্তি সকলই তাঁহার নখদর্পণে রহিয়াছে। সাহস করিয়া বলিতে পারি, সমগ্র বঙ্গদেশে এ বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা আর কাহারও নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি যেমন অদম্য সাহসী, তেমনই স্থির-লক্ষ্য শিকারী;

আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণ।

যেমন অভিজ্ঞ, তেমন তত্বানুসন্ধিৎসু, যেমন উদ্যম ও উৎসাহশীল তেমনই সবল ও কষ্টসহিষ্ণু। তিনি যেমন শিশুর মত সরল, তেমনই বৃদ্ধোপযোগী জ্ঞানগম্ভীর; তিনি যেমন স্বজাতিবৎসল, তেমনি রাজভক্ত; বনবিভাগীয় আইন ও নিয়মাবলী তাঁহার এরূপভাবে জানা আছে এবং ভ্রমণকালে এমনভাবে ঐ সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়া থাকেন, যে তাঁহার সে প্রকৃতি এমন কি ফরেষ্ট বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণেরও অনুকরণীয় হইতে পারে।

এতগুলি গুণের সহিত তাঁহার সার্ব্বজনীন সমাজিকতা এবং দেবপ্রকৃতিক সহৃদয়তা তাঁহাকে লোকমাত্রেরই বরণীয় ও ভালবাসার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও তাঁহার গুণের সমাদর করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার ৫টি বন্দুকের, ১টা Rifle বন্দুকের, একটি রিভলবারের পাশ আছে; তিনি গবর্ণমেণ্টের এবং রক্ষিত বনে শিকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাসে (নভেম্বর হইতে এপ্রিল) প্রতিসপ্তাহে ২টি করিয়া হরিণ শিকার করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। রাজাধিরাজ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি "রায়সাহেব" খেতাব এবং একখানি বহুমূল্য তরবারি খেলাত পাইয়াছেন। উপাধি লাভের পরে তিনি অস্ত্র-আইন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্বনামধন্য দানবীর ডাক্তার পি, সি, রায়ের অগ্রজ এবং বঙ্গবরণীয় প্রসিদ্ধ এক কায়স্থকুলের মুখোজ্জ্বলকারী। এরূপ এক কৃতী পুরুষের পক্ষপুটাশ্রয়ে ভীষণ জঙ্গলে গিয়া, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম।

প্রত্যেকবারই আমাদের সঙ্গে একখানি বড় নৌকা ও একখানি ছোট ডিঙ্গি থাকিত। আমরা ৮।৯ জন যাইতাম, তদ্ব্যতীত মাজিমাল্যা ৪।৫ জন ছিল। বড় নৌকায় আমরা থাকিতাম, রাঁধিতাম ও খাইতাম; ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়া স্নানাদি করিতাম এবং ছোট খালে প্রবেশ করিতাম। সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বনদেবতা বা বনবিবি বলে। অজ্ঞানান্ধকার বিলুপ্ত করিয়া যাহারা কাঠুরিয়াদিগকে সেই বনদেবীর রাজ্য মধ্যে নিরাপদে পথপ্রদর্শন করে, তাহারা বাওয়ালী নামে খ্যাত। এই বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের অনেক তথ্য জানে; আমরা ইহাদের নিকট অনেক সকল্লন গল্পমিশ্রিত সংবাদ পাইতাম এবং শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুও গত বিংশাধিক বর্ষের অভিজ্ঞতার ফলে অনেক প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষী ছিলেন। তদনুসারে তথ্য সংগ্রহ ও কীর্ত্তিচিহ্নের ফটো লইবার জন্য আমায়

বনে প্রবেশ করিতাম। প্রথমতঃ নদী হইতে উভয় নৌকা লইয়া বড় খালে যাইতাম, শেষে যেখানে পাশখালিতে বড় নৌকা যাইত না, সেখানে ছোট ডিঙ্গিতে অগ্রসর হইতাম। যেখানে ছোট ডিঙ্গিও যাইত না, সেখানে তীরে নামিয়া পদব্রজে কর্দ্দমাক্ত ও কণ্টকিত ভয়ঙ্কর বনপথে নিঃশব্দে উদ্দিষ্ট ভগ্নাবশেষের সন্ধানে বহির্গত হইতাম। আমার সঙ্গে খাতা, পেন্‌সিল, ম্যাপ, কম্পাস, ঘড়ি, মাপের ফিতা, বাঁশী (whistle), ছোট দা এবং একখানি লাঠি থাকিত, আমার একজন সহকারী ফটো তুলিবার জন্য ক্যামেরা ও তাহার সরঞ্জামাদি লইত এবং অন্য চারি পাঁচ জন বন্দুক লইয়া অগ্রপশ্চাতে আমাদের শরীররক্ষী ও পথ-প্রদর্শক হইত। সময় সময় কিছু পয়সা দিয়া জনৈক বাওয়ালীকেও সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা যাইত। বয়সাধিক্যবশতঃ রায়সাহেবের এখন আর এরূপ কর্দ্দমাক্ত ভীষণ পথে আমাদের সঙ্গে ভ্রমণের সামর্থ্য নাই, তিনি উপযুক্ত সন্ধান ও উপদেশ দিয়া আমাদের খাদ্যাদির সুব্যবস্থার ভার লইয়া বড় নৌকাতেই থাকিতেন। আমরা বনের মধ্যে "সরিতাম"—কারণ "যাইতাম" একথা বনের মধ্যে বলা একেবারে নিষিদ্ধ। এই সরিবার ব্যাপার বড় গুরুতর, মানুষের দু'টি চক্ষে কুলায় না। দূরে ও কম্পাসে লক্ষ্য রাখিয়া অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্যে পথের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে হয়; ডাইনে বা'য়ে কোথায় হ'দো, হেন্তাল বা বলার ঝোপে বড় মিঞা (ব্যাঘ্র) ছোঁ পাতিয়া আছেন, তাহা দেখিতে হয়; নিম্নদিকে চাহিয়া, কর্দ্দমে অৰ্দ্ধমগ্ন শূ'লোর মধ্যে দেখিয়া দেখিয়া পা ফেলিতে হয়; কণ্টক-লতা কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হয় এবং কাদার মধ্যে চট্ চট্ শব্দে সম্মুখে হরিণ পলাইতেছে শুনিয়া উৎসুক চিত্তকে স্থির রাখিতে হয়। কত সাবধান থাকিতাম, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হইত না। কাঁটায় কাপড় ছিঁড়িত, গা কাটিত, শূ'লোর ঘায়ে পায়ে রক্ত বহিত, কর্দ্দমে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইত, কখনও জল ঝাপাইয়া, কখনও গোলের শীষ দিয়া পুল বাঁধিয়া খাল পার হইতে হইত, কিন্তু আমাদের গতি থামিত না।

আমরা সকল ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম; আমাদের সরঞ্জাম ঠিক ছিল। বাঘের জন্য ৪।৫টি বন্দুক ও তাহার মাল মসলা ছিল, শিকারী ছিলেন নলিনী বাবু স্বয়ং এবং তাঁহার অনুগত শিষ্য নাণ্টু * (সুরেন্দ্রনাথ দে) এবং আরও

* পিতৃহীন নিরাশ্রয় নাণ্টু নলিনীবাবুর নিকট পিতৃস্নেহ পাইয়া প্রতিপালিত [illegible] এবং মোটামুটি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে বেশ শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে [illegible]

৩।৪ জন; নলিনী বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র যামিনী বাবু ছিলেন সাপের ওঝা, তিনি বনের মধ্যে, জলের পরে সুকৌশলে কালসম বন্যসর্প ধরিতে পারিতেন, নাণ্টু এবং কালু সেখ প্রভৃতি এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্য ছিল। আমরা প্রত্যেকবারই দুই একটি করিয়া ভীষণ গোক্ষুরা বা পাতরাজ সাপ ধরিয়া আনিয়াছিলাম। এজন্য নৌকার মধ্যে ঝাপি থাকিত। পথের মাঝে সময়ে সময়ে সাপকে দাঁত ভাঙ্গিয়া গামছায় বাঁধিয়া পুটুলি করিয়া লইয়া আসিতে হইত। কত শিকারীই শিকার করিতে যাইয়া থাকেন, কিন্তু সাপ-শিকারী সহকারী আমাদের যেমন ছিল, তেমন বোধ হয় বঙ্গভূমে কোথাও পাওয়া যায় না। মৎস্য ধরিবার জন্য জাল ছিল। কীর্ত্তিস্থানের ফটো লইবার জন্য ক্যামেরা ছিল, আর বিবরণ লিখিয়া লইবার জন্য আমি ছিলাম।

সুন্দরবনে পথে হারাইবার মত সোজা কাজ আর নাই। আমরাও পথ হারাইতাম; কর্দ্দমাক্ত পথে পদচিহ্নে অনেক সময় পথের পরিচয় রাখিত; কিন্তু ফিরিবার বেলায় কখনও আমরা একটু সোজাপথ ধরিতে গিয়া একেবারে পথ হারা হইতাম। তখন আমাদিগকে বাঁশীর সিঁটি দিয়া নৌকাস্থিত বাঁশীর উত্তর আদায় করিতে হইত। যখন বাঁশীর সুর নৌকায় পৌছাইত না বা উত্তর পাওয়া যাইত না, তখন দীর্ঘ বৃক্ষে চড়িয়া পথের অনুমান করিতে হইত। এমনও দুই এক দিন হইয়াছে, যে অনেক বেলা কাজের জন্য ঘুরিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পথ হারাইয়া বসিয়াছি। তখন একদিকে যেমন ব্যস্তভাবে পথের সন্ধান চলিতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ রাত্রিবাসের জন্য বড় গাছের সন্ধান করিয়া লওয়া হইয়াছে। একদিন এমন বিপদ্ হইল যে বড়গাছ পাইতে হইলে আমাদিগকে একটি প্রকাণ্ড খাল সাঁতারিয়া পার হইতে হয়; তখন পথের সন্ধানের শেষ ফলের আশায় কেহ কেহ ভরা বন্দুকের সাহসে গোলের শীষ দ্বারা বেষ্ঠ করিয়া খালের কূলে

শিকারে তাহার যে শিক্ষা ও দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সুন্দরবনের ভৌগলিক অভিজ্ঞতা তাহার যথেষ্ট, কারণ সে নলিনীবাবুর সহচর ত আছেই, তাহা ছাড়া অনেকবার সাহেবদিগের সঙ্গে সঙ্গেও বনের মধ্যেও ঘুরিয়াছে। সেই ক্ষীণকায় যুবকের যে বিপদ্‌কালে অটল সাহস, শিকারে এক প্রকার অব্যর্থ লক্ষ্য, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, রন্ধনে নিপুণতা, পরসেবায় তুষ্টি এবং সর্ব্বোপরি তাহার যে পরচিত্তহারী মধুর স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা একত্র অন্যত্র অতীব দুর্লভ। যাঁহারা সুন্দরবনে ভ্রমণ বা শিকারার্থ বাহির হইতে চান, শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের মত সঙ্গী তাঁহারা আর পাইবেন না।

বসিয়া তমসাময়ী রজনীর অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যালোকে দূর হইতে আমাদের বৃক্ষারোহী সঙ্গী ডিঙ্গিখানি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একজন গাছে থাকিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিল এবং অন্য ২।১ জন বন্দুক হস্তে ডিঙ্গির সন্ধানে ছুটিল। অবশেষে ডিঙ্গি পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল আমাদের পরিত্যক্ত কাপড় চোপড়ের উপর বানরে অনেক অনধিকার অত্যাচার করিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখন সে তদন্তের সময় ছিল না, ডিঙ্গি যে আছে, ইহাই যথেষ্ট। আমরা আনন্দে ঘন ঘন বংশীরবে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে, অন্ধকারে সাবধানে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে দিনান্তব্যাপী পরিশ্রম এবং সঙ্কটময় অভিযানের পর আমাদের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাসময় গল্পলহরী সেই দীপময়ী তরণীর কক্ষকে কিরূপ আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা উপভোগের বিষয় ছিল, কতকটা অনুভবের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনার বিষয় হইতে পারে না।

সুন্দরবনে ভ্রমণকারীকে সৈনিকের মত জীবন অবলম্বন করিতে হয়। একদিন আমরা সকালে বাহির হইয়া ছিলাম; কয়েকস্থানে ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বেলা ১২ টার সময় নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্বেই গল্প শুনিলাম যে এক বাওয়ালী নলিনী বাবুকে সংবাদ দিয়াছে যে তাহারা প্রাতে কামার পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়া দুইটী বাঘ দেখিয়া আসিয়াছে—উহার একটি কালো এবং একটি হল্‌দে। কত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু বাঘ যে কালো হয়, এ গল্প আমরা কখনও শুনি নাই। বাঘের কৃষ্ণত্বে বিশ্বাস না করিলেও অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া পারিলাম না। সুতরাং তখনই তাহার সন্ধানে আমাদের ডিঙ্গি ভাসাইয়া চলিলাম; অভিভাবকের সুব্যবস্থায় আমাদের দগ্ধ পাকস্থলীর জন্য একটি ঝুনা নারিকেল ও কিছু গুড় তাড়াতাড়ি করিয়া ডিঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত হইল। তাড়াতাড়ি করিলেও আমরা জাল এবং মাছ রাখিবার খালুই লইতে ভুলি নাই। সেখের খাল যেখানে শিবসানদীতে মিশিয়াছে, সেইস্থানে ডিঙ্গিখানি গোলের শিকড়ে বাঁধিয়া আমরা তীরে উঠিলাম এবং সজ্জিত বন্দুকের ভরসায় ও বাঘ দেখিবার আশায় চুপে চুপে পা টিপিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে এক দ্বিতল বাটীর ভগ্নাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপের সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং তাহারই পার্শ্বে দেখিলাম একটি পোস্ত বাঁধা পুকুরের গাত্র-লগ্ন ইষ্টক-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটি ক্ষুদ্র খাল আসিয়া পুকুরকে নদীর সহিত

মিশাইয়া দিয়াছে। গল্পকারী বাওয়ালী ভায়াকে স্থান নির্দ্দেশের জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বড়মিঞাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। অগত্যা আমরা চারিধার ঘুরিয়া একটি ফটো লইয়া ক্ষান্ত হইলাম। তখন নান্টু ভায়া বন্দুক রাখিয়া জাল লইয়া পুকুরের জলে পড়িলেন, কিন্তু নদীর মৎস্য এত অধিক পরিমাণে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল যে মৎস্যের ভারে জাল টানিয়া উঠান কষ্টকর হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট মৎস্যশিকার করিয়া আমরা নৌকায় পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি অন্ন প্রস্তুত।

আমাদের ভ্রমণের একটা বিশেষত্ব ছিল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, শিকারের সন্ধান আনুষঙ্গিক। সুতরাং শিকারের জন্য পথে কোথায়ও সময় নষ্ট করা হইত না। উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকলেরই একটা কর্ত্তব্য বুদ্ধি ছিল, তাহাও আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল নলিনী বাবুর; যিনি আমাদের নেতা এবং অভিভাবক। আমরা সকলেই সুশৃঙ্খভাবে তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি উপরে উঠিতে পারিতেন না। তিনি নৌকায় থাকিতেন, আমরা উপরে উঠিতাম। আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলে দেখিতাম, তিনি অন্য একজনের সহায়তায় নৌকায় সমস্ত আহারাদির বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে নৌকায় বসিয়া নদী-বাহনে শিকারে বাহির হইতেন, আমরাও অবসর মত তাঁহার সঙ্গে যাইতাম, আসিবার সময় মৎস্য শিকার বা জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। আমাদেরও আবার কখনও কখনও অতিথি জুটিত; সুন্দরবনে পানসী নৌকা দেখিলেই লোকে মনে করে উহা মেজো বাবু বা পুটুবাবুর নৌকা; (নলিনীবাবু এই চলিত নামেই অধিক পরিচিত) সুতরাং পানসী দেখিলে কেহ পরামর্শের জন্য, কেহ রোগচিকিৎসার জন্য এবং কেহ বা হরিণের মাংসের লোভে নৌকার নিকটবর্ত্তী হইত। দৈবযোগে বিপদে পড়িয়াও কেহ কেহ আমাদের নৌকায় আশ্রয় লইত। একদিন দেখি কতকগুলি লোকে প্রকাণ্ড এক নৌকা ডুবি হওয়ায় আমাদের নৌকায় আসিয়াছে। আমরা আমাদের সামান্য ভোজ্য দ্বারা অতিথি সৎকার করিলাম। দিন ভরিয়া নানা ভ্রমণ বা অনুসন্ধানের পর আমরা সন্ধ্যাকালে সকলে মিলিয়া নৌকায় বসিয়া, স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল আলোচনা করিতাম। নলিনী বাবু অসঙ্কোচে তাহাকে বোঝান

করিয়া আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করিতেন। পূজনীয় পরিচালকের অধীনে বাস করিয়া এবং কাজ করিয়া যে সুখ, তাহা আমরা সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম।

সুন্দরবনে শিকার চারি প্রকার ;—(১) 'মাঠাল" অর্থাৎ তীরে উঠিয়া জঙ্গলের ভিতর চলিতে চলিতে শিকার ; (২) "বাওন" বা নদীবাহনে শিকার অর্থাৎ ছোট নৌকায় নদী বা খালের কূলে কূলে নিঃশব্দে চলিতে চলিতে তীরের উপর লক্ষ্য করিয়া শিকার। (৩) "গাছাল" অর্থাৎ কোন কোন বিশেষ স্থানে কেওড়া বা অন্য গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শিকার ; ৪) "টোপ" অর্থাৎ নদী সৈকতে, সাগরের বেলা ভূমিতে বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া উহার মধ্যে বসিয়া মাথার উপর পত্রাদি চাপা দিয়া শিকার। ইহার মধ্যে গাছাল এবং বাওনেই অনেক শিকার হয়। টোপের সুবিধা প্রায়ই হয় না, কারণ খোলা স্থান পাওয়া অতীব দুষ্কর। আবার শিকারের চেষ্টায় বন ঢুড়িয়া বেড়ান অনেকে পছন্দ করে না, কারণ উহা যেমন বিপজ্জনক তেমনি কষ্টকর। সুতরাং মাঠালও বড় কম হয়। আমাদের বেলায় কিন্তু এই মাঠালই অধিক, তবে সে মাঠালের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ; হরিণের খোজে বা ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরা যে কখনও কখনও অগ্রসর না হইয়াছি, তাহা নহে ; তবে আমাদের মূল লক্ষ্য প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার, আমাদের গল্পে, কাজে বা ভ্রমণে সর্ব্বদা তাহাই আলোচ্য বিষয়।

সুন্দরবনে ভ্রমণ বা শিকার করিতে হইলে, তৎপ্রদেশীয় ভাষার সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত থাকিলেও, তাহার বিভিন্ন জেলায় সে ভাষার প্রাদেশিক বিশেষত্ব রহিয়াছে। সকল জেলার ন্যায় সুন্দরবনের ভাষারও একটা প্রাদেশিকতা আছে। এই প্রাদেশিকতার সহিত নিকটবর্ত্তী কয়েকটি জেলারও ভাষাগত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুন্দরবনের এই মিশ্রিত ভাষাকে আমরা "জঙ্গলা" ভাষা বলিতে পারি। সুন্দরবনের কাঠুরিয়া, গোলের ব্যাপারী, নৌকার মাঝি, আবাদকারী কৃষক এবং দেশীয় শিকারী, বাওয়ালী ও ফকিরগণ এই ভাষায় কথা কহে। এই সকল লোকের সহিত যশোহর-খুল্‌নার সর্ব্বস্থানের লোকের কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয়, সুতরাং এই জঙ্গলা ভাষা জেলাগত বাঙ্গলা ভাষার সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার শব্দ

ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। জঙ্গলা ভাষা না জানিলে দক্ষিণদেশীয় ব্যাপারীদিগের কথোপকথনের এক বর্ণও বুঝা যায় না। সুতরাং ফরেষ্ট বা পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারিগণের এ ভাষার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুন্দরবন অনেকবার উঠিয়া পড়িয়াছে, আবার পড়িয়া উঠিবে। এখনও পূর্ব্বতন বাসচিহ্ন লুপ্ত হয় নাই, অনেক বনভূমি ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে এবং নিকটে নিকটে মানুষের বসতি হইতেছে। নানা স্থানে কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইতেছে, বঙ্গদেশেও প্রত্নতত্ত্বের পিপাসা জাগিয়াছে। এ পুস্তকেও উহার কতকটা নিদর্শন থাকিবে। তজ্জন্য লোকসমাজে সে সব কীর্ত্তিকথা প্রচারিত হইলে, এ অঞ্চলে ঐতিহাসিকের শুভাগমন সম্ভাবিত হইবে। সুন্দরবনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় বিজ্ঞাপিত হইলে, সাধারণ দর্শক বা শিকারীরও অভাব হইবে না। সাধারণের কতক সুবিধা এবং অন্ততঃ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা সাধ্যমত জঙ্গলা ভাষার কতকগুলি শব্দার্থ সংগ্রহ করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—জঙ্গলা ভাষা।

আইট বা আ'ট—বনের মধ্যে পূর্ব্বতন বসতির চিহ্নযুক্ত উচ্চ জমি।

আদলদার—পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত হইয়া রাশীকৃত হইলে, তাহার উপর যাহারা ছাপ মারিয়া দিত।

আবাদ—জঙ্গলকে "বাদা" বলে, এবং জঙ্গল 'উঠিত' হইয়া যখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন তাহার নাম আবাদ।

আফালি—আস্ফালন। মৎস্যের আফালি।

উশকাড়া—মৎস্যে জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার ঢুকিয়া যায়, উহাকে উশকাড়া বলে।

ওত—শিকারের জন্য প্রস্তুত অবস্থা বাঘে জঙ্গলের মধ্যে 'ওত পাতিয়া বসিয়া থাকে।

ওঝা—মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি। উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ।

কল—বাঁধের মধ্য দিয়া জল নিষ্কাশনের প্রণালী।

কাগজী—যাহারা পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত করিত, তাহাদের কাগজী উপাধি হইত।

কাঁচা (বাদা)—নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ।

কাঠির আবাদ—প্রথমতঃ জঙ্গল কাটিয়া যে আবাদ করে, তাহার নাম কাঠির আবাদ।

কাঠিকাটা (অধিবাসী) - যাহারা সর্ব্ব প্রথমে বাদা কাটিয়া বসতি স্থাপন করে। ঐরূপ জমিতে তাহাদের বিশেষ স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে, এই অর্থে কাঠিকাটা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন ইহা অমুকের কাঠিকাটা মহল।

কাঠুরিয়া—যাহারা কাষ্ঠ কাটিতে বনে যায়।

কাবলীওয়ালা—বাঘ। সম্ভবতঃ প্রকাণ্ড মূর্ত্তির জন্য কাবুলিয়াদিগের নামানুসারে নাম হইয়াছে।

কাবান—জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া রাখিবার ও আনিবার জন্য পরিষ্কৃত প্রশস্ত স্থান।

কুমোর—নদী বা খালের মধ্যে কাঁচা ডাল পাতা দিয়া যে স্থানে মাছ আটকাইয়া রাখে।

কোলা—নদী বা খালের কূলে প্রশস্ত স্থান।

খাস জঙ্গল—গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত বন। Reserved forest.

খাদাড়ী বা খালাড়ী—লবণের কারখানা।

খোঁজ—চিহ্ন বা পদ চিহ্ন। সন্ধান।

খোঁজ তোলা—কাদার মধ্যে চলিবারসময় চিহ্ন রাখিয়া পা তুলিয়া যাওয়া। যেমন "হরিণের খোঁজ তোলার শব্দ"।

গণ—অনুকূল নদীপ্রবাহ। Favourable current.

গরম—হিংস্রজন্তুর ভয়যুক্ত। যেমন "অমুক স্থান গরম"—অর্থাৎ যেখানে বাঘ আছে।

গলুই—নৌকার অগ্রভাগ।

গাছাল—গাছে বসিয়া শিকার। "গাছাল দেওয়া"—অর্থাৎ শিকারের জন্য গাছে বসিয়া থাকা।

গাজি—ব্যাঘ্রের দেবতা। যাহারা ব্যাঘ্র শিকার করে বা মারিয়া বীরত্ব দেখায়, তাহাদের গাজি উপাধি হয়। গাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ ধর্ম্মযোদ্ধা।*

গুঁরো—নৌকার দুই পার্শ্বের "ডালির" সহিত সংযোগ রাখিয়া ২।১ হাত অন্তর যে শক্ত কাঠগুলি এড়োভাবে লাগান থাকে, তলদেশে পা না দিয়াও যে কাঠগুলির উপর পা দিয়া নৌকার সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তাহার নাম "গুঁরো"।

গোছা—নৌকার ভিতর তলদেশে

---

* Ghazi Signifies a conqueror, one who makes warupon infidels Tabakat-i-Nasiri (Raverty) p. 70 Note 2.

"বাগ" লাগান থাকে, সেইরূপ দুই পার্শ্বে ঐরূপ যে ছোট ছোট কাঠ মাঝে মাঝে লাগান থাকে, তাহাকে গোছা বলে।

গ্যাড়া—গণ্ডার।

ঘোষড় (বন)—নিবিড় বা দুষ্প্রবেশ্য।

চ'ট বা চইট—চলাচল বা যাতায়াত। যেমন অমুক বনে খুব হরিণের চ'ট আছে, অর্থাৎ সে বনে অনেক হরিণ চলাফেরা করে।

চ'ড় বা চইড়—নৌকা ঠেলিয়া সরাইবার বা চালাইবার জন্য ব্যবহৃত সরু কাষ্ঠ বা বংশ দণ্ড।

চাড়া—উচ্চ অর্থাৎ যেখানে বাঘের অত্যাচার আছে। "গরম" দেখ।

চাপান—নৌকা বাঁধিয়া থাকা।

চাপান সারা—রাত্রিতে নৌকারোহী-দিগের নিদ্রার পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা বাঘের অত্যাচার নিবারণ করা।

চেলা—শিষ্য।

চেরাক, চেরাগ—প্রদীপ।

চোট—বন্দুকের আঘাত।

ছই—নৌকার উপরিস্থ আবরণ।

ছাপ্পর—ছই।

ছাওয়াল পীর—পাঁচ পীরের অন্যতম

ছিট—ছোট গাছ, যেমন সুন্দরের ছিট অর্থাৎ অল্পবয়স্ক সরু ও দীর্ঘ সুন্দরী গাছ।

জয়াল—নদী-তীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড ভূমি খণ্ড, যাহা সময় সময় নদীর মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

জায়গীর—বানর।

জোয়ার—সমুদ্র হইতে উপরদিকে জলপ্রবাহ।

জোয়ারিয়া—উপর বা উত্তরের দিকে। যেমন অমুকস্থান অমুক স্থানের জোয়া'রে অর্থাৎ প্রথম স্থানে যাইতে হইলে দ্বিতীয় স্থান হইতে জোয়ার দিয়া নৌকায় যাইতে হয়।

জোগা—অমাবস্যা পূর্ণিমার নিকট-বর্ত্তী অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসের সময়।

ঝা'ল—শুক্‌না গাছের অগ্রভাগ।

টোপ—খোলা স্থানে গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে বসিয়া শিকার করাকে টোপে শিকার বলে।

ডালি—নৌকায় তক্তা দ্বারা তলদেশ গড়িয়া আসিয়া সর্ব্বোপরি দুই পার্শ্বে যে অপেক্ষাকৃত পুরু দুইখানি তক্তা লম্বালম্বিভাবে লাগান থাকে, তাহাকে "ডালি" বলে।

দোস্তি—বন্ধুত্ব।

দোখালা—যেখানে দুই পার্শ্বে দুইটি সমান আকারে খাল গিয়াছে, তখন তাহাকে দোখালা বলে। কিন্তু যদি উহার একটি খাল ছোট হয়, তবে তাহাকে পাশখালি বলে।

দোয়ানী খাল—যে খালে দুই দিক্ হইতে জোয়ার ভাটি সরে, তাহাকে দোয়ানী খাল কহে।

ধে'ড়ো—শীর্ষ বা শীষ, যেমন গোলের ধে'ড়ো।

(নদীর) বাঁক—দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া এক মুখে নদী যতদূর যায়।

নল ছেয়া—কোণাকোণি নদী পার হওয়া।

নাও, না, লাও, লা—নৌকা।

না'য়ে বা লা'য়ে—নাবিক, নৌকার মাঝি।

নেমক—লবণ।

পড়া—মরা, যেমন অমুক বনে মানুষ পড়িয়াছে, অর্থাৎ বাঘে মানুষ মারিয়াছে।

পাড়ি—উত্তরণ, পার হওয়া।

পাতারি—নদীর জল হইতে প্লাবন নিবারণ জন্য নদীর তীর দিয়া ছোট বাঁধ। এইরূপে বড় উচ্চ বাঁধকে ভেড়ী বলে।

পাশখালি—"দোখালা" দেখ।

পিঠেম বাতাস—পৃষ্ঠদিক্ হইতে প্রবাহিত অনুকূল বায়ু।

পীর—দেবতা।

ফুলি—আলোক।

বড় মিঞা—বাঘ।

বড় হরিণ—বাঘ।

বনবিবি—বনদেবতা ["বনবিবির জহুরা নামা" নামক মুসলমানী কেতাবে ইহার বর্ণনা আছে]

বাওন—বাহন, নদীবাহনে শিকার।

বাওয়ালী—বনওয়ালী, বনভ্রমণকারী মন্ত্রবিৎ ফকির।

বাগ—নৌকার মধ্যে তলায় যে ছোট ছোট কাঠ এড়োভাবে লাগান হয়।

বাদা—জঙ্গল।

বাটাল—গাছাল। "গাছাল" শব্দ দেখ।

বালিয়াৎ—যে অনুচর অগ্রবর্ত্তী হইয়া শিকার দেখাইয়া দেয়।

বা'লেট—বাঘ।

বৈকিরী—বানর।

বৈঠা, বৈঠক—কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে পাতলা দাঁড় না বাঁধিয়া হাতে তুলিয়া বাহিতে হয়।

বালাম—এক প্রকার নৌকা; এবং ঐ নৌকায় করিয়া যে সরু সিদ্ধ চাউল পূর্ব্বদেশ হইতে অন্যত্র রপ্তানি হইত।

ভাটিয়াল—দক্ষিণ দেশীয়, যেমন ভাটিয়াল চাউল, ভাটিয়াল সুর।

ভাটি বাঙ্গালা—বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ।

ভাটো—নিম্ন বা দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী। যেমন অমুক স্থান অমুক স্থানের ভাটো, অর্থাৎ প্রথম স্থানে যাইতে হইলে দ্বিতীয়

স্থান হইতে নৌকাপথে ভাটিতে যাইতে হয়।

ভূইঞা—ভূম্যধিকারী।

ভেড়ী—জলপ্লাবন নিবারণ জন্য বড় এবং উচ্চ বাঁধ।

ভোঁতড়—বাঘ।

মাল—মহল, সুন্দরবনের ডাঙ্গা।

মাঝি—নৌকার কর্ণধার।

মাঠাল—পায়ে হাঁটিয়া শিকার।

মাদিয়া—দ্বীপ।

মাল্যা—দাঁড়ী।

মানসেলা—মনুষ্যালয়, মনুষ্যের বসতি বিভাগ।

মুখোড় বাতাস—প্রতিকূল বাতাস।

মোলঙ্গা—লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য ভাণ্ড বা ভাঁড়।

মোলঙ্গী—যাহারা ঐরূপ করিয়া লবণ প্রস্তুত করে।

রসাঙ্গী—যে ব্যক্তি লবণের রস লইয়া ভাঁড়ে সরবরাহ করিত।

লগি—"চ'ড়" দেখ।

লা, লাও—না, নাও, নৌকা দেখ।

শাকরেত—শিষ্য।

শিয়াল—শৃগাল, বাঘ।

শূলো—সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গোড়া হইতে উৰ্দ্ধমুখী হইয়া যে সূচল শিকড় উঠে।

সড়া—নদী তীরে নৌকা উঠাইয়া রাখিবার জন্য যে খাল কাটিয়া রাখা হয়।

সয়লা—জঙ্গলের মধ্যে শুঁড়ি পথ।

সাঁই—আড্ডা।

সারী বা সাড়ী গান—নদীপথে যাইতে যাইতে নাবিকেরা যে গান করে। তরঙ্গের মৃদুআন্দোলনে উহাতে এক প্রকার কেমন স্বরতরঙ্গ মাখান থাকে।

সোরা—গাছের কাষ্ঠের মধ্যে যে অংশ নষ্ট হইয়া খোল হইয়া যায়।

স্থল পাহারী—যাহারা লবণের খোলা চৌকি দিত।

হা'নর—বানর।

—:o:—

এতদ্দেশীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সুন্দরবন ভ্রমণ করিবার অবসর পাইলে, তাহার নদী নালা সুন্দর ভাবে মনে করিয়া রাখে এবং সময় সময় স্বভাবজাত কবিতার রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীত রচনা দ্বারা পথের পরিচয় স্মরণ-পথে রাখে। তাহাদের সেই সকল সরল গানে তাহাদের যেমন সরল প্রাণের প্রমাণ পাই, তেমনি তদ্দ্বারা অন্য অনেক নিরক্ষর ভ্রমণকারীর পথভ্রান্তির সম্ভাবনা কমাইয়া দেয়।

এখানে এই জাতীয় একটি দেশীয় গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গীত-রচয়িতা রাড়ুলির পূর্ব্ববর্ত্তী চেচোঁ গ্রামে বাস করিত, এবং তথা হইতে নৌকাপথে সুন্দরবনে যাইত। জঙ্গলা ভাষারও কতকটা দৃষ্টান্ত এই গানে পাওয়া যাইবে।

"চেঁচোর গ্রামে বাস করি খোসনবীশের মাটি
পূর্ব্ব অংশে তু'লে দিলাম, নিমাই খালির ভাটি।
হা'ড়ে বা'সে ছোট নদী ত্রিমোহানা ভারী
সেখানেতে বা'য়ে দিলাম মনসুখের তরী।
বাঁকের মাথায় কোদার গাঙ্গ জানে সর্ব্বজনা
বায় থাকিল দেলুটির গাঙ্গ ডানি সোলা দানা।
মাছুর পান্টা, হাড়ার গাঙ্গ, তা'তে বড় টান
পূর্ব্বের দিকে চেয়ে দেখ তিল ডাঙ্গার গাঙ্গ।
তিলডাঙ্গার পশ্চিমেরে ভাই আছে গড় খালি
সেইখানেতে চেয়ে দেখি কুচিয়া আর চাঁদখালি।
কুচিয়া আর চাঁদখালি গিয়া মনে হ'ল আশা
দক্ষিণের পারে চেয়ে দেখি আলমচাঁদের বাসা।*
ঘোষখালি আর ঢাকির মুখ আছেরে সায় সায়
মাতুল্যার তুফান দেখে পরাণ কেঁপে যায়।
গাঙ্গরই, বুড়া হড্ডা, ন'লেন রইল বায়
সুতার খালির মুখে কত লাও মারা যায়।
আড় বাউনে, লক্ষ্মীপ্রসাদ, ছাচনাঙ্গলার মুখে।
কত না'য়ে চাপান থাকে অতি পরম সুখে।
আ'ড়ো শিপসার মুখে টান করেরে কল্ কল্
পূবের পার চেয়ে দেখ, কুকড়া কাটির থাল।
মার্গির চর, বুজবু'নে নজরেতে দেখি
নোঙ্গর ক'রলাম গিয়ারে ভাই হাত ধাবড়ার মুখি।
কেউ বলে মরা ভদ্র কেউ বলে হাত ধাবড়া—
রূপসার তুফান দেখে রে ভাই কাঁপে পাছার চামড়া।

---

* আলমচাঁদ নামক দক্ষিণদেশীয় এক বিখ্যাত ফকির বা মুসলমান সাধু।

আদা চাকি দিয়া কত ধুমাকল যায়,
আড়পাউড়ী দিয়া তারা আ'ড়ো শিবসায় ধায়।
সেই যে কল মহাবল বুঝে কার সাধ্যি
ডা'ন হাতে তু'লে দিলাম চ'ালোবগির মধ্যি।
বা'য় থাকলো টগিবগি দক্ষিণমুখো হ'লাম
তিন বাঁক বা'য়ে গিয়ে নলবু'নের খাল পালাম।
বনেতে মা বনবিবি করেছে কি খেলা
(দেখ্‌লে) রোগ শোক দূরে যায় আর সংসারের জ্বালা।
বনের মধ্যে বনবিবির কতইরে ভাই খেলা
দুই পার দিয়ে চেয়ে দেখি শুধু গোলের মেলা।
মা যদি করেন দয়া তবে ত আর আসিব
চা'লো বগির কয়থান বাঁক সেইবার গ'ণে যাব।

দ্বিতীয় অংশ—ঐতিহাসিক।

"চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তিরিতিহাসপুরাতনম্ ।
সঙ্কীর্ত্তয়েৎ সদা ভক্ত্যা দেবর্ষিস্বধাভুজাম্ ॥"

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস।
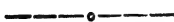
দ্বিতীয় অংশ—ঐতিহাসিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উপবঙ্গে দ্বীপমালা।

যশোহর খুল্‌না বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গের যে ত্রিকোণ ভূভাগ একদিকে ভাগীরথী, একদিকে পদ্মা ও দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর,—এই ত্রিসীমাবেষ্টিত তাহাকে গাঙ্গোপদ্বীপ (Gangetic delta) বা ব'দ্বীপ বলে। এই ব'দ্বীপের একাংশ এক্ষণে প্রেসিডেন্সী বিভাগ। যশোহর ও খুল্‌না জেলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত। বেঙ্গল বা বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রেসিডেন্সী বিভাগ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ মধ্যবঙ্গভুক্ত হয়। যশোহর ও খুল্‌না প্রকৃতপক্ষে একই স্থান; শাসন ব্যবস্থায় ইহারা পৃথক্ হইলেও এখনও সমাজে, ধর্ম্মে, লৌকিক আচারে, ও স্বভাব চরিত্রে একই আছে। এখন যেখানে খুল্‌না জেলা, ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে তাহার অধিকাংশ যশোহরের অন্তর্গত ছিল। তাহারও পূর্ব্বে এখন যেখানে খুল্‌না জেলা, তাহাই ছিল যশোররাজ্য—এবং এখনকার যশোহর জেলা সে রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমানে যশোহর ও খুল্‌না এই দুই জেলার সীমানুসারে যে বিস্তৃত প্রদেশ হয়, তাহারই বিষয় আমাদের আলোচ্য এবং উহাই আমরা যুক্ত-জেলা নামে অভিহিত করিব। এ প্রদেশ প্রাচীন স্থান; বঙ্গের প্রাচীনত্বের সঙ্গে ইহার প্রাচীন গৌরব বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্গের পুরাতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে, এ প্রদেশের প্রাচীন অবস্থা বুঝা যাইবে না।

বঙ্গ অতীব প্রাচীন স্থান। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে। * মহাভারত হইতে জানিতে পারি, মহারাজ বলি দীর্ঘতমা নামক মহর্ষির ঔরসে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইহাদের নামে পাঁচটি বিখ্যাত দেশের নাম হয়। † দীর্ঘতমা বেদোক্ত বিখ্যাত ঋষি। তৎপ্রণীত কতকগুলি সূক্ত আছে। সুতরাং দীর্ঘতমার ঔরসপুত্রগণ বৈদিক যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। ‡ বলি রাজা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গা ও সরযূ-নদীর সঙ্গমে বিখ্যাত "বলিয়া" নগরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তথা হইতে বলির পুত্রগণ ৫টি রাজ্যস্থাপন করেন এবং স্বীয় স্বীয় নামে উহার নাম নির্দ্দেশ করেন। § এজন্য বর্ত্তমান বেহার প্রদেশের নামে অঙ্গ, উড়িষ্যা অঞ্চল কলিঙ্গ, দক্ষিণ রাঢ় বা হুগলী অঞ্চল সুহ্ম, মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ পুণ্ড্রনামে কথিত হয়। আর ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান এবং সম্ভবতঃ রাজসাহী পাবনার কতকাংশ ও ঢাকা অঞ্চল লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিল।¶ তখন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল। গঙ্গার

---

* ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১

† দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাদেবীকে বলিতেছেন ;—

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫০

বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবতেও এই একই বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

‡ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১১৬ পৃঃ

§ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ খণ্ড, প্রথমাংশ, ৬৪ পৃঃ

উক্ত স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানগুলির নাম পূর্ব্বে ছিল। পরে বলিপুত্রগণের মধ্যে যিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, দেশের পূর্ব্বতন নামানুসারে তাঁহার সেই নাম হয়। এরূপ কল্পনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক দীর্ঘতমা ঋষির প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী পুরাণে থাকা বিচিত্র নহে।

¶ রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥ শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।

সহিত সমুদ্রসঙ্গম পুণ্ড্রদেশের সীমা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। বস্তুতঃ গঙ্গাই বঙ্গের বিস্তৃতির কারণ। বঙ্গের আদিম অবস্থা জানিতে হইলে, গঙ্গা-প্রবাহের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের আলোচনা করা আবশ্যক।

গঙ্গা অতি প্রাচীন নদী। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের আলোচনা হইতে এরূপ ধারণা হয় যে সমুদ্র এক সময়ে হিমালয়ের পাদ ধৌত করিত। তখন হিমাচলের অঙ্গবাহিনী সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা হিমাচলের পাদদেশের অনতিদূরে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। তৎপরে রামায়ণের সময় হইতে দেখিতে পাই, গঙ্গা ভগীরথ কর্ত্তৃক ভূতলে অর্থাৎ হিমাচলের সানুদেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সমতলে আনীত হন। গঙ্গার যে মুখ হইতে উহার প্রবাহ ভগীরথ কর্ত্তৃক প্রসারিত হইয়া সগরের পুত্রগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী। তখন গঙ্গার শাখা পদ্মা বা নলিনীর উৎপত্তি হয় নাই। ভবিষ্যতে যখন পদ্মার উৎপত্তি হওয়ায় গঙ্গার প্রধান প্রবাহ সেই পথে ধাবিত হয়, তখন সেই পদ্মার উৎপত্তি স্থান হইতে গঙ্গার প্রাচীন খাত পৃথক্‌ভাবে ভাগীরথী নামে চিহ্নিত হইয়াছিল।

আমরা সুন্দরবনের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে বঙ্গোপ-সাগর ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিতেছে। সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান সকল প্রথমতঃ নিম্ন থাকে, সেখানে সমুদ্রের জল উঠে ও জঙ্গল জন্মে। ক্রমে স্থান উচ্চ হইয়া নিম্নে যত আরও চরভূমি জাগে, সমুদ্র তত সরিয়া যায়। উপরের জঙ্গলে মানুষের বসতি হয় এবং নিম্ন চরে পুনরায় বন প্রস্তুত হইতে থাকে। এই ভাবে সমুদ্র ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দূরে সরিতেছে। সমুদ্রের কূলে নিম্নচর, তাহার উপরে জঙ্গলাকীর্ণ চর এবং তাহার উপরে মানুষের বসতি; এই ভাবে চর ও জঙ্গল সমুদ্রকূলের চিরসঙ্গী। হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলেই সমুদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নেপাল

ভাগীরথীর পশ্চিমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মার উত্তর ও পূর্ব্বভাগ লইয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গদেশের আকার অশ্বক্ষুরবৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহার মধ্যে দক্ষিণাংশে সমুদ্রগর্ভ হইতে দ্বীপের উদ্ভব হইতেছিল।

রাজ্যের নিম্নদেশে গঙ্গপ্রবাহের উভয় পারে এক ভীষণ অরণ্য ছিল, উহার নাম চম্পারণ্য। এখন উহা চম্পারণ জেলা। এই চম্পারণ্যের মধ্য দিয়াই গণ্ডকী বা সদানীরা নদী প্রবাহিত। যখন চম্পারণ্যে ভীষণ জঙ্গল ছিল, তখন তাহারই নিম্নে এক বিস্তৃত চর পড়িতেছিল। ঐ চর হইতেই বিদেহ বা মিথিলার উৎপত্তি হয়। বিদেহ যে পূর্ব্বকালে সমুদ্রকূলে ছিল, তাহা ইহার তীরভুক্তি নাম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। * বেদে উক্ত হইয়াছে যে এ প্রদেশ জলে মগ্ন হইত। † সুতরাং মিথিলা তখন সুন্দরবনের মত নিম্নস্থান ছিল। মিথিলার বিস্তৃতি ছিল গণ্ডকী হইতে কৌশিকী পর্য্যন্ত। ‡ ক্রমে মিথিলা উন্নত হইলে, তথায় লোকের বসতি হয়। আমরা বৈদিক বিবরণী হইতে জানিতে পারি যে ঋষিগণ সরস্বতী নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে পূর্ব্বমুখে আসিয়া, সদানীরা বা গণ্ডকী পার হইয়া মিথিলাদেশে আগমন করেন এবং তখন হইতে এ প্রদেশে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয়। মিথিলার পূর্ব্বসীমা কৌশিকী বা কুশী নদী। কৌশিকী নদী যেখানে গঙ্গা হইতে উঠিয়াছিল, তাহা সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ প্রথম সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি-বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে মহাদেবের ললাটানলদাহে জল বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবী স্থলীভূতা হইয়া যায়। § এই ললাটানল সম্ভবতঃ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প এইরূপ অকস্মাৎ উন্মেষের একটি কারণ হওয়া বিচিত্র নহে; বঙ্গদেশে ভূমিকম্প দ্বারা এইরূপে জমি উন্নত বা অধোগত হওয়ার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপ কোন আকস্মিক শক্তির বলে বহুবিস্তৃত চরভাগ জাগিয়া ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সমান উচ্চ হইয়া উঠে নাই; এবং সেরূপ হয়ও না।

---

* "গণ্ডকী-তীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তগং শিবে
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতস্তীরভুক্ত্যভিধঃ সতু ॥"
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

এই তীরভুক্তি হইতে ত্রিহুত হইয়াছে, কলিকাতার ত্রিহুতবাসী বা ত্রিহুতদিগের যে বাজার ছিল তাহা এক্ষণে টেরেটি বাজারে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে বেহারের একটি বিভাগের নাম ত্রিহুত।

† শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০

‡ 'কৌশিকীন্তু সমারভ্য গণ্ডকীমধিগম্য বৈ।"—বিষ্ণুপুরাণ

¶ "ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা ॥"

প্রথমতঃ চর জাগে, নানাস্থানে একটু একটু ভূমি উচ্চ হইয়া উঠে, মনে হয় যেন সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপ। কিন্তু জলের নিম্নে সমস্ত ভূমিভাগই উন্নত হয়, উপরে তাহারা পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। এইরূপে স্থানে স্থানে দ্বীপ জাগিলে, ভিতরে ভিতরে জল থাকে, তাহাই অসংখ্য নদীরূপে প্রতিভাত হয়। সম্ভবতঃ মহাভারতীয় যুগে কৌশিকী নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত চরভূমি একেবারে জাগিয়াছিল এবং উহাদের মধ্যে মধ্যে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছিল। কারণ মহাভারতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির তীর্থোপলক্ষে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ নর্ম্মদা ও কৌশিকীসঙ্গমে স্নান তর্পণাদি করেন। তখন কৌশিকী হইতে সমুদ্র অধিক দূরে ছিল না। পরে তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হন; তথায় পঞ্চশত নদীর মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশে চলিয়া যান।* কহ্লণ-প্রণীত "রাজ-তরঙ্গিণী"র বর্ণনায় সমুদ্র যে প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে অধিক দূরে ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীহর্ষ যখন আদিশূরের রাজধানীতে উপনীত হন, তখন তিনি উহার সন্নিকটেই সমুদ্র দর্শন করেন।†

গঙ্গা আর্য্যাবর্ত্তে অবতরণ করিয়া সপ্তধারে প্রবাহিত হন। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিন স্রোত পূর্ব্বদিকে এবং সুচক্ষুঃ, সীতা ও সিন্ধু নামক তিনস্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়; ‡ মধ্যভাগে ছিল ভাগীরথী বা গঙ্গার মূল স্রোত।

---

* ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়!
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ!
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত! ॥
মহাভারত, বনপর্ব্ব ১১৩।১—৩

† বান্ধব ষষ্ঠখণ্ড ৫ম সংখ্যা, বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩ পৃঃ।

‡ হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গা শিবজলাঃ শুভাঃ।
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ।
সপ্তমী চান্বগাৎ তাসাং ভগীরথরথং তদা ॥
রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪৩শ অধ্যায়।

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে স্থতিনামক স্থানের নিকট হইতে পূর্ব্বকালে নলিনী বা পদ্মা বহির্গত হয়। অতি প্রাচীনকালে নলিনী সম্ভবতঃ একটু উত্তর-মুখে ঘুরিয়া ক্ষীণ-ধারায় প্রবাহিত হইত। তাহার বিশাল বিস্তার ছিল না, তখন রাজসাহী ও পাবনা প্রভৃতি স্থানের সহিত নদীয়া যশোরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পদ্মার প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক রহিয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। * যেস্থান হইতে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী নামে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল, সেই স্থান হইতেই পদ্মা বাহির হইয়াছিল। কালে ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে একটি ঘোলা হইয়া ভাগীরথীর একটু বক্রগতি হয়। এখনও সে বক্রগতির পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ এইজন্যই গঙ্গার মহাবল প্রবাহ পদ্মার দিকে এক সরল পথের আবিষ্কার করিয়া সোজা পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" প্রভৃতি গ্রন্থে গল্পের অবতারণাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে গঙ্গাদেবী ভগীরথের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন; এমন সময়ে ভগীরথ একটু শ্লথগতি হওয়ায় পদ্মমুনি বা শঙ্খাসুর গঙ্গাদেবীকে পথ ভুলাইয়া পূর্ব্বমুখে লইয়া যান। গঙ্গা কিন্তু বুঝিতে পারিয়া সে পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ভাগীরথী-খাতে দক্ষিণ-বাহিনী হন। বাস্তবিকই পদ্মার শীর্ণ জলধারা পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহ্‌দীগঞ্জের নিকট মেঘনায় মিলিত হইত। পরে পদ্মায় গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বহিতে থাকিলে, উহা ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বহুপ্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসসাধন করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নাম গ্রহণ করে। এক্ষণে পদ্মা কীর্ত্তিনাশা ও ভাঙ্গনী নামক দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোতও জবুনা নামক নবোত্থিত শাখা দিয়া পদ্মাতে পড়িয়া, তাহার আকার আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। আর যে ভাগীরথীর তীরে এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, পদ্মার প্রভাবে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া গেল।

যখন পদ্মা এইভাবে প্রবল হইল, তখন ভাগীরথীর প্রবাহ মন্দীভূত হইতে লাগিল। নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাহার এই অবস্থা ছিল। তথায় জলঙ্গী নামক পদ্মার একটি শাখা আসিয়া ভাগীরথীতে মিশিয়া তাহাকে সজীব করিল। ফলে

---

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২২—২৩ পৃঃ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৬—৭ পৃঃ, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৫৭—৬১ পৃঃ, Census Report, 1891, pp. 39—40.

নবদ্বীপ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথী বেশ সজীব থাকিল। ত্রিবেণীতে যখন ভাগীরথী দক্ষিণে সরস্বতী ও বামে যমুনায় বিমুক্ত হইয়া গেল, তখন আবার মূল-স্রোত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং অবশেষে কালীঘাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে উহা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইতে লাগিল। ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী বেগ-বতী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল এবং সেই পথে সেকালে বঙ্গদেশের শিল্প ও পণ্য-বাহিনী দূরদেশে নীত হইত। ভাগীরথীর একটি ক্ষুদ্র স্রোত বর্ত্তমান কলিকাতা দুর্গের সন্নিকট হইতে শাখরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হয়। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র খাল প্রশস্ত হয় এবং ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে উহার কতকাংশ তাঁহা-দিগের দ্বারা খনিত হয়। তাহাতে গঙ্গার মূল প্রবাহ ঐ পথে শাখরোলে আসিয়া সরস্বতীর সহিত মিশিল এবং সেস্থান হইতে সরস্বতীর মোহানা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রবাহ গঙ্গার অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এজন্য এ সময় হইতে যেস্থানে গঙ্গার সাগরসঙ্গম হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর মোহানা, প্রাচীন গঙ্গাসঙ্গম হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। হুগলীতে ইংরাজদিগের একটি কুঠি ছিল। পূর্ব্বে সরস্বতী-পথে হুগলীতে তাঁহাদের জাহাজাদি যাতায়াত করিত, এখন সমুদ্রপ্রবাহ শাখরোল হইতে গঙ্গার পথে প্রর্ত্তিত হওয়ায় তথা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত সরস্বতী মজিয়া গেল। সে প্রাচীন খাত এখনও রহিয়াছে। হুগলী পর্য্যন্ত বাণিজ্যপথ গঙ্গার পথে কলিকাতার নিম্ন দিয়া উন্মুক্ত হইল, এজন্য ইংরাজগণ এ অংশের নাম রাখিলেন—হুগলী নদী। অপরদিকে কালীঘাটের নিম্নবর্ত্তী প্রাচীন খাত বা "আদিগঙ্গা" টলী (Tolley) সাহেবের খনিত টালীর নালায় পরিণত হইয়া মজিয়া গেল এবং দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া "ঘোষের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" নামে বদ্ধ জলাশয়স্বরূপ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গার এই আধুনিক অবস্থার সহিত যশোহর-খুল্‌নার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহার প্রাচীন প্রকৃতি সহিত সমস্ত বঙ্গদেশের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যশোহর-খুল্‌নার ত কথাই নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে পদ্মা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে মহাভারতীয় যুগে বহুদ্বীপের উন্মেষ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য নদী ছিল ; পাণ্ডবেরা সে সকল নদীতে স্নানাদি করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে চলিয়া যান। ক্রমে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে ও পদ্মার দক্ষিণ তীরে চর হইতে দ্বীপ সৃষ্টি হইতে থাকে।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী প্রভৃতি অঞ্চলের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে সহজে বুঝা যায় যে, কিরূপে পূর্ব্বপারে দ্বীপ সৃজনজন্য নূতন মৃত্তিকা গঠিত হইতে ছিল। হিমালয়ের গাত্রধৌত জলরাশি বহুল পর্ব্বতরেণু বহন করিয়া গঙ্গাখাতে সাগরসন্ধানে ছুটে এবং মৃত্তিকা ও বালির সংযোগে একপ্রকার পলিমাটী দেশে দেশে রাখিয়া যায়। গঙ্গার মত ভূমিগঠনের ক্ষমতা পৃথিবীর মধ্যে কোন নদীরই নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অকস্মাৎ এক সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা এক বিস্তৃত ভূমিভাগ স্থানে স্থানে জল হইতে মস্তক উত্তোলন করে, গঙ্গার গৈরিক মৃত্তিকা উহার উপর সঞ্চিত হইতে হইতে দ্বীপের সৃষ্টি হইতে থাকে। যশোহর-খুল্‌নারও অনেকস্থানে পুষ্করিণী বা কূপ খননকালে এই পলিমাটীর স্তর ৪।৫ ফুট হইতে ৯।১০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নবর্ত্তী আঁটাল বা জোবমাটীর সহিত এই পলির কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে যখন দ্বীপ উন্নত হইতে লাগিল, তখন উত্তরদিকে ভূমি ক্রমশঃ বনাকীর্ণ ও অবশেষে জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। দ্বীপ নির্ম্মাণকার্য্য তখন ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে এক ত্রিকোণাকার ভূমিখণ্ড সমুদ্রসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বকচঞ্চুবৎ আকৃতির জন্যই সম্ভবতঃ ইহার নাম হইয়াছিল বকদ্বীপ।* ইহাকেই আমরা ইংরাজীর অনুকরণে ব’দ্বীপ করিয়া লইয়াছি। বকদ্বীপই বৌদ্ধ আমলে ভাষার অপকর্ষবশতঃ বগ্‌দি নামে পরিণত হয়। উহা হইতে সেনরাজগণের রাজত্বকালে একটি উপবিভাগের নাম হইয়াছিল বাগ্‌ড়ী। † ব’দ্বীপ বা বগ্‌দির জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে যে অসভ্য জাতি বাস করিত, তাহারা এখনও বাগ্‌দী বলিয়া পরিচিত আছে। বাঙ্গালীর সহিত এক স্থানে বহুবৎসর যাবৎ বাস করিয়াও তাহাদের বন্যপ্রকৃতি ও স্বরভঙ্গি এখনও আছে।

এই ব’দ্বীপ আজ যেমন বিস্তৃত, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু ইহার আকৃতি যাহাই থাকুক, ইহার সমুদ্রকূলবর্ত্তী অংশ যে বহু কালাবধি কাননাবৃত ছিল, ভূতত্ত্ব-

---

* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" ১০ পৃষ্ঠা।

† শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ মহাশয়ও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ১০৮ পৃষ্ঠা।

বিৎ পণ্ডিতগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাণিনির মহাভাষ্যে পতঞ্জলি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উহার পূর্ব্বভাগে কালকবনের উল্লেখ করিয়াছেন।* এই কালকবনই বোধ হয় সুন্দরবন। † কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, যে মগধের অন্তর্গত প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষের পূর্ব্বদিকৃস্থ গিরিদ্বয়মধ্যবর্ত্তী যে বন এখনও কাল্‌কা জঙ্গল বলিয়া খ্যাত আছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহাই। ‡ কিন্তু প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের যে সকল সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মগধের বহুপূর্ব্বদিকে তাহার পূর্ব্বসীমা বলিয়া বোধ হয়। মগধের মৃত্তিকার অবস্থা পরীক্ষা করিলে, তাহা আধুনিক কোন সময়ে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, এমন প্রতীয়মান হয় না। দিগ্বিজয়প্রকাশে বঙ্গদেশস্থ সরস্বতী ও কালিন্দী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কিলকিলা বলা হইয়াছে। এখনও খুল্‌না জেলার কালিন্দীতটে কলকলি নামে স্থান আছে। কলিকাতার নামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। জনৈক জৈন স্থরির নাম কালক। কাহারও কাহারও মতে ইনিই পর্য্যুষণ পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত করেন। জৈন কালকের সহিত কালকবনের কি সম্বন্ধ তাহাও একটি নির্ণয় করিবার বিষয়। যাহা হউক পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে গঙ্গার মোহানায় সমুদ্রকূলে চির-দিনই বন ছিল; এই বনের নাম কালকবন বা অন্য যাহা কিছু হইতে পারে। গঙ্গার মোহানা সম্বন্ধে যে কথা, শতমুখী গঙ্গার শাখা প্রশাখার সমুদ্রসঙ্গম সম্বন্ধেও সেই কথা। বঙ্গদেশে প্রায় সমস্ত দক্ষিণভাগ এই মোহানায় পরিপূর্ণ, এবং তজ্জন্য সমস্ত দক্ষিণভাগ নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই মোহানাগুলি যত সরিয়াছে, বনও তত সরিয়াছে। বনের উত্তরভাগে লোকের বসতি ক্রমে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম স্থান হইতে উহাদের সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপই বকদ্বীপ বা ব'দ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল।

এই ব'দ্বীপ সমগ্র বঙ্গের অংশ এবং ইহা বহু প্রাচীন গ্রন্থে "উপবঙ্গ" বলিয়া খ্যাত। ইহা ভাগীরথীর পূর্ব্বপার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত

---

* "প্রত্যক্কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পরিপাত্রম্' পাণিনি ২।৪।১০ মহাভাষ্য।

† বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ও ১৫৫ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১৩৯ পৃঃ। ‡ সাহিত্য ১৯শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ৬০ পৃঃ।

বিস্তৃত ছিল। দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক প্রাচীন গ্রন্থে * ইহার এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কানন-সংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥"

এই বহু নদনদী-সমন্বিত কাননসংযুক্ত বিস্তীর্ণ প্রাচীন উপবঙ্গ-প্রদেশ বঙ্গদেশেরই একাংশ ছিল। ইহাই বৌদ্ধযুগে সমতট ও সেন-রাজত্বকালে বাগ্‌ড়ী আখ্যা পাইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য কানন-কুন্তলা যশোহর-খুল্‌না এই উপবঙ্গের এক প্রধান অংশ। যশোহর ও খুল্‌নার উৎপত্তি জানিতে হইলে, উপবঙ্গের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে হইবে।

উপবঙ্গ একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। ইহা এক্ষণে একটি দ্বীপ হইলেও পূর্ব্বতন অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। সব দ্বীপগুলিই গঙ্গার পলি হইতে উৎপন্ন। তাহাই বুঝাইবার জন্যই পূর্ব্বে গঙ্গার গতিপথের বিবরণ দিয়াছি। হিমালয়ের উপরে ও পাদদেশে গঙ্গার বেগ অত্যন্ত অধিক। যত সমতল ক্ষেত্রে আসিতে থাকে, গঙ্গার বেগ তত কমিতে থাকে; তৎপরে বামে দক্ষিণে বহু শাখা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বেগ আরও মন্দীভূত হইতেছিল। এইরূপে জল কতকটা স্থির হইলে উহাতে যে বহুল পর্ব্বত-রেণু মিশ্রিত থাকে, তাহা নিম্নে পতিত হইয়া ভূমি গঠন করে এবং ক্রমে দ্বীপের উদ্ভব হয়। বর্ষার সময়ে গঙ্গার জলে এই গৈরিক-রেণু এত অধিক থাকে, যে জল রক্তাভ হইয়া যায়। উহার তৎকালীন বর্ণকেই গৈরিক রঙ্ বলে। গঙ্গার গাত্র-রঙ্ ভারতবাসীর বড় প্রিয় বস্তু। গঙ্গার কূলে বা সন্নিকটে যাঁহারা বাস করেন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তাঁহাদের বস্ত্র গৈরিক বর্ণ ধারণ করে। গঙ্গাকূলে বাস এবং গঙ্গাস্নান এদেশে এত গৌরবের যে সাধু-সন্ন্যাসিগণ গঙ্গা হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহাদের সমস্ত

* দিগ্বিজয়প্রকাশ এক বিরাট্ গ্রন্থ। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। ইহা প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব সময়ে বা তাহার প্রাক্কালে কবিরাম নামক এক পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি গিরিমাটী দ্বারা গৈরিক বর্ণ করিয়া লন। এই গৈরিকের সহিত বালুকা মিশ্রিত হইয়া, এদেশের উর্দ্ধতন মাটীর বর্ণ প্রকাশ করিয়াছে।

নিম্ন বঙ্গে থাকিয়া গঙ্গাজলের গৈরিকে দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং গঙ্গা এইরূপে দ্বীপের পর দ্বীপ সৃজন করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখী হইয়াছিলেন। নবনির্ম্মিত দ্বীপসকলের যেমন নামকরণ হইতে লাগিল, উহাদের নামের সহিত অনেক স্থানে দ্বীপ বা দ্বীপবোধক শব্দ যুক্ত হইয়া থাকিতে লাগিল। ঘটক-কারিকা এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে এই সকল দ্বীপের বিবরণ ও সীমা দেওয়া হইয়াছে। সেনরাজগণের সময়ে যখন নবদ্বীপে রাজধানী ছিল, তখন সেই নবদ্বীপ রাজ্য গঙ্গা-গর্ভোত্থিত বহু সংখ্যক দ্বীপমালায় বিভক্ত ছিল; * ইহার মধ্যে ১২টি দ্বীপ প্রধান। ঐ বারটির মধ্যে নবদ্বীপ একটি এবং সেই নবদ্বীপ পুনরায় নয়টি দ্বীপের সমষ্টি। † প্রধান বারটির অন্যান্য দ্বীপের মধ্যেও দুই একটি করিয়া খণ্ড দ্বীপ আছে। সুতরাং দ্বীপের সংখ্যা অনেক। চর হইতে যখন ভূমি উচ্চ হইয়া, কৃষি ও মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হয়, তখনই উহার নাম-করণ হয়। হয়ত কোন দ্বীপের এইরূপ নামকরণ হওয়ার পূর্ব্বেই উহা অন্য দ্বীপের সহিত মিলিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। এভাবেও অনেক দ্বীপের নাম আমরা জানিতে পারি নাই। এই জানিত ও অজানিত বহু সংখ্যক দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গাঙ্গেয় উপদ্বীপ গঠিত হইয়াছে। উহার সমস্ত স্থানের ভৌম প্রকৃতি হইতেও ঐ একই কথা প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্য প্রধানতঃ দ্বাদশটি দ্বীপে বিভক্ত। আমরা প্রথমতঃ ভাগীরথীর প্রবাহপথে উহাদের মধ্যে কতকগুলির অবস্থান নির্ণয় করিব। ভাগীরথী-পথে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কতক দূর আসিলে সর্ব্বাগ্রেই

---

* গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো দ্বীপপুঞ্জৈর্বহির্ধৃতঃ।
প্রতীচ্যাং যস্য দেশস্য গঙ্গা ভাতি নিরন্তরম্॥
এড়ু মিশ্রের কারিকা।

† "নয়দ্বীপে নবদ্বীপ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম।"
নরহরি চক্রবর্ত্তি কৃত "নবদ্বীপ পরিক্রমা"

নবগঠিত বা নূতন দ্বীপ বলিয়া নবদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া যে অন্য একটি মত আছে, তাহা গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয় না। "নবীনাকাহিনী"—৩পৃঃ।

(১) অগ্রদ্বীপ। উহারই মধ্যাংশের নাম (ক) কণ্টক দ্বীপ বা কাঁটোয়া।* তৎপরেই (২) নবদ্বীপ আরম্ভ। ইহা আবার ৯টি খণ্ড দ্বীপের সমষ্টি। অগ্রদ্বীপ ছাড়িয়া আসিলেই বর্ত্তমান ভাগীরথীর উভয় পারে মাজদিয়া অঞ্চল লইয়া (ক) মধ্যদ্বীপ; একটু দক্ষিণে আসিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে (খ) সীমন্ত দ্বীপ—কাসিয়া ডাঙ্গা, বিল্বপুষ্করিণী (বেলপুকুরিয়া) ও সরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে ধর্ম্ম নামে নৃপতি ছিলেন, তাঁহার নামানুসারে ধর্ম্মদ্বীপ বা ধর্ম্ম দহ † হইয়াছে। সীমন্ত দ্বীপ ছাড়িয়াই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে (গ) রুদ্রদ্বীপ। পূর্ব্বস্থলী, শঙ্করপুর, রাতুপুর বা রুদ্রডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। পূর্ব্বস্থলী বিখ্যাত স্থান। সম্ভবতঃ এইস্থানে স্থলভাগ প্রথম জাগিয়া ছিল এজন্য ইহার নাম পূর্ব্বস্থলী। রুদ্রদ্বীপ ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে আসিলেই পূর্ব্ব পারে ভাগীরথীর চক্রাকার প্রবাহের অন্তর্ভাগে (ঘ) অন্তর্দ্বীপ এবং পশ্চিম পারে (ঙ) মোদদ্রুম দ্বীপ। মায়াপুর বা মিঞাপুর এবং ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। মায়াপুরে চৈতন্য দেবের জন্ম হইয়াছিল। অন্তর্দ্বীপেই প্রাচীন নবদ্বীপ রাজধানী ছিল। এখন সেনরাজগণের বিস্তীর্ণ রাজধানীর ভগ্নস্তূপ ও বল্লাল-দীঘি পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে। পশ্চিম পারে একডালা, মহৎপুর প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুম দ্বীপের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। উহারই দক্ষিণে (চ) জহ্নুদ্বীপ বা জাননগর প্রভৃতি স্থান। ইহা বর্ত্তমান নদীয়া সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। জহ্নুদ্বীপের দক্ষিণাংশে (ছ) ঋতুদ্বীপ; রাউতপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতিস্থান। ‡ ভাগীরথীর অপর পারে গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থান লইয়া (জ) গোদ্রুমদ্বীপ এবং ঋতুদ্বীপের দক্ষিণাংশে সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন (ঝ) কোলদ্বীপ। এই নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ।

* "অগ্রদ্বীপস্ত মধ্যাংশঃ কণ্টক ইতি কথ্যতে"—এড়ু মিশ্রের কারিকা।

† 'ধর্ম্মনামা নৃপস্তস্ত কেশরী রায়ি সংজ্ঞিতঃ।
অন্তর্দ্বীপস্য রাজা যশ্চক্রাগ্রদ্বীপয়োশ্চ সঃ॥ এড়ু মিশ্র।

‡ ইহারই সন্নিকটে মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান ছিল বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

নবদ্বীপ ছাড়িয়া ভাগীরথী-পথে দক্ষিণে আসিলেই (৩) মধ্যদ্বীপ। * উলা বা বীরনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান ইহার মধ্যবর্ত্তী। মধ্যদ্বীপের পরেই (৪) চক্রদ্বীপ বা চাকদহ। ইহার উত্তর ভাগে দেবগ্রাম, মধ্যস্থানে শ্রীনগর ও দক্ষিণে কুমারহট্ট নামক প্রসিদ্ধ স্থান। চক্রদ্বীপ প্রধানতঃ যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যমুনা হইতে দক্ষিণদিকে কালীঘাট পর্য্যন্ত (৫) এড়ুদ্বীপ বা এঁড়েদহ। খড়দহ বা তৃণদ্বীপ এবং শিয়ালদহ বা শিবাদহ (শিবাদ্বীপ) এই এড়ুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। † কালীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ ভাগকে (৬) প্রবালদ্বীপ বলে। জয়নগর, পলাবাটী ইহার মধ্যবর্ত্তী। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছয়টি দ্বীপ গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। অপর ছয়টি দ্বীপ ইহাদেরই পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

চক্রদ্বীপের পূর্ব্বভাগে (৭) কুশদ্বীপ বা কুশদহ। "সোঽপি দ্বীপো মহাদীর্ঘ ইচ্ছাপুরসমন্বিতঃ।" ইহা একটি প্রধান দ্বীপ এবং এখানে প্রবল সমাজ ছিল। ‡ গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, খাঁটুরা, জলেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ইহার অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণার বসির হাট, খুল্‌নার সাতক্ষীরা ও যশোহরের বনগ্রামের অংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল। কুশদ্বীপের উত্তর ভাগে এবং মধ্যদ্বীপের পূর্ব্বদিকে (৮) অন্ধ্রদ্বীপ অবস্থিত। চৌগাছা, যাদবপুর, বোধখানা, কাগজপুকুরিয়া, সারশা, গদখালি, লাউজানি, কেশবপুর প্রভৃতি স্থান এই অন্ধ্র বা আঁধার দ্বীপের অন্তর্গত। এখনও চৌ-গাছার উত্তর পশ্চিম কোণে আঁধার কোঠা পূর্ব্ব নামের

* নবদ্বীপ যে নয়টি দ্বীপ লইয়া গঠিত তাহারও একটির নাম মধ্যদ্বীপ এবং প্রাচীন নবদ্বীপ-রাজ্য যে দ্বাদশ দ্বীপের সমষ্টি তাহারও একটি মধ্যদ্বীপ। এই উভয় মধ্যদ্বীপ পৃথক্ স্থান। কেহ কেহ উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। "সম্বন্ধনির্ণয়, উপসংহার ৭২০ পৃঃ। "কুশদহ" পত্র আশ্বিন, ১৩১৮, ১২২ পৃঃ।

† "খড়দহ, তৃণদ্বীপ, এড়ুদ্বীপ অংশ"—ঘটক কারিকা। "সম্বন্ধনির্ণয়, ৭৩১ পৃঃ; "যমুনা পূর্ব্বসীমায়াং গঙ্গা যস্য পুরঃস্থিতা"।—এড়ু মিশ্র।

‡ নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলানিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে কুশদ্বীপকে একটি মহাদ্বীপ বলিয়াছেন যথা ;—

"কুশদ্বীপ মহাদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ
সিদ্ধান্ত তর্কসিদ্ধান্তে শিরোমণি স্তবধি

কুশদ্বীপ কাহিনী" ২ পৃঃ

স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। যশোহর জেলার বর্ত্তমান সারশা ও কেশবপুর থানা লইয়া এই দ্বীপ গঠিত ছিল।

(৯) বৃদ্ধদ্বীপ বা বুঢ়ান। ইহা অন্ধ্‌ দ্বীপের দক্ষিণ ও কুশদ্বীপের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বকূল হইতে আরম্ভ করিয়া সোজা কেশব পুরের দক্ষিণভাগ দিয়া পূর্ব্বোত্তর মুখে বর্ত্তমান খুল্‌না দিয়া বলেশ্বর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।* সাতক্ষীরা ও খুল্‌না সদর উপরি ভাগের অধিকাংশ এই বৃদ্ধদ্বীপের অন্তর্গত। এখনও সাতক্ষীরা সহরের উত্তর পশ্চিমাংশে যমুনা ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষী পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ়ান পরগণা পূর্ব্বতন দ্বীপের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। মোটামুটি বলিতে গেলে প্রাচীন যশোর রাজ্যের পূর্ব্বাংশে বুঢ়ান দ্বীপ, পশ্চিমাংশে প্রবালদ্বীপ এবং উত্তরাংশে কুশদ্বীপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বুঢ়ান, ভালুকা, দাঁতিয়া, খলিসাখালি, সাহস, খালিসপুর ও বেলফুলিয়া এই কয়েকটি প্রধান পরগণা বৃদ্ধদ্বীপের অধিকৃত। সাতক্ষীরা, কুমিরা, তালা, শোভনা ও সেনহাটি বৃদ্ধদ্বীপের পুরাতন নগর।

(১০) সূর্য্যদ্বীপ। অন্ধ্‌দ্বীপের পশ্চিমোত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধদ্বীপের উত্তর ভাগে মধুমতী বা বলেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড দ্বীপের নাম সূর্য্যদ্বীপ। ইহার প্রাচীন নাম যোগীন্দ্রদ্বীপ ছিল, পরে মহারাজ বল্লাল সেন একটি অদ্ভুত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ নামক একজন কৈবর্ত্ত ধীবরকে যোগীন্দ্র-দ্বীপের যে অংশ দান করিয়াছিলেন তাহাই সূর্য্যদ্বীপ হয়। † এখন কিন্তু বিপরীত হইয়াছে। সমস্ত দ্বীপটিকে সূর্য্যদ্বীপ বলা হয় এবং উহা তিন অংশে বিভক্ত। ‡

---

* "বৃদ্ধদ্বীপো বৃহৎকায়ো যস্য গর্ভে বলেশ্বরঃ"—মিশ্রকারিকা।

† সেনরাজত্ব প্রসঙ্গে ও মহেশপুরের বিবরণীতে যথাস্থানে এ ঘটনা বিবৃত হইবে। মহেশপুরে সূর্য্যরাজার পরিখা-বেষ্টিত বাড়ী এখনও "সূর্য্যের বেড়" নামে গভীর জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। "আর্য্যাবর্ত্ত" ১৩১৯। আশ্বিন, "মহেশপুরের সূর্য্যরাজা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ "সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার" ;—কুলোপঞ্চাননের কারিকা।

"সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈঃ সরিদ্‌গাত্যা বিভজ্যতে।
তে লাটকঙ্কযোগীন্দ্রা ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ॥
যোগীন্দ্রো ধীবরপ্রাপ্তো লাটো দাসস্য রাজ্যকম্‌
কঙ্কস্তু পূর্ব্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে॥"

এড়ু মিশ্রের কারিকা। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি কৃত "সম্বন্ধনির্ণয়", ৭১৭ পৃঃ।

ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত ভৈরব নদের উভয়কূলে মহেশপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া যোগীন্দ্রদ্বীপ, কপোতাক্ষ হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত লাটদ্বীপ এবং চিত্রা হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাংশ কঙ্কদ্বীপ। বনগ্রামের উত্তরাংশ লইয়া যোগীন্দ্র-দ্বীপ, মহেশপুর ইহার প্রধান নগর, তথায় কৈবর্ত্তজাতীয় সূর্য্য রাজার রাজধানী ছিল। * যশোহর সদর উপবিভাগের অধিকাংশ লইয়া লাটদ্বীপ। বারবাজার, মুড়লী, খাজুরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান লাটদ্বীপের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এ অংশে লাটুদিয়া পরগণা ছিল। চিত্রা হইতে বলেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশকে কঙ্কদ্বীপ বলিত। ইহারই দক্ষিণ সীমায় বৃদ্ধদ্বীপ। কঙ্কদ্বীপের দুইটি অংশ; চিত্রা হইতে উত্তর দিকে নবগঙ্গা পর্য্যন্ত এক অংশ; প্রাচীন কাঁকদি পরগণা তাহার মধ্যবর্ত্তী; লক্ষীপাশা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান ঐ অংশের অন্তর্গত। চিত্রা হইতে একদিকে ভৈরবের অপর পার এবং অন্যদিকে মধুমতী পর্য্যন্ত অন্য ভাগ; ইহারই মধ্যে চেঙ্গুটিয়া পরগণা। চেঙ্গুটিয়া, জগন্নাথপুর (সেখহাটি), নড়াইল, কালিয়া প্রভৃতি এই অংশের মধ্যে অবস্থিত।

(১১) জয়দ্বীপ—নবদ্বীপের পূর্ব্বভাগে, সূর্য্যদ্বীপের উত্তরাংশে, পূর্ব্বদিকে মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তরে গড়ই দ্বারা সীমাবদ্ধ, নবগঙ্গার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশ জয়দ্বীপ। জয়পুর, জয়নগর, জয়রামপুর প্রভৃতি স্থান ইহার পূর্ব্ব পরিচয় দিতেছে; মহম্মদপুর, বিনোদপুর, নহাটা প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানসমূহ এই দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী। পদ্মা হইতে গঙ্গা-সলিল লইয়া যশোহরে যে নবগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, গঙ্গার মত তাহারও দ্বীপ গঠনের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় আছে। কুমার নদ হইতে বহির্গত হওয়ার পর কিছুদূর দক্ষিণে আসিয়াই আলুপদিয়া, সিরিজদিয়া (শিরীষদ্বীপ), ঝাকড়দিয়া, নলদী (নলদ্বীপ) - সকল গুলিই এই জয়দ্বীপের অন্তর্গত।

(১২) চন্দ্রদ্বীপ—খুলনা জেলার পূর্ব্বাংশ এবং বরিশাল জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া গঠিত প্রসিদ্ধ বাকলা রাজ্য। †

---

* মহেশপুরে সূর্য্যরাজার যে দুইটি পুষ্করিণী আছে, তাহার একটি যোগীন্দ্র ও অন্যটি যোগিনীদহ নামে খ্যাত।

† "মধুমত্যাঃ পূর্ব্বভাগে লোহিত্যস্য পশ্চিমে চ
আসমুদ্র ইচ্ছামতী বিস্তৃতমিদং দ্বীপদেশং" ॥৩১॥ দেববংশ পুঁথি।
"পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তথোত্তরে
মধুমতিঃ পশ্চিমে চ সমুদ্রদক্ষিণে তথা" মহাবংশাবলী।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে দ্বাদশটি দ্বীপের নামোল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপ ভাগীরথীর উভয় পারবর্ত্তী এবং তদ্ব্যতীত সবগুলিই ভাগীরথীর পূর্ব্ব-ভাগে সংস্থিত। নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে আসিয়াও ভাগীরথী পশ্চিমপারে দ্বীপ-গঠন করিয়াছেন, তবে সংখ্যায় অল্প এবং সবগুলি সংকীর্ণ। কারণ সে দিকে সুহ্ম রাজ্য বা দক্ষিণ রাঢ় অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। তজ্জন্য সুহ্ম রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে দামোদর ও গঙ্গার মধ্যস্থলে কয়েকটি দ্বীপের উদ্ভেদ হয়। যেখানে এক্ষণে ৺তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, উহার পূর্ব্বনাম ছিল সিংহলদ্বীপ; ইহারই সন্নিকটে সিঙ্গুর বা সিংহপুর। প্রবাদ এই, সেখানে পূর্ব্বে সিংহবাহু রাজা বাস করিতেন। তৎপুত্র বিজয়সিংহ সমুদ্র-পথে লঙ্কা বা তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া তাহা জয় করিয়া সিংহল নাম রাখেন, এখনও সেই নাম চলিতেছে। সিঙ্গুরে সিংহের ভেড়ী, রতনপুর (রত্নমালার ঘাট), দক্ষিণ মশাট (মশান) প্রভৃতি গ্রামগুলি পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সিংহদিগের রাজত্বস্থান যে পূর্ব্বে একটি দ্বীপ ছিল, এবং প্রথমে তাহারা তথায় রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় উহার সিংহলদ্বীপ নাম রাখেন, তাহা প্রচলিত গান ও কবিতা হইতে জানা যায়। * পরে বিজয়সিংহ যখন লঙ্কাদ্বীপে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন নিজের বাসভূমির আদর্শে তাহারও নাম সিংহলদ্বীপ রাখেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে গঙ্গার এপারে ওপারে এবং উহার বহুশাখার দুইপারে ধারে ধারে প্রাচীনকালে অসংখ্য দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ এই অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। মিসর বা প্রাচীন মিশ্রদেশের অধিকাংশ যেমন নীল নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে নীল নদীর প্রদত্ত ফল (the giftof the Nile) বলিয়া উল্লিখিত হয়, বঙ্গভূমিও সেইরূপ গঙ্গার প্রদত্ত দল (the gift of the Ganges) বলিয়া কথিত হইতে পারে। আমাদের আলোচ্য যশোহর ও খুল্‌না জেলা এই প্রাচীন বঙ্গের অংশমাত্র। উহাও অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি।

"বন্দিলেন বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি
চারিদিকে জলা জঙ্গল খাগড়ার বসতি;
মধ্যেতে সিংহলদ্বীপ অতি মনোহর
তা'র মধ্যে বিরাজেন প্রভু তারকেশ্বর।"
কুশদ্বীপকাহিনী (শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সংগৃহীত) ৩৬ পৃঃ

"গৌড়ের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ।

আমরা পূর্ব্বে যে দ্বাদশটি দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কুশদ্বীপের অধিকাংশ, বৃদ্ধদ্বীপ, অন্দ্রদ্বীপ, সূর্য্যদ্বীপ ও জয়দ্বীপের সম্পূর্ণাংশ, এবং চন্দ্রদ্বীপের কতকাংশ লইয়া যশোহর খুল্‌না গঠিত। তবে এই দুই জেলার সীমা ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। সূর্য্যদ্বীপের উত্তরে, নবদ্বীপ ও জয়দ্বীপের মধ্যস্থলে যশোহর জেলার ঝিনাইদহ অঞ্চল কোন্ দ্বীপের অন্তবর্ত্তী ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ঝিনাই দহ নামেও একটি দ্বীপের কথা বুঝাইয়া দেয়; শুধু ঝিনাইদহ নহে, এ অঞ্চলে ফেনদহ, অঙ্গারদহ, * অজয়দহ, কল্যাণদহ, সাগরদহ, মধুদহ, রূপদহ-প্রভৃতি দহ-সংযুক্ত বহুস্থান প্রাচীন দ্বীপ সংস্থানের পরিচয় দিতেছে। ইহা ব্যতীত বৃদ্ধদ্বীপ বা বুঢ়ানের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বহুদ্বীপের সৃষ্টি হইয়া সুন্দরবন অঞ্চলকে অনেকদূর দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে সে সব অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল না, এখনও তাহার অনেকস্থান বাসোপযোগী হয় নাই। এজন্ত প্রাচীন কারিকাদি গ্রন্থে সে সকল স্থানের কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধদ্বীপ দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে কোণাকোণিভাবে অবস্থিত। উহার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বলেশ্বর বা বড় গঙ্গার অপর পারেই চন্দ্রদ্বীপ। পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বলেশ্বরের উভয়পারে বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার বাগেরহাট উপবিভাগের অধিকাংশ চন্দ্রদ্বীপের অধিকৃত ছিল। চন্দ্র-দ্বীপ অতি প্রাচীন রাজ্য। বর্ত্তমান বাকলা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে রাজ্যসংস্থাপন করেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও চন্দ্র-দ্বীপের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের প্রাচীন কারিকা হইতে জানা যায় যে আদিশূর চন্দ্রদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। † চন্দ্রদ্বীপ পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল, পরে মহাদেবের ললাটাগ্নিতে জল শুষ্ক হইলে দ্বীপের উদ্ভেদ হয়। ‡ এই

---

* শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দেবল রায়" নামক গ্রন্থে ফেনদহ ও অঙ্গারদহের বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা ।/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজাংস্তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।
তাম্রলিপ্তিং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্টসংজ্ঞকম্॥ মিশ্রকারিকা।

চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয়পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেবপ্রসাদেন শুষ্কা ভূতা হি মৃত্তিকা॥
ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা॥
মেঘনাদপূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী বঙ্কসীমা দক্ষিণে সুন্দরবনম্।

ললাটাগ্নির অর্থ ভূমিকম্প বলিয়াই বোধ হয়। * বাক্‌লার অধিপতি মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব এইস্থানে রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ অনেক বার উঠিয়াছে পড়িয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এবম্বিধ চন্দ্রকলাবৎ হ্রাস বৃদ্ধিই চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তির কারণ। † চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিম ও বৃদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে মধুদ্বীপ বা মধুদিয়া। ইহাও ক্রমে দক্ষিণদিকে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই জন্য ইহার নবোত্থিত দক্ষিণাংশকে পার মধুদিয়া বলে। মধুদ্বীপের পশ্চিম গাত্রে রঙ্গদ্বীপ বা রাঙ্গদিয়া। ইহাও ভৈরব হইতে উত্থিত একটি বিখ্যাত দ্বীপ। খুল্‌না জেলার বাগের হাট সবডিভিসনে এখনও মধুদিয়া ও রাঙ্গদিয়া বিস্তৃত পরগণা বিদ্যমান রহিয়াছে। রাঙ্গদিয়ার পশ্চিম পার্শ্বে বৃদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে বাহিরদিয়া বা বহির্দ্বীপ একটি অতি প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম। বাগেরহাটের কাছে কালদিয়া, জয়দিয়া প্রভৃতিও পূর্ব্বাবস্থার ইঙ্গিত করে। এইরূপে মধুমতীর কূলে কোড়কদি ও মাণিকদহ, কপোতাক্ষকূলে আগর দাঁড়ী (অগ্রদণ্ডী), সাগর দাঁড়ী (সাগর দণ্ডী), ধানদিয়া (ধনদ্বীপ) এবং সুন্দর বনের মধ্যে গিয়া অসংখ্য মাদিয়া বা মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ, সমস্ত উপদ্বীপ যে অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি তাহারই সমর্থন করে। এই বিস্তৃত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে সমগ্র উপবঙ্গের মত যশোহর ও খুল্‌না প্রথমতঃ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টিমাত্র ছিল।

---

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, প্রথমভাগ, ১২ পৃষ্ঠা।

† চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে অস্য চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে বপুঃ॥
তস্য তদ্‌গুণযোগেন চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।"
এড়ু মিশ্রের কারিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্বীপের প্রকৃতি।

উপবঙ্গ যে সকল দ্বীপ লইয়া গঠিত হইয়াছিল, উহারা লোকের বসতিহেতু ক্রমে নানা গ্রামে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ সকল নামের সহিত দেশের সাধারণ প্রকৃতির একটা ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই যশোহর ও খুল্‌নার গ্রাম সমূহের নামের পূর্ব্বে বা পরে কতকগুলি পরিচয়াত্মক শব্দ আছে। উহাদের মধ্যে বিশিষ্ট-গুলিকে আমরা এইভাবে সাজাইয়া রাখিতে পারি, যথা :—দোহা, ঘোনা, মোহানা, খালি, ডাঙ্গা, কূল, দাঁড়ী, ঘাটা, দিয়া, দহ, চর, চক, বুনিয়া, কাটি, আবাদ, পোল, কোল, মারা, খোলা, খাদা, গাতি, মহল, তলা, তলী, গাছা, গাছি, গ্রাম, পুর, নগর, ঘর, বাড়ী, বাড়িয়া, পাড়া, পাশা, ভোগ, কুণ্ড, হাট, হাটি, থানা, কস্‌বা, গঞ্জ। বোধ হয়, এই দুই জেলার চৌদ্দ আনা গ্রামের শেষে ইহাদের কোন না কোন শব্দ আছে। তাহা হইতে ঐ সকল স্থানের পূর্ব্বাবস্থার আভাস পাইবার সুবিধা হয়।

এতদঞ্চল প্রথমতঃ জলে মগ্ন ছিল; পরে ভূমি গঠন হইতে থাকে; নবোত্থিত ভূমিভাগ চিহ্নিত করিতে কোন দোহা বা আবর্ত্ত, ঘোনা বা নদীর বাঁক এবং মোহানার নিদর্শনে স্থানের নাম হইতে থাকে। সাগরদোহা, গৌরী ঘোনা, মাগুরাঘোনা, ত্রিমোহিনী প্রভৃতি নামের ইহাই উৎপত্তির কারণ হইতে পারে। যখন দ্বীপ জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সেই চর সকল মধ্যবর্ত্তী জলভাগ অর্থাৎ গাঙ্গ বা খালের নামে পরিচিত হইল; যেমন দ্বিগঙ্গা, গাঙ্গনী, চাঁদখালি, গদখালি, খলিসাখালি প্রভৃতি। যখন নদীর কূলে উচ্চজমি বা ডাঙ্গা জমিল, তখন "ডাঙ্গা" দিয়া অসংখ্য গ্রামের নাম হইতে লাগিল; যেমন নলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা। যখন দ্বীপ পরিষ্কার হইয়া উঠিল, তখন "দিয়া" ও "দহ" দ্বারা নাম চলিল; রাঙ্গদিয়া, ধানদিয়া, ঝিনাইদহ, বাঁশদহ। যেখানে দুই দিকে জলের ভিতর চরের উপর লোকের বাড়ী হইল, তখন সে স্থানের নাম হইল দিয়াড়া। এ দুই জেলায় অনেকগুলি দিয়াড়া আছে। চর সকল বিভিন্ন চক বা অংশে বিভক্ত হইয়া, লোকের কয়ায়ত্ত হইতে লাগিল, তখন "চর" ও "চক" গ্রামের নামে গ্রথিত হইয়া রহিল;

যেমন, চরকাটি, বকচর, চাকদহ, চকশ্রী (চাকসিরি)। ক্রমে স্থানে স্থানে জমিতে জঙ্গল জমিয়া 'বুনিয়া' হইতে লাগিল; যথা বুজবুনিয়া, তালবুনিয়া। এই জঙ্গল কাটিয়া লোকে যখন আবাদ করিতে লাগিল, তখন 'কাটি' ও 'আবাদের' ছড়াছড়ি হইল; মামুদকাটি, কাটিপাড়া, চূড়ামণকাটি। খুল্‌না ছাড়াইলে বরিশাল জেলায় প্রধান প্রধান স্থানের নাম অধিকাংশই কাটি সংযুক্ত। রায়েরকাটি, ঝালকাটি, সিদ্ধকাটি, কাটির আর অবধি নাই। যাহারা কোন-স্থানে প্রথমে "কাটির আবাদ" করিয়া অর্থাৎ জঙ্গল কাটিয়া বসতি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় 'কাটিকাটা বাসিন্দা' বলে। এই সকল লোকের চেষ্টায় ইমাদাবাদ, আমীরাবাদ, নয়াবাদ, প্রভৃতি অসংখ্য বনভূমি আবাদ হইল এবং আবাদ সকল বাঁধবন্দী হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিগণিত হইতে লাগিল। তখন বেনাপোল, আল্‌তাপোল, শ্রীকোল, বালিখোলা প্রভৃতি কত স্থান হইল। শস্যক্ষেত্র সকল নানা জনের নানা নামে 'গাতি' ও 'মহলে' বিভক্ত হইয়া নানা প্রকারে তলা, তলী, গাছা, গাছি প্রভৃতিতে চিহ্নিত হইতে লাগিল। বুনাগাতি, আইচগাতি, সিংহগাতি, চন্দনীমহল, ফুলতলা, বাঁশতলী, চৌগাছা, কলাগাছি প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনির্ম্মাণের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী, পুর, নগর, গ্রাম, ঘর, বাড়ী, বাড়িয়া, পাড়া, পাশা প্রভৃতি যোগ হইয়া খুল্‌না যশোহরের প্রায় অর্দ্ধেক গ্রাম বিজ্ঞাপিত হইল। সত্রাজিৎপুর, দৌলতপুর, মহেশপুর, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, নূরনগর, বনগ্রাম, পয়গ্রাম, মুলঘর, তেঘরিয়া, কচুবাড়িয়া, সোণাবাড়িয়া, লক্ষ্মীপাশা, মহেশ্বরপাশা, চাঁদপাড়া, কাড়াপাড়া, নওয়াপাড়া প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামের আদিম উৎপত্তি এইভাবে। বসতির সহিত বিপণির প্রয়োজন; হিন্দুর হট্ট বা হাট, মুসলমানের 'বাজার' এবং বৈদেশিকের গঞ্জ ও আড়ংএ পরিণত হইল। বাগেরহাট, নহাটা, সেখহাটি, সেনহাটি, বার-বাজার, সেনের বাজার, কালীগঞ্জ, মোরেলগঞ্জ, হেঙ্কেলগঞ্জ, আড়ংঘাটা ও আড়ং-গাছা প্রভৃতি স্থান ইহারই পরিচয়স্বরূপ। এইরূপভাবে যশোহর ও খুল্‌নার প্রায় গ্রামগুলির নাম লইয়া পর্য্যালোচনা করিলে, দেশের প্রকৃতির কতকটা জ্ঞান হইতে পারে। যে পর্য্যায়ে পর পর কতকগুলি গ্রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, সেরূপভাবে একটির পর একটির উৎপত্তি না হইতেও পারে; তবে গ্রামের নামের মধ্যে দৈশিক অবস্থার যে একটা সজীব ইতিহাস প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে, এইরূপ আলোচনা হইতে তাহারই কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং গ্রামগুলির এইরূপ সাধারণ আলোচনাকে আমরা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ণয়ের প্রথম পন্থা করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ যশোহর ও খুল্‌নার গ্রামগুলির কতকটা তুলনা করিলে উহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাই। "ডাঙ্গা" সংযুক্ত গ্রামের নাম যশোহরে ২২৬ খানি এবং খুল্‌নায় ১২১ খানি হইবে। ইহা হইতে একটি অনুমান করা যায়। প্রথমে যখন জল হইতে জমি উঠিতেছিল, তখন বহুস্থান "ডাঙ্গা" হইয়া গেল; প্রথমে উত্তরদিকে অর্থাৎ যশোহরে "ডাঙ্গা" হইল, লোকে প্রথমতঃ যশোহরের দিকে বসতি আরম্ভ করিল। ক্রমে খুল্‌না অঞ্চলেও ডাঙ্গা হইল, কিন্তু বসতি তেমন হইল না সুতরাং সেদিকে ডাঙ্গা উঠিয়া বহুকাল পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল। যে সব স্থানে বসতি হইল না, সে সকল স্থানের ডাঙ্গা নাম থাকিল না। খুল্‌নায় শেষে জঙ্গল কাটিয়া বাসভূমি প্রস্তুত হইল। এজন্য যশোর অপেক্ষা খুল্‌নায় "কাটি" যুক্ত গ্রাম অধিক। যশোহরে ২১ খানি ও খুল্‌নায় ৬৯ খানি গ্রামে "কাটি" আছে এবং ক্রমে যেমন সুন্দরবন আবাদ হইতেছে, ততই কাটির সংখ্যা আরও বাড়িবে। এইরূপে খুল্‌নায় যতগ্রামে "বুনিয়া" আছে, যশোহরে তত নাই। যশোহরে দিয়াড়া একটি আছে, খুল্‌নায় অন্যূন ৫টি।

তৃতীয়তঃ যে দেশ দ্বীপাকারে জল হইতে উত্থিত হয় এবং যে দেশের চতুর্দ্দিকে নদী, খাল পরিবেষ্টিত থাকে, সেদেশে যথেষ্ট পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যায় এবং দেশের অধিবাসিগণেরও মৎস্য একটি প্রধান খাদ্যোপকরণ হয়। এই জন্য সেদেশে কালে মৎস্যের নামে বহুসংখ্যক গ্রামের নাম হয়। যশোহর খুল্‌নায়ও তাহাই হইয়াছে। যেমন যশোহর জেলায় ইলিশমারি, ইচাখাদা, ইচাখোলা, কইখালি, কাতলাকর, খলিসাখালি, চাঁদা, চেঙ্গা, চিংড়া, টাকিপুর, টেঙ্গরা, টেঙ্গরালি, পুঁটিমারি, পুঁটিয়া, বাট্‌কেমারি, বাট্‌কেডাঙ্গা, বোয়ালিয়া, ভেটকিয়া, মাগুরা, মাগুরাডাঙ্গা, মাগুরখালি, রুইজানি, শলুয়া, শৈলকূপা, শৈলমারি, সিঙ্গা, সিঙ্গি প্রভৃতি। এবং খুল্‌না জেলায় ইলিশপুর, কইখালি, কাইনমারি, কাতলা, খলিসাখালি, খলসী, গজালমারি, গজালিয়া, গাগড়ামারি, চাঁদা, চিতলমারি, চিংড়া, চিংড়াখালি, টাকি, টাকিপুর, টাকিমারি, টেঙ্গরা,

টেঙ্গরাখালি, পুঁটি, পুঁটিখালি, পুঁটিমারি, বাইনতলা, বাটকেমারি, বোয়াইল-মারি, বোয়ালিয়া, মাছখোলা, মাগুরা, মাগুরাডাঙ্গা, শৈলমারি, সিঙ্গা প্রভৃতি। ইহার অধিকাংশে এক নামে ২।৩টি বা ততোধিক গ্রাম আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে খলিসাখালি যশোহরে ৭টি এবং খুল্‌নায় ৪টি আছে, বোয়ালিয়া যশোহরে ৬টি ও খুল্‌নায় ৪টি, মাগুরা যশোহরে ৮টি ও খুল্‌নায় ৪টি, টেঙ্গরা মাছের নামে যশোহরে ৫টি ও খুল্‌নায় ৬টি, সিঙ্গা যশোহরে ১৫টি এবং খুল্‌নায় ২টি আছে। যশোহরে এক নামে অধিকতর গ্রামের নাম আছে, খুল্‌নায় অধিকতর জাতীয় মৎস্যের নামে গ্রামের নাম আছে। মোটের উপর এক এক জেলায় ৬০।৭০ খানি মৎস্যনামীয় গ্রাম আছে। যে সকল মৎস্য এই অঞ্চলে পাওয়া পায়, সেই সকল মৎস্যের মধ্যেই গ্রামের নাম আছে। কোন অপ্রাপ্য বা বৈদেশিক মৎস্যের নামে কোন গ্রামের নাম হয় নাই। যশোহর জেলার অধিকাংশস্থলে মৎস্যের শুধু নাম মাত্র আছে, মৎস্যের পর্য্যাপ্ত আমদানী নাই। খুল্‌নাই এক্ষণে উভয় জেলার মৎস্য সংস্থান করে বলিলে অত্যুক্তি হয় নাই। যশোহরে উচ্চ জমি বা ডাঙ্গা অধিক, খুল্‌নায় খাল, বিল ও মৎস্য প্রচুর। কিন্তু রেলওয়ে ট্রেণের ব্যবস্থায় প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত প্রভৃতি কথা দেশান্তরিত হইতেছে। গ্রামের নামের ইতিহাস অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পুরাতন নাম উঠাইয়া কৃতী পুরুষ বা জমিদারের স্মৃতি গ্রামের গায়ে লিখিয়া রাখা হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস সঙ্কলন করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

চতুর্থতঃ জলমগ্ন দেশ যখন দ্বীপাকারে দেশে পরিণত হয়, তখন তাহার আর একটি প্রকৃতি এই যে উহার সভ্যতা নদীপথেই বাহিত হয়। বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে দ্বীপ উৎপন্ন হইলে, মধ্যে মধ্যে বড় বড় নদী খাল রহিয়া যায়। ক্রমে এই সকল নদীপথে পলি আসিয়া কূলভাগ উন্নত ও সমুর্ব্বর করে এবং সেই সকল নদীর কূলে উচ্চ শুষ্ক উর্ব্বর জমি পাইয়া লোকে বসতি করিয়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই দুই জেলার প্রাকৃতিক বিবরণে পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, পশ্চিমে যমুনা-ইচ্ছামতী, মধ্যস্থলে দক্ষিণমুখী কপোতাক্ষ ও পূর্ব্বমুখী ভৈরব, উত্তরভাগে নবগঙ্গা-চিত্রা, এবং পূর্ব্বসীমায় মধুমতী—এই

পাঁচটি নদীই এই উভয় জেলার সভ্যতা ও প্রতিভার বিকাশপথ। কি রাজনৈতিক প্রাধান্য, কি সামাজিক প্রতিপত্তি, কি ধর্ম্মভাবের উন্মেষ বা বিদ্যার গৌরব—যে ভাবেই ধরা যায়, এই পাঁচটি নদীই অতি প্রাচীন যুগ হইতে এদেশের যাহা কিছু উন্নতি বা সমৃদ্ধির প্রকৃত কারণ। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, খাঁজাহান আলি, সত্রাজিৎ বা মুকুটরায় সকলেই এই নদীর কূলেই ক্রীড়াক্ষেত্র করিয়াছিলেন; কুশদ্বীপ, যশোর, কুমিরা, বাঘুটিয়া, জঙ্গলবাধাল, সেনহাটি বা সেখহাটি, লক্ষ্মীপাশা, সিঙ্গিয়া, বা সত্রাজিৎপুর, ইতিনা বা মল্লিকপুর—উচ্চ-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের প্রধান প্রধান সমাজকেন্দ্র এই কয়েকটি নদীর কূলে অবস্থিত। এই কয়েকটি নদীর কূলেই পণ্ডিতের সমাজ, সাধকের লীলাক্ষেত্র, বিদ্বানের লীলাস্থল এবং কবির জন্মভূমি। নদীই এদেশের আদিম অধিবাসের চিহ্নস্বরূপ, নদীই এদেশের উন্নতির মূলীভূত এবং নদীর পতনই এদেশের অধঃপতনের কারণ।

পঞ্চমতঃ নদীমাতৃক দেশের অধিবাসীর পূর্ণ প্রকৃতিই যশোহর খুল্‌নার লোকের চরিত্রে দেখা যায়, আচার ব্যবহার ও কর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত হয়। এ অঞ্চলের লোক একটু অধিক মৎস্যাশী, তাহারা মৎস্য ধরিতে, প্রত্যহ একাধিকবার স্নান করিতে, সন্তরণ করিতে সাধারণতঃ সুদক্ষ। নৌকা-যানের মত যান নাই, ইহা এদেশে একটি সাধারণ প্রবাদবাক্য। অন্য দেশের লোকে ইহার মর্ম্ম তেমন বুঝে না; কিন্তু এখানে লোকে সুবিধা পাইলেই নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। নানাবিধ নৌকা গঠনে, তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে নৌকাচালনে, সাধারণ নাবিকতা ও নৌযুদ্ধে এদেশের লোকে বিশেষ পারদর্শী। পূর্ব্বকাল হইতে এতদ্দেশীয় বড় লোকেরা দুই একখানি সুন্দর নৌকা রাখিতে যত্নবান্ হন; এদেশে কতকগুলি যাযাবর জাতি আছে, তাহারা নৌকার মধ্যেই আপনাদের ঘর বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া নিত্য নূতন স্থানে যাতায়াত করে। এ অঞ্চলের লোকের ধারণা এই যে যেখানে নদী নাই, সেখানে বাস করিতে নাই। লোকে সব ত্যাগ করিতে পারে, নদীর মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। এই নদীমাতৃক দেশের অধিবাসীর নিকট নদী বড় প্রিয় বস্তু; দেশমাতৃকার স্তন্যধারারূপিণী নদী প্রবাসীর মনে কি আনন্দময়ী স্মৃতি জাগাইয়া তুলে, তাহা "যশোর সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে"

যাঁহার জন্মভূমি ছিল, সেই বঙ্গকবিকুলশিরোমণি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ফ্রান্স হইতে লিখিত পত্রে পরিচয় দেয়ঃ—

"বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

আমরা এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম, যে যশোহর খুল্‌না যে ভূভাগের অন্তর্গত ইহাই গাঙ্গরাষ্ট্র বা গাঙ্গোপদ্বীপ। এদেশ গঙ্গাজলবাহিত হিমালয়ের গাত্র-ধৌত পলি হইতে উৎপন্ন। প্রথমে এস্থান সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল; পরে গঙ্গার পলিতে যেমন দ্বীপ হইতে থাকে, সমুদ্রও তেমনি দক্ষিণে সরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গমও দক্ষিণে সরিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রথমতঃ অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ছিল, পরে উহার অনেকগুলি মিশিয়া, একত্র হইয়া, উন্নত হইয়া এমন উর্ব্বর হইয়াছিল যে জগতে তাহার তুলনা নাই।* এই সমুর্ব্বর দেশে ক্রমে লোকের বসতি স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ বাগদি প্রভৃতি নানা অসভ্যজাতি এস্থানের অধিবাসী হয়; ক্রমে এদেশে আর্য্যজাতির আবির্ভাব হয়। সেই সময় হইতেই আর্য্য সভ্যতার আরম্ভ হয়। সেই আর্য্য সভ্যতা এখনও চলিতেছে। গাঙ্গোপদ্বীপের এই দীর্ঘ জীবনকে সাতটি প্রধান যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম মহাভারতীয় যুগ হইত্রে খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আদি যুগ। ২য়—অশোকের সময় হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ১২।১৩ শত বৎসর জৈন বৌদ্ধ যুগ। ৩য়—পরবর্ত্তী দুই শত বৎসর সেনরাজগণের হিন্দু যুগ। ৪র্থ—পরবর্ত্তী ৩০০ বৎসর পাঠান শাসন। ৫ম—৫০।৬০ বৎসরকাল বার ভূঞার আমল। ৬ষ্ঠ—পরবর্ত্তী ১৫০ বৎসর মোগল রাজত্বকাল। ৭ম—বিগত শতাধিক বৎসর ইংরাজ শাসন। প্রথম যুগে আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্‌না জেলা বকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল; এই বকদ্বীপেরই নামান্তর উপবঙ্গ। বৌদ্ধযুগে

* "The great chasm which divided the ancient Barendra and Rarh Divisions of Bengal, has thus gradually disappeared and in its place we have a rich alluvial tract which as respects fertility, yields the palm to no other country on the face of the globe."-Ram Sanker Sen's Agricultural Statistics of Jessore. p. 4

তাহা সমতট আখ্যা পাইয়াছিল। ৩য় যুগে অর্থাৎ সেন রাজত্বকালে উহাই বগ্‌ড়ী নামে চিহ্নিত হয়।* পাঠান যুগে যশোহর ও খুল্‌না মামুদাবাদ, ফতেহাবাদ, ও খলিফাতাবাদ এই তিনটি সরকারের কতকাংশ লইয়া গঠিত ছিল। এই সময়ই দক্ষিণভাগে যশোর রাজ্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। মোগল আমলে যশোর প্রথমতঃ একটি সামন্ত রাজ্য ও পরে স্বাধীন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইংরাজশানকালে এই যশোর রাজ্য ও উত্তরবর্ত্তী বিস্তৃত প্রদেশ লইয়া প্রথমতঃ যশোহর ডিভিসন ও পরে তাহা হইতে খণ্ডিত করিয়া যশোহর জেলা গঠিত হয়। আদি যুগে অতি অল্প স্থানেই লোকের বসতি স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী যুগের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলে। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুন্দরবন অঞ্চল দিয়া অবনমনাদি হইয়া দেশের ধ্বংস হইয়াছিল। পুনরায় ভূমি জাগিয়া সমতট হয় এবং উহাতে ৫।৬ শত বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট বসতি ও দৈশিক প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। উহার পরেই সুন্দরবন অঞ্চলের একবার নিমজ্জন হয়, তাহাতে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। পুনরায় সেন-রাজত্বের প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া আবার দেশের জাগ্রত অবস্থা হয়। এমন সময়ে পাঠান বিজয়ের পর হইতে নানাভাবে দেশের অবনতি সাধিত হইতে থাকে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের পুনরায় একটা অবনমন হয়। ইহাকে আমরা তৃতীয় অবনমন বলিতে পারি। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পুনরায় দেশ উন্নত হইতে থাকে। এইবার উন্নত হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। এই তৃতীয় অবনমনের পর খাঁজাহান আলি সুন্দরবন আবাদ করিয়াছিলেন। ক্রমে যখন দেশের একটা বিশিষ্ট উন্নত অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই বার ভূঞার যুগ এবং প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরবৃন্দের অভ্যুদয় কাল। কিন্তু সেই অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই পুনরায় যশোর রাজ্যের দক্ষিণাংশ বা সুন্দরবনভাগ অবনমিত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। উত্তর ভাগে এই উপদ্রব যায় নাই। পুনরায় অতি অল্প দিন হইতে সুন্দরবনের সেই দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ সুন্দরবন বিভাগ পরিমাপ ও পরীক্ষা করিয়া অনুমান করিতেছেন যে সগরদ্বীপ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ব'দ্বীপের তীরভূমি সোজাভাবে ছিল। বরিশালের মধ্যভাগ হইতে পূর্ব্ব

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৬৫-৬৬ পৃঃ।

দিকে তীরভূমি এক্ষণে যেরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখা যায়, উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অবনমনের ফল। উক্ত অবনমনে উচ্চ ভূমি যেমন নিম্ন হইয়া গিয়াছিল, নিম্ন ভূমি খালে পরিণত হইয়াছিল। এই অবনমনের পর নানাস্থানে বিশেষতঃ ঢাকার দক্ষিণ ভাগে মধুপুর জঙ্গলে যে ভূমিগঠন হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আদি হিন্দু যুগ।

বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে যেখানে আমরা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখি, † তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বঙ্গ, বগধ (মগধ) এবং চের এই তিন দেশবাসিগণ দুর্ব্বলতা, দুরাহার ও বহু অপত্যত্বে কাক চটকপারাবত সদৃশ।‡ ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বঙ্গে তখন অসভ্য জাতির বাস ছিল, তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বা খাদ্যবিচার ছিল না। অবশ্য বলির পুত্রগণ যখন অঙ্গবঙ্গাদি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন আর্য্যেরাই এদেশে আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের নানাস্থানে পবিত্র তীর্থস্থান এবং পীঠমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই তীর্থস্থান-

---

* "There are indications that at one time the Delta-face extended from somewhere near Saugor Island right accross to the Chittagong coast and that the break that occurs now from the middle of the Bakarganj District to that coast is caused by recent depression. The original Surface has been depressed as time went on and many of the *Khals* that now exist were the lowest portions of the old land surface."—Narrative Report Submitted to the Government of Bengal by Major F. C. Hirst I. A,. Director of Surveys, Bengal and Assam under the Topographical Survey of the Khulna and 24-Parganas Sundarb 1905-08. See *Statesman*, 23-3. 1914.

† "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি
বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি"

ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১

‡ পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী প্রণীত ত্রয়ী টীকা ১৬৩ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৫৬ পৃঃ।

গুলিই আবার এ প্রদেশে আর্যোপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কারণ হইয়াছিল। সব চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অতি পুরাতন দেববিগ্রহ বা পূজার স্থানসমূহ এক স্মরণাতীত যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তীর্থের জন্য আর্য্যগণ এদেশে বাস করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অসংখ্য অসভ্য জাতির সংস্পর্শে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-হানি হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরাই দিগ্বিজয়ে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতেন, ব্রাহ্মণেরা এ দূরদেশে আসিতেন না। ধর্ম্মহানির তাহাই কারণ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ অভাবে ক্ষত্রিয়জাতীয় পৌণ্ড্রগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* তীর্থযাত্রা ব্যতীত এদেশে আগমনও নিষিদ্ধ ছিল।† বৌধায়ন সূত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে আগমন করিলে, যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে হয়।‡

গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গরাষ্ট্রে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। রামায়ণের যুগেই ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনীত হন। তৎসঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিথিলা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে থাকে। দশরথের রাজত্বকালে বঙ্গ একটি প্রধান রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামাভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইলে, অভিমানিনী ভার্য্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য রাজা দশরথ বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি § বহুদেশের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে এ সকল দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাত মধ্যে যাহাতে তাঁহার অভিলাষ হয়, তাহাই তাঁহাকে আনিয়া দিবেন। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এ সকল দেশ তখন দশরথের বিস্তৃত রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রঘুর

---

* শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
মনুসংহিতা, ১০।৫৩

† "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

এই শ্লোকটি মনু হইতে উদ্ধৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রচলিত কোন মনুসংহিতায় এ শ্লোকটি পরিদৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড. ৫৭ পৃঃ ও ৭৮ পৃঃ এবং বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ১১৮ পৃঃ।

‡ বৌধায়ন, ১।১।২,

§ "দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
গঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশীকোশলাঃ॥ ইত্যাদি
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম।

দিগ্বিজয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, বঙ্গবাসিগণ নৌবাহিনী সাজাইয়া মহাবীর রঘুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। রঘু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে জয়স্তম্ভাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* উপবঙ্গে যে তখন সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল এবং দেশের প্রকৃতি অনুসারে তদ্দেশবাসিগণ যে নৌবল সঞ্চয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামায়ণ হইতে জানা যায়, সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। ভগীরথ এই সগররাজের অধস্তন বংশধর।† তিনি সাধন বলে গঙ্গাকে ভূতলে আনিয়া তাঁহার পবিত্র জলস্পর্শে শাপদগ্ধ পূর্ব্ব পুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। যেখানে সগরের পুত্রগণ ভস্মীভূত ও পরে উদ্ধার প্রাপ্ত হন, সেই স্থানেই কপিলাশ্রম ছিল এবং তাঁহারই নাম সগরদ্বীপ। সগরের পুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত বলিয়া সমুদ্রের অন্য নাম সাগর। গঙ্গার সহিত সাগরের সঙ্গমেই সগরদ্বীপ অবস্থিত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে জানিতে পারি, শ্রীমন্ত সওদাগর সপ্তডিঙ্গা লইয়া যাইতে যাইতে, ক্রমে কালীঘাট, বারাশত, ছত্রভোগ পার হইয়া হাতিয়াগড়ে অম্বুলিঙ্গ শিব ও সঙ্কেত মাধবের পূজা করিয়া অবশেষে এই সগরদ্বীপে উপনীত হন।

"যেখানে সগর বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ;
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে
হৈয়া সব চতুর্ভুজ বেশ।
মুক্তিপদ এই স্থান, এইখানে করি স্নান
চল ভাই সিংহল নগর;
তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা ল'য়ে সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর"।‡

---

* "বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥
রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক।

† সগরের পুত্র অসমঞ্জ, তৎপুত্র অংশুমান্, তৎপুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্রই ভগীরথ।

‡ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা, এলাহাবাদ সংস্করণ ২৪০ পৃঃ।

সগরদ্বীপ যুগযুগান্তর ধরিয়া একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পূর্ব্বে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পাঠান যুগে শ্রীমন্ত সওদাগরের সময় হইতে মোগল আমল পর্য্যন্ত সগরদ্বীপের অবস্থা কবিকঙ্কণের বর্ণনা হইতে জানা গেল। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রতাপাদিত্যের যুগ। সে সময় সগরদ্বীপ তাঁহার একটি প্রধান নৌবাহিনীর আড্ডা এবং শাসনকেন্দ্র ছিল। তিনি সগরদ্বীপের শেষ নৃপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।* বৈদেশিকেরা প্রতাপাদিত্যকে চ্যাণ্ডিকানের (chandecan) অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান।† প্রতাপাদিত্যের পতনের পরও সগরদ্বীপের ভাল অবস্থা ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহাতে দুই লক্ষ লোকের বাস ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বৎসরই সহসা এক ভীষণ জলপ্লাবনে উহা নিমজ্জিত হয় এবং তদবধি আর উঠে নাই।‡ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাতে আবাদ পত্তন করা যায় নাই।§ এখন পৌষ-সংক্রান্তিতে ২।১ দিনের জন্য বহুসংখ্যক যাত্রী সগরদ্বীপে বা গঙ্গাসাগরতীর্থে যাইয়া থাকে। এখানে কোন লোকের বসতি নাই। কেবলমাত্র জঙ্গলের মধ্যে ২।১টি প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে কিছু প্রাচীন নিদর্শন রাখিয়াছে।

মহাভারতীয় যুগে সমগ্র বঙ্গদেশে আর্য্য-সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে পাণ্ডবেরা যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন

* হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের" মুখপত্রেই এই পংক্তিটি উদ্ধৃত আছে:—"The last king of Saugor Island"; কোথা হইতে উদ্ধৃত তাহা স্পষ্ট জানিতে পারি নাই। See Calcutta Edition, 1856.

† প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রাচীন ম্যাপ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। এ সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য, উপক্রমণিকা, ১৩৬—১৪৪ পৃঃ। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য থাকে প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে বলিব।

‡ "Two years before the foundation of Calcutta, it (Sagar Island) contained a population of 200,000 souls, which in one night in 1688 was swept away by an innundation." An article on 'Calcutta in the olden time" in Calcutta Review, No. XXXVI.

§ "As early as 1811 one Mr. Beaumont applied for lease &c. and attempt went on up to 1820 and failed completely. It is now almost uninhabited" Sir W. Hunter's Statistical Accounts, Vol. I. p. 106.

ভীমসেন পূর্ব্বদেশ জয় করিবার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে রাজ্যজয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি "পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কোশিকী কচ্ছবাসী মনোজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং সুহ্মদিগের অধীশ্বর ও মহাসাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"* ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশ তখন নানাভাগে বিভক্ত ছিল এবং এক রাজার অধীন ছিল না। সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ বা রাঢ় এই তিন ভাগে বঙ্গ বিভক্ত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে সমুদ্রসেন, উপবঙ্গাদি লইয়া ভাগীরথীর উভয়কূলবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রসেন এবং দক্ষিণবঙ্গ বা সুহ্ম রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এই তাম্রলিপ্ত রাজার রাজধানী ছিল। মহাভারতের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে তাম্রলিপ্তকগণ ম্লেচ্ছ ছিল,† কিন্তু অন্য নৃপতিদ্বয়ের সেনা সম্বন্ধে সেরূপ কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং যশোরাদি উপবঙ্গে তখন আর্য্য-রাজত্ব ছিল বলা যাইতে পারে। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন উভয়ে সম্পর্কিত থাকাও বিচিত্র নহে। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে তাঁহারা নানা বিত্ত ও রত্ন উপহার লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা "প্রত্যেকে সুশিক্ষিত ও পর্ব্বতপ্রতিম কবচাবৃত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ‡ রথী ও অতিরথের সংখ্যা নির্ণয় করিতে গিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর ভীষ্ম এক চন্দ্রসেনকে পাণ্ডবপক্ষের একজন প্রধান রথী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।§ এই চন্দ্রসেন বঙ্গাধিপ চন্দ্রসেন কিনা বলা যায় না।

উপরোক্ত পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত ছিলেন। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব হইতে পৃথক্ বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। হরিবংশ হইতে জানা যায় পৌণ্ড্রক প্রবলটীক ছিলেন; তিনি

---

* মহাভারত, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। সভাপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায়।

সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥

† দ্রোণপর্ব্ব, ১১৯।১৫, এখানে শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

‡ সভাপর্ব্ব, ৫১।১৬—১৯

§ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭১ অধ্যায়।

নরক জরাসন্ধ প্রভৃতির বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু ছিলেন। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন।* বাসুদেবের পিতার নাম বসুদেব এবং মাতার নাম সুতনু। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম কপিল। কপিলের মাতার নাম নারাচী। কপিল সম্ভবতঃ তাঁহার গর্ব্বিত ও পরাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবের চক্রান্তে বিতাড়িত হন এবং পরে মুনিব্রতাবলম্বন করিয়া সুদূর উপ-বঙ্গের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের মধ্যে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐস্থান এক্ষণে কপিলমুনি নামে খ্যাত। ইহা খুল্না জেলার কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। যিনি সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা এবং যাঁহার অভিশাপে সগরবংশের ধ্বংস হইয়াছিল, ভগবানের অবতারকল্প সেই মহর্ষি কপিল † হইতে ইনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। বাসুদেবানুজ কপিলও সন্ন্যাসী এবং ভক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি কপিলমুনিতে আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া তথায় এক ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি কপিলে-শ্বরী কালী বলিয়া খ্যাত।

কপিল মহাভারতীয় যুগের লোক। তাঁহার পর সুন্দরবন অঞ্চল দিয়া কত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আর এখন নাই। উক্ত স্থানে কপোতাক্ষীর কূলে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল বেষ্টন করিয়া একটী বিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ মুনির আশ্রম নির্দ্দেশ করে। কপিলের কালী-মূর্ত্তি ও মন্দির সম্ভবতঃ বৌদ্ধ আমলেও ছিল, বৌদ্ধ যুগের কোন কোন নিদর্শন এখনও কপিলমুনিতে আছে। পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। বৌদ্ধ-

* পৌণ্ড্রকের নানা অদ্ভুত অভিযানের বিষয় হরিবংশের ভবিষ্য পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভবিষ্যপর্ব্বের কতকাংশ হস্তলিখিত পুঁথিতে নাই এবং টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহার টীকাও করেন নাই। এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকে সেরূপ ধরা হয় নাই। যাহা হউক পৌণ্ড্রকের নাম মহাভারতে কয়েক স্থানে আছে; বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা আছে। তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসী সংস্করণের হরিবংশে উদ্ধৃত ভবিষ্যপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

† "গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।" গীতা ১০।২৬
ভাগবতের মতে সাংখ্যকার কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার; তাঁহার পিতার নাম কর্দ্দম, মাতার নাম দেবহূতি।

যুগের শেষভাগে সুন্দরবনে যে প্রাকৃতিক বিপ্লব হয়, তাহাতেই উক্ত মন্দিরাদি ভূপ্রোথিত হইয়া যায় এবং কালীমূর্ত্তি বিনষ্ট হয়। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর এই সকল স্থান মনুষ্যের বাস ও গতিবিধি বিহীন অবস্থায় ছিল। পরে যখন পুনরায় পত্তন হইতে ছিল, তখন কপিলের কথা নানা জনশ্রুতিমুখে বিজ্ঞাপিত হয় এবং সেই স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে চৈত্রমাসে বারুণী স্নানের দিন কপিলমুনিতে এক যাত্রী সমাগম ও মেলা আরম্ভ হয়। মধুমাসীয় কৃষ্ণাত্রয়োদশী কপিলের মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা সিদ্ধিলাভের দিন হইতে পারে। এই মেলায় বহু দূরবর্ত্তী স্থানের লোক আসিত। তখন হইতে সাধারণগৃহে কপিলেশ্বরীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। লোকের বিশ্বাস উপরোক্ত তিথিতে কপোতাক্ষের জল গঙ্গাজলতুল্য পবিত্র হয় এবং উহাতে স্নান করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়। এখন আর মাসাধিক কালব্যাপী মেলা হয় না বটে, কিন্তু চৈত্রমাসে বারুণী তিথিতে কপোতাক্ষে স্নান করিবার জন্য এখানে বহুলোকের সমাগম হয়।

কপিলমুনি একটী অতি প্রাচীন স্থান। ইহা মলই পরগণার অন্তর্গত। ইহা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার পতনের পর মলই পরগণা রায় উপাধি-ধারী এক পরাক্রান্ত ব্যক্তির হস্তগত হয়। এই বংশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কমলা-কান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়। তাঁহারা চাঁচড়ার অধীন জমিদার ছিলেন। এখনও এই বংশীয় ব্যক্তিগণ হরিঢালী ও রাড়ুলিতে বাস করিতেছেন। মলই পরগণার কর প্রভূত পরিমাণে বাকী পড়িলে, চাঁচড়া-রাজ ৺মনোহর রায় ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রায়বংশীয়দিগের নিকট হইতে কোবলা দ্বারা এই জমিদারী স্বীয় হস্তে লন। চাঁচড়ার রাজগণ চিরদিন দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ এবং দেবসেবায় মুক্তহস্ত, তন্মধ্যে আবার রাজা মনোহর রায় এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কপিলেশ্বরীর জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবার জন্য যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পরে ঐ মন্দির নদীগর্ভস্থ হয়। ইতিমধ্যে ইংরাজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মনোহরের বংশধর শ্রীকণ্ঠ রায়ের রাজত্বকালে মলই পরগণা বিক্রয় হইয়া যায়। উহা সাতক্ষীরার জমিদার বাবুরা ক্রয় করেন এবং তাঁহারাই ৺কপিলেশ্বরীর সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিছুকাল পরে তাহা-দিগেরও ⅞ অংশ বিক্রয় হওয়ায় সে অংশ দিঘাপাতিয়ার রাজা এবং শ্রীধরপুরের বসু বাবুরা ক্রয় করেন। অবশিষ্টাংশ সাতক্ষীরার বাবুরা উভয় সরিকে ভোগদখল

করিতেছেন। নানা অংশে বিভক্ত হওয়ায় উক্ত জমিদারগণ কালীবাড়ীর প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। তখন ঝিকার গাছার কুঠিয়াল মেকেঞ্জি সাহের ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে একটী ছাদওয়ালা ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন।* ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে সে ইষ্টক গৃহও ভূমিসাৎ হয়। তখন অগত্যা একটী পর্ণশালায় দেবী মূর্ত্তিটি স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কপিলমুনি নিবাসী শ্রীবিনোদবিহারী সাধু খাঁ নামক একজন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত যুবক নদীর সন্নিকটে একটী পাকা মন্দির ও নাট্টশালা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মায়ের এক সুন্দর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথেষ্ট সদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মায়ের মন্দিরে এক প্রস্তর ফলকে লিখিয়া রাখিয়াছেন ঃ—

"যথা দ্বিজ, সাধু, ভক্ত তথা তীর্থ স্থান।
তাই মাগি পদধূলি দেহ পুণ্যবান্।
৺ভরত সাধু খাঁ পুত্র শ্রীযাদব আর
বিনোদবিহারী দীন প্রিয় পৌত্র তার,
মায়ের মন্দিরপ্রান্তে লুটাইছে শির
এস সাধু সদাশয় জ্ঞানী গুণী ধীর।"

মুনিবর কপিল যেখানে পুণ্যভূমি বাছিয়া মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, কত কত শতাব্দী ধরিয়া সাধুপদরেণুতে যে পুণ্যভূমি পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে, সেখানে মায়ের মূর্ত্তিস্থাপনা যে এক সাধনার ফল এবং অর্থের সদ্ব্যবহার, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই স্মরণাতীত আদিযুগেই যশোর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় দুই দিকে দুইটী পীঠস্থান হইয়াছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাটে আদিগঙ্গার তটে ৺মায়ের দক্ষিণ পায়ের ৪টী অঙ্গুলি পড়িয়াছিল, এবং তথাকার ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর।

---

* Westland's Report P. 41

"কালীঘট্টে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী"

মহানীলতন্ত্র।

"নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ"

মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র।

এইরূপে যশোর রাজ্যের পূর্ব্বাংশে যমুনাকূলে মায়ের পাণিপদ্ম পতিত হয় এবং তথায় ভৈরবের নাম চণ্ড।

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

তন্ত্রচূড়ামণি।

এখানে পাণিপদ্মে হস্ত ও পদ উভয় বুঝাইতেছে। আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানিতে পারি —

"কলেঃ সায়ং যশোরে চ যবনানাঞ্চ রাজ্যকে
যশোরেশী মহাদেবী চান্তর্ধানং ভবিষ্যতি
তত্রৈব পতিতৌ দেব্যাঃ হস্তপদৌ পুরা দ্বিজ।"

"দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে যে অনরি নামক ব্রাহ্মণ যশোরেশ্বরীর পীঠমূর্ত্তির জন্য একশত দ্বারযুক্ত বিরাট্ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সম্ভবতঃ এ মন্দির সুন্দরবনের বিপ্লবে অষ্টম শতাব্দীর পর বিনষ্ট হয়। ইহার পর যখন পশ্চিমদেশ হইতে পাল, সেন ও দেব প্রভৃতি বংশীয় অনেক জাতি বঙ্গে আসিয়া নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন, সে সময়ে গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামক রাজা এদেশে আসেন এবং তিনি তীর্থদর্শন জন্য যশোরে গিয়াছিলেন। তিনি যশোরেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ধেনুকর্ণ কিছুকাল এ প্রদেশে রাজত্বও করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য উত্তর দিকে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সেন রাজগণের প্রবল প্রতাপজন্য অবশেষে এ বংশীয়দিগের পতন হয়। দিগ্বিজয় প্রকাশেই উল্লিখিত আছে যে ধেনুকর্ণের পুত্র কণ্ঠহার বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি "বঙ্গভূষণ" উপাধিভূষিত ছিলেন। এই বঙ্গভূষণ যশোরের উত্তর ভাগ

অধিকার করিয়া তাহার নাম রাখেন ভূষণ, উহাই পরে ভূষণা বলিয়া পরিচিত হয়। কণ্ঠহার এখানে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে ধেনুকর্ণের মন্দির অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু চণ্ডভৈরবের মন্দির ছিল না। তজ্জন্য তিনি ভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেন রাজত্বের শেষ ভাগে সুন্দরবন অঞ্চলে যে নিমজ্জন হয়, তাহাতে উভয় মন্দির বিনষ্ট হয় এবং দেবীমূর্ত্তি ভূপ্রোথিত ও ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। প্রতাপাদিত্যের সময় পুনরায় সে মূর্ত্তির আবির্ভাব ও মন্দির নির্ম্মিত হয়।

যশোরেশ্বরী যে সত্যযুগ হইতে আছেন, তাহা তন্ত্রাদি হইতে যেমন জানা যায়, লোকের মুখে কিম্বদন্তী পরম্পরায়ও সেইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যশোরেশ্বরীর সেবায়ৎ ৺কালীকিঙ্কর অধিকারীর সহিত দেবোত্তর জমির স্বত্ব লইয়া গবর্ণমেণ্টের এক মোকদ্দমা হয়, উহার রায়ের অনুবাদ হইতে জানা যায়ঃ—

"আপীলাণ্ট যে অজুহত দাখিল করিয়াছে তাহার খোলসা এই জে ইশ্বরিপুর গ্রামে মহাপীট শ্রীশ্রীজসরেশ্বরি ঠাকুরাণী সত্যজুগ হইতে প্রকাষ আর শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এ জায়গায় স্থাপীত আছেন আর বিরধিয় ভূমী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর দেবত্তর হইতেছে এবং রাজা প্রতাপ আদিত্যের আমল হইতে অদ্যতক যে যে লোক জমীদার হইয়াছেন তাহারা সকলে এই সকল জমী বহাল রাখিয়াছেন।" †

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে ইহা হইতে অনেকগুলি কথা বুঝা যায়। যশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন,

---

* কণ্ঠহারের বীর্য্যে নীচ যোনিজ পুত্রগণ জঙ্গল বাধা ও চালিথা বেষ্টক (চালতা বাড়িয়া) গ্রামে বাস করিত। চালতাবাড়িয়া বৈদিক ব্রাহ্মণবংশীয় রায়দিগের অধীন ছিল। জঙ্গল বাধা বা জঙ্গল বাধাল যশোহরে সিঙ্গিয়া ষ্টেশনের সন্নিকটে এবং চালতাবাড়িয়া কপোতাক্ষের সন্নিকটে সারসা থানার অন্তর্গত।

† Quoted from the translation of judgment of Special Court of Calcutta and Murshidabad, 4—5—1842, *Kali kinkar Adhikari of Iswari pur, pergunnah Dhuliapur VS Government.*

এই মোকদ্দমার রায় ও তাহার অনুবাদের সহিমোহর নকল ঈশ্বরীপুর নিবাসী ৺মায়ের ভক্ত সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত হইয়াছে।

তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। "দেবী অন্নপূর্ণা" প্রতাপাদিত্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি সত্যযুগের স্থাপিত নহেন, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে। *

কালীঘাটে মহাকালীর ও যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তির পৌরাণিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই সকল শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য। এ মূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন দেখিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে যে ইহা বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রচিত। ইহা দূরে বসিয়া তর্ক করিবার বিষয় নহে, যশোরেশ্বরী দেবীর ভীষণা মূর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইলে কেহই তাহার প্রাচীনতায় সন্দেহ করেন না। যে যুগে প্রস্তরে হাস্যলহরী বা নয়নভঙ্গী সজীববৎ প্রতিভাত হইত, এ মূর্ত্তি সে যুগের না হইলেও ইহাতে যে অপূর্ব্ব দৈবভাব তাহার ভয়ঙ্করী ছায়ার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন মূর্ত্তিতে আকারানুকরণ ভাল হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ভারত-শিল্পীর প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের শিল্প নিরাকারকে আকার দিতে গিয়া প্রকৃত ভাবে আকারসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু কঠিন প্রস্তরফলকে অনাড়ম্বর ভাবে যে দেবভাব ফলাইয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এ সম্বন্ধে এক কৃতী লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কি কৌশলে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা অন্য দেশের শিল্পকার অভিব্যক্ত করেন নাই। যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত্যুমূর্ত্তি, তাহাও বিশ্বমাতার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র; ইহা কেবল ভারতশিল্পেই অভিব্যক্ত।" † মাতা যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি এইরূপ একটি মৃত্যু-মূর্ত্তি বটে, তাঁহার অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা মূর্ত্তি দর্শকমাত্রেরই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তবুও সেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তির বদনমণ্ডলে কি জানি কি এক অপূর্ব্ব দেবভাব কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া রহিয়াছে! উহা সেই প্রাচীন যুগেরই সম্পত্তি, এ যুগের নহে। তুমি এক্ষণে তিল তিল করিয়া আকারানুগত বিধিবিহিত সুষমাময়ী তিলোত্তমা গড়িতে পার, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরপিণ্ডে, সেই অপ্রাকৃত চোকে মুখে, তেমন স্বর্গীয় ছায়াকে কায়াপরিগ্রহ করাইতে পার না। ইয়োরোপ দেবতাকে মানুষের আদর্শে, মানুষের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকারে গঠন করিতে গিয়া তাহার দেবভাব হারাইয়া ফেলিয়া ছিল, ভারতবর্ষে মানুষের

---

* এই মূর্ত্তিটি দেবী অন্নপূর্ণা কিনা তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

† শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, "শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি" প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায় মাঘ, ১৩১৩)

মূর্ত্তিতে, মানুষের কাঠামে স্থূল গঠনে দেবতা গড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য শিল্পীও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। *

বাস্তবিকই যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি ভীষণ হইলেও ইহা যে ভাস্কর্য্যের একটি চরম আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন সম্বলপুরে সম্বলেশ্বরীর মন্দিরে শনির মূর্ত্তি ব্যতীত মানুষের মূর্ত্তিতে এমন ভীষণ ভাব আর কোথাও ফলান হয় নাই। † উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে বৈতরণী-তীরে সপ্ত মাতৃকার মূর্ত্তিমধ্যে চামুণ্ডা মাতার মূর্ত্তিও এইরূপ ভয়ঙ্করী। তাহাও এ জাতীয় মূর্ত্তিশিল্পের পরাকাষ্ঠারূপে বর্ণিত হইয়াছে। ‡ যশোরেশ্বরী মূর্ত্তির গঠনশক্তি কেবল মাত্র মুখমণ্ডলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ মূর্ত্তির কণ্ঠের নিম্নে হস্তপদ বা নিম্নাঙ্গ কিছুই নাই। উহা একখানি প্রস্তরপিণ্ড মাত্র। ইহার কষ্টিপাথরের কৃষ্ণতনু যে কত বৃহৎ বা ভারী, তাহা বুঝা যায় না। প্রথমতঃ একটী সমচতুষ্কোণ প্রস্তরময় বেদী প্রায় ১ হাত উচ্চ। তাহা হইতে কৃষ্ণ প্রস্তরের একটী আবরণ ক্রমশঃ সরু হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া মুখমণ্ডলের সহিত সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। এটি প্রকৃত আবরণ কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। আবরণ হইলে, উহার নিম্নে কোন হস্ত পদাদির চিহ্ন আছে কিনা জানিবার উপায় নাই। থাকিলেও তাহা মুখমণ্ডলের অনুযায়ী পরিমাণবিশিষ্ট নহে; যদি সেরূপ পরিমিতই হয়, তাহা হইলে

---

*"Greek and Italian art would bring the gods to earth, and make them the most beautiful of men; Indian art raises men up to heaven and makes them even as the gods." Havell's *Indian Sculpture and Painting* p. 83.

†' A people, superstitious like the Hindus, were no less influenced by one of the best specimens of Hindoo Sculpture in the frightful image of Jashareswari. For a better conception of the terrific realised in human countenance by the aid of art, is scarcely to be met with in India, except perhaps in the small figure of Shani to be seen in the temple of Sambaleswari at Sambulpur."—Mookerjee's Magazine, July, 1872; Antiquities of Jessore—Iswaripur by Baboo Rashbehari Bose.

‡ "The Sculptor has certainly succeeded in producing a more disagree able image of death than any other artist has imagined; there is nothing in Holbeins' Dance of Death quite so horrible."

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়, ১০ম সংখ্যা ৪৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মূর্ত্তিদেহ নিম্নে অনেকটা প্রোথিত আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, মুখের নিম্নাংশ কয়েক পরদা বস্ত্রে সমাবৃত থাকে। উহার উপরিভাগের রক্ত বস্ত্রখানি বৎসর অন্তর পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু নিম্নের বস্ত্রের নিম্নে প্রস্তরের গঠনাদি পুরোহিতগণও দেখিতে পারেন না। পুস্তকের প্রারম্ভপত্রে যে ত্রিবর্ণ চিত্র দেওয়া হইল তাহা হইতে দেবীমূর্ত্তির আভাস পাওয়া যাইবে।* বিশ্বকোষে যশোরেশ্বরীর যে ছবি (wood cut) প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছেন। সে ছবি কোথা হইতে কিরূপ ভাবে সংগৃহীত হইল তাহা বলিতে পারি না।†

যশোহর খুল্‌নার মধ্যে আর কোনও পীঠমূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু এই প্রাচীন যুগে এ প্রদেশে অন্যান্য দেব দেবীর নানামূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু যশোর রাজ্যের উত্থান পতনে, নানা বিপ্লবে, বিজাতীয় শাসনফলে এই সকল দেব-বিগ্রহ অনেক নষ্ট হইয়া যায়। তবুও এক্ষণে ২।১টির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। খুল্‌নার অন্তর্গত আমাদি গ্রামের পরীমালা বা পরিমলা দেবী এবং

---

* বহুজনে যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তির ফটো লইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। মন্দিরের ভিতরে তৈলাক্ত কৃষ্ণপ্রস্তরের মূর্ত্তির ফটো তোলা কঠিন ব্যাপার। আমরাও ২।৩ বার চেষ্টা করিয়া ভাল ছবি করিতে পারি নাই। একবার একখানি আয়না হইতে মায়ের মুখের উপর সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া মুখমণ্ডলের ছবি লইয়া ছিলাম বটে, কিন্তু নিম্নাংশের কোন ছায়া ধরিতে পারি নাই। অবশেষে মদীয় বন্ধু যশোহর শবানন্দকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফে খুব ভাল ছবি তুলিতে না পারিয়া, মাসাধিক কাল মন্দিরে থাকিয়া মায়ের এক বর্ণচিত্র প্রস্তুত করেন। উহা হইতে এক ব্লক প্রস্তুত করিয়া তিনি বৃহদাকারে ছবি প্রস্তুত করত প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারই সাগ্রহ সম্মতিক্রমে সে ছবি হইতে আমি এই বর্ণচিত্র প্রকাশ করিলাম। বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এ ছবি সম্পূর্ণ মূলানুগত হইয়াছে।

† বিশ্বকোষে যশোরেশ্বরীকে শিলাদেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার মতে এই শিলাদেবীকে মানসিংহ অম্বরে লইয়া যান এবং তৎপরে কচুরায় ঈশ্বরীপুরে এক নূতন প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা ঠিক নহে। স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা হইবে। মূর্ত্তির প্রকৃতি দেখিয়া যাঁহারা উহার সময়ের একটা অনুমান করিতে পারেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বলিবেন যে যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি কচুরায়ের সময়ের হইতে পারে না, সে মূর্ত্তিতে যে হস্ত পদ নাই, তাহাও প্রকৃত সত্য। সকলেই দূরে বসিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বচক্ষে দেখিয়া ধীরভাবে ভাবিয়া লিখিবার প্রথা এখনও বিশেষভাবে বঙ্গদেশে আসে নাই। বঙ্গে ইতিহাস উদ্ধারের ইহাই প্রধান অন্তরায়। বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড, ৪৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আমাদি গ্রামের পরীমালা দেবী। ১৬১ পৃঃ

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি এ প্রসঙ্গেউল্লেখ করা যাইতে পারে। যশোহর খুল্‌নায় ৺কালীবাড়ী নাই এমন কোন প্রধান স্থানই নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ দেবীস্থান পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদি গ্রাম এক্ষণে সুন্দরবনের উত্তর সীমায় কপোতাক্ষকূলে অবস্থিত প্রাচীন যুগে ইহা একটী প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান যুগের অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। তাহার বিষয় যথাস্থানে বর্ণনা করা যাইবে। আমাদি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অতি পূর্ব্বকালে ইহা আমদ্বীপ (আম্রদ্বীপ) বা আমাদ অর্থাৎ পিশাচ-গণের বাসভূমি ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে কিনা বলা যায় না। যাহা হউক এই গ্রামে বা ইহার সন্নিকটে কোথাও পরীমালা দেবী পূজিত হইতেন। পরে কোনও বার সুন্দরবনের নিমজ্জনে উহার মন্দিরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং দেবী মূর্ত্তি ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ উহা প্রথম বিপ্লবে হয়। পরে উহার উপর দিয়া বহু শতাব্দী চলিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে ভূগর্ভ হইতে পরীমালা দেবীর উদ্ধার সাধিত হইয়াছে।

প্রবাদ এই যে টাকীর জমীদারগণ যখন জামিরা পরগণার মালিক হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ৺গোবিন্দ দেব রায় চৌধুরী স্বপ্নাদিষ্ট হন। তদনুসারে তাঁহার লোকে কয়ড়া নদীর কূলে নারায়ণপুর গ্রামে ভূমি খনন করিয়া, একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পান। বহুকাল পর্য্যন্ত লবণাক্ত কর্দ্দমে কঠিন প্রস্তরেরও বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। তবুও মূর্ত্তিটী যে নরমুণ্ডমালিনী দেবী তাহা বুঝা যায়। উক্ত রায় চৌধুরী মহোদয় এই প্রতিমা আনিয়া আমাদি গ্রামে উহার স্থাপনা করেন। দেবীমূর্ত্তির জন্য একটী ছাদওয়ালা মন্দির প্রস্তুত হয়, উহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া পুষ্পোদ্যান রচিত হয়; নহবৎখানা প্রস্তুত হয় এবং সেবার সর্ব্ববিধ ব্যাপারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বাঁকার নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামনিবাসী ৺কালীনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতের উপর স্বপ্নাদেশ অনুসারে যথাবিধি পূজার ভার অর্পিত হয়।* তিনি মূর্ত্তির দেবতা নির্ণয় করিয়া উহার পূজা আরম্ভ করেন।

* কিছু দিন পরে ৺কালীনাথ চক্রবর্ত্তী আমাদী গ্রাম নিবাসী ৺শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে

যাঁহাকে সাধারণ লোকে পরীমালা বলিয়া জানে, তিনি চামুণ্ডা দেবী। চণ্ডমুণ্ড অসুরের নিপাত জন্য মহাদেবী এই করালবদনা চামুণ্ডা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদিতেও দেবী মূর্ত্তির নিম্নলিখিত "চামুণ্ডা" ধ্যানে পূজা হয়ঃ—

ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা॥
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতাদিঙ্‌মুখা।
ওঁ ক্রীং হ্রীং চামুণ্ডারূপায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥*

এই মূর্ত্তিটি একখানি ২´—৩´´×১´—১০´´ প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ ছিল। মূর্ত্তির চারিখানি হস্ত। নরমুণ্ডমালার একটু একটু চিহ্ন আছে। নিম্নে অসুরাদি অঙ্কিত ছিল বুঝা যায়। বক্ষের উপর দুইটি শূন্যগর্ভ প্রস্তরপিণ্ড আছে, উহা স্তনযুগল ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু দেহের অনুপাতে উহার অস্বাভাবিক আকার ও মধ্যে ফাঁপা দেখিয়া কেমন সন্দেহ হয়। মস্তকে প্রস্তরের মুকুট ছিল, সমগ্র প্রস্তরখানি প্রায় দুই মণ ভারী হইবে। অতিকষ্টে প্রস্তরখানিকে দরজার বাহিরে আনিয়া ফটো লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট এবং অতিরিক্ত মসী ও তৈল সঞ্চয়ে বিকৃত যে ইহার ভাল ফটো হয় নাই।

পৌরহিত্যে প্রতিনিধি রাখিয়া যান। এই গাঙ্গুলী বংশের দৌহিত্র-কুলোদ্ভব শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক্ষণে পুরোহিত আছেন। পূর্ব্বোক্ত জমিদার মহাশয়গণ মায়ের পূজার জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ৫৬৷৵০ রাজস্বের একটী নির্দ্দিষ্ট তালুকে পরিণত হইয়াছে এবং উহাতে ১৫০৲ টাকার অধিক আয় আছে। এক সময়ে রাজস্বের অনাদায় জন্য এই তালুক বিক্রীত হইবার উপক্রম হইলে, আমাদি নিবাসী শ্রীসারদাচরণ সিংহ ও মহেন্দ্রনাথ সিংহ টাকা আমনত করিয়া দিয়া বিষয় রক্ষা করেন; তাহার ফলে তাঁহারা তালুকের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিতেছেন। সুতরাং এখনও বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু মায়ের পূজার অবস্থা তেমন নাই। এখনও বহু দূরবর্ত্তী স্থানের লোক এখানে পূজা দিতে আসে, কিন্তু দেবায়তনের তেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুরোহিতের তেমন পূজার ব্যবস্থা এখন আর নাই।

* মার্কণ্ডের চণ্ডীতে চণ্ডমুণ্ডবধাধ্যায়ে এই চামুণ্ডাদেবীর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থানেই দেবীর এই ধ্যান আছে। আমাদিতে যে ধ্যানে পূজা হয় তাহাতে যে বীজ মন্ত্র আছে, তাহা ঠিক কিনা বলিতে পারি না। অন্যত্র চামুণ্ডাবীজ ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ, —এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

তাহা হইলেও যে ছবি প্রদত্ত হইল, উহা হইতে দেবী মূর্ত্তির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে এবং উহার ভাস্কর্য্য যে অতি প্রাচীন যুগের তাহাও অনুমিত হইতে পারিবে। যাজপুরে বৈতরণী তটে যে চামুণ্ডা দেবীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রেব অমর লেখনীর মুখে যে "বিশুস্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা, পলিতকেশা, নগ্নবেশা, খণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডার" ধ্যানমূর্ত্তি * ফুটিয়া উঠিয়াছে, এখানেও সেই একই দেবীবিগ্রহ সুন্দরবনের মৃত্তিকার দোষে বিকৃত হইয়াছেন।

খুল্‌না জেলার বাগেরহাট উপরিভাগে বাগেরহাট সহর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে পাণিঘাটে এক অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি আছেন। পাণিঘাট অতি প্রাচীন স্থান এবং এই ক্ষুদ্রকায় দেবীমূর্ত্তিও আদিযুগের বলিয়া অনুমান করা যায়। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী মত আছে। আমরা প্রথমতঃ সেই দুই গল্প বিবৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। পাণিঘাট এক্ষণে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদের চিরুলিয়া পরগণার অধীন। এখানে মায়ের মন্দির ভৈরব নদের কূলে অবস্থিত। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় লোকে বলেন যে পুরোহিত বংশের ৮।১০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ৺রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান কালীবাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নদীকূলে ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রবাদ এই—তখন এখানে সুন্দরী, পশূর প্রভৃতি বৃক্ষও ছিল। রাজীবের স্ত্রী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া রাজীব একটি ঔষধের অনুসন্ধানে এই বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পান ও তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া পড়েন। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একটী অব্যর্থ ঔষধ দেন ও বলিয়া দেন যে তাঁহার একটী কন্যাসন্তান হইবে এবং সন্ন্যাসী যে সেখানে আছেন তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সন্ন্যাসী যেমন বলিয়াছিলেন, রাজীবের একটী কন্যাসন্তান হইল। তখন সন্ন্যাসীর প্রতি রাজীবের অত্যন্ত ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি প্রত্যহ গোপনে সন্ন্যাসীর নিকট যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার কৃপা লাভে দীক্ষিত হইয়া প্রায় ছয়মাস কাল তন্ত্রাদি শাস্ত্রীয় উপদেশ সন্ন্যাসীর নিকট লাভ করেন। এমন সময় বাৎসরিক শ্যামাপূজার দিনও নিকটবর্ত্তী হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন "রাজীব! তোমাকে এই স্থানে একখানি কালীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে

* সীতারাম, ১ম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

হইবে।” রাজীব দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজার আয়োজন করিতে ভয় পাইলেন দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন “তুমি মৃত্তিকা আনিয়া দাও, আমি মূর্ত্তি গড়িয়া দিব, তুমি পুষ্পপত্রে পূজা করিবে মাত্র।” তাহাই হইল। সন্ন্যাসী স্বহস্তে কালীমূর্ত্তি গড়িয়া দিলেন, রাজীব উপদেশ মত পূজা করিলেন। কিন্তু পূজান্তে সন্ন্যাসীর আদেশমত প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইল না। রাজীব বলিলেন,“কোন অনাদি মূর্ত্তি ব্যতীত কি পীঠস্থান হয়?” তদুত্তরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে নদীগর্ভে একটী স্থানে ডুব দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা তুলিয়া আনিতে বলিলেন। রাজীব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ডুব দিয়া এক অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী কালীমূর্ত্তি পাইলেন। পরে উহাই তন্ত্রোক্ত আসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজাপদ্ধতি প্রচলন করিলেন। তদনন্তর সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন।

রাজীবের একটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। পুত্রটি পূর্ণবয়স্ক হইয়া যোগ শিক্ষাকালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যা হইতে রাজীবের দৌহিত্রবংশ ছিল। সে বংশের শেষ বংশধর রামানন্দ চক্রবর্ত্তী ৪।৫ বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামের বংশ আছে। শ্রীরামের দুই পুত্র,— রামদেব ও রামকান্ত। রামদেবের বংশের অধস্তন তারাপদ চক্রবর্ত্তী এবং রামকান্তের বংশের ১০২ বৎসর বয়স্ক রামবিষ্ণু চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান। দুঃখের বিষয় ইঁহারা পূর্ব্বপুরুষের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত জানেন না।

অষ্টাদশভূজার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবরণ ৺কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম-প্রণীত “দ্বিগঙ্গা রাজবংশম্” নামক সংস্কৃত পুঁথি এবং ৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত “বাসুকী-কুলগাথা” নামক বাঙ্গালা পুঁথি হইতে জানা যায়।* উভয় পুঁথিতে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। বিশেষতঃ বাসুকীকুলগাথায় বহুস্থানে তারিখ দেওয়া হইয়াছে এবং তারিখগুলি ঐতিহাসিক তারিখের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এই পুঁথি অনুসারে দ্বিগঙ্গা † সেন বংশীয় রুদ্র নারায়ণ বরিশালের

---

* এই দুইখানি পুঁথিই সম্প্রতি (খুল্‌না) মঘিয়ার রাজবংশীয় বাসুকীকুলপ্রদীপ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের জন্য উভয় পুঁথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

† এই গ্রাম সর্ব্বপ্রথমে এই সেনবংশের কুলপুরুষ রমানাথ মহারাজ আদিশূরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। পুঁথিতে আছে:—

“ভাগীরথী নদীতীরে দীর্ঘ গঙ্গা গ্রাম
সর্ব্বস্থানে দ্বিগঙ্গা বলিয়া ঘুষে নাম।

অন্তর্গত রায়ের কাঠিতে এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজা উপাধি পান।* রুদ্র-নারায়ণের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে গন্ধর্ব্বনারায়ণ সর্ব্বকনিষ্ঠ; তিনি অংশমত চিরুলিয়া পরগণা প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রাজচন্দ্র অল্পবয়সে সান্নিপাত জ্বরে অজ্ঞান হন এবং রাজবৈদ্যেরা তাঁহার জীবনসঞ্চার করিতে পারেন না। এমন সময় হঠাৎ এক সন্ন্যাসী আসিয়া সেই মৃত কুমারকে ডাকিবা মাত্র তাহার চৈতন্যোদয় হয়, এবং সন্ন্যাসী তাহাকে ডাকিয়া নদীর কূলে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যান। রাজা রাণী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে "পাণি আন" বলিয়া ছিলেন। দীক্ষান্তে সন্ন্যাসী পুনরায় পঞ্চম বৎসরে মহাষ্টমী দিনে সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া অন্তর্ধান হন। ক্রমে গল্প যত রটিল, এই স্থান বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

"বহু লোক সমাগমে তথা হইল হাট
তদবধি সে স্থানের নাম পাণিঘাট"

অল্পদিন পরে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গন্ধর্ব্বের লোকান্তর হইল† এবং রাজচন্দ্র পরে পঞ্চম বর্ষে মহাষ্টমীর দিনে সেই স্থানে সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে গোপাল, বাসুদেব, শ্যামরায়, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি কতকগুলি দেববিগ্রহ দিয়াছিলেন; এবং সর্ব্ব শেষে—

সুন্দর সে গ্রামখানি কি শোভা তাহ তে,
সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে।"

এই দ্বিগঙ্গা কোথায় তাহা নির্ণয় করা যায় না। ২৪ পরগণা জেলায় বারাসত উপবিভাগে এক দ্বিগঙ্গা আছে; তাহা প্রাচীন স্থান বলিয়া বোধ হয়; যেখানে প্রকাণ্ড দীঘি ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। কিন্তু উহার গঙ্গা নদীর উপর নহে। গঙ্গানদী হইতে উহার দূরত্ব ১০ ১২ মাইল হইবে। এই দ্বিগঙ্গা একসময়ে বঙ্গের একটি প্রধান স্থান ছিল। অন্য প্রসঙ্গে ইহার সমালোচনা করা যাইবে। বিভারিজ সাহেব দ্বিগঙ্গাকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বলিয়াছেন।

* রমানাথ সেনকে প্রথম পুরুষ ধরিলে ১৯ পর্য্যায়ে রুদ্র নারায়ণ। ইনি "বাণঋতু বাণ-শশি শকের বৈশাখে" রায়ের কাঠিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কালী মন্দিরের শিলালিপি হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। see Beveridge, History of Bakargunj. p. 121

† "গ্রহবাণ ঋতু শশধর শক পৌষে
রাজা রাণী স্বর্গে যান অত্যন্ত হরষে।"

গ্রহ=৯, বাণ=৫, ঋতু=৬, শশধর=১, ইহাকে উল্টাইয়া লইলে ১৬ ৫৯ শক বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

"পরে গুরু অন্য এক মূর্ত্তি দিল ফিরি
বাহির করিল মূর্ত্তি জটাজাল চিরি॥
অষ্টাদশভুজা আদ্যাশক্তির প্রতিমা।
তাঁহার রূপের কথা দিতে নারি সীমা॥"

এবং সে মূর্ত্তি পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দেন। সন্ন্যাসীর নাম ব্রহ্মাণ্ড গিরি।

রাজচন্দ্র তখন রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম নামক তাঁহার কুল-পুরোহিত ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকিয়া, পাণিঘাটে বটমূলে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

উপরি লিখিত বিবরণ হইতে দেখা গেল, যে পাণিঘাটে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের পর হইয়াছে। পুরোহিতদিগের বিবরণ হইতে দেখা যায়, রাজীবের পর তাঁহারা ৮।১০ পুরুষ বাস করিতেছেন। এই পুরোহিত-বংশ যেরূপ দীর্ঘায়ু, তাহাতে অনুমান করা যায় যে ১০ পুরুষে ৪০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাজীব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পাণিঘাটের নাম ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যখন রাঙ্গদিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি দ্বীপের সৃষ্টি হইতে ছিল, সে সকল স্থানে কোন বসতি হয় নাই, উহার দক্ষিণ দিয়া পশর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান জলমগ্ন ছিল, তখনও পাণিঘাটের নাম শুনা যায়। পাণিঘাট হইতে পশর নদীর পার্শ্ববর্ত্তী কুড়লতলা পর্য্যন্ত একটি খেয়া পড়িত, ইহার এক খেয়া দিতে এক দিন লাগিত। তখন এই দিকে ভৈরবের দক্ষিণে ও পশরের পূর্ব্বে কোন বসতিস্থান ছিল না। খুল্‌না জেলায় এ কথা অনেকস্থানে সাধারণ প্রবাদবাক্য পরিণত হইয়া রহিয়াছে। দেশের প্রকৃতি দেখিলেও তাহা অনুমান করা যায়। ইহাতে ভূতের গল্প কিছু নাই। লোক-পরম্পরাগত এই সকল প্রবাদ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাণিঘাটের নামোৎপত্তি হইয়াছে, একথা স্বীকার করা যায় না অথচ পুঁথিগত তথ্যের ও একটা ভিত্তি থাকা সম্ভব।

সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, পাণিঘাট অতি পুরাতন স্থান। সেন রাজগণের রাজত্ব কালেও এখানে দেবীপীঠ ছিল।

পাণিঘাটের অষ্টাদশ ভুজা
দেবী মূর্ত্তি ১৬৬ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

পরে পাঠান আমলের প্রাক্কালে এ অঞ্চলে যে বিপ্লব হয়, তাহাতে এ প্রদেশ বসিয়া গিয়া ভীষণ জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়ে। পাঠান আমলের মধ্যভাগে পুনরায় এ দেশ আবাদ হইয়া লোকের বসতি হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন খাঁ জাহানালি বাগের হাটে এক শাসন-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান খুল্‌নার পূর্ব্ব হইতে ভৈরব-কূল দিয়া বসতি স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অংশে ভৈরবের কূলবর্ত্তী গ্রাম সমূহের আদিম অধিবাসীদিগের বংশ-বিবরণ হইতে এই একই. কথা সপ্রমাণ হয়; যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই সকল আদিম "বাসিন্দা"-দিগের সময়ে পাণিঘাটে দেবীমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া বিশ্বাস। পূর্ব্বকাল হইতে দেবীমূর্ত্তি এই স্থানেই জঙ্গলের মধ্যে নদীর কূলে বা গর্ভে ছিল। এক সন্ন্যাসী আসিয়া সে মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। পুরোহিতগণের বিবরণেও তাহাই আছে; সন্ন্যাসী জঙ্গলের মধ্যে এক পশুর বৃক্ষের তলে বসিয়া ছিলেন, তিনি রাজীবকে নদীতে নামিয়া দেবীমূর্ত্তি উঠাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সন্ন্যাসী জটাজাল চিরিয়া দেবীমূর্ত্তি বাহির করিলেন, একথা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রায় ৬৷৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট প্রস্তরময়ী ভারী দেবীমূর্ত্তি জটাজালের মধ্যে লুকাইয়া রাখা যায়, এবং জটাজাল চিরিয়া তথা হইতে বহুদিনের স্থাপিত মূর্ত্তি বাহির করিতে হয়, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পুঁথিতে আছে শুধু এমূর্ত্তি নহে, সন্ন্যাসী আরও অনেক মূর্ত্তি দিয়া যান। দ্বাদশ গোপাল, বাসুদেব, শ্যামরায়, কালাচাঁদ ঠাকুর, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত বিগ্রহগুলিও ব্রহ্মাণ্ডগিরি সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে দেন।* হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ নদীর জল পর্য্যন্ত ছিল, উহার মধ্যে সন্ন্যাসী এই সকল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভৈরবের গর্ভ খাতে নানাস্থানে এরূপ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পাণিঘাটের নিকটবর্ত্তী লাউপালা গ্রামের পার্শ্বস্থ মরা ভৈরবের প্রাচীন খাতে জালিয়াদিগের জালে একটি চতুর্ভুজ

* দ্বাদশ গোপাল, বাসুদেব, শ্যামরায়
কালাচাদ ঠাকুর গুরু রাজচন্দ্রে দেয়।
লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ে করিল প্রদান
সে সব বিগ্রহগুলি প্রস্তর নির্ম্মাণ।

বাসুকী কুলগাথা. ৩৩ পৃঃ

বাসুদেব মূর্ত্তি উঠে। ঐ সুন্দর মূর্ত্তিটির মধ্যস্থানে কতকটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মূর্ত্তিটি ৺সখিচরণ দাস মোহান্ত কর্ত্তৃক লাউপালার গোপাল মন্দিরের বহির্দ্বারে দেওয়ালের ভিতর গাথিয়া রাখা হয়। উক্ত গোপাল বিগ্রহ ও এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সেও আজ দেড় শত বৎসরের কথা।

অষ্টাদশভুজার মূর্ত্তি দেখিলেও তাহা অতি প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্যের পরিচয় দেয়। অতি প্রাচীন কঠিন কষ্টি পাথরের প্রস্তুত হইলেও বহুযুগের কালধর্ম্মে ইহা অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

তান্ত্রিকগণ বলেন শতভুজা বা অষ্টাদশভুজা প্রভৃতি অধিক সংখ্যক ভুজ-বিশিষ্টা মূর্ত্তি হিমালয়ের উপরই নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইত, ক্রমে হিমাচল হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, তত হস্তসংখ্যা কমিয়া মায়ের মূর্ত্তি অষ্টভুজা বা চতুর্ভুজা ও অবশেষে দ্বিভুজা হইতে থাকে। কোন্ অনাদিযুগে এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া ক্রমে বঙ্গদেশের বহু পীঠস্থানে নীত ও স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মোট কথা কপিলেশ্বরী কালীমূর্ত্তি, যশোরেশ্বরী কালীমূর্ত্তি, আমাদির চামুণ্ডামূর্ত্তি এবং পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি যশোহব খুল্‌নার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জৈন বৌদ্ধ যুগ।

আমরা দেখিয়াছি অতি প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সাধুসন্ন্যাসীরা অন্যদেশ হইতে সে সকল স্থান দর্শন করিতে আসিতেন। উত্তরাপথ হইতে যখন ক্ষত্রিয়েরা দিগ্বিজয়ে আসিতেন, বঙ্গবাসীরা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন। মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; রঘুর সময়ে বঙ্গবীরগণ নৌযুদ্ধে অসামান্য রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতা বিস্তৃত হইতেছিল কিন্তু দেশ প্রকৃতভাবে আর্য্যভূমি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি,

ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি।"* তাঁহার মতে খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বা তদ্বৎ কোন কালে এ দেশে প্রকৃতভাবে আর্য্যজাতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই আর্য্যাধিকারের পূর্ব্বে পুণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতিগণ সমুদ্র-কূলবর্ত্তী বঙ্গের অধিবাসী ছিল। এখনও সমুদ্রকূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদেশে বহুসংখ্যক পুঁড়া বা পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া বা পোদ পুণ্ড্র শব্দের অপভাষা। ইহা ব্যতীত চণ্ডাল বা চান্দালগণ বরেন্দ্র হইতে আসিয়া উপবঙ্গের নানা স্থানে বসতি করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে নমঃশূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। যশোহর খুল্‌নায় বহুসংখ্যক নমঃশূদ্রের বাস। বাছাড় নামক ইহাদের এক থাক আছে। খুল্‌নার দক্ষিণাংশে বাছাড়েরা ধনধান্যে বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন। ইহাদের ব্যবহার্য্য দক্ষিণদেশীয় এক প্রকার শক্ত নাতিদীর্ঘ নৌকাকে বাছাড়ী নৌকা বলে। খুল্‌নার সর্ব্বদা জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য এই বাছাড়ী নৌকার চলন আছে। যশোহর জেলায় পুঁড়া বা খুল্‌নায় দক্ষিণাংশে পোদ, চণ্ডাল, বাগ্‌দি প্রভৃতি বহুজাতি বাস করে। ইহারাই এ মণ্ডলের আদিম অনার্য্য অধিবাসী। ইহারা লবণাক্ত জলাভূমিতে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া বাস করিতে সক্ষম।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যৌধেয় বা যাদব জাতি বঙ্গাধিকার করে। অশোকের শিলালিপিতে যৌধেয় ও রাষ্ট্রকূট জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ বহু রাষ্ট্রকূট জাতি যে অংশে বাস করে, তাহারই নাম হয় রাঢ় বা লাঢ়। প্রাচীন জৈন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। † মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস তাঁহার রাজসভায় ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গঙ্গারিডি গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ়ী শব্দের বিকৃতি মাত্র। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তিসৈন্যের ভয়ে অন্য রাজগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেকজেণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া সেইখান হইতে প্রস্থান

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০, "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ।
† আচারাঙ্গ সূত্র ১।৮৩, "গৌড়রাজমালা" ১ম পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করেন।” * সত্য মিথ্যা জানি না, তবে গঙ্গারিডি যে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল। † সুতরাং উপবঙ্গ বা যশোহর-খুল্‌না এই গাঙ্গরাষ্ট্র বা গঙ্গারিডিদেশেরই অংশ মাত্র। প্লিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে গঙ্গাসঙ্গমের পার্শ্বে একটি দ্বীপে মোদ্গালিঙ্গী জাতি বাস করিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বুড়ন, বাকলা, সন্দ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত এবং মোদ্গালিঙ্গী শব্দ মোলঙ্গী শব্দের নামান্তর। ‡ এই লবণাক্ত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ হইতে পূর্ব্বকালে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। ঐ লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যে একপ্রকার ভাণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা এবং যাহারা লবণ প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। এখন চব্বিশ পরগণা ও খুল্‌না জেলার দক্ষিণাংশে বহু সংখ্যক মোলঙ্গীর বাস আছে, কিন্তু তাহারা এক্ষণে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকারে বঞ্চিত।

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গারিডি রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল—গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া। ইহা সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় লিখিত পেরিপ্লাসে ও গঙ্গেবন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশে যাইত বলিয়া উল্লিখিত আছে। § আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ প্রবাল দ্বীপ নামে পরিচিত। ¶ গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া এই প্রবাল দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গঙ্গারেজিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ‖ আমাদের মনে হয় ইহা বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত নহে, প্রাচীন যশোর রাজ্যের

---

* বঙ্কিম চন্দ্রের “বাঙ্গালার কলঙ্ক” প্রবন্ধ, প্রচার ১২৯১, শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মেগাস্থিনের ভারত বিবরণ. ৭২ পৃঃ।

† তত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় এই রূপই অনুমান করিয়াছেন। “গৌড়রাজ-মালা, ২ পৃষ্ঠা।

‡ Pliny, *Historia Naturalis*, VI. 21. 8-23, মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ ১৯১ পৃঃ. বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১৩৫ পৃঃ।

§ The *Periplus* of *the Erythraean sea*, edited by Professor Wilfred H. Schoff of Philadelphia Museum.

¶ ১৩৫ পৃষ্ঠা।

‖ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১৪৫ পৃঃ

অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্ত্তী বারাশত হইতে হাসনাবাদ যাইবার রেলপথের পার্শ্বে দ্বিগঙ্গা নামক একটি স্থান আছে। ইহাকে কেহ দেগঙ্গা, কেহ দ্বিগঙ্গা বলে। সম্ভবতঃ উহা দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা এইরূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ। প্রকাণ্ড দীঘি এবং বহুদূর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ-মালা এখনও এস্থানের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহারই নিকটে দেউলিয়ায় চন্দ্রকেতু প্রভৃতি প্রাচীন রাজার কীর্ত্তিস্থান। ইহারই দক্ষিণে প্রাচীন বালবল্লভী রাজ্যের রাজধানী বালাণ্ডা অবস্থিত। মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ এই বিখ্যাত প্রাচীন স্থানে আসিয়া হিন্দুর উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী হাড়োয়াতে সেই অত্যাচারী প্রচারকগণের অন্যতম গোরাই গাজীর সমাধি আছে। দ্বিগঙ্গা বীরধর্ম্মী সেনবংশীয় কায়স্থগণের প্রথম নিবাস ছিল। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ; দ্বিগঙ্গা দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। এই দীর্ঘ গঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা ভাগীরথী তীরে ছিল বলিয়া "বাসুকী কুল-গাথায়" উল্লিখিত আছে। * ইহা প্রকৃত পক্ষে ভাগীরথীর কূলবর্ত্তী নহে বটে, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া যমুনার পদ্মা নাম্নী এক শাখা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন-কালে পদ্মা বা গঙ্গার নামের প্রভেদ লক্ষিত হইত না। মধুমতী নদীরও অপর নাম বড় গঙ্গা। † উক্ত সেনবংশীয়গণ এক সময়ে প্রবল শক্তিশালী ছিলেন। সুন্দরবনের উত্থান পতনে দ্বিগঙ্গা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বরিশাল ও খুল্না জেলায় রায়েরকাটি, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। এখনও তাঁহারা "দ্বিগঙ্গার সেন" বলিয়া বিশেষ সম্মানিত। এই দ্বিগঙ্গাই ছিল, "গঙ্গা রেজিয়া" বা গঙ্গাবন্দর—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীন যশোরের কতস্থান যে দেশে বিদেশে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার শেষ নাই।

বুদ্ধদেবের সমসময়ে গাঙ্গরাঢ় হইতে বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া সিংহল রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সিংহল পুরুষানুক্রমে এই সিংহদিগের অধিকৃত ছিল। "মহাবংশ" নামক সিংহল দেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই উপনিবেশ স্থাপনের বর্ণনা আছে। বাস্তবিকই

---

* ১৬৪ পৃষ্ঠা।

† নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতির বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের "অন্নদা মঙ্গলে" আছে :—পূর্ব্ব "সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।" ধূলিয়াপুর পরগণা মধুমতীর পূর্ব্বপারে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত

"ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি বাঙ্গালীর মত ঔপনিবেশিকতা দেখাইতে পারেন নাই।" উত্তরকালে সিংহলে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল, বাঙ্গালী বীর তাহার পথ দেখাইয়া ছিলেন। ভগীরথের শঙ্খনিনাদের অনুবর্ত্তী হইয়া যেমন গঙ্গা-স্রোত বহিয়াছিল, বঙ্গবীরের বিজয় শঙ্খনিনাদে তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবাহের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এইরূপে যাহারা ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম এবং মধ্যে দ্বিগঙ্গা প্রভৃতি নগরী তাহাদের প্রধান বন্দর এবং সদর স্থান ছিল। প্রাচীন যশোর ঔপনিবেশিকতায় বঙ্গদেশের বহু স্থানের অগ্রদূত হইয়াছিল।

এই ভাবে দেখা গেল আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের অনেক আভাস এখনও পাওয়া যায়। লুপ্ত গৌরবের কোন ক্ষীণাভাষ দিতে গিয়া যদি কোন গর্ব্বভঙ্গি প্রকাশ পায়, আমাদের বোধ হয় তাহাও মার্জ্জনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, "অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী। এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" * গঙ্গারেজিয়া যশোরে টানিয়া লইয়া, গঙ্গারাঢ়ের সহিত যশোহরের ঘনিষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতে গিয়া, যদি কোন দেশ-গৌরব প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া থাকি, তাহাতে বাঙ্গালীর কিছু অগৌরব হইবে না। গঙ্গারেজিয়ার মত আরও কত জিনিসই যে যশোহরের বক্ষে, খুল্‌নার কক্ষে টানিয়া লইতে হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। কত অনুমান, কত প্রমাণ তাহার পোষকতা করিবে। অনুমানও একপ্রকার প্রমাণ এবং তাহা অপ্রমাণ করিতে কাহারও বাধা নাই। উত্তেজনাই প্রমাণের পথ সুগম করে, ইতিহাসের সৃষ্টি করে। ইতিহাসই সারগর্ভ গর্ব্বের মূল; গর্ব্বিত জাতিরই ইতিহাস আছে। আমাদের আছে কি?

খৃষ্টের জন্মের ৬।৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে এক নূতন হাওয়া বহিয়াছিল। আর্য্যেরা ক্রমশঃ এদেশে আসিতে ছিলেন। প্রথমে ক্ষত্রিয়, পরে বৈশ্য, সর্ব্ব শেষে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলে বৈশ্যেরা আসিয়া পণ্য যোগাইতেন। এই ভাবে কতদিন গেল, দেশে ক্রিয়া কর্ম্ম রহিত

* বিবিধ প্রবন্ধে 'বাঙ্গালার ইতিহাস।' বঙ্গদর্শন, ১২৮১।

হইল ; তখন আবার ধর্ম্মভাব জাগিল। তখন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইল, ব্রাহ্মণ আসিলেন। সেই ধর্ম্মভাব, সেই যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণ আসিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় আর সে ক্ষত্রিয় ছিলেন না। অনার্য্যস্পর্শে ক্ষত্রিয়দিগের নানাবিধ অবনতি হইতেছিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া বসিতে বসিতে এক নূতন হাওয়া আসিল, বঙ্গবাসীর নবার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে ভাসিয়া গেল। সেন রাজগণের পূর্ব্বে আর তেমন ভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম জাগে নাই।

এ যুগে মগধই ভারতের ঐতিহাসিক কেন্দ্র। ধর্ম্মই সে কেন্দ্রের মূল শক্তি। শুধু ধর্ম্মশক্তি নহে, সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিও সেখানে কেন্দ্রীভূত হইল। বঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রত্যঙ্গের কিছু মাত্র ঐতিহাসিকতা বুঝিতে গেলে, সে কেন্দ্রতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে নেমিনাথ প্রথম জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধে বিম্বিসারের রাজত্বকালে জৈন ধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ প্রাদুর্ভূত হন। * উভয় ধর্ম্ম প্রথমতঃ মগধেই প্রচারিত হয়। যদিও বুদ্ধদেব সম্বোধি লাভের পর স্বয়ং মগধের সীমা অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু তখন ইহা প্রচার ধর্ম্মের মত বঙ্গদেশে আসিয়াছিল কিনা বলা যায় না।

যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধ যুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথী হইতে পূর্ব্বমুখে সমতট কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং † তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে বুদ্ধদেব স্বয়ং কর্ণ সুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আসিয়াছিলেন এবং তিনি সমতটের রাজধানীর উপকণ্ঠে যেস্থানে সাতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করেন,

* ইঁহাদের উভয়ের জন্ম মৃত্যুর তারিখ লইয়া বহু তর্ক আছে। সাধারণতঃ গৃহীত হয় যে মহাবীর ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এবং বুদ্ধদেব ৪৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দেহত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে বহুমত আছে। See V. A. Smith's Early History, 2nd Edition, p. 42.

† এই পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ ও বানান লইয়া বহু মতভেদ আছে। Huen Tsang (Encyclopoedia), Hiuen Tsiang (V. A. Smith) এবং Thomas Watters এর সম্পাদিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংস্করণের উপক্রমণিকায় Professor Rhys Davids বহু গবেষণার পর Yuan Chwang এই উচ্চারণ স্থির করিয়াছেন। আমরা উহারই অনুবাদে ইউয়ান চোয়াং করিলাম।

তথায় মগধরাজ অশোকের সময়ে এক স্তূপ নির্ম্মিত হয়। ইউয়ান চোয়াং এ স্তূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোধ হয় বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই সমতটে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বেই জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে। জৈন গ্রন্থ হইতে জানা যায় নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন। জৈনগুরু পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ছোট নাগপুরে সমেত শেখরে তিনি সমাহিত হইলে, সেই পাহাড়ের নামই পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ হয়। এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখরে সমস্ত জৈন তীর্থঙ্করগণের সমাধি-মন্দির আছে। পার্শ্বনাথ পুণ্ড্র ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগমন করিয়া বহু লোককে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। জৈনগুরু মহাবীরের অন্য নাম বর্দ্ধমান। সম্ভবতঃ তাহা হইতে রাঢ়ীয় বর্দ্ধমান প্রদেশের নাম হয়। পুরাণাদির আলোচনা হইতে জানিতে পারা যায়—জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জনের সহিত বাঙ্গালীর সংশ্রব ঘটিয়াছিল। *

ইহা হইতে বুঝা গেল যে জৈন ধর্ম্মই প্রথম বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরে আসিয়াছিল। জৈন ধর্ম্মের প্রভাববশতঃ বৌদ্ধমত সহজে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই উভয় ধর্ম্ম পরস্পর এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত প্রবল সংঘর্ষ চলিয়া ছিল।

বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রুর রাজত্ব কালে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। অজাতশত্রুর পর শূদ্রজাতীয় নন্দবংশীয়েরা মগধের রাজা হন। এই বংশীয় মহানন্দের রাজত্ব কালে মাসিডনাধিপতি আলেকজেণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। (৩২৭—৩২৫ খৃঃ পূঃ)। মহানন্দের এক পুত্র চন্দ্রগুপ্ত। ইনি মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভজাত বলিয়া মৌর্য্য নামে খ্যাত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই জৈন ধর্ম্মের প্রবল প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং জৈন মতের পক্ষপাতী বলিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট 'বৃষল' আখ্যায় লাঞ্ছিত হইয়া ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ২৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। মহারাজ অশোকের শুদ্ধ শান্ত দেবান্তঃকরণের প্রবাহে, সেই রাজর্ষির ভিক্ষুমূর্ত্তির

* বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ।

আদর্শে এবং তাঁহার স্বরচিত * লিপিমালায় ও বহু শিলানুশাসনে ভারতবর্ষের বহু স্থান সুকীর্ত্তিত হইয়াছে। সে প্রবাহ বঙ্গে আসিয়াছিল, সমতটে আসিয়াছিল, যশোহর-খুল্‌নায় আসিয়াছিল। যখন পূর্ব্বদিকে চট্টলরাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, তখন সমতট বা যশোর প্রদেশেও বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউয়ান চোয়াং সমতটে যে বহুসংখ্যক সংঘারামের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে সব এবং অসংখ্য চৈত্য বা মন্দির এই যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধমতের এবম্বিধ প্রসার লাভের অনেক প্রমাণ আছে। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী প্রথম প্রমাণ; এখনও এদেশে বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, স্তূপাদির নিদর্শন আছে, সে সকল তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ; আর ভারতের অনেকস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম মরিলেও তাহা বঙ্গদেশে—যশোহর-খুল্‌নায়, এখনও সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, এখনও প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করিয়া পূর্ব্বচিহ্ন বজায় রাখিয়াছে, ইহাই তাহার তৃতীয় প্রমাণ। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার আলোচনা করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—গুপ্ত সাম্রাজ্য।

২৩১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই তদ্বংশীয়দিগের রাজত্ব শেষ হয়। পরবর্ত্তী প্রায় পাঁচ শত বৎসর ভারতবর্ষ নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া সুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্র প্রভৃতি রাজন্য দ্বারা শাসিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে মগধের গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার ছয় বৎসর রাজত্বের পর ৩২৬ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র সমুদ্র গুপ্ত পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি বহু রাজ্য জয় করেন। সমুদ্র হইতে নেপাল, কামরূপ হইতে কর্ত্তৃপুর † পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ ও মধ্যভারত তাঁহার রাজ্য সীমার অন্তর্গত ছিল। প্রয়াগে বর্ত্তমান দুর্গ মধ্যে যে অশোক স্তম্ভ রহিয়াছে, তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেণ বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের এই দিগ্বিজয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়,

* Smith's Early History, pp. 178-9.

† Dr. Fleet হিমালয়ের পশ্চিমভাগে কুমায়ুন অঞ্চলে কর্ত্তৃপুরের স্থান নির্দ্দেশ করেন।

তিনি সমতট, ডবাক, নেপাল, কামরূপ ও কর্ত্তৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত নৃপতি কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইতেন। * এইস্থানে সমতটের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যশোহর-খুল্‌নার এই সমতটের অন্তর্গত। সমতট ভাগীরথী হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত সমুদ্র কূলবর্ত্তী প্রদেশই সমতট। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বঙ্গ এবং পদ্মার উত্তর পারে বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান লইয়া ডবাক রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ডবাক হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। † এতদনুসারে পূর্ব্ববঙ্গ ডবাক হইলে, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলা লইয়া প্রধানতঃ সমতট গঠিত হয়, ধরা যাইতে পারে। তবকাত্‌-ই-নাসিরি গ্রন্থে সমতটকে সন্‌কট বা সাঁকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সমতট সমুদ্র গুপ্তের সময়ে একটি সীমান্ত রাজ্য; ইহার অধিপতিগণ সামন্ত রাজা হইলেও তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এমন বলা যায় না।

সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ উজ্জয়িনীরাজ যশোধর্ম্ম দেব বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া এই গুপ্ত নৃপতিকেই নবরত্ন সভার অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। ‡ কারণ চন্দ্রগুপ্ত ও উজ্জয়িনী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দিল্লীতে কুতব মিনারের সন্নিকটে পিথোরা দুর্গ-প্রাঙ্গণে যে এক লৌহস্তম্ভ আছে, তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে চন্দ্র নামধেয় এক রাজার কথা পাওয়া যায়; তিনিও এই চন্দ্রগুপ্ত হইতে পারেন। তিনি বঙ্গ বা সমতট রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। § চন্দ্র গুপ্তের পর তৎপুত্র কুমার গুপ্ত (৪১৩—৪৫৫) ও পরে কুমার

---

* 'সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত নৃপতিভিঃ সর্ব্বকরদানাজ্ঞা করণ প্রণামাগমন-পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য।'' Fleet's Gupta Inscriptions, p 6, গৌড় রাজমালা, ৪ পৃঃ, J. R. A. S., 1898 p. 198, Smith's Early History pp. 270-1.

† Early History, p. 271, বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, p. 148.

‡ Early History p. 287, J. R. A. S. 1901, p. 579, 1903 p. 551.

§ পার্শ্ববর্ত্তী এক প্রাচীর গাত্রে নানা ভাষায় ঐ প্রশস্তির যে সকল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংরেজী ভাষায় আছে :—"He on whose arm fame was inscribed by the sword when in battle in Vanga countries (Bengal). He kneaded and turned back with his breast the enemies that united together came against him." এই ইংরাজী অনুবাদে প্রশস্তির সময় খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ও ৩৭৫ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

স্কন্ধ গুপ্তের পর কয়েক জন গুপ্ত সম্রাট্ রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই হীনবীর্য্য ছিলেন। এই সময়ে পশ্চিম ভারতে দুদ্ধর্ষ হূণদিগের প্রবল আক্রমণ হয়। মালবের যশোধর্ম্মদেব উহাদিগকে নিরস্ত করিয়া, এক প্রবল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গুপ্ত নৃপতিদিগের মত "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রশস্তি হইতে জানা যায় তিনিও ব্রহ্মপুত্র নদ সীমা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট দিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। * যশোধর্ম্মের পর কান্যকুব্জের অধীশ্বরগণ উত্তর ভারতে সার্ব্বভৌম নৃপতি হন। কিন্তু এই সময়ে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বদেশ অধিকার করিয়া লন। সুতরাং সমতটও তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে।

শশাঙ্ক সবিক্রমে কান্যকুব্জ অধিকার করেন এবং অন্যায় ভাবে সম্রাট্ রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা সাধন করেন। শশাঙ্ক ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং মগধ ও কনৌজের বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়ান। তিনি বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম উৎপাটিত করেন, তথায় শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মগধে বৌদ্ধদিগের যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। † কিন্তু অচিরে অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গ হইতে সমগ্র উত্তরাপথের আধিপত্য রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের হস্তগত হইয়া পড়ে। কোন বিদ্রোহী রাজন্যের আবির্ভাব না হওয়াতে এবং পরাক্রান্ত নৃপতির মধুর শাসনের ফলে আবার কিছু কালের জন্য দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে মগধের অন্তর্গত নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিশ্ব পৃষ্ঠে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়া প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় নামের উপযুক্ত হইয়াছিল। শীলভদ্র নামক একজন বাঙ্গালী-কুলতিলক মহাপণ্ডিত এই সময়ে নালন্দ বিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং তাঁহারই শিষ্যরূপে পাঁচ বৎসর কাল যাবতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা

---

* গৌড়রাজমালা ৫পৃঃ, Fleet's Gupta Inscriptions, p. 146. Smith's Early History p. 301

† কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন যে বোধিদ্রুম-বিনাশক শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক একব্যক্তি নহেন। কর্ণসুবর্ণরাজ সমতটের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু তথায় কোন বৌদ্ধমূর্ত্তির উপর কিছুমাত্র অত্যাচার করেন নাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১০৩—১১০ পৃঃ।

করিয়া "মহাযান দেব্" উপাধি লাভ করেন। ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর কাল ইউয়ান চোয়াং ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়া এক বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। উহার মধ্যে তাঁহার সমতটের বিবরণী হইতে আমরা যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

গুপ্ত রাজগণ হিন্দু তান্ত্রিক এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। স্কন্ধ গুপ্তের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মতি আকৃষ্ট হয়। বালাদিত্য বৌদ্ধ ছিলেন। সমুদ্র গুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশে যেখানে যে সকল সুন্দর চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার কতক এই যুগে এবং কতক পরবর্ত্তী সেন রাজত্ব কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ শ্রমণে যে চির বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, গুপ্তযুগে হিন্দুরা কতক বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ায় তাহার মীমাংসা হইয়া আসিতেছিল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মের বহু মত-বিপর্য্যয় হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষণ সম্রাট্ কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের এক মহাসম্মিলনে বৌদ্ধধর্ম্ম দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। নাগার্জ্জুন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য কতকগুলি হিন্দু দেবদেবী স্বীকার করিয়া যে উদার বৌদ্ধ মতের প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই হইল মহাযান। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধ দেবের প্রচারিত মতে যাহারা বিশ্বাসবান রহিলেন, তাঁহারাই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। ইহাকে প্রাচীন বা স্থবির মতও বলে। কালে ইহার সহিত মহাযান মতের কতকটা সংমিশ্রণে স্থবির মহাযান মত হইয়াছিল। কণিষ্ক স্বয়ং মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন এবং তখন হইতে মহাযানেরই আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ক্রমে বসুবন্ধু নামক বৌদ্ধমুনি পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও মন্ত্রাদি মহাযানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। তখন হইতে নাগার্জ্জুনের মতের নাম হইল মাধ্যমিক ও বসুবন্ধুর প্রবর্ত্তিত নব মহাযান মত যোগাচার নামে অভিহিত হইল। এই ভাবে হিন্দু তান্ত্রিকতা যত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, হিন্দু দেবদেবী যত বৌদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন, ততই হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মে একটা মিলন হইয়া গেল। বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের দশ-অবতারের অন্তর্গত হইয়া পড়িলেন। পরবর্ত্তী কালে পুরুষোত্তমে বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্ম—বৌদ্ধদিগের এই ত্রিমূর্ত্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসী দ্বারা সমভাবে পূজিত হইতে লাগিলেন।

হিন্দু তান্ত্রিকতা বৌদ্ধধর্ম্মে এমন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, দেবদেবীর সংখ্যা যেন হিন্দুদিগের অপেক্ষাও বৌদ্ধধর্ম্মে অধিক হইবার উপক্রম হইল। ইহাই দেখিয়া হিন্দুদের প্রাচীন আগম শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। হিন্দু তান্ত্রিকতা আবার জাগিয়া উঠিল। নানা স্থানে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। গুপ্ত সম্রাট্গণ এই হিন্দু তান্ত্রিকতার পুনরুত্থান যুগে তদীয় প্রবল পৃষ্ঠ-পোষক হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন সতীর ছিন্নদেহ হইতে যে সকল পীঠমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই যুগেই হয়। আমাদের মনে হয় সে সকল পীঠমূর্ত্তি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। তবে সেই পীঠস্থানগুলিতে এই যুগে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া রীতিমত পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া বিশেষ সম্ভবপর। হিন্দুধর্ম্ম এই সকল উপায়ে বৌদ্ধপ্লাবিত দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতে-ছিল। গুপ্তযুগে পীঠ দেবতা ব্যতীত অন্য বহু সংখক দেবদেবীর পূজা হইতে থাকে। পাণিঘাটের অষ্টাদশভুজা বা আমাদির চামুণ্ডা মূর্ত্তি এযুগের হওয়া অসম্ভব নহে।

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধমত নিষ্প্রভ করিয়া শৈব মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাচীর দ্বারা সমাবৃত করিয়া শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। শশাঙ্ক বৌদ্ধমতের বিপক্ষে দণ্ডায়-মান হইলেও বুদ্ধ মূর্ত্তির শত্রু হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তখন সমগ্র সমতট তদীয় অধীন ছিল। সেখানে তিনি কোন বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সময়ের প্রভাবেই শিবকল্প বুদ্ধদেব শিব হইয়া যাইতে ছিলেন, কোথায়ও তিনি দেবীপীঠে ভৈরব হইতে ছিলেন, কোথায়ও জীব বলি দিয়া তাহার অহিংসা মতের অবমাননা করা হইতেছিল। আমরা পরে ইহার অনেক প্রমাণ দিব। শাশাঙ্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থানে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে প্রসিদ্ধ অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব, কুশদহে যমুনাতটে লাউপালা নামক স্থানে পোড়া মহেশ্বর শিব ও জলেশ্বর নামক স্থানে জলেশ্বর শিব এই সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। জলেশ্বর একটি

প্রধান স্থান ছিল। এখানে এখনও শিবচতুর্দ্দশীর দিন বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে শিবের মন্দির নাই, লিঙ্গমূর্ত্তি পুষ্করিণীর জলমধ্যে নিমগ্ন আছে। শিব-চতুর্দ্দশীর দিন উপরে উঠান হয়। এই পুষ্করিণী হইতে যমুনাতট পর্য্যন্ত এক মাইল পথের দুই পার্শ্ব নানা ইষ্টকস্তূপ ও প্রাচীন ভিত্তিচিহ্নে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারবাজার প্রভৃতি স্থানে আরও কত শিবমন্দির ছিল, তাহা জানি না। মুসলমান বিজয় কালে হিন্দুর কত মন্দির যে কাল-কবলিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই।

এইযুগে সমতট ও কলিঙ্গের কত স্থান হইতে কত লোক সমুদ্রপথে বালী, লম্বক, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া শৈবমত প্রচার এবং বহু সংখ্যক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নব মত ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি সব জাতীয় লোকে স্পর্শ করিতে বা পূজা করিতে পারে, শিবপূজা সকলের কর্ত্তব্য, ইহাতে অধিকারী ও অনধিকারীর ভেদ নাই, দীক্ষিত না হইলেও বালক বালিকায়ও ইচ্ছামত জলে, ফুলে, বিল্বদলে শিবপূজা করিতে পারে—এই উদার পদ্ধতি হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এ অঞ্চলে লোকে এত শৈব-মতালম্বী হইয়াছিল যে সকলে শিবপূজা করিত, শিব কথা কহিত, শিব গীত গাহিত, এবং শিবের তত্ত্বকথা এমন ভাবে সকল বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল যে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত"—এ দেশের একটি প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে।

এই ভাবে দেখিতে পাই গুপ্ত রাজগণের ও শশাঙ্কের রাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাধান্য সমতটের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের তান্ত্রিকতা তাঁহাদের সকল কার্য্যে প্রতিফলিত হইত, তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রাতেও ইহা প্রকটিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি ছিল, সমুদ্র গুপ্তের মুদ্রায় যজ্ঞাশ্বের প্রতিকৃতি আছে। যশোহর জেলায়ও ইঁহাদের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কতদূর তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা হইতেও তাহা এক-প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার উত্তরাংশে মহম্মদপুরে এলেংখালি বা মধুমতী নদীর সন্নিকটে একটি কূপখনন কালে এক ব্যক্তি মৃৎপাত্রে কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। ঐ মুদ্রাগুলি তৎকালীন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট F. L. Beaofort সাহেবের হস্তে পড়ে। তিনি তাহা

এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলির কতকগুলি চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত রাজগণের মুদ্রার মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার তিনটি মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। * এই তিনটি মুদ্রায় একটি কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের, দ্বিতীয়টি কোন পরবর্ত্তী গুপ্ত নৃপতির এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে এখনও কোনও স্থির মত ধার্য্য হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সমতটে চীন-পর্য্যটক।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে ৪০০ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান নামক একজন চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং মূর্ত্তি সংগ্রহই তাঁহার প্রধান সাধনা ছিল, সুতরাং তাঁহার বিবরণীতে দেশের কোন বিশেষ ইতিহাস নাই। তিনি সমতটে আসেন নাই, সাধারণভাবে ভারত-বাসীর চরিত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে সুবিখ্যাত ইউয়ান চোয়াং এদেশে আসেন। তিনি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাল মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার বিরাট্ বিবরণীতে ভারতের তাৎকালিক ইতিহাস সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কথা আছে। তিনি ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সমতটে আসেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমস্ত উপবঙ্গ বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। † তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, তিনি "কামরূপ হইতে দক্ষিণ মুখে ১২।১৩ শত লী ভ্রমণ করিয়া সমতট দেশে উপনীত হন। এই দেশ সমুদ্রকূলে অবস্থিত বলিয়া নিম্ন এবং আর্দ্র। ইহার পরিধি ৩০০০ লী এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ২০লী হইবে। এদেশে ৩০টির অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম এবং বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের ২০০০ এর অধিক

---

* Notes on three ancient coins found at Mahammadpur in the Jessore District, J. A S. B. 1852 Vol. XXI, p. 401.

† Cunningham's Ancient Geography p. 593.

শ্রমণ ছিলেন। শতাধিক দেবমন্দির ছিল এবং নানা মতাবলম্বী লোক যেখানে সেখানে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিত। এদেশে দিগম্বর নিগ্রন্থ জৈনদিগের সংখ্যাও যথেষ্ট। রাজধানীর সন্নিকটে একটি অশোকস্তূপ ছিল; এই স্থানে বুদ্ধদেব স্বয়ং ৭ দিন পর্য্যন্ত দেব-মানব-সকাশে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত চারিজন বুদ্ধের কর্ম্মক্ষেত্র ও আশ্রমের চিহ্নও বর্ত্তমান ছিল। রাজধানীর সন্নিকটে একটি বৌদ্ধমঠে বুদ্ধদেবের আট ফুট উচ্চ একটি গাঢ় নীলবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি ছিল। ইহাতে বুদ্ধমূর্ত্তির যাবতীয় বিশিষ্ট চিহ্ন প্রকটিত ছিল এবং মূর্ত্তি হইতে বিস্ময়করী শক্তি বিকীর্ণ হইত। পর্য্যটক অবশেষে ক্রমান্বয়ে সমতটের সন্নিকটবর্ত্তী ৬টি দেশের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি এ সকল দেশ স্বয়ং পরিদর্শন করেন নাই; তিনি উহাদের সম্বন্ধীয় বিবরণ সমতটের রাজধানীতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" * ইউয়ান চোয়াং সমতট সম্বন্ধে আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে এই স্থানের ভূমি উর্ব্বরা, লোক সকল ক্ষুদ্রাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি। চৈনিক সাধু এদেশে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। †

সমতট যে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে চীনপর্য্যটকের বিবরণ হইতে ইহার রাজধানীর অবস্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইউয়ান চোয়াং যে দূরত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সমতটের রাজধানী গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত; উহা তাম্রলিপ্তি হইতে ৯০০ লী পূর্ব্বে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পর্য্যটক কামরূপ হইতে ১২।১৩ শত লী দক্ষিণে আসিয়া সমতট রাজ্যে পড়েন। ৬ লী এক মাইলের সমান ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এই হিসাবে দূরত্ব মাপিয়া নানাজনে এই রাজধানী নানাস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। ফার্গুসন বলেন সমতটের রাজধানী সোণার গাঁও বা সুবর্ণগ্রামে ছিল; ওয়াটার্স (Watters) সাহেব বহু গবেষণা করিয়া বলিতেছেন যে ইহা ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত, কোথায় তাহা দূরে

---

* Thomas Watters on Yuan Chwang, Vol. II., p. 187.

† Beal's Buddhist Records pp. 119—200, Julien's Hiouen Thsang iii, 81.

বসিয়া ঠিক করিয়া বলেন নাই। কানিংহাম সাহেব তাঁহার বিখ্যাত ভারতীয় প্রাচীন ভূগোলে যেমন বহুস্থানের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তেমন ভাবে বহু বিবেচনা করিয়া এই প্রাচীন রাজধানী মুড়লী বা বর্ত্তমান যশোহর সহরের সন্নিকটে স্থির করিয়াছেন। * আমরা তাঁহার গণনা প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিতে চাই যে রাজধানী মুড়লীর সন্নিকটেই ছিল। এই রাজধানী ঠিক মুড়লীতে থাকাও বিচিত্র নহে, কারণ ইহা অতি প্রাচীন স্থান। তবে বহু বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা একটি অনুমান করিতেছি যে প্রাচীন সমতটের রাজধানী মুলীর কয়েক মাইল উত্তরে বারবাজার নামক স্থানে ছিল। বারবাজারের বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিলে, এই অনুমানের কারণ বাহির হইবে।

বর্ত্তমান যশোহর নগরী হইতে ঠিক উত্তর দিকে দশ মাইল দূরে বারবাজার অবস্থিত। যশোহর হইতে ঝিনেদহ পর্য্যন্ত যে নূতন ছোট রেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে, বারবাজার উহার একটি প্রধান ষ্টেশন। পূর্ব্বকালেও মুড়লী হইতে বারবাজার ও নলডাঙ্গার দিকে খুব বড় রাস্তা ছিল। উহাই বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা হইয়াছে এবং এই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়াই রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। বারবাজার ভৈরব নদের উত্তর পারে অবস্থিত। ভৈরব যখন পূর্ণ বিক্রমে প্রবাহিত হইত, তখন বারবাজারের অবস্থান অতি সুন্দর ছিল।

বারবাজারের এই সুন্দর অবস্থানই তাহাকে সমতটের প্রাচীন রাজপাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রধান ও প্রথম কারণ। গৌড়, পাটলীপুত্র বা কর্ণসুবর্ণ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে আসিতে হইলে ভৈরবতটবর্ত্তী এই স্থানই প্রথম লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। বহু কীর্ত্তিচিহ্নমণ্ডিত, বহু প্রাচীন, বহু বিস্তৃত এবং অধুনা অধঃপতিত এমন কোন স্থান এ প্রদেশে আর নাই।

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ইষ্টকালয় নষ্ট হয়, মঠ ভাঙ্গিয়া মন্দির হয়, মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ হয়, মস্‌জিদ কালে লোকের বসতি বাটীতে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু প্রাচীন জলাশয়ের তেমন পরিবর্ত্তন হয় না। জলাশয় প্রায় জলাশয়ই থাকিয়া যায়, অথবা তাহার শুষ্ক খাত প্রাচীন মনুষ্যাবাসের সাক্ষ্য দেয়। বারবাজারে জলাশয়

* Ancient geography pp. 501-2.

অসংখ্য, লোকের মুখে প্রবাদ এই, তথায় ৬ বুড়ি ৬টা পুকুর অর্থাৎ ১২৬টি পুকুর আছে। ইহার অধিকাংশই দীর্ঘিকা বা দীঘি। কোনটি হিন্দুর কীর্ত্তি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, কোনটি মুসলমানের কীর্ত্তি পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। কোন কোন মুসলমান উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, কিন্তু কোন হিন্দু পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ জলাশয় খনন করেন না বা তাহার জল খান না। বারবাজারের অনেক পুকুরে এখনও বারমাস জল থাকে; এখানে জলকষ্ট নাই। আমরা কতকগুলি দীঘির নাম করিতেছি; রাজমাতা দীঘি, সওদাগর দীঘি, পীর পুকুর, মীরের পুকুর, ঘোড়ামারি পুকুর, গোড়ার পুকুর, চেরাগদানি দীঘি, গলাকাটির দীঘি, ভাই বোন পুকুর, মনোহর পুকুর, সেখের পুকুর, কচুয়া, লোহাশলা, উভগাড়া, মিঠা পুকুর, নূনগোলা, খোনকার দীঘি, কানাই দীঘি, সাতপুকুর—এইগুলি রাস্তার পশ্চিম পারে এবং রাস্তার পূর্ব্ব পারে বাদে ডিহি অংশে - পাঁচ পীরের দীঘি, ছাতারে দীঘি, আলো খাঁ দীঘি, হাঁস পুকুর, বিশ্বাসের দীঘি, শ্রীরাম রাজার দীঘি (৫৫০´× ৩৫০´; উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পারে বাঁধা ঘাটের ভগ্নাবশেষ, বারমাস সুন্দর জল থাকে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পাহাড় এখনও ১০।১২´ ফুট উচ্চ) এবং বেড়দীঘি অর্থাৎ শ্রীরাম রাজার বাড়ীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গড়খাই বহু বিস্তৃত এবং পদ্মমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহা ব্যতীত ফেন ঢালা, চাউল ধোয়া, পিঠেগড়া, ডাইল ঢালা, কোদাল ধোয়া প্রভৃতি চির-পরিচিত ছোট বড় অসংখ্য পুকুরের অভাব নাই। খুব কাছে কাছে এত জলাশয় কোথায়ও দেখি নাই। এতগুলি দীঘি ও পুষ্করিণী যে প্রাচীনত্বের প্রধান সাক্ষী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দ্বিমত নাই।

তৃতীয়তঃ বারবাজারের ৩।৪ মাইল বিস্তৃত স্থান ইষ্টকস্তূপে পরিপূর্ণ। পশ্চিম-দিকে কতকগুলি ১০।১২ হইতে ১৫।১৬ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে, উহার কোন একটি অশোকের স্তূপ হওয়া বিচিত্র নহে। লোহাশলা নামে একটি পুকুর আছে, উহার সন্নিকটে কোন লৌহস্তম্ভ থাকিতেও পারে। হয় ত স্তম্ভের চতুঃপার্শ্ব খনন করিয়া তাহাকে এই পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছিল। কোথায়ও উচ্চ ঢিবি, কোথায়ও অট্টালিকার ভগ্নচিহ্ন, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এবং প্রস্তর স্তম্ভাদি ও সর্ব্বত্র বিস্তৃত ইষ্টকখণ্ড বারবাজারকে হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমানের মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে খনন করা যায়,

সেই স্থানেই প্রায় ইষ্টকের প্রাচীর বাহির হইতেছে। লোকে তুলিয়া লইয়া গৃহভিত্তি, প্রাচীর, ইদ্‌গা ও মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে। যে সকল উচ্চ ঢিবি স্থানে স্থানে জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে, সাধারণ লোকে নানাবিধ ভয়ে সেগুলি খনন করিতে যায় না, গবর্ণমেণ্ট বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় উহার কতকগুলি খনিত হইলে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব বাহির হইতে পারে।

চতুর্থতঃ বারবাজারে স্থানে স্থানে কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে, উহা বৌদ্ধ আমলের প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। উপরোক্ত গোড়ার পুকুরের পশ্চিমদিকে যে অভগ্ন মস্‌জিদ এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহার প্রাচীরগাত্রে চারিখানি প্রস্তর-স্তম্ভ গাথুনির ভিতর প্রবেশ করান রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে একটি প্রস্তরস্তম্ভ মাটীতে পোতা রহিয়াছে। উহার ৩′—৮″ মাত্র বাহিরে আছে, অধিকাংশই মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত বলিয়া বোধ হয়। এইস্থান হইতে আরও পশ্চিমদিকে যাইতে পথের কাছে একখানি ১′—৯″×১′—৯″ পরিমিত সুন্দর কালো পাথরের পাদপীঠ পড়িয়া রহিয়াছে। চেরাগদানি পুকুরের পশ্চিম পারে মস্‌জিদের উপর ১ খানি এবং গলাকাটি দীঘির দক্ষিণ পারে মস্‌জিদের উপর ১ খানি পাথর আছে। আরও কত জঙ্গলের মধ্যে আছে বা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। দেখিলেই বোধ হয় এই হিন্দু বৌদ্ধ আমলের মঠ-মন্দিরের পাথরগুলি মুসলমানগণ সকল স্থানে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। এই সকল প্রস্তর কোথা হইতে আসিল সে সম্বন্ধে আমাদিগকে পরে বিশেষ বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ মগধ ও বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যেখানে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ-প্রতিপত্তির প্রধান স্থান ছিল, পাঠান আমলে মুসলমান প্রচারকগণ সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানেই দেখা দিয়াছিলেন এবং মঠ বা মন্দির ভগ্ন করিয়া, জাতিধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যেখানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল, সেইখানেই তাঁহাদের অধিক আক্রোশ পড়িত, কারণ অহিংসাধর্ম্মী, নিরীহ বৌদ্ধশ্রমণগণ শত্রুর আক্রমণে বিশেষ বাধা দিতে সক্ষম ছিলেন না, এবং একটি সংঘারাম অধিকার করিতে পারিলে এককালে বহুলোক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইত। যাহারা তাহাতে বাধা দিত, তাহারা অনেকস্থলে অসিমুখে নিপাতিত হইত।

এইভাবে মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে অসংখ্য মুণ্ডিতশীর্ষ শ্রমণ কালগ্রাসে পতিত হন। মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজ-উদ্দীন তাঁহার তবকাত-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। সেখানেই প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধনগরী ছিল, তাহাই এক্ষণে মুসলমানপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। এ সকল মুসলমানই অন্যদেশ হইতে আসে নাই। এই দেশীয় নানাজাতীয় লোকে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। জাতীয় শক্তি বা বংশগৌরব লুপ্ত থাকিবার জিনিস নহে। যেখানে বিদেশ হইতে আগত প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের বংশ রহিয়াছে, সেখানে এখন তাহাদের চেহারায়, বিদ্যাচর্চ্চায় ও তেজস্বিতায় তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়; আর যেখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইয়াছিল, সেখানেই নিষ্প্রভ নিরক্ষর সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। রাজধানী বালাণ্ডা মুসলমানের স্থান হইয়াছে, * জগন্নাথপুরে হিন্দুর নাম উল্টাইয়া সেথহাটি হইয়াছে, পয়গ্রাম কসবায় হিন্দু একেবারেই নাই। বাগেরহাটে মুসলমান বারো আনা। বারবাজারেও হিন্দু নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ষষ্ঠতঃ এ দেশে যখন মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন তাহাদের প্রধান আস্তানা ছিল বারবাজার। যে বার আউলিয়া বা ফকির সুন্দরবন অঞ্চলে ধর্ম্ম ও শস্যের আবাদ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রথম আড্ডা হইয়াছিল বারবাজার। এই বারজন ফকিরের আস্তানার জন্য স্থানটির নাম রাখা হইয়াছিল বারবাজার। এই খানে গোরাইগাজী প্রথম জামলা গোদার গোদ ভাল করিয়া দেন, শ্রীরাম রাজাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এক্ষণে বারবাজারের চারিপাশে সাদেকপুর, ইনায়েৎপুর, হাবাতপুর, পিরাজপুর, মুরাদগড়, মোল্লাডাঙ্গা, রহমৎপুর, বাদেডিহি, দৌলতপুর প্রভৃতি বহু মুসলমানী গ্রাম রহিয়াছে। পূর্ব্বে এস্থানে মুসলমান ছিল না। তাহার প্রমাণ "কালুগাজি ও চাম্পাবতী" নামক মুসলমানী কেতাবে আছে। বারবাজারের যে অংশে শ্রীরামরাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে, উহারই পূর্ব্ব নাম ছিল ছাপাইনগর। এখনও স্থানীয়

---

* ১৩২০ সালের সাহিত্য-সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

মুসলমানেরা ছাপাইনগর জানে। উহা এক্ষণে বাদুরগাছা মৌজার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কালুগাজি দুই ভাই যখন এইস্থানে আসিলেন, তখন—

"যত প্রজা ছিল তথা সবে হিন্দুয়ান।
সেখানেতে নাহি ছিল এক মছলমান।" *

সপ্তমতঃ বারবাজার একেবারে মুসলমান হইয়া গেলেও এখনও কিছু কিছু হিন্দু বৌদ্ধের চিহ্ন আছে। বাদুরগাছার মধ্যে এখনও একটি ৺কালীস্থান আছে। মুরদগড়ের গাঙ্গুলী মহাশয়েরা সেখানে পূজাদি করেন। বহু হিন্দুতে পূজা ও বলি দিতে আসে। দেবীর মন্দির এক্ষণে নাই, একটি অতি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেবীস্থানকে আশ্রয় দিয়াছে। রাজমাতার পুকুর, কানাইপুকুর প্রভৃতি কিছু প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। নিকটবর্ত্তী রহমৎপুর, সাকোমতপুর, দেবরাজপুরে যোগী জাতির বাস এবং সাকো, সাজিয়ালি ও পয়গ্রামে বণিকের বসতি আছে। এই যোগী ও গন্ধবণিক্ জাতির সহিত বৌদ্ধ সংঘারামের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ কানিংহাম সাহেবের গণনার সহিত এই সকল কারণের সমাবেশ করিয়া আমরা বলিতে চাই যে এই বারবাজারই ছিল সমতটের রাজধানী। ইহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রাচীন নগরীর একাংশ যে ছাপাইনগর বা চাম্পাইনগর ছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ইউয়ান চোয়াং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে সেঙ্গচি নামক একজন পর্য্যটক চীনদেশ হইতে জলপথে সমতটে আগমন করেন। তিনিও সমতটের রাজধানীতে আসিয়া ছিলেন। তিনি তখন রাজভট্ট নামক একজন নৃপতিকে তথায় রাজত্ব করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। † ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইৎসিং ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় সমতটের রাজা হো—লো—শে—পো—তো বা হর্ষভট্ট স্বয়ং বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং বৌদ্ধদিগের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে যে বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা ইউয়ান চোয়াং এর সময়ে ২০০০ ছিল, তাহাই ইৎসিংএর সময়ে ৪০০০ হইয়াছিল।

* "কালুগাজি ও চাম্পাবতী" ১৫ পৃঃ
† Beal's Life of Hiuen Tsiang P. xxx, Watters, Vol II P. 188.

ইউয়ান চোয়াং যাহাদিগকে প্রাচীন স্থবির মতাবলম্বী দেখিয়া গিয়াছিলেন, ইৎসিংএর সময় তাঁহারা গোঁড়া মহাযানী হইয়াছিল। *

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে দুইটি। ১ম, ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী ভুক্ত সে বৌদ্ধ বিহারমালা, সেই সত্যনিষ্ঠ চীনদেশীয় সাধুর উল্লিখিত সমতটের সে ৩০টি সংঘারাম কোথায়? ২য়, এত যে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ অধিবাসীতে দেশ জনাকীর্ণ ছিল, তাহারা কোথায় গেল? আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—মাৎস্য-ন্যায়।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দেশ ভরিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সময়ে মহারাজ যশোবর্ম্মা কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। কিন্তু গৌড় বঙ্গ বিজয় করিয়া প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরেই কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য আসিয়া তাঁহাকে কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত করেন। গৌড়াধিপ তখন ললিতাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি কাশ্মীরে গেলে ললিতাদিত্য তাঁহার হত্যাসাধন করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় দেন। এই ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য বা জয়াপীড়। কহ্লণ-প্রণীত রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারি, জয়াপীড় রাজ্যারোহণ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ভ্রমণার্থ আসিয়া, রাজা জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীদেবীকে বিবাহ করেন এবং স্ববলে রাজ্যজয় করিয়া শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়া যান।

---

* Record of the Buddhist Religion by J. Takasasu.

এই জয়ন্তই আদিশূর কিনা, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে।* "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, জয়ন্তই পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়া আদিশূর উপাধি ধারণ করেন। অনেকে এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।† যতদিন বিপক্ষে কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততদিন এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ আদিশূর পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে রাজধানী স্থাপন করেন; এবং সেখানেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করেন। তাঁহার জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যেই এ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর ছিলেন নামে মাত্র। এই সময়ে গৌড়রাজ্যের উপর গুর্জ্জর, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে আক্রমণ হইতেছিল। এবম্বিধ বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ জন্য গৌড়রাজ্যে তখন মাৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন জনসাধারণ দৈশিক শান্তির জন্য পালবংশীয় গোপালকে পাটলীপুত্রে রাজা করিয়া প্রজাশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল।‡ পাল ও শূর বংশীয়েরা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোপাল সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।§ সমতটও তাঁহার রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। গোপালের পৌত্র দেবপাল সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার মুঙ্গের লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তর দক্ষিণে হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে সিন্ধু হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শূরবংশীয়েরা বঙ্গ হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে বিতাড়িত হন। দেবপাল সুশাসক ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার শাসনের সুফল যশোর রাজ্যে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু এই খানেই তাহার শেষ। ইহার পরে রাজার শাসন কি, যশোর খুল্না অঞ্চল তাহা বহুকাল জানে নাই।

---

* গৌড়রাজ মালা. ১৮—১৯ পৃঃ। † বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম খণ্ড ১০৩—৪পৃ সাহিত্য, ১২শ ভাগ, ৭২৩ পৃঃ, বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১৯২ পৃঃ Archœological Survey Report, vol. XV p. 163.

‡ 'মাৎস্যন্যায়মুপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ।"
ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন, গৌড় লেখমালা, ১২ পৃঃ।

§ "বিজিত্য যেনাজলধের্ব্বসুন্ধরাং"
দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি, গৌড়লেখমালা, ১ম স্তবক, ৪১ পৃঃ

দেবপালের রাজত্বের পর পালরাজ্য উন্নতিহীন অবস্থায় ছিল। উন্নতি হইতেছিল শুধু ধর্ম্মের। পালনৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মও দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। দেবপালের পর পাঁচ জন নৃপতির পরে রাজা হইলেন মহীপাল। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ এক প্রকার ত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক মঙ্গলকর কার্য্যানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যাহা হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমেয়। তিব্বতীয় তারানাথের মতে তিনি ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সারনাথে তাঁহার শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি ১০২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

সমস্ত বঙ্গদেশ নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। পালরাজগণের সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে যেমন শূরবংশীয়েরা রাজত্ব করিতে ছিলেন, উত্তর বঙ্গে রাজা ছিলেন ধাড়ি চন্দ্র, তাঁহার পুত্র সুবর্ণ চন্দ্র, তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র।* মাণিকচন্দ্রের পর তৎপুত্র, "পাটিকা নগরে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ভূপ"।† গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব বহুদূর বিস্তৃত ছিল।‡ এই সময়ে মাণিকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপাল রঙ্‌পুর অঞ্চলে এক রাজ্যস্থাপন করেন। যে ভবদেব বাল-বল্লভীভুজঙ্গ ভুবনেশ্বরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেববিগ্রহ স্থাপন করেন, তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ প্রথম ভবদেব এই ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই ধর্ম্মপালের সহিত পালবংশীয় ধর্ম্মপালের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সময়ে কর্ণাট ক্ষত্রিয়বংশীয় সামন্ত সেন রাঢ় দেশে এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

---

* প্রাচীন কবি দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে" আছে :—

সুবর্ন্নচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ পিতা
তার পুত্র মানিক চন্দ্র শুন তার কথা"।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত "গোবিন্দ চন্দ্রগীত" ৬৩ পৃঃ।

† পাটিকা গ্রাম কোথায় তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা তর্ক আছে। কোচবিহারের পশ্চিমে এক পাটগ্রাম আছে। কেহ কেহ তাহাকেই পাটগ্রাম বলেন (গোবিন্দ চন্দ্র গীত. টীকা, ৪২ পৃঃ)। তারানাথের মতে চাটিগ্রামই পাটিগ্রাম, কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। ফরিদপুর জেলায় সাতৈর পরগণায় পাটিকা আছে, এস্থান রাজধানী হওয়া সম্ভবপর। কেহ বলেন ত্রিপুরা জেলার পাটিকারাই এই পাটিকা। গৃহস্থ, ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, দ্রষ্টব্য।

‡ গোবিন্দচন্দ্র বলিতেছেন "সোলো দন্তের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী" (গো. চ. গী. ৬০ পৃঃ)। শ্রদ্ধেয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন "দন্তের" স্থলে "দণ্ডের" ধরিয়া লইয়া, এই বঙ্গাধিকারীর

যখন মহীপাল সমস্ত গৌড়রাজ্যের রাজা, তখন রাঢ়ে সামন্ত সেন, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে সেনভুম প্রদেশে রাজা ছিলেন কর্ণসেন। প্রবাদানুসারে অজয় তটে ত্রিষষ্ঠী গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহাকে তাড়াইয়া ইছাই ঘোষ রাজা হয়। রঙ্গপুরের ধর্ম্মপালের সহিত কর্ণসেনের আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপাল ইছাই ঘোষের কিছু করিতে পারেন না। অনেক কাল পরে কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন তাহার হত্যা সাধন করিয়া রাজ্যোদ্ধার করেন।* মহীপালের রাজ্য পশ্চিমে কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে পশ্চিম ভারতে মুসলমান আক্রমণকারিগণের আবির্ভাব হইতেছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গজনীপতি মামুদ। তিনি প্রবল বিক্রমে রাজ্যজয় ও দেশ ছারখার করিয়া হিন্দুর দেবদেবী ও মন্দিরাদির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বেপমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। মামুদ

"নিগ্রহিয়া বিগ্রহের নিধি নিল হ'রে
হইল অলকা ভ্রান্তি গজনী নগরে"।

কিন্তু মামুদের সে দুর্দ্ধর্ষ অভিযান মহীপালের রাজ্যগণ্ডীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহীপাল যখন এই ভাবে পশ্চিম দিকে রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে কেশরিবংশীয় রাজেন্দ্রচোল দেব সমগ্র গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। চোলরাজের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি উড়িষ্যা ("ওড্ডবিষয়"), দক্ষিণ রাঢ়ের ("তক্কণ লাড়ং") অধিপতি রণশূর, বঙ্গ দেশের ("বঙ্গাল" দেশ) অধীশ্বর গোবিন্দচন্দ্র এবং মহাযোদ্ধা মহীপালকে

বিস্তৃতরাজ্যকে কয়েকখানি গ্রামের সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছেন। ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৭৫ পৃঃ); কিন্তু এই "দণ্ড" শব্দও দুর্ব্বোধ্য। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্রশীল এই "দণ্ড"কে নদী বোধক "গর্ত্ত" করিতে চান ("গোবিন্দচন্দ্র গীত" ৬০ পৃঃ) অর্থাৎ যোল নদী দ্বারা সিক্ত দেশেই গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সে রাজ্য সমতট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল কি না জানিবার উপায় নাই। তবে তাহা যে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

* এই ধর্ম্মপাল ও কর্ণসেনের কথা, ইচ্ছাই ঘোষ ও লাউসেনের কথা সহদেব চক্রবর্ত্তী, মাণিক গাঙ্গুলি ও ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলে আছে। বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্মমঙ্গল অনেকগুলি। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৪৭২—৮৫ পৃঃ

পরাজিত করিয়াছিলেন।* কিন্তু তিনি যে যুদ্ধান্তে রাজ্যমধ্যে অগ্রসর হইয়া রাজ্যশাসন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্থির জলাশয়ে লোষ্ট্রনিক্ষেপবৎ এইরূপ রাজ্যজয়ের ফল অধিক কাল স্থায়ী হইত না।

প্রকৃত পক্ষে যে মাৎস্য-ন্যায় দূরীভূত করিবার জন্য প্রজাগণ গোপালকে সিংহাসনে বসাইছিল, সে মাৎস্য-ন্যায় যায় নাই। দেবপাল পর্য্যন্ত দেশে কতকটা শান্তি থাকিলেও তাহার পর হইতে শাসনের ফল আর অনুভূত হয় নাই। নানাস্থানে নানাবংশীয়েরা বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপন করায় প্রজাবর্গ সর্ব্বদা সুবিধামত পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যতঃ এক প্রকার স্বাধীনভাবে বাস করিত। গৌড় বা মগধে ভূপাল মহীপাল যিনিই রাজা হন, তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া যাইত না। তাহারা পাল বা সেন, ইছাই ঘোষ বা গোবিন্দচন্দ্র সকলের রাজদণ্ডলাভে সম্মতি দিয়া স্বকীয় স্বার্থে কৃতপ্রযত্ন হইত। দেশের এই অবস্থা শোচনীয়।

সমতটের এবং তদন্তর্গত যশোর-খুল্‌নার অবস্থা আরও ভীষণ। যদিও দক্ষিণাংশে অনেক স্থল তখনও জলমগ্ন ছিল, তবুও উত্তরাংশে ইহার বিস্তৃতি নিতান্ত কম ছিল না। নদনদীবেষ্টিত এই রাজ্যে রীতিমত রাজ্যশাসন না থাকায়, নানা দস্যুদুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার হইয়াছিল। নানাজনে নানাস্থানে রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া দশের উপর অত্যাচার করিয়া আত্মপোষণ করিত। দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এইরূপ এক এক রাজচক্রবর্ত্তী জাগিয়া উঠিত। রাজবাড়ী বা রাজপাটে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। যদি পরবর্ত্তিকালে বিপ্লবের পর বিপ্লবে এই সকল স্থান ধ্বসিয়া বসিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে ইতিবৃত্ত-বিহীন কত ভগ্নাবশেষ যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তাহা বলা যায় না।

মহীপালের সময় তিব্বৎদেশে নিষ্প্রভ বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান জন্য মহাপণ্ডিত ধর্ম্মপালকে পাঠান হয়, কিন্তু মহীপালের পুত্র ন্যায়পালের রাজত্বকালে দীপঙ্কর অতীশ গিয়া সে কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ন্যায় পালের পর আরও অন্যূন ৯ জন পালরাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু সেন রাজগণের বর্দ্ধিত প্রভাবে তাঁহাদের রাজ্য-সীমা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। উক্ত ৯ জনের মধ্যে কুমারপালের

* Epigraphia Indica vol. IX pp 232-3, গৌড়রাজমালা, ৩৯ পৃঃ।

নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বৈদ্যদেব। এই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে এক ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দক্ষিণ বঙ্গ বলিতে তখন কতদূর বুঝাইত এবং যশোহর-খুল্‌নার লোক এ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি নদী-বহুল দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহিগণের সহিত জলযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাসরবে ("নৌবাট হীহী রব") দিক্‌সমূহ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। * ইহা হইতে অনুমান করা যায়, সমতট তখনও কুমারপালের অধীন ছিল এবং তথাকার সামন্ত রাজগণ নৌযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন।

এ দিকে গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র হাড়িপা নামক ডোমজাতীয় এক যোগীর নিকট ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া চিরজীবনের মত দেশত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। ইঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম গবচন্দ্র। উভয়েই সমান মূর্খ। ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী—এই উভয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার অসংখ্য গল্প বরেন্দ্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের সবই অদ্ভুত; রাজার আদেশে প্রজারা দিনে নিদ্রিত থাকিয়া রাত্রিতে কাযকর্ম্ম করিত, এরূপও শুনা যায়। রাজা ও মন্ত্রীর নিরেট মস্তিষ্কে যখন যে খেয়াল উঠিত, তাহাই পালন করিতে গিয়া প্রজার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। এমন রাজাকে প্রজারা কতকাল কিরূপভাবে মান্য করে, তাহা সহজবোধ্য। ভবচন্দ্র শুধু একজন নয়, বঙ্গদেশের নানাস্থানে তখন বহু ভবচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। ফল হইয়াছিল—দেশময় এক অরাজকতা; তাহার ঢেউ যে যশোহর-খুল্‌না প্লাবিত করিয়া সমুদ্র সীমান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ অরাজকতার যুগে আমাদের প্রস্তাবিত যশোহর-খুল্‌নার যেখানে সেখানে নানা ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশ নিদর্শন কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। যশোহরের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েক স্থানে কৈবর্ত্তগণ রাজত্ব করিতেন। লোকে বলে যাদব রায় নামক এক কৈবর্ত্তরাজ যাদবপুর স্থাপন করেন। কলারোয়া থানার মধ্যে ধানদিয়ার সন্নিকটে মানিঘরে এক তিয়র রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুর্গ, গড়খাই এবং অনেকগুলি দীঘির চিহ্ন

* গৌড় লেখমালা, ১ম স্তবক, ১৩০, ১৪০ পৃঃ।

এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ সময়ে এ স্থানের অধিকাংশ জলপ্লাবিত ছিল। সেইজন্য তিয়র, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিল। বিদ্যানন্দকাটিতে অন্য এক রাজার গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। ডুমুরিয়ার কাছে ভরত ভায়না নামক স্থানে এক ভরত রাজা বাস করিতেন। নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল। ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। সাতক্ষীরার সন্নিকটে যে গণরাজার কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তিনিও এই যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন কি না বলা যায় না। যশোহর-জেলায় নবগঙ্গার তীরে সিঙ্গিয়ার সন্নিকটে নয়াবাড়ী গ্রামে এক পাতালভেদী রাজার দুর্গবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। ইনি পাতালভেদী রাজা নামেই খ্যাত, ইঁহার বিশেষ কোন নাম জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন সিঙ্গাশোলপুর প্রভৃতি স্থানে যে রায় উপাধিকারী শৌলোক-(সৌলুক) দিগের বাস আছে, পাতালভেদী রাজা সেই বংশীয়। নয়াবাড়ীতে উঁহার যে দুর্গবাড়ীর চিহ্ন আছে, তাহা ৮৩৩´×৭৬২´ ফুট পরিমিত, উহার চারিদিকে ৯০´ ফুট বিস্তৃত একটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই পরিখায় এখনও জল থাকে। দুর্গের মধ্যে একটি পুকুর ও কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ পূর্ব্বাবস্থার কিছু আভাস দেয়। লোকে বলে এই রাজা মৃত্তিকার নিম্নে গড় কাটিয়া তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং দুর্গ হইতে নিকটবর্ত্তী নবগঙ্গা নদীতে যাইবার জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। * নদীর কূলে এক স্থানে বহুদূর বিস্তৃত ইষ্টকখণ্ড দ্বারা সুড়ঙ্গের মুখ প্রমাণ করা হয়। বাস্তবিক এরূপ কোন সুড়ঙ্গ ছিল কি না, সন্দেহস্থল। তবে দুর্গ হইতে উত্তর মুখে নদী পর্য্যন্ত যে ৩৫´ ফুট বিস্তৃত একটি সুন্দর রাস্তা ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দুর্গবাড়ী খনন করিলে কিছু প্রাচীন তথ্যের সন্ধান হইতে পারে। এজন্য এদিকে গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ববিভাগ এবং স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী নড়াইলের জমিদার বাবুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

* নয়াবাড়ী গ্রামে শ্রীরামচরণ গজীর বাড়ীর উত্তর ধারে সুড়ঙ্গের মুখ প্রদর্শিত হয়। পাতালভেদী রাজার বাড়ী পরবর্ত্তিকালে কোন বিপ্লবে বসিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—বৌদ্ধ সংঘারাম কোথায় ছিল ?

চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত ৩০টি সংঘারাম কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এ বিষয় লইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ মস্তক বিড়ম্বিত করিতে উদ্যোগী হন নাই। পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ সমতটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া অনুমান করিয়াছেন যে, রায়পুরা, বজ্রযোগিনী, মহেশপুর, মঠবাড়ী, রামপাল, সুবর্ণগ্রাম, জম্বুসর বেজিনীসার (বজ্রিনীসার), জয়পুর, পাংশা, বাজাসন (বজ্রাসন), যোগীডিহা, সুখডিহা, শ্রীনগর, কুমার হট্ট, শৈলকূপা, তেলিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সংঘারাম ছিল। * কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ অনুমান করিবার কি কারণ আছে, তাহা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। প্রদত্ত স্থানগুলির অধিকাংশ ঢাকা জেলায় অবস্থিত। তন্মধ্যে বজ্রযোগিনী, বজ্রাসন, বজ্রিনীসার, সুবর্ণগ্রাম ও রামপালে বৌদ্ধ মঠাদির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঢাকার অন্তর্গত সম্ভার বা সাভার একটি প্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। † বৌদ্ধতান্ত্রিক পরমজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বজ্রযোগিনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বজ্রাসন বিহারে দ্বাদশবৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে প্রাচ্যবৌদ্ধের সর্ব্বপ্রধান স্থান সুবর্ণদ্বীপের ‡ মহাসংঘিকাচার্য্যের নিকট আরও দ্বাদশবর্ষকাল বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইলে, মহারাজ ন্যায়পাল § তাহাকে বিক্রমশিলা বিহারে সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে তাঁহার মত বৌদ্ধপণ্ডিত কেহ ছিল না। ¶ তাঁহার দ্বারাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হয়। তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে তথায় স্বকীয় জন্মস্থানের নামানুসারে যে বজ্রযোগিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শীলভদ্রের মত দীপঙ্করের নামও বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছে। উপরোক্ত তালিকায় কেবলমাত্র মহেশপুর ও

---

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১৭৭ পৃঃ

† শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫১৭, ৫১৮, ৫২১ পৃঃ

‡ পেগুর অন্তর্গত সুধর্ম্মনগর, বর্ত্তমান নাম থেটন।

§ মহীপালের পুত্র ন্যায়পাল (১০৩০—১০৫৫ খৃঃ অঃ)

¶ "Indian Pundits in the land of snow", pp. 50-51, Rockhill's "Life of Buddha" p. 227.

শৈলকুপা যশোহর জেলায়। এ দুইটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান বটে, কিন্তু বৌদ্ধপ্রতিপত্তির প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় না। খুল্‌না জেলার কোন স্থান উক্ত তালিকাভুক্ত হয় নাই। আমরা এই দুই জেলায় যাহা কিছু প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইয়া থাকি, তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে। সমতটের রাজধানী বারবাজারে ছিল ধরিয়া তথায় ২।১টি সংঘারামের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান করিয়াছি। বারবাজার ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, বর্ত্তমান যশোহর সহরের সন্নিকটে মুড়লীতে একটি বৌদ্ধস্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। কানিংহাম সাহেব এখানেই সমতটের রাজধানী কল্পনা করিয়াছেন। মুড়লী অতি প্রাচীন স্থান। এমন কোন প্রাচীন ম্যাপ বা ভৌগলিক বৃত্তান্ত নাই, যাহাতে মুড়লীর নাম নাই। পাঠান, মোগল ও ইংরাজ আমলে ইহার প্রাধান্যের অনেক ইতিহাস আছে। পাঠান: আমলে বারজন ফকিরের মধ্যে দুইজন এখানে স্থায়িভাবে আস্তানা করিয়া বহুলোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপূর্ব্বেও ইহা একটি বিখ্যাত স্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বিস্তৃত ভৈরবের কূলে এই সুন্দর স্থানে হিন্দু বৌদ্ধের বাস ছিল, এজন্য এখানে মুসলমান ফকিরগণ স্থায়ী আস্তানা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকিবেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়া পাঠানেরা সহর বসাইতেন; এখানেও তাঁহাদের একটি সহর ছিল। তাহার নাম ছিল, মুড়লীকস্‌বা। পুরাতন কস্‌বায় এখনও গরিব সাহ ও বেহরাম সাহের সমাধিস্থান আছে। আধুনিক সময়ে মুড়লীতে একটি অতি সুন্দর ইমামবারা বা মুসলমানদিগের ভজনালয় আছে। প্রাচীনকালে এখানে এক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত ৺কালীবাড়ী ছিল। এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরে সেই প্রাচীন মন্দিরের প্রাচীরগুলি দেখা যায়। চাঁচড়া রাজের উদার ব্যবস্থায় এখানে পূজাদির বিশেষ আয়োজন ছিল। কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে। ৺কালীমূর্ত্তির হস্তপদবিহীন দেহপিণ্ডটি আছে; কিন্তু শায়িত শিবমূর্ত্তির প্রায় সম্পূর্ণই আছে। এখনও সেখানে প্রতি অমাবস্যায় পূজা হয়। আধুনিক যুগের নানা দেবমন্দির ও দেবালয়, আখড়া প্রভৃতি প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত করিতেছে। এখানে কোন বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বর্ত্তমান যশোহর নগরী হইতে আরম্ভ করিয়া কপোতাক্ষের পূর্ব্বকূল দিয়া

আগ্রার স্তূপ।

[১৯৭ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

দক্ষিণে চাঁদখালি পর্য্যন্ত গেলে, অনেক স্থানে পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষের স্তূপ পাওয়া যায়। ঝাপার কাছে, তালার নিকটবর্ত্তী আগরঝাড়ায় ও কপিলমুনির সান্নিধ্যে আগ্রা নামক গ্রামে অনেকগুলি স্তূপ আছে। আগরঝাড়ার দক্ষিণে শ্রীপদগুহা গ্রাম। ঐ স্থানে হাড়ুদহ ও শ্রীপদদহ পুষ্করিণী বৌদ্ধসম্বন্ধের সন্দেহ জন্মায়। নিকটবর্ত্তী আটারই ও বারুইহাটি গ্রামে কতকগুলি ইষ্টকগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। কপিলমুনির বাজার হইতে ১ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে আগ্রা গ্রাম। এখানে প্রধানতঃ তিনটি ঢিপি আছে; তন্মধ্যে ২টি বড় ও একটি ছোট। যোগীরা বৌদ্ধ ছিল, তাহা আমরা প্রমাণ করিব। এখানে যোগীর বাস পূর্ব্ব হইতে আছে। সমস্ত আগ্রা গ্রামটিই একটা ভগ্নাবশেষ। গ্রামের যেখানে খনন করা যায়, সেখানেই ইষ্টক বাহির হয়। গ্রামের মধ্যে একটি রাস্তা গিয়াছে, উহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পাকা রাস্তা ছিল, অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন আছে। গ্রামমধ্যে সকল স্থানেই গর্ত্ত খনন করিতে হইলেই ইট বাহির হয়। হা'জোর পুকুর নামে একটি অতি প্রাচীন বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুর আছে। ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড সাহেব এখানকার একটি স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন; উহার গর্ত্তের মধ্যে অবতরণ করিলে প্রাচীর ও জানালার ভগ্নাবশেষ সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। * আগ্রার উত্তর কাশিমনগর গ্রামে ২টি স্তূপ আছে। উহার একটি এখনও যোগিপাড়ার মধ্যস্থানে। যোগিগণ এখানকার প্রাচীন বাসিন্দা। কপিলমুনি গ্রামেই বহুসংখ্যক যোগীর বাস আছে। তাহাদের মধ্যে বাগনাথ মোহান্ত নামক এক সাধুর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার জীবন্ত কবর হইয়াছিল। বাগনাথের সে সমাধিস্থান সকল শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্মানিত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের একটি বিপ্লবের পর পাঠান আমলের মধ্যস্থলে যখন এ প্রদেশে পুনরায় বসতি পত্তন হইতে থাকে, তখনই বাগনাথ ও তাঁহার গুরু শিশুনাথ অধিবাসি-গণের অগ্রদূতরূপে এইস্থানে উপনীত হন এবং তাঁহারাই প্রথম জঙ্গলাবৃত কালী বাড়ীর আবিষ্কার করেন। এই জন্য সাধারণ লোকে বলে কালীবাড়ী তাঁহারাই স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাগনাথ বাক্‌সিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। ইঁহার বংশীয়গণ এক্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়।

---

* Westland's Jessore p. 42.

১৩০৩ সালে কপিলমুনিনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাধু খাঁ মহাশয়ের বাড়ীতে একটী পুষ্করিণী খননকালে ১৭।১৮ হাত মাটীর নিম্নে ৬টি প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩টি রক্তপ্রস্তরের ও একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের। একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের ও একটি রক্তমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। যাঁহারা দেখিয়া ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, উহার মধ্যে একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ছিল। অবশিষ্ট ২টি মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী প্রতাপকাটি গ্রামনিবাসী শ্রীরসিকলাল হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। দুইটিই রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত। বড়টির পরিমাণ ১১″×৬″ ইঞ্চি। ইহা চারি হস্তবিশিষ্ট দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; দক্ষিণদিকে উপরের হস্তে চক্র ও নিম্নে গদা এবং বামদিকে উর্দ্ধে শঙ্খ ও নিম্নে পদ্ম। পুরাণাদিতে যে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তদনুসারে এ মূর্ত্তির নাম মাধব। ছোট মূর্ত্তিটিও চারি হস্ত-বিশিষ্ট; উপরোক্ত ক্রমে হস্তগুলিতে চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা আছে। পরিমাণ ৭½″×৪″, এ মূর্ত্তির নাম জনার্দ্দন। * হালদার মহাশয়েরা বড়টিকে ব্রহ্মা এবং ছোটটিকে বিষ্ণু বলিয়া পূজা করেন।

উপরোক্ত পুকুর খননকালে প্রাচীর সমেত একটি ভগ্ন মন্দির বাহির হয়। তাহার মধ্যেই মূর্ত্তিগুলি ছিল। এই মন্দির মধ্যে মোমবাতিতে আলোক দেওয়া হইত; তাহা হইতে এক রাশি মোম সঞ্চিত হইয়াছিল। উহার একটি পিণ্ডও ঐ সময়ে পাওয়া যায়। মোম মাটীর নিম্নে যুগযুগান্তর থাকিলেও নষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে মন্দিরটি হঠাৎ ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং মন্দিরমধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি একত্র সমভাবে পূজিত হইতেন। কপিলমুনির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তাহার সহিত এস্থলে যে সব বিবরণ দেওয়া গেল, তাহা একত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি যে কপিলমুনিতে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল।

খুলনা জেলায় দৌলতপুর হইতে সাতক্ষীরা যাওয়ার রাস্তায় দক্ষিণ মুখে ১৩ মাইল গেলে বুড়ীভদ্র নদীর কূলে ভরতভায়না গ্রাম। এইস্থানে নদীর সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ আছে। উহা এখনও ৭০′ ফুট উচ্চ আছে; লোকে

* শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ প্রণীত "বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়" ৩৮ পৃঃ।
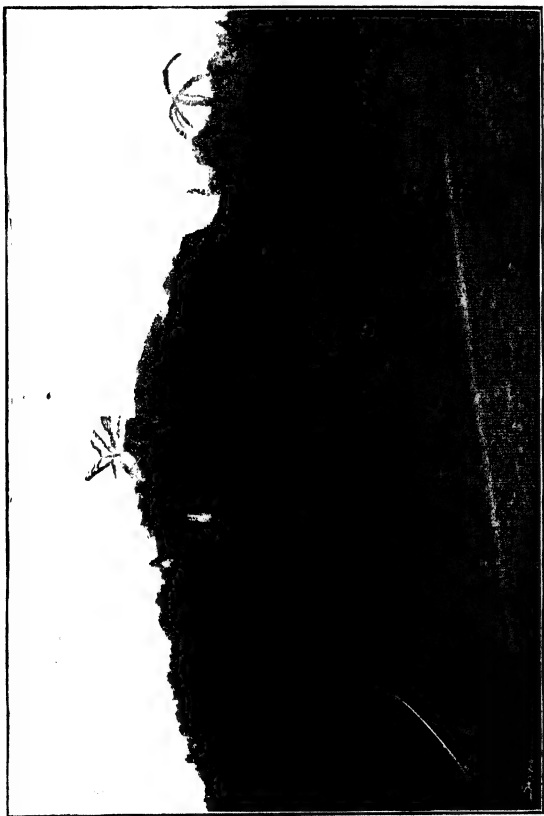
ভরত ভায়নার স্তূপ।

[১৯৯ পৃঃ।

বলে উহা পূর্ব্বে আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু একবার ভূমিকম্পে অনেকটা বসিয়া গিয়াছে। স্তূপটি প্রায় গোলাকার; উহার পরিধি পাদদেশে ৯০০ ফুটেরও অধিক হইবে। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিক্ দিয়া নদী প্রবাহিত, অন্য তিন দিকে গড়খাই ছিল, তাহার চিহ্ন আছে। দক্ষিণদিকে নদীর নিকটে একটি পুকুরের খাত দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপটি সম্পূর্ণ ইষ্টকরাশিতে পরিপূর্ণ। পাদদেশে ২।১ স্থান খনন করিয়া প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। একটু দূর হইতে এই বনাচ্ছন্ন বিশাল স্তূপ দেখিলে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রকে চিন্তাকুল করিয়া তুলে।

এ স্তূপ কাহার? স্থানের নাম ভরতভায়না। লোকে স্তূপটির নাম রাখিয়াছে ভরত রাজার দেউল। এ কোন্ ভরত? গল্প অনেক আছে, তাহার হাতে জড়ভরতও নিস্তার পান নাই। কেহ বলেন ভরত একজন ব্রাহ্মণ, তিনি এই মন্দির দ্বারা একধার মাতৃস্তন্যের ধার শোধ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাই মন্দিরের শীর্ষভাগ ভাঙ্গিয়া মাতৃস্তন্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিল। আবার কেহ বলেন ভরত একজন ক্ষত্রিয় নৃপতি। তিনি এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইহাই ঠিক। পালরাজত্বের প্রাক্কালে যখন সমগ্র বঙ্গে মাৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় সেই সময়ে ভরত নামক এক রাজা এই প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবে শাসন করিয়াছিলেন। সুন্দরবনে ১২৮ নং লাটে যে এক ভরতরাজার গড়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, * সেখানকার সে ভরত রাজা ও এখানকার রাজা অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৌরীঘোনা গ্রামে ভরত রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। † ঐ স্থানে ২ খানি সুন্দর প্রস্তর সুদূর অতীতের কিছু সাক্ষ্য দিতেছে। একখানি পাথর ২′—২″ × ১′—৬½″ এবং উচ্চতা ১′ ফুট, উহা কোন প্রস্তর

* ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বুড়ীভদ্র নদীর একটি সুন্দর বাঁকের মুখে গৌরীঘোনা গ্রামে রূপচাঁদ কুণ্ডুর বাড়ীর পশ্চিম গায়ে ভরত রাজার বাড়ী ছিল। বিস্তৃত স্থানে সর্ব্বত্র ইষ্টকখণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখান হইতে ইট লইয়া নিকটবর্ত্তী মুসলমানেরা বাড়ীতে প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে গৌরীঘোনা গ্রামের নীলকুঠি ও মীর্জ্জানগরের জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক এই স্থান হইতে ইট লইয়া নির্ম্মিত হয়।

স্তম্ভের পাদপীঠ হইতে পারে। পাথরখানি গয়ার পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ। অন্য পাথরখানি একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কুমীরের নিম্নার্দ্ধের একাংশ বা সম্মুখ ভাগ। ইহা ৫´—৬´´×১—৫´´ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১´ ফুট হইবে। কুমীরটি যখন সম্পূর্ণ ছিল তখন তাহার পরিমাণ আনুমানিক ১৫´×১´—৫´´ এবং উচ্চতা প্রায় ২´ ফুট ছিল। ইহা কোন সিঁড়ির পার্শ্বে বা তোরণ প্রাচীরের উপরিভাগে বসান থাকিতে পারে। সে বাড়ী কি প্রকাণ্ড রাজার বাড়ী ছিল, তাহা ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায়। এই রাজবাটীর সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে নদী ও অন্য তিন দিকে গড়খাই ছিল, তাহার খাতের চিহ্ন আছে। ভরতের দেউলের অর্দ্ধ মাইল মাত্র দক্ষিণে কাশিমপুর গ্রামে ডালিঝাড়া বলিয়া একটা স্থান আছে। ইহাও একটি ভগ্ন স্তূপ। এখানে ভরতরাজার কোন প্রধান কর্ম্মচারীর বাড়ী থাকিতে পারে।

চুকনগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ভদ্রনদীর ধারে বরাতিয়া কাঁটালতলার হাটের সন্নিকটে মঠবাড়ী গ্রামে একটি মঠ এক্ষণে বসিয়া গিয়াছে, ঐ মঠ বৌদ্ধ আমলের কারুকার্য্যমণ্ডিত ইষ্টকে গ্রথিত ছিল। মঠবাড়ী নামেও বৌদ্ধ মঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ভরতভায়নার একাংশকে আগরহাটি বলে। এখানে বহু সংখ্যক কপালী জাতীয় লোকের বাস। ইহারা এদেশে এক নূতন জাতি। ইহারা পূর্ব্বকালে কাশ্মীর হইতে এদেশে আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বল্লালসেন সুবর্ণবণিকের মত ইহাদের উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদের জল অনাচরণীয় করিয়া দেন। ইঁহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। এখন তাহার নিদর্শন আছে। ইহারা কৃষিব্যবসায়ী ও ধর্ম্মমতে বৈষ্ণব। শাক্ত যে কতকাংশ না আছে, তাহা নহে; তবে সংখ্যায় কম। ইঁহারা কাহারও দাসত্ব করে না। ইহাদের গুরু পুরোহিত সকলই স্বতন্ত্র। নিকটবর্ত্তী ১৪।১৫টি গ্রামে কপালীর বাস।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, ভরতভায়নায় একটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক গ্রামে এই সংঘারামের সংশ্লিষ্টভাবে বহু বৌদ্ধের বাস ছিল। তাহারা সকলেই এখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। ভরতরাজা ছিলেন এই সংঘারামের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজকীয় ব্যয়ে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ সংসারত্যাগী হইয়া এই সংঘারামে আদর্শ জীবন

অতিবাহিত করিতেন। কেহ কেহ বলেন এই ভরতভায়নার স্তূপটি একটি বৌদ্ধ স্তূপ। কিন্তু তাহা আমাদের মনে হয় না। সম্ভবতঃ বড় বড় প্রকাণ্ড চারিটি মঠ একস্থানে ছিল, উহার মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল; মঠগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাহার ভগ্নাংশগুলি প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইয়া সব সমেত একটি স্তূপের মত দেখা যাইতেছে। ঢিবির উপরে উঠিয়া দেখিলে মধ্যস্থানে কিছু নিম্ন ও ফাঁপা বোধ হয় এবং পার্শ্বের দিকে ইষ্টকের প্রাচীর বাহির হয়। * গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্য বিভাগ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই স্তূপ খনিত হইলে, এই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারামের ভগ্নাবশেষ হইতে যথেষ্ট পুরাতত্ত্বের প্রামাণ্য উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ২৪পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। বৌদ্ধপণ্ডিতেরা পুঁথি পাঁজি লিখিতেন, ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধবিহার ছিল। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।" হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা উভয়ই প্রাচীন যশোর-রাজ্যের অন্তর্গত এবং উহার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। ঐ রাজ্যের পূর্ব্বদিকেও বৌদ্ধবিহার বিস্তৃত হইয়াছিল। যমুনা-তীরে বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, কপোতাক্ষকূলে বোধখানা নামক স্থানে, ভদ্রকূলে বিদ্যানন্দকাটি গ্রামে, পূর্ব্ব বৌদ্ধনিবাস ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। উত্তর দিকে নবগঙ্গার কূলে জগদল, সত্রাজিৎপুর প্রভৃতি কোন স্থানে, এরূপ কোন বিহার বা মঠ থাকিবার সম্ভব। দক্ষিণে কপোতাক্ষকূলে যেখানে আমাদির নিকট মস্‌জিদকুড়ে একটি খাঁজাহান আলির আমলের মস্‌জিদ আছে এবং পূর্ব্বে ভৈরবকূলে যেখানে বাগেরহাট অবস্থিত, সেখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধবিহার ছিল বলিয়া অনুমান করি।

অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে। বিদ্যানন্দকাটিতে পুরাতন দুর্গপ্রাকারের

---

* এমন সুন্দর লালবর্ণ এবং প্রকাণ্ড আকারবিশিষ্ট ইট কুত্রাপি দেখি নাই। ইটগুলি ১′—২″×৯″ ইঞ্চি পরিমিত। স্তূপের যেখানে সেখানে খনন করায় যথেষ্ট ইট বাহির হইয়াছিল। স্তূপের উত্তর পার্শ্বেই শ্রীনীলাম্বর গড়গড়ির বাড়ী। তিনি এই স্তূপ ও উহার বেষ্টনপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ হইতে ইট লইয়া নিজের বাড়ীতে একখানি প্রকাণ্ড ঘরের পোতা, দেওয়াল ও বারাণ্ডার পিল্‌পা নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছেন।

মধ্যে কয়েকস্থানে স্তূপ বা চৈত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রকাণ্ড দীঘির ইতিহাসের সহিত অনেক প্রাচীন কাহিনী বিজড়িত আছে। বোধখানায় অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগের ভগ্নবাটী প্রভৃতি থাকিলেও উহা যে একটি পুরাতন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই এবং উহার নামেও কিছু বৌদ্ধ সম্বন্ধের ইঙ্গিত করে। গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে যমুনাগর্ভে সুন্দর ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং উহা এখনও বনগ্রামের সন্নিকটে এক গ্রামে রক্ষিত আছে। মস্‌জিদকুড় বা বাগেরহাট পাঠান পীরের লীলাক্ষেত্র। এখানকার হিন্দু বৌদ্ধ-নিদর্শন মুসলমান কীর্ত্তির কুক্ষিতলে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবুও কিছু আছে।

মস্‌জিদকুড়ে একটি নবগুম্বজ মস্‌জিদ আছে, উহাতে চারিটী প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান। বাগেরহাটে একটি ৭৭ গুম্বজওয়ালা বিরাট্‌ ভজনালয় আছে, উহাতে ৬০টি স্তম্ভ। এ সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হর্ম্ম্যরাজি এখনও আছে। দেশের লবণাক্ত বায়ু এবং স্বার্থসেবী মানুষের খনিত্রের আঘাত সহ্য করিয়া, তাহারা এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই উভয় অট্টালিকার প্রস্তর কোথা হইতে আসিল ? সমতটে প্রস্তর নাই ; কিন্তু শুধু এইদুই অট্টালিকায় নহে, আরও কতস্থানে প্রস্তরস্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায়ও কৃষ্ণপ্রস্তর এবং কোথায়ও রাজমহল অঞ্চলের প্রস্তর দেখা যাইতেছে। অনেকে বলেন, এ সকল প্রস্তর খাঁজাহান আলি চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে আনিতেন। কিন্তু পাথরগুলি দেখিলে তাহার সবগুলি চট্টগ্রামের প্রস্তর বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ কৃষ্ণ বা রক্ত প্রস্তরগুলি যে চট্টগ্রামের নহে, তাহা নিশ্চিত। ইহাই প্রথম সন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণের জন্য স্বয়ং স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে, উহার সকলগুলি সমান, উপযুক্তভাবে পুষ্ট এবং পরিমাণানুযায়ী করিয়া লইয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মত এদেশে মুসলমানেরা নক্সা স্থির করিয়া শিল্পীকে দিতেন। যাহারা পাথর কাটিত, তাহারা সেই নক্সা মত পাথর কাটিয়া দিত। সুতরাং কোন একটি গৃহের জন্য নির্ম্মিত স্তম্ভের গঠনাদি একরূপ হইবারই কথা। কিন্তু খাঁজাহান আলির সাতগুম্বজে বা মস্‌জিদকুড়ের নবগুম্বজে স্তম্ভগুলি দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। উহার অনেকগুলি দৈর্ঘ্যে কম বেশী আছে, অনেকগুলি বিপর্য্যস্ত করিয়া লাগান হইয়াছে। সাতগুম্বজের পাথরগুলি সব ভারবহনক্ষম হইবে না ভাবিয়া হয় ত সবগুলিই ইষ্টকদ্বারা ঢাকিয়া

দেওয়া হইয়াছিল, এখনও ৪।৫টি ইষ্টকমণ্ডিত রহিয়াছে। মস্‌জিদকুড়ে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের স্তম্ভটি প্রথম, উত্তর পূর্ব্বকোণের স্তম্ভ দ্বিতীয়, উত্তর পশ্চিমকোণে ৩য় ও দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ৪র্থ ধরিয়া লইলাম। প্রত্যেক স্তম্ভ দুইখানি খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। কিন্তু উহার প্রত্যেক খানির মাপ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম স্তম্ভে ৩′ ফুট ও ৪′-৭″ ইঞ্চি প্রস্তরে মোট ৭′-৭″ ইঞ্চি দীর্ঘ; তৃতীয় স্তম্ভ ৩′-১০″ ও ৪′-৯″ ইঞ্চি দীর্ঘ দুইখানি পাথর মোট ৮′-৭″ ইঞ্চি দীর্ঘ। নিম্নে পাদপীঠে প্রস্তর বা ইষ্টক কম বেশী দিয়া মোট দৈর্ঘ্য ঠিক রাখা হইয়াছে। ১ম স্তম্ভের উপরের অষ্টকোণ ৩ ফুট পাথরখানি যেভাবে লাগান হইয়াছে, চতুর্থস্তম্ভে নিম্নের ঠিক সেই ভাবের একখানি পাথর উল্টা করিয়া লাগান হইয়াছে। ১ম স্তম্ভে পাদপীঠে একখানি কালো পাথর আছে, কিন্তু অপর তিনটি স্তম্ভে ঐস্থানে লাল পাথর আছে। এই সকল দেখিয়া সন্দেহ হয়, যে এ পাথরগুলি পূর্ব্বে অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিল। বৈদেশিক দর্শকও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। *

তৃতীয়তঃ, মুসলমানের স্তম্ভাদিতে কোন জীবজন্তুর মূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকিতে পারে না। কিন্তু খাঁজাহান আলির দুই একটি স্তম্ভে দেবমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। বাগেরহাটে সাতগুম্বজ হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তর দিকে মগরার খালের উপর একটি স্থানকে জাহাজঘাটা বলে। প্রবাদ এই—ঐ স্থানে খাঁজাহান আলির জাহাজ সকল আসিয়া লাগিত। ঐ স্থানে ঘাটের উপর একখানি প্রস্তরস্তম্ভ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভূপ্রোথিত রহিয়াছে, মাত্র ৪½ ফুট উপরে আছে। ঐ অংশে একটি দেবীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। দেবী বামদিগের এক হস্তে মহিষাসুরের মস্তকের কেশ ধরিয়া, দক্ষিণদিগের এক হস্তে উহার বক্ষে ত্রিশূলের আঘাত করিতেছেন এবং দক্ষিণ দিকের এক হস্তে তরবারি রহিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এই মূর্ত্তি সিন্দুর-চর্চ্চিত হইয়া হিন্দুর নিকট পূজিত হইতেছে। সাতগুম্বজের স্তম্ভ ও নিকটবর্ত্তী স্থানে পতিত অন্যান্য স্তম্ভের মত এই স্তম্ভ একই প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় এবং

Sir James Westland writes of Masjidkur pillars:—"These stones were not brought there and were not fashioned for the purpose they at present fulfil. They belonged to some other structure and they were taken from it or from its ruins to form pillars in this mosque." Report on Jessore pp. 16-7

বারবাজারে যেমন একখানি প্রস্তর প্রোথিত আছে, এখানিও সেই একই আদর্শে গঠিত। লোকের প্রবাদ খাঁজাহান আলির সময়ে এই প্রস্তরখানি নিকটবর্ত্তী রাজাপুর গ্রামে সোণাই পণ্ডিতের পুকুর হইতে উঠিয়াছিল। এই গ্রাম এবং লোকের নাম উভয়ই সন্দেহজনক। পালরাজত্বের সময়ে যেখানে সেখানে যেমন রাজা হইয়াছিল, এখানে তেমন রাজা থাকা বিচিত্র নহে; আর পণ্ডিত উপাধি যে বৌদ্ধত্বজ্ঞাপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মস্‌জিদকুড়ের সন্নিকটেও আমাদিতে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ী ছিল। তিনিই সম্ভবতঃ এখানকার বিখ্যাত কালিকা দীঘি খনন করেন। এই জলাশয় পাহাড় সমেত ১০০ বিঘা হইবে। দীর্ঘিকার এক কোণে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ ও যদুনাথ ঘোষ মহাশয়দিগের বসতি বাটীতে উক্ত রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ লুক্কায়িত আছে। পার্শ্বে একটি জলটুঙ্গি পুকুর অর্থাৎ পুকুরের মধ্যস্থানে মাটীর ঢিপি আছে; ঐস্থানে গ্রীষ্মকালে রাজপরিবার বায়ু সেবন করিতেন। হাতিবাঁধা নামে আর একটি দীর্ঘ পুকুরের খাতচিহ্ন আছে। উহার পার্শ্বে একখান সুন্দর প্রস্তর পড়িয়াছিল। ইহাও কোন বিশেষ কারুকার্য্যখচিত হর্ম্ম্যস্তম্ভের অংশবিশেষ।

এই সকল নানা নিদর্শন হইতে মনে হয়, এই দুই স্থানে প্রাচীন কালে কোন কোন বৌদ্ধবিহার বা হিন্দু মন্দির ছিল। বৌদ্ধযুগে যে সকল প্রস্তরে ভারতের নানাস্থানে বিশাল চৈত্য, স্তম্ভ বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে ভাস্কর্য্যের ফলে প্রস্তরগাত্রে মানুষের চিত্তপ্রকৃতি সহজে ফুটিয়া উঠিত, তাহারই আয়াসহীন অস্ত্রকৌশলে উক্ত দুই স্থানের স্তম্ভ ও পাদপীঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার বা হিন্দুমন্দিরের প্রস্তর আনিয়া মুসলমান-শিল্পী তাহার সাহায্যে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীর ইষ্টকদ্বারা গুম্বজ ও মিনার গড়িয়া, বঙ্গদেশে মহম্মদীয় স্থাপত্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। পাঠান শাসনকালে কোন স্থান বিশেষে অত্যাচার হউক বা না হউক, অত্যাচারের ভয়ে, অধিবাসীরা দেবমূর্ত্তি সকল পুষ্করিণীর জলে, নদীগর্ভে বা জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এই ভাবে কত মূর্ত্তি যে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠান বা মোগলের হাতে যাহা নিস্তার পাইয়াছিল, পাশ্চাত্য নীলকরের হস্তে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক সময় যশোহর ও খুল্‌নার নানা স্থানে যে শত শত নীল-কুঠি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অনেক উপকরণ নিকটবর্ত্তী ভগ্ন মন্দির বা মস্‌জিদ

হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যে স্থানে নদীর কূলে নিকটে ভগ্ন অট্টালিকা ও বিস্তৃত সমুচ্চ প্রান্তর ছিল, নীলকরগণ সেইস্থানে প্রবল প্রতাপে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিতেন। ইউয়ান চোয়াং এর বর্ণিত ৩০টি সংঘারামের মধ্যে যশোহর-খুল্‌নায় যে গুলি ছিল, তাহার ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কি কিছুই নাই ?

বাগের হাটে যে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল, আমরা তাহার আরও প্রমাণ দিব। বাগেরহাট হইতে বর্ত্তমান খুল্‌না পর্য্যন্ত ২০।২১ মাইল স্থানে বহুগ্রামে যোগী জাতির বাস রহিয়াছে। বাগের হাটের সন্নিকটে যোগীদহ পুকুর এবং কিছুদূরে যোগীখালি ঐ একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে। যোগীদিগের চরিত্র, রীতি-নীতি, ও ধর্ম্মমত হইতে আমরা প্রমাণ করিব যে তাহারা সকলেই বৌদ্ধ। গন্ধবণিক, ভড়ং, এমন কি নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ প্রভৃতি এই প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণও বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। আমরা দেখাইব দেশীয় অনেক প্রবাদ-বাক্য ইহাদের অনেক প্রাচীন কাহিনী অভিব্যক্ত করে। নিশ্চয়ই ইহাদের কোন প্রধান ধর্ম্মস্থান বা সংঘারাম ছিল, এবং তাহা বাগেরহাটে বা তাহার সন্নিকটে নদীর এপারে বা ও পারে কোথায়ও ছিল বলিয়া মনে হয়।

এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। খাঁজাহান ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার প্রাক্কালে যখন বাগেরহাটে তাঁহার সমাধিমন্দিরের নিকটে একটি বহু বিস্তৃত পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন, তখন কয়েক হাত মাটীর নিম্নে একখানি প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরের বৌদ্ধ প্রতিমা পান। প্রতিমাখানি উত্থিত হইলে উহা খাঁজাহান মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ উহা লইয়া গিয়া বাগেরহাটের ৪ মাইল দূরে শিবপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি উহা সেই স্থানেই আছে; কিন্তু বুদ্ধরূপে পূজিত না হইয়া শিবরূপে পূজিত হইতেছে। সেই জন্যই গ্রামের নাম হইয়াছে শিবপুর। যে বাটীতে মূর্ত্তি আছেন, তাহার নাম শিববাড়ী। এই স্থানে শিবচতুর্দ্দশীতে মেলা হয়; অহিংসা যাঁহার ধর্ম্মমতের প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে কালভৈরব কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ছাগ বলি দেওয়া হয়। বৌদ্ধ মতের এতদপেক্ষা আর কত পরাজয় হইতে পারে? কিন্তু তবুও একটি আনন্দের কথা আছে। প্রস্তরের গুণে ও মাধুর্য্যে হিন্দুর হাতে তাহা বিনষ্ট

না হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার পূজার উপস্বত্ব হইতে প্রকারান্তরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পরিবারের উদরান্নের সংস্থান হইতেছে।

এই মূর্ত্তি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কতকগুলি কিম্বদন্তী একত্র বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। খাঁজাহান আলি প্রথমতঃ ষাটগুম্বজের সন্নিকটে নিজের বাটীতে বাস করিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কৃতী লোক মাত্রেরই নিয়ম আছে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বকীয় সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া যান। খাঁজাহান মৃত্যুর প্রাক্কালে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কোন্ স্থানে জরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করিবেন, জানিতে চাহিলে ভগবান্ তাঁহাকে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি তথায় মস্‌জিদ ও সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম কিম্বদন্তী এই যে, অনেক দূর খনন করিলেও জল পাওয়া গেল না। শেষে আরও খনন করিলে একটি মন্দির বাহির হইল। সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁজাহান আলি এক হিন্দু যোগীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যোগীর নিকট জল চাহিলে উৎসমুক্ত জল দ্রুতবেগে বাহির হইতে খাঁজাহান ও তাঁহার অনুচরবর্গ বহুকষ্টে কূলে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। লাগিল। লোকের বিশ্বাস, এই মন্দির এখনও জলতলে বিদ্যমান। *

দ্বিতীয় কিম্বদন্তীবাগের হাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুপ্রসিদ্ধ বাবু গৌরদাস বশাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। তিনি শুনিয়া ছিলেন যে মন্দিরের মধ্যে হিন্দু যোগী না থাকিয়া একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। ফকির ভৈরবের কূলে আশ্রম স্থাপিত করিয়া ধ্যানস্থ হন। যখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, তখন মন্দির মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। †

তৃতীয় কিম্বদন্তী সাধারণ লোকের। তাঁহারা বলেন পুষ্করিণী খনন কালে অনেক দূরে গেলেও জল উঠিল না। তখন এই প্রস্তরখানি পাওয়া গেল। প্রস্তরখানি এত ভারী বোধ হইল যে খাঁজাহানের খনকেরা তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি স্বচ্ছন্দে পাথরখানি নিজে মস্তকে করিয়া লইয়া গেলেন।

---

* Westlands' Report on Jessore, p. 15; আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। ১১৫ পৃঃ।

† J. A. S. B (1867-8) Vol. XXXVI p. 118. The Antiquities of Bagirhat by G. D. Basak.

বাগেরহাট হইতে চারি মাইল আসিয়া প্রস্তরখানি মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিন্তু তথা হইতে আর উহা উঠাইতে পারিলেন না। * তখন সেস্থানে কোন লোকের বসতি হইয়াছিল না। ব্রাহ্মণই সেখানে আদিম বাসিন্দা হইলেন। খাঁজাহান স্বপ্নাদিষ্ট ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার দেবমূর্ত্তির সেবার ব্যবস্থার জন্য ৩৬০ বিঘা ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এখনও সেই ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

এক্ষণে এই তিনটি কিম্বদন্তীর কি কোন সমন্বয় করা যায় না? আমাদের মনে হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধমন্দিরে এই মূর্ত্তি ছিল। সুন্দরবনের এক বিপ্লবে প্রতিমা সমেত মন্দিরটি ভূপ্রোথিত হইয়া যায়। জলপ্লাবিত স্থানে ক্রমে পলি জমিয়া মন্দির অনেক মৃত্তিকার নিম্নে পড়ে। মাটীর নিম্নে কোন মন্দির অভগ্ন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে পারে না। এ মন্দির ও তাহা ছিল না। উর্দ্ধতন মৃত্তিকার চাপে সব মন্দিরই ভগ্ন হইয়া যায়, এ মন্দিরও সেইরূপ ভগ্ন হইয়াছিল। ভূগর্ভস্থ সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে যে হিন্দুযোগী ধ্যানস্থ ছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য এই প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাস্কর্য্যপ্রভাবে মূর্ত্তি জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইলেও যোগী অস্থিমাংসে জীবিত ছিলেন না। গৌরদাস বাবুর মুসলমান ফকিরের কথা মুসলমানগণের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার অতিরঞ্জিত সংস্করণ ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু তাহার প্রবাদ হইতে একটি কথা স্বচ্ছন্দে বুঝা যায়, যে বিপ্লবাদি কোন কারণে মন্দির সমেত মূর্ত্তিটি ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। মন্দির অভগ্ন ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এবং খাঁজাহান মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইহা মিথ্যা কথা। তাহা হইলে খনকের আঘাতে প্রতিমার প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তির বাম হস্তখানি ভগ্ন হইত না। উহা সেইরূপ ভগ্ন অবস্থায় এখনও আছে। খাঁজাহান আলি যে প্রস্তরখানি ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিয়া উহার সেবার জন্য কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সত্য হইতে পারে।† তাহার সেই দানের প্রমাণ-

এত ভারী যে আমাদের ফটো তুলিবার সময় ৮ জন সবলকায় ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তর প্রতিমা গৃহ হইতে বাহিরে আনিতে হইয়াছিল।

† মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর আদিম বাস ছিল চরকাটি। তিনি মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান শিবপুরে বাস করেন। তাহা হইতে বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণবিহারী এবং বিহারিলাল ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত ১৬ পুরুষ হইয়াছে। ইঁহারা বলেন মূর্ত্তির জন্য দেবোত্তর খাঁজাহান আলি দেন নাই। পরবর্ত্তী

কল্পে কোন দলিল বর্ত্তমান পূজারিদিগের নিকট নাই। যদি পূর্ব্বে কোন দলিল থাকিয়া থাকে, তাহা গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎকাল প্রচলিত সনন্দ, তাম্রনির্ম্মিত "পাঞ্জা" এই পরগণা জরিপকালে ব্রহ্মোত্তরের প্রমাণ জন্য আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল, আর আনয়ন করা হয় নাই। এই প্রতিমা বা ঠাকুর উঠিয়াছিল বলিয়া খাঁজাহানের খনিত সেই জলাশয়ের নাম হইয়াছিল ঠাকুর দীঘি।

আমরাই প্রথম এই মূর্ত্তির প্রতিকৃতি ও বিবরণ প্রকাশ করি † বাবু গৌরদাস বশাক লিখিত বাগের হাটের বিবরণে বা ওয়েষ্টল্যাণ্ড কৃত যশোহরের ইতিহাসে এ মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। সাণ্ডার সাহেব তাহার ষাট গুম্বজ সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "শুনিয়াছি শিববাড়ীতে এই মূর্ত্তি আছে।" "খুল্না গেজেটিয়ার" প্রণেতা বিখ্যাত ওম্যালী সাহেব মহোদয় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন "যে শিবমূর্ত্তিটি শিববাড়ী গ্রামে আছে।" যাঁহারা বাগের হাটের কীর্ত্তিকলাপের প্রামাণিক বিবরণী প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা কিরূপে অদূরবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামের মূর্ত্তিটি পরিদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা বিস্ময়কর বটে। এই জন্যই দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আজকাল ঐতিহাসিকেরা চক্ষু অপেক্ষা কর্ণের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করেন।

শিববাড়ীর এই বুদ্ধ প্রতিমার যথেষ্ঠ বিশেষত্ব আছে। ইহা খুল্নার

সময়ে গৌড়ের বাদশাহের জনৈক কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া প্রত্যক্ষ শিবের চড়কপূজায় অত্যদ্ভুত ব্যাপারাদি দর্শন করিয়া বাদশাহের পাঞ্জায় ৩৬০ বিঘা ভূমি নিষ্কর দেন। এ কথা অসম্ভব নহে, কারণ খাঁজাহানের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হোসেন সাহ গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন; তিনি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বাগেরহাটের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার পুত্র নসরৎ কিছুদিন স্বয়ং বাগেরহাটে ছিলেন। সে সকল বিবরণ আমরা পরে প্রদান করিব। সদাশয় হোসেন সাহ বা তাঁহার পুত্র এই নিষ্কর ভূমি দান করিতে পারেন।

† গত ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের আর্য্যাবর্ত্তে আমার "শিব বাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ ও মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমার অনুরোধ ক্রমে শিববাড়ীর মূর্ত্তি স্বয়ং দেখিয়া আমার প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁহার নিজ বিবরণী প্রকাশ করেন। আমি যে ফটো লইয়া ব্লক প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই ফটো হইতে ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে বাগেরহাটের "পল্লীচিত্রে" হঠাৎ বিনা বিবরিণীতে একটী ছবি মাত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী মাসে "গৃহস্থ" পত্রে উহার একটী অনুকৃতি প্রকাশিত হয়। মদীয় প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে যাইবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার যাওয়া হয় নাই। তিনি গেলে, পাষাণে কিছু কথা কহিত।
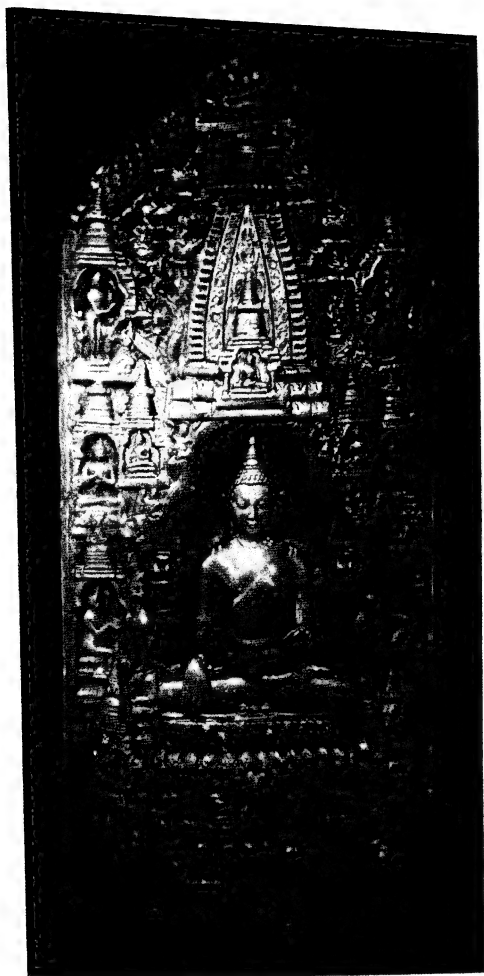
শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি ২০৮ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ইতিহাসের একটি প্রধান উপজীব্য। এজন্য আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি। সম্পূর্ণ প্রস্তরখানি শূর্পাকৃতি এবং উহা পাদপীঠ বাদে ৩½ ফুট দীর্ঘ ১ ফুট ৮½ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রতিমার নিম্নে একটি কীলক আছে, উহা নিম্নাঙ্কিত পাদপীঠের মধ্যস্থলে যে একটি ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। প্রয়োজন মত দুইখানি প্রস্তর পৃথক্ করা যায়। প্রতিমা-প্রস্তরের সম্মুখভাগ
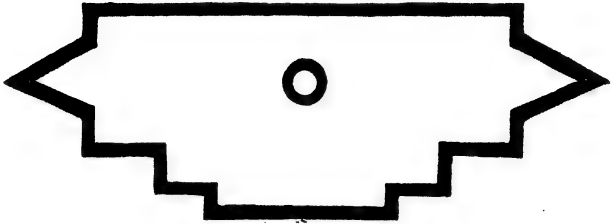
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; মধ্য ভাগে উহার বেধ প্রায় ১ ফুট হইবে। এই প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেবের অসংখ্য নিজ মূর্ত্তি ও তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ ভাস্কর-শিল্পে সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ প্রতিমাকে মূর্ত্তিস্তবক বা stele বলা হয়।* শিববাড়ীর এই প্রতিমার মত এরূপ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ষ্টীল বা মূর্ত্তিস্তবক অতীব দুর্ল্লভ। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, ভারতবর্ষে এরূপ সম্পূর্ণ আর একখানি মাত্র ষ্টীল আছে। উহাও শিববাড়ীর প্রতিমা অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট, উহাতে মূর্ত্তি সংখ্যা কম আছে এবং উহার বড় বুদ্ধমূর্ত্তিটিতে তেমন শান্ত সাম্যভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে

---

* "The image of Buddha in the middle and the ornamental reliefs round about provided another model for these representations. The stale's in the centre of which Buddha stands or sits are then much reduced; besides him are disciples and monks, above rises a pointed arch in which a conversion scene is represented." Buddhist Art in India, stele Representations, (translated from the Hand book of Professor Grunwedel p. 133-4).

হয় না। সেখানি কলিকাতার যাদুঘরে (Indian Museum) রক্ষিত হইয়াছে। * তুলনার জন্য শিববাড়ীর মূর্ত্তির সঙ্গে যাদুঘরের সে প্রতিমারও প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। সরকারী বিবরণীতে লিখিত আছে, সেখানি বিহার হইতে সংগৃহীত বলিয়া অনুমান করা হয়, † সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সেখানি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৎসংগৃহীত শিববাড়ীর এই বুদ্ধ প্রতিমা এবং অন্যান্য কয়েকটি মূর্ত্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বঙ্গদেশে প্রস্তর না থাকিলেও উড়িষ্যা, গান্ধার বা মগধের ন্যায় সেখানেও প্রস্তরশিল্পের এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। তিনি ইহাকে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যপদ্ধতি (Bengal School of Sculpture) বলিয়া অভিহিত করিতে চান।

প্রতিমার মধ্য স্থানে একটি বড় বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই উপবিষ্ট মূর্ত্তি এক ফুটের অধিক উচ্চ হইবে। বুদ্ধ যোগাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানস্থ; বহুযুগবর্ষী মালিন্যমণ্ডিত প্রস্তর মূর্ত্তির বদনমণ্ডল হইতে এখনও দিব্যজ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইয়া পড়িতেছে। যে যুগে শিল্পী পাথরকে কথা বলিবার মত ভঙ্গি দিতে জানিতেন, এ সেই যুগের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে শান্ত সৌম্য দেবভাব এমন সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। এই বড় মূর্ত্তিটি একটি চৈত্যের মধ্যে স্থাপিত। চৈত্যের দুইটি গোলাকার স্তম্ভ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে লম্বমান। এই চৈত্যের উপর বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের এক অনুকৃতি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ধ্যানী বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত। উপরিস্থ মন্দির এবং নিম্নস্থ চৈত্য এই উভয়ের মধ্য স্থানে দুই পার্শ্বে দুইটি বিদ্যাধর কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা চৈত্যের খিলান এবং মন্দিরের তলদেশ উভয়কে হস্ত দ্বারা রক্ষা করিতেছে।

বড় মূর্ত্তিটির বাম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নদিকে গিয়া পরে

---

* Br. 5. Catalogue of the Indian Museum Vol II.

† "The history of the sculpture is unknown and it is supposed to be from Behar." *Ibid*, Vol. II p. 80.
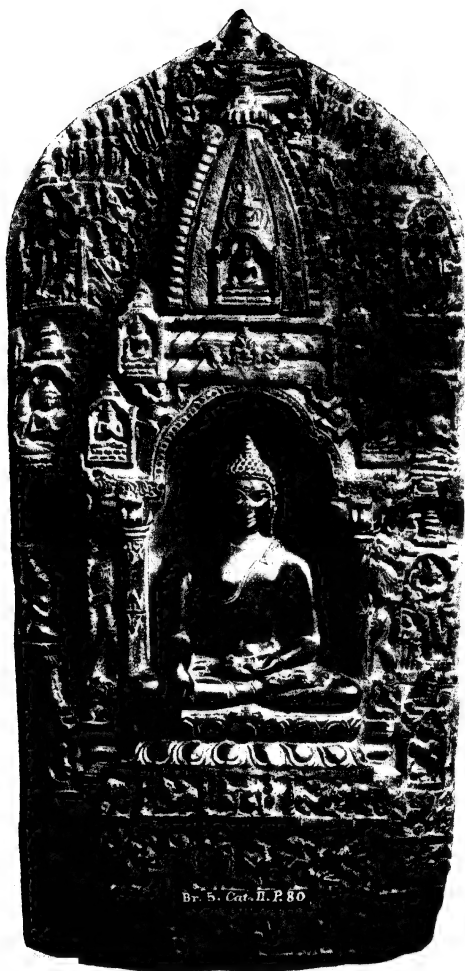
যাদুঘরের বুদ্ধমূর্ত্তি।

২১১ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

আবার উপর মুখে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট মূর্ত্তি দেখা যায়। উহা দ্বারা বুদ্ধদেবের জীবনলীলা পর্য্যায়ক্রমে প্রকটিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে স্বপ্নে এক শ্বেত হস্তী মায়া দেবীর গর্ভস্থ হয়, তাহার কোন উল্লেখ এখানে নাই; তবে শিব বাড়ীর মূর্ত্তিতে বুদ্ধদেবের আসনের নিম্নে হস্তিমুণ্ড অঙ্কিত আছে, যাদুঘরের ছবিতে তাহা নাই। বড় মূর্ত্তির বামভাগে চৈত্য স্তম্ভের পার্শ্বে প্রথমতঃ বুদ্ধের জন্মলাভ চিত্র। লুম্বিনী উদ্যানে মায়াদেবী প্রসবকালে অশোকশাখা ধরিয়া দণ্ডায়মানা, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সিদ্ধার্থ বাহির হইতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে ইন্দ্রদেব এবং বামভাগে ভগিনী প্রজাপতি দণ্ডায়মান। ইন্দ্রের পার্শ্বে আর একটি মূর্ত্তি আছে, সম্ভবতঃ ব্রহ্মা। এই চিত্রের নিম্নে সপ্তপদ গমন প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্নিম্নে নারদ ও অসিত, তাঁহারা শিশুকে হস্তে গ্রহণ করিয়া উহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার নিম্নে বিদ্যালয়। এ ছবি যাদুঘরের চিত্রে আছে, কিন্তু শিববাড়ীর চিত্রে নাই। শিক্ষক উপবিষ্ট; নিম্নে তিনটি বালক ভক্তিভাবে যোড় করে দণ্ডায়মান। তৎপরে প্রথম চিন্তা, সিদ্ধার্থের রথের উপর নগর পরিভ্রমণ ইত্যাদি। তদনন্তর মহাভিনিষ্ক্রমণ। চিত্রে বড় মূর্ত্তির নিম্নে তিন শ্রেণী মূর্ত্তি আছে। প্রথম শ্রেণীতে বিদ্যাধর বা উপাসকমণ্ডলী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিদ্ধার্থের গার্হস্থ্য জীবনের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। কিরূপে তাঁহার পিতা তাঁহার নির্ব্বেদভাব পরিহারের জন্য যৌবনের প্রথমে তাঁহার বিবাহ দিয়া বহু যুবতীজনসঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, কিরূপে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান কোলে করিয়া তাঁহার স্ত্রী ও সহচরীবর্গ নিদ্রিত হইলে, তিনি পরিবার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলির বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিলে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ কপিলাবাস্তু হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া যাইতেছেন; কণ্টককে (অশ্ব) পরিত্যাগ; ছন্দকের (সারথি) সহিত বস্ত্রালঙ্কার বিনিময়; বোধিসত্ত্বের সর্ব্বত্যাগ; প্রলোভনের বিভীষিকা; মার কর্ত্তৃক আক্রমণ; অবশেষে সর্ব্বজয় করিয়া সিদ্ধার্থের সম্বোধিলাভ। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি ভূমিস্পর্শ করত ধরণীকে তাঁহার সম্বোধিলাভের সাক্ষী হইতে আহ্বান করিতেছেন। মূর্ত্তির দক্ষিণদিকে একটু উপরিভাগে ধর্ম্ম-চক্র

প্রবর্ত্তনের চিত্র এবং প্রতিমার শীর্ষদেশে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্ব্বাণ। বুদ্ধদেব এক প্রকার খট্বাঙ্গের উপর শায়িত, চারি কোণে চারিটি মনুষ্য মূর্ত্তিতে সে খট্বাঙ্গ ধরিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বশীর্ষে একটি চৈত্য। ফটো তুলিবার সময়ে যাঁহারা প্রস্তরখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের অঙ্গুলির ছবিতে এই চৈত্য লুক্কায়িত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় পার্শ্বে প্রস্তরের অবশিষ্টাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র চৈত্য, তন্মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নানা প্রতিকৃতি দ্বারা পূর্ণ। প্রস্তরের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বে যে অসংখ্য ছোট ছোট মূর্ত্তি আছে, উহা সম্ভবতঃ মার কর্ত্তৃক বুদ্ধের পরীক্ষাসূচক নানা বিধ চিত্র। বড় বুদ্ধমূর্ত্তির বাম হস্তে খনকের অস্ত্রাঘাতে হস্ততল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; যাদুঘরের চিত্রে প্রতিমার হস্ত অক্ষত রহিয়াছে।

এখানে যে বিবরণ দেওয়া হইল অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রপট পরীক্ষা করিলে, প্রস্তরবিহীন খুল্‌না জেলায় এমন মূর্ত্তি যে দুর্ল্লভ পদার্থ এবং ইহা যে একান্ত দর্শনীয়, তাহা সহজে স্বীকার করিবেন। যে প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের চাক্ষুষ নিদর্শন অতীব বিরল, সেখানে এমন মূর্ত্তির আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, ইহার প্রবীণত্বও তেমনই নিশ্চিত। সম্ভবতঃ সেনরাজত্বের সময়ে এ প্রদেশে যে বিপ্লব হয়, তাহাতেই মন্দির সমেত এ মূর্ত্তি ভূপ্রোথিত হয়। তাহারও পূর্ব্বে ২।১ শত বৎসর ইহা আবির্ভূত ছিল। তাহা হইলে অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে এ মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এ মূর্ত্তির বয়স সহস্র-বর্ষের কম হইবে না। তাহা হইলে সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত ছিল, এ মূর্ত্তি তাহার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধুনাবিলুপ্ত অধ্যায়ের প্রতি আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে।

সমতট বিস্তীর্ণ রাজ্য। আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্‌নার বাহিরে সমতটের অনেক অংশ ছিল। ইউয়ান চোয়াং এর বর্ণিত ৩০টি সংঘারাম ও ১০০ দেবমন্দিরের মধ্যে কয়টি এ প্রদেশে ছিল এবং কয়টি ইহার বাহিরে ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। একস্থানে সমতটের রাজধানী ছিল বলিয়া আমরা কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপিত করিয়াছি; সে প্রমাণ যে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা

আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভালভাবে বুঝি। হয়ত সেখানে একটি সংঘারাম মাত্র ছিল এবং সমতটের রাজধানী প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে ছিল। যতদিন অকাট্য প্রমাণবলে এই বিপ্লববহুল দেশের পুরাতত্ত্ব মীমাংসিত না হয়, ততদিন শুধু মানসিক সন্তাড়নে পরকে নিজের মতাবলম্বী হইতে বলা যায় না। নিজে যাহা বিশ্বাস করা যায়,অন্যে তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিবে, নিজের কোন জাতি বা অভ্যাসগত ধারণার ফলে ঐতিহাসিক সত্যকে বিপর্য্যস্ত করিতেছি কি না, ঐতিহাসিককে পদে পদে ইহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আবার কোন একটি বিষয়ে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়া পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান না করিলে, প্রকৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটন হয় না। এই জন্য আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যদি কোন স্থানে কোন একটি অনুমান উত্থাপিত করিয়া উহাকে কতকগুলি সবল বা দুর্ব্বল প্রমাণের বলে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি, অন্যে সুবিধা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহা অপ্রমাণ করিতে পারেন। মত থাকিলেই মতান্তর হয়; সমীচীন মতান্তর গ্রহণ করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব। আমি নিজের চেষ্টায়, চিন্তায় ও চাক্ষুষ দর্শনের ফলে যতটুকু সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, অকপটে অসঙ্কোচে তাহাই লোকলোচনের পথবর্ত্তী করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

এতক্ষণে আমরা বৌদ্ধ যুগের শেষ সীমায় উপনীত হইলাম। ইহার পরে আর বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাগে নাই। পরবর্ত্তী হিন্দু সেনরাজগণ ও পাঠানদিগের রাজত্ব কালে নানাভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি এবং এক প্রকার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। এই বিলোপের পর বৌদ্ধমত হিন্দু ধর্ম্মের অন্তরালে, বালুকা মধ্যে ফল্গুধারার মত, প্রচ্ছন্ন ভাবে কোন প্রকারে একটু আত্মরক্ষা করিয়াছিল। আমরা সেন ও পাঠান আমলের পর তাহার অবতারণা করিব।

নবম পরিচ্ছেদ—সেনরাজত্ব।

মহারাজ মহীপালের রাজত্ব কালে সামন্ত সেন নামক একব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া সুবর্ণরেখা নদীতীরে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। সিরাজগঞ্জের তাম্র শাসন হইতে জানা যায় তিনি কর্ণাট ক্ষত্রিয়। * তৎপুত্র হেমন্ত সেন; তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। হেমন্তের পুত্র বিজয় সেন। তিনি বরেন্দ্র মণ্ডলে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। † হেমন্ত সেন বা বিজয় সেনের সহিত বিবাহসূত্রে শূরবংশীয় নৃপতিদিগের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল। ‡ বিজয় সেনের বরেন্দ্রাধিকার উপলক্ষে গৌড়াধিপ পাল রাজের সহিত যুদ্ধসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই মদন পাল মগধে বিতাড়িত হন। সেখানে তাঁহারা আরও কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজয় সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন এবং মিথিলাধিপতি নান্য দেবকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। বরেন্দ্র মণ্ডলে

---

* "বংশে কর্ণাটক্ষত্রিয়নাম জনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ"

† বল্লালসেনকৃত "দানসাগর গ্রন্থে" আছে:—হেমন্তসেনের পর,

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে"

‡ "অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেধন্দে শশাঙ্কস্বররন্ধ্রশাকে।
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।"

সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব।

শশাঙ্ক—১, স্বর—৫, রন্ধ্র—৯, উল্টাইয়া ৯৫১ শকে ১০২৯ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহাই বিজয় সেনের জন্ম তারিখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৪৯ পৃঃ। শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে" দেখিতে পাই শূরবংশীয় চন্দ্রসেনের জামাতা ছিলেন বিজয় সেন। কিন্তু তিনি শিবভক্ত পরম যোগী, নিঃসন্তান শ্বশুরের রাজত্বলাভে স্বীকৃত হন না। "সেকশুভোদয়ায়" দেখিতে পাই, বিক্রমপুরে রামপালের মৃত্যুর পর দেবাদেশে বিজয়সেনকে রাজা মনোনীত করা হয়। যদিও সান্যাল মহাশয় ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, "মৎকৃত ইতিহাসে সম্পূর্ণ অমূলক কোন বৃত্তান্ত নাই।" তথাপি তিনি কোথায়ও কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া তাঁহার মত অসঙ্কোচে গ্রহণ করা কঠিন হয়। বিশেষতঃ উপরোক্ত বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকা-ধৃত বচনের সহিত তাঁহার কথার বিরোধ হয়। "সেকশুভোদয়া" নানা কাল্পনিক গল্পে পরিপূর্ণ বলিয়া ঐতিহাসিকের উপজীব্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমরা রামপালের পর কুমার পালকে তদীয় বীর সেনাপতি বৈদ্যদেবের সাহায্যে কিছুকাল রাজত্ব করিতে দেখি। কুমার পালের পরও বিক্রমপুরে পাল রাজত্বের শেষ হয় নাই। সেকশুভোদয়ার একটী শ্লোকের (শ্রীশিবচন্দ্র শীল দ্বারা) পরিশোধিত পাঠ "শাকে যুগ্ম করেণুরন্ধ্রগণিতে" হইতে জানা যায়, রাম পাল ৯৮৮ শাকে বা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হন। সুতরাং বিজয় সেনের রাজত্ব ইহার পরে আরম্ভ হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যায়। [বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১৯পৃঃ, সাহিত্য, ১৩০১ বৈশাখ ৮-১৪পৃঃ, J. A. S. B. 1894 গোবিন্দচন্দ্র গীত, ৫৩পৃঃ, সাহিত্য, ১৩২০, চৈত্র ৪৬০—১পৃঃ গৌড়রাজমালা, উপক্রমণিকা, ॥/০পৃষ্ঠা]

বিজয়পুরে * তাঁহার রাজধানী ছিল। বিজয় সেনের তিন পুত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। এক স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র—মল্ল ও শ্যামল বর্ম্মা, † অন্য স্ত্রীর গর্ভে—বল্লাল সেন। ‡ সম্ভবতঃ বিজয় সেনের জীবদ্দশায় মল্ল ও শ্যামল উভয়ই—মৃত্যুমুখে পতিত হন; এজন্য বিজয় সেন পরলোক গত হইলে বল্লালই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিজয় সেনের রাজ্যারোহণের পর শ্যামল বর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং সমগ্র উপবঙ্গের অধিকাংশ জয় করেন।

গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনদ্যাশ্চ পশ্চিমম্।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্॥
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয়ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥

সামন্তসারের বৈদিক কুলার্ণব।

---

* বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ীথানার অন্তর্গত বিজয়-নগরই বিজয় সেনের বিজয়পুর রাজধানী বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এ প্রদেশে "বিজয় রাজার বাড়ী" বলিয়া খ্যাত। এখানে বিজয় সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের প্রশস্তিতে কবি উমাপতি ধর যে সকল বিস্তৃত জলাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি এই প্রদেশে আছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয় নবদ্বীপকেই বিজয়পুর বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা গৃহে বসিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের সাহায্যে ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ঘাটনে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের তর্কজাল বিপুলতা লাভ করে বটে, কিন্তু সব সময়ে সফলতা লাভ করে না।

† মহিষ্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।
মল্লশ্যামলবর্ম্মাণৌ জনয়ামাস নন্দনৌ॥ ঘটককুলপঞ্জী।

কেহ কেহ শ্যামল বর্ম্মাকে বল্লালের পুত্র বলিয়া মানিয়া লন নাই। বাস্তবিক যেখানে শ্যামলের দিগ্বিজয়কাহিনী আছে, তথায় তিনি সেনবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পঞ্জিকা হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি বিজয় সেনের পুত্র। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৪৪, ২৪৯, ২৫১পৃঃ।

‡ বল্লালের জন্ম নানা উপকথায় পূর্ণ। কেহ বলেন তিনি বিজয়সেনের ঔরসপুত্র নহেন, তিনি ক্ষেত্রজপুত্র। রামজয় কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জীতে আছে;—

কলিতে ক্ষেত্রজপুত্রের নাহি ব্যবহার
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার।
আদিশূর বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা
বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা।

কেহ বলেন শৈববরে পুত্রলাভ করিয়া বিজয়সেন পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, বরলাল, উহাই বল্লাল হইয়াছে। কেহ বা বল্লালকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া বর্ণনও করিয়াছেন। সামাজিক ইতিহাস ২৩পৃঃ; বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩৩—৩৪পৃঃ। Marshman's History of Bengal.

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্ব ভাগে বরেন্দ্রের দক্ষিণে মেঘনা নদীর পশ্চিমে এবং লবণ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্যামলনামা নৃপতি সেনরাজগণের আশ্রয়ে এক করদ রাজ্য লাভ করিয়া স্বধর্ম্মনিরত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উপবঙ্গের যে সীমার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইহার সহিত তাহা সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইতেছে। এই বর্ণনা হইতে শ্যামলবর্ম্মাকে বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া বোধ হয় না। * যাহা হউক, তিনি যাহাই হউন্ এবং সেনরাজের সহিত তাঁহার রাজনৈতিক যে সম্বন্ধই থাকুক, তিনি যে দূরদেশে এক প্রকার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্‌না এই বর্ম্মরাজের অধীন হইয়াছিল। বহুকাল হইতে এ প্রদেশে যে অরাজকতা চলিতেছিল, এই শ্যামলবর্ম্মাই তাহার পরিহার করেন। সে অনৈতিকতার যুগে দেশের উপর দিয়া নানা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল। শুধু রাজ্যবিপ্লব নয়, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব এবং সর্ব্বোপরি সুন্দর বনের প্রাকৃতিক বিপ্লবে দেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এই সময় হইতে পূর্ণ একশত বৎসর কাল পুনরায় দেশে সর্ব্ববিধ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজ্যে সুশাসন চলিতে লাগিল, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, সমাজ পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইল, উচ্চমন্দির, নানাবিধ হিন্দু তান্ত্রিকবিগ্রহ, জলাশয় প্রভৃতির উদ্ভব হইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বনগ্রাম, জঙ্গল বাধাল ও "বুনিয়ার" দেশ মাথা তুলিয়া জনকোলাহলময় হইতে লাগিল। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সেনরাজগণের মত আর কেহ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

শ্যামলবর্ম্মা যখন দক্ষিণ বঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, বল্লাল তখন পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে তাঁহার রাজধানী ছিল। পালবংশীয় রামপালই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। † শ্যাবলবর্ম্মার রাজধানীও বিক্রমপুরের সন্নিকটে ছিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে বিজয় সেনের জীবদ্দশায় শ্যামলের মৃত্যু ঘটে। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে বল্লালসেন সিংহাসন

---

* শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহোদয় লিখিয়াছেন :—"দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে ও রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল।" (গৌড়রাজমালা. ৬৫পৃঃ)। ইহা হইতে বোধ হয় বর্ম্মরাজ বিজয় সেনের শত্রু ছিলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। বর্ম্ম-রাজের ঐতিহাসিক তথ্য মীমাংসিত না হইলে এবিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করা যায় না।

† আদিশূরের রাজধানী এই রামপালে ছিল বলিয়া যে পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (১৮৯পৃঃ)

লাভ করেন। * দানসাগর হইতে জানা যায় তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল ৫০ বৎসর। বল্লালসেন রাজ্যলাভ করিয়াই মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও অবশেষে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামপালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের জন্ম হয়। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মিথিলা-যুদ্ধে বল্লালের মৃত্যুকথা প্রচারিত হইয়াছিল, তদনুসারে লক্ষ্মণ সেনের জন্মমাত্রই রাজ্যপ্রাপ্তি যোগ ঘটে। মিথিলা-বিজয় ও পুত্রের জন্ম এই উভয় ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত বল্লাল একটি নূতন সম্বৎ প্রবর্ত্তন করেন; পুত্রের নামানুসারে উহারই নাম রাখা হয় লক্ষ্মণ সম্বৎ বা লসং। মিথিলায় এখনও এই লসং চলিতেছে। † বল্লাল এইভাবে

তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। পুর্ব্ববঙ্গবাসিগণ রামপালেই আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া আদিশূর বিরক্ত হইলে, উহারা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ বারিদ্বারা শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠকে যে সজীব গজারি বৃক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন, সে বৃক্ষও রামপালে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ("আদিশূর ও বল্লাল সেন", বিক্রমপুরের ইতিহাস, ২২-৩০ পৃঃ, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "ভক্তির জয়" ১০-১৬ পৃঃ, ঢাকার ইতিহাস, ৫০৩ পৃঃ, ফরিদপুরের ইতিহাস ২৬ পৃঃ, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ২৬২ পৃঃ) অপর পক্ষে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং গৌড়বিবরণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় বলেন, রামপালে আদিশূরের রাজধানীর প্রবাদ মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই এবং পঞ্চবিপ্র "সুরসরিদবধৌতং" গৌড়েং আগমন করিয়াছিলেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণখণ্ড, ১০৯ পৃঃ, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ১৮ পৃঃ) যাহা হউক এ বিষয়ে কোন সর্ব্ববাদিসম্মত মত এখনও স্থির হয় নাই।

* আমরা এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতই গ্রহণ করিলাম। (J.A.S.B. 1896 pp 25-27) "দান সাগরে" আছেঃ—"শশি নবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ;" ইহাতে ১০৯১ শক বা ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। এ সময়ে বল্লাল জীবিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বল্লালের অন্যগ্রন্থ "অদ্ভুত সাগর" হইতে দেখাইয়াছেন, বল্লাল "খ-নব-খেন্দ্বব্দে" অর্থাৎ ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (Report on the Search of Sanskrit Mss in Bombay, 1887-91 p. XXXV.

তাহা হইলে বল্লালের মৃত্যুও লক্ষ্মণের রাজ্যারোহণ—১১৬৯ বা ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। লক্ষ্মণ সেন ১১৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (Indian Antiquary, vol. XIX, J. A.S.B. 1913 vol. IX. p. 277) কিন্তু সে মতের সহিত পরবর্ত্তী ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন।

† সন হইতে শকাব্দা ও লসং বাহির করিবার জন্য মৈথিলী ভাষায় এক সঙ্কেতসূচক শ্লোক আছেঃ—

"সনমহ লিখহুঁ শরশশি বাণ
সো শাকে জানহুঁ পরমাণ;

ক্রমে ক্রমে মিথিলা, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও বাগ্‌ড়ী জয় করেন, এই পঞ্চরাজ্যে রীতিমত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সুশাসন প্রবর্ত্তিত করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সবল শাসনে সুফল ফলিয়াছিল। দেশে দস্যুদুর্ব্বৃত্তের উৎপত্তি ছিল না। এই সময়ে সমতটেরই নাম বাগ্‌ড়ী হইয়াছিল। যশোহর-খুল্‌না এই বাগ্‌ড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বল্লালের শাসনাধীন ছিল।

বল্লাল সেন শুধু রাজনৈতিক শাসক মাত্র ছিলেন না। দেশের সমাজ ও ধর্ম্মের উপরও তাঁহার সর্ব্বময় ক্ষমতা ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে গুণানুসারে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন। এই কুলীনগণ ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য মধ্যে, সর্ব্বত্র বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি পুনরায় জাগিয়াছিল, তাহার ফলে হিন্দু তান্ত্রিকতার আবির্ভাব হওয়ায় বিকৃত বৌদ্ধমতের বিলোপ হইতেছিল; তিনি নিজে তান্ত্রিক হিন্দু হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারের উপর নানা অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি রুষ্ট হইয়া সুবর্ণবণিক্ ও যোগী প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতিকে অধঃপাতিত ও নির্য্যাতিত করেন। বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁহার এই সর্ব্বতোমুখ শাসনের ভার তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের উপর নিপতিত হয়। লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্বহইতেই পূর্ব্ববঙ্গে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

বল্লালসেন এক নীচ জাতীয় স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তজ্জন্য লক্ষ্মণ সেন পিতার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি মাতার দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া পিতার ঐ সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলে, বল্লাল সেন সেই দুষ্টা রমণীর কুমন্ত্রণায় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেন। ইহার পর কিছু কাল অতীত হইল। এমন সময়ে বর্ষাকালে একদিন বল্লাল আহার সময়ে অন্দরে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার ভোজনগৃহের প্রাচীরে কে যেন একটি শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছে:—

পুনি সন বাণ ইন্দ্র শর খোএ
বাঁকি বাত্রে লসং বিলোএ॥"

অর্থাৎ সনের অঙ্কের সহিত ৫১৫ যোগ দিলে শকাব্দা এবং সন্ হইতে ৫১৫ বাদ দিলে লসং হয়। এতদনুসারে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লসং আরম্ভ হয়। (ভারতী, ১৩১৭, চৈত্র)। এই শ্লোকে "ইন্দ্র" শব্দটি "দন্দ" হইবে কি না সন্দেহ স্থল।

পতত্যবিরলং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

বল্লালের বুঝিতে বাকী থাকিল না যে ইহা তাঁহার পতিবিধুরা পুত্রবধূরই মর্ম্মোক্তি। তখন লক্ষ্মণ সেনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, প্রিয় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে আসিয়া রাজনাবিকগণকে ডাকিলেন এবং প্রচার করিলেন যে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে আনিয়া দিতে পারে, তবে সে রাজ্যাংশ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্যনামক এক দুঃসাহসিক ধীবর এই দুরূহ কার্য্য করিতে অগ্রবর্ত্তী হইল। সে অসংখ্য ক্ষেপণীযুক্ত এক তরণী লইয়া তন্মুহূর্ত্তে যাত্রা করিল। বল্লাল নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সন্তপ্তা দশমধ্বজাগতিনা সন্তাপিতা নির্জ্জনে।
তুর্য্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশেভস্তনী॥
সা ষষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্য ভবিতা ত্রসপ্তমী বর্জ্জিতা।
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব॥ *

সূর্য্য নারায়ণ এই অদ্ভুত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সূর্য্যদ্বীপ † অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুরে তাঁহার প্রচীন রাজধানীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এই দেশকে এখনও সূর্য্যমাঝির দেশ বা ধীবর রাজ্য বলে। কেহ কেহ সেই

---

* সেন রাজত্বে সংস্কৃত চর্চ্চার বিশেষ উন্নতি হয়। বল্লাল ও লক্ষ্মণ উভয়েই পণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরাও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। এইরূপ শ্লোক দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত। বল্লাল নীচ জাতীয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রে এইরূপ শ্লোকে কথা কাটাকাটি চলিয়াছিল। এখানে বল্লাল সেন এই শ্লোকটিকে এমনভাবে রচনা করেন যে ইহার অর্থ যাহাতে সাধারণের নিকট অবোধ্য থাকে, কারণ লক্ষ্মণকে আনিবার কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। বল্লালের সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হয়। তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে অদ্ভুত সাগর পুস্তক লিখেন ও তাহা লক্ষ্মণসেনের সময়ে শেষ হয়। এই শ্লোকে সংখ্যাদ্বারা দ্বাদশরাশির নামোল্লেখ করিয়া কৌশলে উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি দ্বারা রাশিগুলি সূচিত হইয়াছে।

শ্লোকার্থ:—হে বৃষ (২য়) বৎ বলী (পুত্র), মকর (১০ম) সমাগমে কর্কটও মীনবৎ (৪র্থ ও ১২শ), মকরকেতন (কন্দর্প) সমাগমে করি কুম্ভ (১১শ) স্তনী (বধূ) প্রপীড়িতা এবং সেই তুলা (৯ম) বা তুলনা রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় ত্রাসসম্পন্না কন্যা (৬ষ্ঠ) সিংহ (৫ম) তুল্য রাজকুমারের পত্নী হইয়াও বৃশ্চিক (৮ম) বৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; হে মেষবৎ (১ম) (বিনীত পুত্র, শীঘ্র আসিয়া উভয়ে মিথুন (৩য়) অর্থাৎ মিলিত হও।

† ১৩৯-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাঝির নাম মহেশ ছিল এবং তজ্জন্য তাহার বাসস্থানের নাম মহেশপুর হয়, এই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদে তাহার সূর্য্যমাঝি নামই রক্ষা করিয়াছে; মহেশ নামে তাহার কোন পুত্র থাকিতে পারে।

প্রবাদ আছে বল্লালসেন তাঁহার জামাতা হরি সেনকে যৌতুকস্বরূপ (বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত) সেনহাটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তখন বাগ্‌ড়ীর অন্তর্গত সেনহাটি জঙ্গলাবৃত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে এখানে রীতিমত নগর স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে সেনহাটি গ্রাম বোধ হয় বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্যপ্রধান স্থান।

বল্লালের মৃত্যুকালে লক্ষ্মণ সেন উপস্থিত ছিলেন না। পিতার সহিত তাঁহার অসদ্ভাব শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মধু বা মাধব সেনকে পিতার মৃত্যুকালে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বল্লাল স্বরাজ্য বালক মধুসেনকে দিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ আসিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। সেন-রাজগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ও সুবিখ্যাত ছিলেন। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, * লক্ষ্মণসেন দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরস্থানে এবং গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে ত্রিবেণীতে 'সমরজয়স্তম্ভমালা' স্থাপন করিয়াছিলেন। মাধাই নগরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তিনি কাশীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। পিতার রাজত্বকালে যুবরাজ লক্ষ্মণসেন তাঁহার নানা অভিযানের সহায়ক ছিলেন; বল্লাল যে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহা লক্ষ্মণসেনের বাহুবলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণসেন বীরদর্পে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে তেমন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব হিন্দুরাজত্বের শেষ রাজত্ব হইত না।

লক্ষ্মণসেন পরম পণ্ডিত, নানাশাস্ত্রবিৎ, সুকবি ও একান্ত বিদ্যোৎসাহী এবং দানে কল্পতরু ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি শস্ত্রচর্চ্চা

---

* J. A. S. B. 1896, part 1, plate 1, line 18-19 and p. 11 এই দানপত্র বিশ্বরূপ সেন কৃত বলিয়া নগেন্দ্র বাবু উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে কেশব সেনের দানপত্র বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চান।

অপেক্ষা শাস্ত্রচর্চ্চাতেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতপরিষদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সে পঞ্চরত্নপরিষদ্ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন:—"গীতগোবিন্দ"রচয়িতা জয়দেব, "পবন-দূত"প্রণেতা কবিরাজ ধোয়ী, আসাধারণ কবি শরণ, মহামন্ত্রী উমাপতিধর, আর "আর্য্যাসপ্তশতী"র গ্রন্থকার গোবর্দ্ধন। সেনরাজগণের সঙ্গে সঙ্গেই বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গ দেশে আসে এবং তাঁহাদের অবসানের পরেও বঙ্গের অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু তবুও তখন পাণিনির অনাদর ছিল না। এবং উহার সাহায্যে বৈদিক শাস্ত্রচর্চ্চার পথ সুগম করিবার জন্য লক্ষ্মণসেনের আদেশে পুরুষোত্তমের "ভাষাবৃত্তি" রচিত হয়। লক্ষ্মণসেনের প্রাড়্বিবাক বা প্রধান বিচারমতি হলায়ুধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন জন্য "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" রচনা করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ নিজেও সুকবি ছিলেন, তৎপ্রণীত অনেক শ্লোক তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীধরদাস কর্ত্তৃক "সদুক্তিকর্ণামৃতে" সংগৃহীত হয়। আরও কত কবি ও পণ্ডিত যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার শোভা-বর্দ্ধন করিতেন, তাহার ইতিহাস নাই। মহাকবি জয়দেবের "মধুর কোমলকান্ত পদাবলী" বঙ্গদেশে সেই তান্ত্রিকযুগে যে এক অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদের উন্মেষ করিয়া দিয়াছিল, তাহাই হইয়াছিল চৈতন্য যুগের ধর্ম্মস্রোতের প্রবর্ত্তক। এই বিদ্যা-চর্চ্চার প্রভাব সমগ্র বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল।

শুধু বিদ্যাচর্চ্চা নহে, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারও সেনরাজগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। বল্লালসেন সমাজের দুরবস্থা অপনয়নজন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন; লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আমরা পরে তাহার বিশেষ বিবরণ দিব। এ কৌলীন্যজন্য সমাজমধ্যে মহা আন্দোলন হয় এবং রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র কুলীনদিগের বসতি স্থাপন জন্য দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

বল্লালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধমতই দেশের মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম ছিল। বল্লাল সেনও প্রথমে এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে তিনিও তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম্মে

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।

রূপসনাতন লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারে এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখিয়াছিলেন।

দীক্ষিত হন। লক্ষ্মণ সেন পরম ভক্ত হিন্দু ছিলেন। পিতা পুত্রের রাজত্ব কালে তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে তন্ত্রোক্ত দেবদেবী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও বহুস্থানে এই সকল মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও কত সহস্র মূর্ত্তি বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ও দৈশিক বিপ্লবে কতক বিনষ্ট কতক ভূপ্রোথিত বা নদীগর্ভগত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যশোহর-খুল্‌নার সর্ব্বত্র এই সকল মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মূর্ত্তির কতক ঠিক এই যুগেই নির্ম্মিত হইতে পারে, কতক পরবর্ত্তী যুগে সেন-রাজগণের মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নহে। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি এবং নানা জাতীয় তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিই প্রধান। *

চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি মধ্যে অনেক প্রকার মূর্ত্তি যশোহর-খুল্‌নায় আছে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মের স্থাপনাভেদে এই বিষ্ণুমূর্ত্তি সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। † ইহার অধিকাংশ মূর্ত্তিই পাষাণময়ী; স্থানে স্থানে দুই একটি পিত্তল বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিও পাওয়া যায়। এখানে আদর্শস্বরূপ যে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইল, উহার নাম শ্রীধর বা দামোদর। এই মূর্ত্তিটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহেশ্বরপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মজুমদার মহাশয়দিগের বাড়ীতে একটি পুষ্করিণী খনন কালে ৮।১০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা এক্ষণে ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীগোবিন্দ-চন্দ্র ভদ্রের বাটীতে পূজিত হইতেছে।

সেনরাজগণের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে মূর্ত্তিদ্বারা গণেশ পূজা ছিল না। ভারত-বর্ষের অন্যত্র আবহমান কাল এই গণেশ মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেনরাজগণের আমলেই—উহা প্রচলিত হয়। আবার সে রাজত্বের শেষেই উহার বিলোপ হইয়াছে। গাণপত্য মত এদেশে নাই। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, গণপতি মূর্ত্তি এ অঞ্চলের অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে কোন স্থায়ী ভক্তিভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

---

* এরূপ কত মূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা দৃষ্টান্তস্থলে দুই চারিটির উল্লেখ করিতেছি। খুল্‌না সহরস্থ কালীবাটীতে একটী বাসুদেবমূর্ত্তি, সেখহাটির ভুবনেশ্বরী মন্দিরে ঐরূপ একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি, মহেশ্বর পাশায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভদ্রের মন্দিরে ২টি পাষাণময়ী ও একটী পিত্তল নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, লাউপালার মন্দির গাত্রে ১টী ও নড়াইল বাবুদিগের প্রাচীরগাত্রে ১টি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ইহা ব্যতীত গদাধর, জনার্দ্দন প্রভৃতি মূর্ত্তি অনেক স্থানেই রক্ষিত আছে।

† শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়" দ্রষ্টব্য।
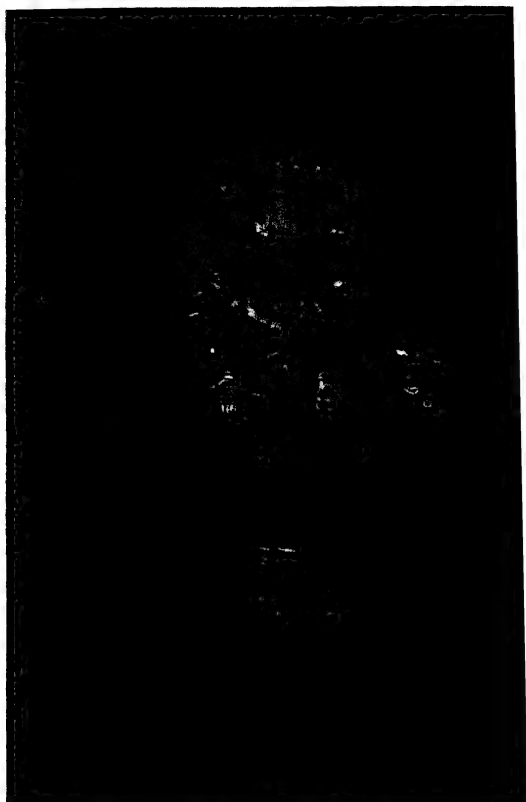
চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি

(মহেশ্বরপাশা) ২২২ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

দিগ্বিজয়প্রকাশে বিবৃত হইয়াছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন যশোরেশ্বরীর মন্দিরসন্নিধানে চণ্ডভৈরবের এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে ৺যশোরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যে চণ্ডভৈরবের বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাও ঐ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। যেখানেই কোন কারণে লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, সেখানেই তিনি কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা সে সম্বন্ধ চিরস্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই ঐ স্থানে এক পৃথক্ মন্দিরে একটি গঙ্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সুন্দর-বনের বিপ্লবে যশোরেশ্বরীর প্রতিমার মত সে মূর্ত্তিও জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় উভয় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। পুরাতন যশোরে-শ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার কথা জানিত। গঙ্গামূর্ত্তি আবিষ্কারের পর তেমন পরিচিত হয় নাই। সুতরাং উহা প্রতাপা-দিত্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি পুনরায় বিপ্লবের মধ্যে উহা কিছুকাল অদৃষ্ট অবস্থায় ছিল বলিয়া লোকে সে গঙ্গামূর্ত্তির নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তাহাকে অন্নপূর্ণা দেবী স্থির করিয়া লইয়াছিল। পরবর্ত্তি-যুগের দলিলপত্রে এই অন্নপূর্ণা নামই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এ মূর্ত্তি অতি সুন্দর; যে অপূর্ব্ব ভাস্কর-শিল্প এই মূর্ত্তি গড়িয়াছিল, পাঠান আমলের তামসযুগে তাহার কোন চর্চ্চা না থাকায়, পরবর্ত্তী আমলে এমন প্রতিমা প্রস্তুত করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই মকরবাহনা, মাল্যহস্তা দেবীর দেহ-ভঙ্গিমা অতীব মধুর এবং তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল হইতে যে দিব্যলাবণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের মনে হয়, এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সেনরাজত্বেরই সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় গঙ্গাদেবী অন্নপূর্ণা নামে পুজিত হইতেছেন এবং তাঁহার দেবোত্তর সম্পত্তিও সেই নামে চলিয়া আসিতেছে। *

যশোহর-খুল্‌নার সহিত সেন-রাজগণের আরও সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যুক্ত জেলা এক্ষণে যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বাগ্‌ড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বল্লাল সেনের সমগ্র রাজ্য পাঁচটি প্রধান 'ভুক্তি' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা :—বঙ্গ, মিথিলা, বরেন্দ্র, রাঢ় ও বাগ্‌ড়ী; মিথিলার পূর্ব্বনাম তীরভুক্তি। এই ভুক্তিগুলি পুনরায় 'মণ্ডল' বা মণ্ডলিকায় বিভক্ত ছিল।

* ১৫৭—৮পৃষ্ঠা দেখুন।

মণ্ডল অতি প্রাচীন হিন্দু শব্দ। ভাগবতাদি পুরাণেও মণ্ডলের কথা আছে। মুসলমান যুগ হইতে মহল বা জেলা শব্দ এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক জেলায় যেমন এক্ষণে কতকগুলি করিয়া সব্‌ডিভিসন বা উপবিভাগ আছে, সেনরাজত্বে মণ্ডলসমূহও সেইরূপ কতকগুলি 'বিষয়' বা 'শাসনে' বিভক্ত ছিল। এখনও বিষয় কথা চলিয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার প্রভৃতি 'বিষয়ী'-লোকে বিষয় কার্য্য দেখে এবং বিষয় রক্ষা করে। দেশে কু-শাসন থাকিলেও এখন আর "শাসন" কথার পূর্ব্ব অর্থ নাই, ব্রহ্মশাসন প্রভৃতি গ্রামের নাম পূর্ব্ব শাসনের চিহ্ন রাখিয়াছে।

বল্লাল সেনের ৫টি খণ্ড রাজ্য বা ভুক্তির জন্য পাঁচটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। বঙ্গের রাজধানী ছিল, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তৎপুত্র বিশ্বরূপ এই স্থানে থাকিয়া প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গ শাসন করিতেন। বল্লালের সময়ে বরেন্দ্রের রাজধানী ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্দনে। প্রকাণ্ড দীঘিকা, দুর্গপরিখা ও ইষ্টকস্তূপ ঐ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষী আছে। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কিছুদূর দক্ষিণে গঙ্গার সন্নিকটে সুরম্য লক্ষ্মণাবতী নগরী নির্ম্মাণ করেন। মুসলমানেরা উহাকেই লক্ষ্মৌতি বা গৌড় বলিতেন। রাঢ়ের রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ বীরভূমের অন্তর্গত লক্ষৌর নামক স্থানে। বঙ্গবিজয়ের পর পাঠানেরা এই স্থানে আড্ডা করিয়াছিলেন। লক্ষৌরে মুদ্রিত পাঠান আমলের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মিথিলার রাজপাট কোথায় ছিল জানা যায় না। হয়ত লক্ষ্মণসেন ইহার শাসন কেন্দ্রের জন্য বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে রামাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "সেকশুভোদয়া" গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—"পুরী রামাবতী যত্র ভুবি বিখ্যাতনামিকা"। * কিন্তু বাগ্‌ড়ীর শাসনকেন্দ্র কোথায় ছিল ?

নবদ্বীপে সেনরাজগণের কোন রাজনৈতিক শাসনকেন্দ্র ছিল না। বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে এই স্থানে গঙ্গাবাসের আবাস স্থির করিয়াছিলেন। কুলকারিকা হইতে জানা যায় ঃ—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গা স্নান
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাসস্থান।"

নবদ্বীপে যেখানে বল্লাল নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, এখনও যেখানে বল্লাল দীঘি

* সাহিত্য, ১৩০১, ১৭ পৃঃ, বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৫৪ পৃঃ।

গঙ্গাদেবী, ঈশ্বরীপুর

[২২৪ পৃঃ ।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ও প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা এক সময়ে তিন দিকে ভাগীরথী দ্বারা বেষ্টিত একটি সুন্দর দ্বীপ এবং তীর্থস্থান ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বৃদ্ধ নৃপতির সহচর হইয়া এখানে আসিয়া নানা স্থানে বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আগমনে এইস্থান একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়েও এখানে রাজধানী ছিল না, দুর্গ বা সৈন্যাবাস ছিল না। সুতরাং ইহাকে আমরা প্রাদেশিক রাজধানী বলিতে পারি না। কিন্তু কানন-কুন্তলা বাগ্‌ড়ী ভূমি নানা দুর্ব্বৃত্ত জাতির বসতি হেতু দুর্দ্দমনীয় ছিল। সেখানে নিশ্চয়ই কোনও শাসন-কেন্দ্র ছিল। তাহা কোথায়?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ একটি অনুমান উপস্থিত করিতেছি। বহুদিন ভ্রমণ ও চিন্তার পর এই অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছি; এজন্য অসঙ্কুচিত ভাবে ইহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিলাম। হয়ত ইহা অনুমান মাত্র। কিন্তু যে ঘটনা পরম্পরার সমাবেশে এই দিকে চিন্তা প্রবাহ সমাকৃষ্ট করিয়াছে, পাঠকের অবিশ্বাসের পূর্ব্বে তাহা বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যশোহর জেলায় নড়াইল সবডিভিসনের মধ্যে, সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে সেখহাটি বলিয়া একটি গ্রাম আছে। ইহার নিম্নদিয়া এক্ষণে ভৈরব প্রবাহিত, অপর পারে জগন্নাথপুর গ্রাম। পূর্ব্বে ভৈরব জগন্নাথপুরের দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং তখন জগন্নাথপুর ও সেখহাটি একপারে পরস্পর সংলগ্ন ছিল। ভৈরব ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ হইতে উত্তরের দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে; ভৈরবের সে প্রাচীন খাতগুলি জগন্নাথপুর গ্রামে এখনও বিদ্যমান আছে। এই জগন্নাথপুর সেখহাটিতে পূর্ব্বে কোন প্রাদেশিক রাজধানী ছিল বলিয়া মনে করি।

স্থানের অবস্থান এ অনুমানের প্রথম কারণ। এক্ষণে নদী নানা ভাবে প্রবাহিত হইয়া স্থানটিকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এখানে একটি প্রকাণ্ড নগরী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে চারিটি গ্রাম এই বিস্তীর্ণ নগরীর চারি অংশ নির্দ্দেশ করিতেছে। উত্তর দিকে বহির্ভাগ (বর্ত্তমান নাম বাহির ভাগ), পূর্ব্বদিকে দেবভাগ (বর্ত্তমান নামও তাহাই), দক্ষিণদিকে তপোবন ভাগ বা তর্পণভাগ * (বর্ত্তমান নাম তপন ভাগ) এবং পশ্চিম দিকে

* দিনাজপুরে তর্পণদীঘিতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে প্রদত্ত দানপত্রের এক তাম্র-

প্রেমভাগ (বর্ত্তমান পমভাগ)।—ইহা লইয়া নগরীটি ৪ মাইল দীর্ঘ ও চারি-মাইল প্রস্থ হইবে। বহির্ভাগ হইতে রাজবর্ত্ম পশ্চিমে কপোতাক্ষ ও পূর্ব্বে চিত্রা পর্য্যন্ত ছিল। দেবভাগে নগরীর প্রধান প্রধান দেবালয় ছিল, উহার নিদর্শন আছে। তপোবনভাগে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল, এখনও তপনভাগ একটি ব্রাহ্মণপ্রধান প্রসিদ্ধ স্থান। প্রেমভাগে পান্থনিবাস, দেবালয় প্রভৃতি থাকিবার সম্ভব। জগন্নাথপুরের মত প্রেমভাগও সে সময়ে সেথহাটির এক পারে ছিল। দক্ষিণে দেবপাড়া (বর্ত্তমান দেয়াপাড়া) নামক স্থানেও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানেও অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। উত্তর পশ্চিম কোণে এই নগরীর বাজার হাট ছিল, হয়ত সেথহাটি নামও পূর্ব্বে সেনহট্ট, শঙ্করহট্ট, শঙ্খহট্ট, বা শাঁখ হাট ছিল। পাঠান আমলে সেস্থানে সেখের বাসহেতু "সেখপাড়া" গ্রাম হইলে হাটের নাম ও সেথহাটি হইয়া গিয়াছে। এখন নিকটবর্ত্তী শাঁথারি গাতি, বাণিয়াগাতি কিছু পর্ব্ব পরিচয় দিতেছে। সেনহট্ট সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ যেদিকে দেবভাগ অবস্থিত, সেই অংশে একটি স্থানকে বিজয়তলা বলে। স্থানীয় প্রবাদ এই—ঐ স্থানে বিজয়সেন রাজার বাড়ী ছিল। তিনি যে একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আছে এবং তাহার সন্নিকটে একখানি পর্ণ কুটীরে দেবীর উদ্দেশে নিত্য পূজা হয়। এই মন্দিরের ভগ্নচিহ্ন যে চতুর্দ্দিকে আরও কত ভগ্নাবশেষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি কতকগুলি প্রকাণ্ড অচিনের গাছের * অন্ধকারময়ী ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, মানুষের বসতি-নিলয়ের বহুদূরে থাকিয়া, ভয়াতুরের রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়া থাকে। প্রবাদ একেবারে প্রত্যাখ্যাত হইবার নহে। উক্ত বিজয়সেন মহারাজ বল্লাল সেনের পিতা। তিনি বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ তাঁহার

লিপি পাওয়া গিয়াছিল। (J. A. S. B. Vol. XI. IV.) এখানেও তপনভাগের এক কোণে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে, উহা উত্তর দক্ষিণে দীঘি ৭০০ x ৬০০ হাত হইবে; উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম দীঘির পাড়।

* অচেনা বা অজানিত বৃক্ষ। এরূপ গাছ আমাদের দেশে নাই। বটজাতীয় বৃক্ষ, পাতাগুলি কতকটা যজ্ঞডুম্বুরের মত, ইহাতে এক নূতন রকমের ফল হয়। কোন কোন প্রাচীন কীর্ত্তিস্থানে ইহা দৈবাৎ দেখা যায়। কিন্তু সেথহাটিতে বিজয়তলায় যেমন অনেক গুলি গাছে স্থানটিকে জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তেমন আর অন্যত্র দেখি নাই।

বিজয় বাহিনী এই পথে গিয়াছিল এবং তিনি এখানে কোন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; অথবা তাঁহার পুত্র বল্লাল বাগ্‌ড়ীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া এইস্থানে যে রাজধানী প্রস্তুত করেন তাহাতে কোন দেবমন্দিরের দ্বারা পিতৃনাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ হিন্দু বৌদ্ধের কোন প্রধান কীর্ত্তিস্থান দেখিলেই সেখানে মুসলমানগণ প্রথম অধিবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথপুর প্রভৃতি সেইরূপ স্থান। পাঠানদিগের পত্তনে এখানকার অনেক লোক মুসলমান হয়, এবং অধিকাংশ স্থান ত্যাগ করে। এখন জগন্নাথপুরে চৌদ্দ আনা মুসলমান। ঐ গ্রামের একাংশ এখনও "পাঠান পাড়া" নামে পরিচিত। ঐ পাঠানদিগের এখনও অনেক "চেরাকী" জমি আছে। সেখপাড়া, সিঙ্গিয়া মুসলমানে পূর্ণ। এখন সকল স্থানে অনেক মুসলমান আছেন, যাঁহাদের ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বে আচার ব্যবহার হিন্দুর মত ছিল।

চতুর্থতঃ, এইস্থানে যে সকল দেববিগ্রহ বা দেবালয়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও অনেকটা সেনরাজগণের সময় নির্দ্দেশ করে। সেখহাটি গ্রামে কামার পাড়ার উত্তরে তুদকণ্ঠনামক পুষ্করিণীতে একটি বড় গণেশমূর্ত্তি পাওয়া যায়। উহার নিকটে বারুইদিগের একটি পুষ্করিণীতে একটি বাসুদেব ও একটি গণেশমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই দুইটি গণেশ ও একটি বাসুদেব মূর্ত্তি এই স্থানের জমিদার নড়াইলবাবুদিগের বাটীতে নীত হয়। ঐ তিনটি মূর্ত্তিই এক্ষণে ৺রাজকুমার রায় জমিদার মহোদয়ের বৈঠকখানার প্রাচীরে গ্রথিত রহিয়াছে। তুদকণ্ঠ পুকুরের সন্নিকটে একটি স্থানকে মঠবাড়ী বলে, এখানে অনেক ইষ্টকস্তূপ আছে। গ্রামের মধ্যে কয়েক স্থানে গভীর পরিখার খাত বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ একটি বাহিরের গড়খাই এক সময়ে আফরার খালে পরিণত করা হইয়াছিল। সেখহাটিতে অন্য একটি পুকুর কাটিতে একটি প্রকাণ্ড ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি পাওয়া যায়; প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি কালিদাস রায় এখানে বসতিস্থাপন করিবার সময়ে উক্ত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির সেবার ব্যবস্থা করেন। ঐ ভুবনেশ্বরী মন্দিরে একখানি চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি আছে, তাহাও ঐ ভাবে ভূগর্ভে প্রাপ্ত। এমূর্ত্তিটি ২—৫″× ১—৩′ ইঞ্চি পরিমিত। এই গ্রামে ৺কালাচাঁদ পণ্ডিত তাঁহার বাটীর নিকটে

একটি পুষ্করিণী খনন কালে একখানি ক্ষুদ্র (২" × ১২" ইঞ্চি) ভুবনেশ্বরীর পাষাণমূর্ত্তি পান। মূর্ত্তিখানি ক্ষুদ্র হইলেও অবিকল বড় মূর্ত্তির মত ষড়্‌ভুজা, সিংহবাহিনী ও নানালঙ্কারবিভুষিতা। বৃদ্ধ আদিত্যচন্দ্র পণ্ডিত ঐ মূর্ত্তির নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। এই গ্রামে এইরূপ যে কত ভগ্ন অভগ্ন দেবদেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। গণেশমূর্ত্তির কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছি, অন্য অনেকগুলি মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুমূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি এবং তন্ত্রোক্ত ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বিবিধ দেবী মূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি সেনরাজগণই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিশিল্পের তেমন উৎকর্ষ পরবর্ত্তী যুগে আর হয় নাই। এই সকল নিদর্শন হইতে আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি, এই স্থানে সেনরাজগণের কোন প্রধান কার্য্যস্থান বা শাসন কেন্দ্র ছিল।

পঞ্চমতঃ, পূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কথা বলা হইল, উহাই সেন-রাজত্বের প্রধান প্রমাণ। এ মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব ভাস্কর-শিল্পের নিদর্শন; এমন অতুলনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা যশোহর-খুল্‌নায় আর কোথায়ও নাই, সমগ্র বঙ্গদেশের কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ স্থল। শিল্পী এ মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে যে অনুপম দেব-ভাব ফলাইয়া শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দুই হাত তুলিয়া প্রশংসা করিবার জিনিস। দেবদেবীর মূর্ত্তির বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, ইহা মুখের ভাষায় বুঝান যায়, চিত্রপটে বর্ণরেখায় প্রতিফলিত করা যায়, কিন্তু পাষাণের গায়ে, পাষাণের ভাষায় পাষাণের রেখায় সে ভাব অভিব্যক্ত করা অতীব দুঃসাধ্য কার্য্য; কিন্তু পাঠক এ মূর্ত্তি দর্শন করিলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে এক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্য্যও সিদ্ধ করিয়াছেন। যে ধ্যানে এ মূর্ত্তির পূজা হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, মা করুণামৃতবর্ষিণী দৃষ্টিতে সাধকের প্রতি চাহিয়া আছেন; বাস্তবিকই তাহাই, মায়ের করুণার্দ্র ও নিম্নদৃষ্টি চক্ষুর্দ্বয় এবং বরাভয়প্রদর্শক হস্তদ্বয়ের ভঙ্গিমা দেখিলে এ ভাব সহজেই অনুভূত হইবে। হৃদয়ে চিত্র টানিয়া আনিয়া নয়নপটে কিরূপে অঙ্কিত করা যায়, দর্শকের প্রাণে বিশ্বাস ও আশ্বাসের উদ্রেক করিয়া দিয়া এ মূর্ত্তি তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। যে বৌদ্ধযুগে জ্ঞানবৈরাগ্যদীপ্ত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিতে এবং হিন্দুযুগে আগমানুশাসিত দেব প্রতিমায় নরশিল্পী মানুষের আদর্শে

ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি।

২২৯ পৃঃ।

পাষাণপিণ্ডে দেবদেবী গড়িয়া তাহাতে মানুষ ও দেবতার পার্থক্য প্রত্যক্ষরূপে বুঝাইয়া দিতেন, এ মূর্ত্তিও সেই যুগের সম্পত্তি। সেনরাজগণ যেমন সাহিত্যে তেমনই শিল্পে বঙ্গদেশে এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসানে সে যুগ আর প্রত্যাগত হয় নাই। কত যুগান্তর হইয়া গিয়াছে, তাই আমরা সে গৌরবময় যুগের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন আমাদের মুখের কথা—'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' এ মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবেন যে বঙ্গদেশে ভাস্কর শিল্পের কোন প্রাধান্য ছিল না এবং বঙ্গের বাহিরে এমন মূর্ত্তি না দেখিয়া কে বলিবেন যে বঙ্গদেশে ভাস্কর্য্যের কোন বিশেষত্ব ছিল না ?

সেখহাটির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ৫′ ফুট উচ্চ এবং ২′—৫″ ইঞ্চি প্রস্থ। ইহা শূর্পাকৃতি একখানি কঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাদপীঠে সমাসীনা দেবী দক্ষিণপদ বিলম্বিত করিয়া ষট্‌কোণচক্রস্থ সিংহের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পদতলে নানামুখে দণ্ডায়মান ও অর্দ্ধশায়িত সিংহগুলির চারিটি দেখা যাইতেছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ এবং মস্তকের উপর মন্দিরের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে। মন্দিরের উপরিভাগে মধ্যস্থলে মহাকালের মস্তক এবং দুই পার্শ্বে দুইটি বিদ্যাধরের মূর্ত্তি। দেবীর পদতলস্থ সিংহাসনের পার্শ্বে দূতীগণ চামরাদি নানা সেবা-সামগ্রী লইয়া উপবিষ্টা। দেবী ষড়্‌ভুজা, দক্ষিণদিকে উর্দ্ধাধোভাবে পদ্ম, চাপ ও বর এবং বামভাগে পাশ, অভয় ও শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। দেবী ভুবনেশ্বরী বলিয়া পূজিত হইলেও ইনি প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুটেশ্বরী এবং তন্ত্রোক্ত নিম্ন লিখিত ত্রিপুটা-ধ্যানে ইঁহার পূজা হয়।

পারিজাত বনে রম্যে মণ্ডপে মণি কুট্টিমে।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্‌কোণ-শোভিতে॥
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ।
চাপং পাশাম্বুজসরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্॥ *
সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈ রত্নমৌলীং ত্রিনেত্রাং।
হেমাব্জাভাং কুচভরনতাং রত্নমঞ্জীরকাঞ্চীং॥

* তন্ত্রসারে দেখিতে পাই যে অম্বুজ ও সরসিজ উভয় শব্দের প্রয়োগে পদ্মযুগল বুঝাইবে, অম্বুজ বলিতে শঙ্খ বুঝাইবে না। কিন্তু এখানে দেবীর হস্তে শঙ্খই আছে। [তন্ত্রসার, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ, ১৭৯-৮০ পৃঃ]

গ্রৈবেয়াদ্যৈ র্বিনমিততনুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাদ্যাং।
চামরাদর্শ-তাম্বুল-করণ্ডক-সমুদ্গকান্॥
বহন্তীভিঃ কুচার্ত্তাভি র্দূতীভিঃ পরিবারিতাং।
করুণামৃতবর্ষিন্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥

এই মূর্ত্তি প্রথমতঃ সুবিখ্যাত কালিদাস রায়ের সময়ে এক পুষ্করিণী খনন কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালিদাস প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনানী ছিলেন। তিনি এই মূর্ত্তির দেবতা নির্ণয় করিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের আশ্রিত ধলবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যদিগের জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিতকে আনাইয়া মূর্ত্তির ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি স্থির করেন এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের জমিদারী তদ্বংশীয়দিগের হস্তে ছিল। পরে নবাব সরকারে তাহাদের খাজনা বাকী পড়িলে উহা পরিশোধ করিয়া দিয়া চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বীয় জমিদারী ভুক্ত করিয়া লন। শতাধিক বৎসর যাবৎ পূজার ব্যবস্থাদি চাঁচড়ার রাজগণের দ্বারা হইয়াছিল। পরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ প্রদেশ বাকী খাজনার নিলামে চাঁচড়ার হস্তচ্যুত হয় এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺গোপীমোহন ঠাকুর উহা খরিদ করেন। তিনিই ভুবনেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির ও বেষ্টন প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু সে মন্দির এক্ষণে জরাজীর্ণ, দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের খিলান ফাটিয়া গিয়াছে, মন্দিরের ভিতরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের জমিদারীর অধীন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এ মন্দিরের সংস্কার জন্য কিছু মাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। দেবীর নিত্য পূজার অতি দীন ব্যবস্থা আছে। এখনও দেবীর পূজাদিতে রায়-বংশীয়দিগের নামে সংকল্প করা হইয়া থাকে। আমরা এই প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার দিকে কীর্ত্তিমান, কৃতবিদ্য ও হৃদয়বান্ নড়াইলের জমিদার বাবুদিগের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় দালবাজারে লক্ষ্মণসেনের সময়ে নির্ম্মিত চণ্ডী-দেবীর পাদদেশে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "লক্ষ্মণসেন" শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত ঐ মূর্ত্তি ও

N
S
W
E
ন গ র রা স্তা
প্রা চী ন ভৈ র ব ন দে র খা ত
বাগের খাঁ দীঘি
নিমাই পাটনীর বাড়ী
জাহাজঘাট
কোতোয়ালী চৌতারা
চিলাখানা
বিষপুকুর
দিদার খাঁ
খাঁজাহানের আবাস বাটী
গদা খাঁ
হোসেন সাহ
হাবসীখানা
বুড়া খাঁ
আহমদ খাঁ
দরিয়াখাঁ
ইদগা
কাটানি মসজিদ
খাঁজাহানের দরগা
মিঠাপুকুর
রণবিজয়পুর গ্রাম
পচা দীঘি
D.B. Road
ঘোড়া দীঘি
বিবিজানের মসজিদ
ষাটগম্বুজ
গেট
বাবুর্চিখানা
খাঁজাহানের সমাধি
বাধাঘাট
জেন্দাপীর
কারে দীঘি
ঠাকুর দীঘি
কা ড়া পা ড়া
বাসাবাটী গ্রাম
খাঁজাহান আলির
হাবেলী খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট)
শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র প্রণীত
যশোহর-খুলনার ইতিহাসের জন্য।
১ মাইল।
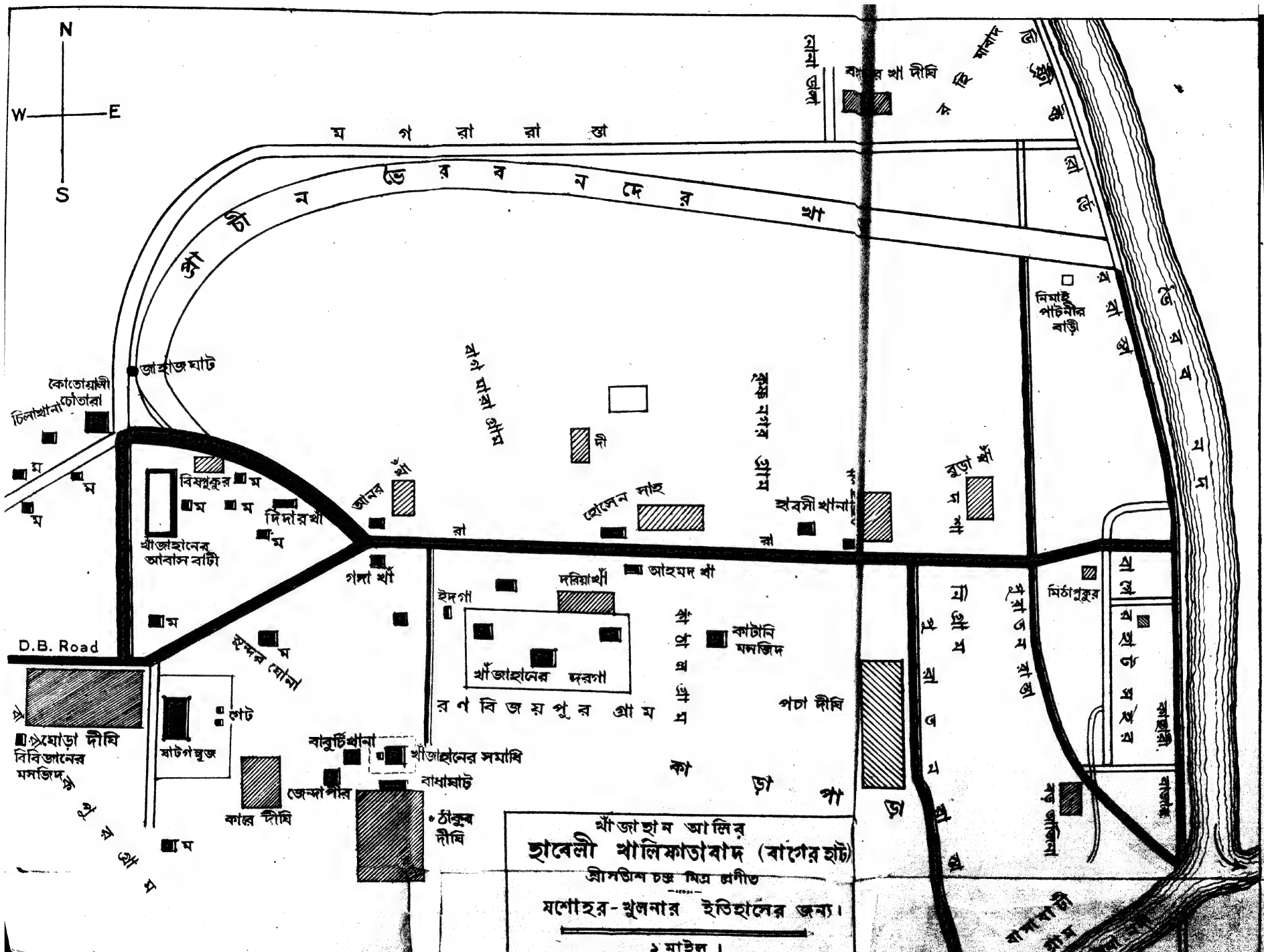
লিপির প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। * ঐ লিপি হইতে জানা যায় মূর্ত্তিটি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে সম্পন্ন হয়। ঐ চণ্ডী মূর্ত্তির সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির পাশাপাশি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে দুইটি মূর্ত্তি যেন একই শিল্পী দ্বারা একই সময়ে গঠিত। একই দেবতা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু বিভিন্ন দেবতার মূর্ত্তিতে ভাবভঙ্গি ও বস্ত্রালঙ্কারের বিশিষ্ট সমতা দেখিলে শিল্পী ও সময়ের অভিন্নতার সন্দেহ না হইয়া পারে না। দুইটি মূর্ত্তির প্রভেদ এই যে চণ্ডীমূর্ত্তি চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মানা এবং ভুবনেশ্বরীদেবী ষড়্‌ভুজা ও নিষণ্ণা। অবশ্য চক্ষুর্দ্বয়ের দিব্য করুণার্দ্রদৃষ্টিতে, অভয়মুদ্রার হস্ত-ভঙ্গিমায় এবং সমাসীনা মূর্ত্তির ধীর গম্ভীর শান্ত মধুর অঙ্গপ্রতিভায় ভুবনেশ্বরী অতুলনীয়া। কিন্তু উভয় মূর্ত্তিতে একই প্রকারে কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র একই ভাবে পরিহিত, অলঙ্কারগুলি প্রায় সবই এক এবং অভিন্নরূপে প্রতি অঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে; মস্তকের মুকুট, কর্ণের কুণ্ডল, কণ্ঠের হার, বক্ষের কঞ্চুলী, বিপুল পয়োধরের উপর একই ভাবে বিলম্বিত রত্নমালা, উন্মুক্ত নাভি, তন্নিম্নে প্রশস্ত রত্নকাঞ্চী, একই প্রকারে দক্ষিণদিকে বঙ্কিম কটীদেশ, হস্তদ্বয়ে একই ভাবে সংবদ্ধ কেয়ূর মালা ও পদদ্বয়ে মঞ্জীর, দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ ও তদুপরি মন্দির-প্রতিকৃতি, একই প্রকার শূর্পাকৃতি সমগ্র প্রস্তর ফলক এবং পদতলে একই প্রকারে অঙ্কিত অর্দ্ধশায়িত সিংহ ও উপবিষ্ট দূতীগণ—এই সমস্ত দেখিলে কেহ না বলিয়া পারে না যে এই দুইটি মূর্ত্তি একই সময়ে সম্ভবতঃ একই কারিকর দ্বারা প্রস্তুত। চণ্ডীমূর্ত্তি লক্ষ্মণসেনের আমলে প্রস্তুত হইলে, ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিও যে তাঁহারই সময়ে বা অগত্যা তাঁহার পুত্রের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। লক্ষ্মণসেন যেখানে এমন সুন্দর অতুলনীয় প্রকাণ্ড দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে তদুপযোগী বৃহৎ মন্দির ছিল; এবং শুধু তাহাই নহে, যেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ অসংখ্য দেবদেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেখানে যে সেন-রাজগণের বাগড়ী ভুক্তির এবং অগত্যা তদন্তর্গত কোন মণ্ডলিকার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইতে পারে।

দিগ্বিজয় প্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে যে লক্ষ্মণসেন সেনহট্ট নামক এক নগর

* J. & P. A. S. B., July, 1913.

প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বারা বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান সেন-হাটি গ্রামকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন লক্ষ্মণসেন রাজা তখন কি সেনহাটি গ্রামে লোকের বাস ছিল? এই স্থান প্রথমে জলমগ্ন ছিল, তাহারই মধ্যে গ্রামের উদ্ভেদ হইতে থাকে। এই জলমগ্ন স্থানকে ছুঁচহাটির বিল বলিত। পরে যেখানে জমির পত্তন হইয়া ক্রমে জঙ্গল হইয়া গেল, তথায় আসিয়া চক্রবর্ত্তিগণ জঙ্গল কাটাইয়া বাস করেন; উহারাই এখানকার "কাটিকাটা বাসিন্দা", এজন্য উহাদের উপাধি হয়, "কাটানি।" ইহারা কাটানি গাঁইভুক্ত ব্রাহ্মণ। কাটানিগণ এখন একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিতেছেন। ক্রমে এখানে অন্য ব্রাহ্মণ ও নিম্নশ্রেণীর কায়স্থগণের বাস হইতে থাকে। তৎপরে বৈদ্য ধন্বন্তরি বংশের পূর্ব্ব পুরুষ কৌলিন্যে খ্যাতিমান্ হিঙ্গুসেন এখানে আসিয়া বাস করেন। * হিঙ্গুসেন হইতে এক্ষণে ১৯ পুরুষ হইয়াছে। বৈদ্যবংশের উন্নতি, বাল্যবিবাহ ও বংশ-বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে উহাতে কোন ক্রমে ৫০০ বৎসরের অধিক হয় না। কিন্তু লক্ষ্মণসেন সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের আমলে সেনহাটি নাম ছিল কিনা বিচার-সাপেক্ষ। হয়ত লক্ষ্মণসেনের সময়ে সেখহাটির নামই হইয়াছিল, সেনহট্ট। পরে সেস্থান সেখহাটি হইয়া গেলে হিঙ্গুসেনের সময় হইতে ছুঁচহাটির নাম হয় সেনহাটি। অবশ্য ইহাকে অনুমান ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন পাঠান বিজয়ের পর নবদ্বীপ হইতে শাঁখনাটে পলাইয়া যান। এই শাঁখনাট কি সেনহাট, শাঁখহাট বা শঙ্কর-হাট হইতে পারে না? মদনপাড় ও ইদিলপুরের তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারি সেন-রাজগণের পূর্ণ নাম ছিল—অরিরাজবৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর বিজয়সেন দেব, অরিরাজনিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর বল্লালসেন দেব, অরিরাজসূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেব, অরিরাজ-অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর কেশবসেন দেব এবং অরিরাজ-বৃষভাঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর বিশ্বরূপসেন দেব। সকলের নামেতে শঙ্কর আছে। সেনরাজ-প্রতিষ্ঠিত স্থান শঙ্করহট্ট হওয়া সম্ভব নহে কি? কেহ কেহ শাঁখনাটকে

* "রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্ট নগরীমধ্যবাস সঃ।"

কটিকণ্ঠহার প্রণীত "সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।"—৪৭ পৃঃ।

জগন্নাথ করিয়া লইয়াছেন। সেখহাটিরও একটি পূর্ব্বনাম ছিল জগন্নাথপুর। * সে নাম এখনও চলিতেছে, হয় ত এই সমস্ত জল্পনার মধ্যে কিছু চিন্তা করিবার বিষয় আছে।

দশম পরিচ্ছেদ—সেন-রাজত্বের শেষ।

লক্ষ্মণসেনদেব যখন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর। তাঁহার রাজত্বকাল ২৭।২৮ বৎসর। তন্মধ্যে প্রথম কয়েক বৎসর তিনি পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করেন। তাঁহার বীরত্বের অভিযানের যে সব কথা আছে, তাহার কতক তাঁহার পিতার রাজত্বকালে সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পার হইল, তখন তিনি রাজকার্য্য একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপ আসেন। এ সময় তাঁহার পুত্র মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ তিন জনই প্রাপ্তবয়স্ক। জ্যেষ্ঠ মাধব ভাবী উত্তরাধিকারী। পিতার রাজত্বকালে তিনি তৎসঙ্গে লক্ষ্মণাবতীতেই থাকিতেন। কেশব সম্ভবতঃ রাঢ় অঞ্চল শাসন করিতেন। এবং বিশ্বরূপ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই সুদূর বিক্রমপুরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। বাগ্‌ড়ীর অন্তর্গত যশোহর-খুল্‌না তখন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল। এখানে পৃথক্ কোন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন কিনা বা কে ছিলেন, ঠিক জানা যায় না।

লক্ষ্মণসেন যখন গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপ আসেন, তখন মাধবই গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একবার বঙ্গত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রায় কেদারনাথ যান; কুমায়ুনে যোগেশ্বরের মন্দিরে মাধবসেন কৃত দানপত্রের তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। † তৎপরে মাধবসেনের আর কোন সংবাদ পাওয়া

---

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় অনুমান করিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন সমতটে বা সুন্দরবনে গিয়াছিলেন। শাশ্বতী, ১৩২০, ফাল্গুন, ৬৮৯ পৃঃ

† Atkinson's Kumaon, p. 516; J. A. S. B. 1896. p. 28.

যায় না। সম্ভবতঃ তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এজন্য বৃদ্ধ নৃপতিকে আরও বৈরাগ্যপরায়ণ করিয়াছিল। এখন হইতে কেশব রাঢ় ও বরেন্দ্র উভয় প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি বিশ্বরূপের মত বীর বা সুদক্ষ ছিলেন না। এজন্য ফল হইল, রাজ্যমধ্যে বিপ্লব ও ষড়্যন্ত্র। বল্লাল ও লক্ষ্মণ যে কৌলীন্যের সৃষ্টি করিয়া সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন, সেই দেশময় আন্দোলনেই লোক ব্যতিব্যস্ত ছিল। কাহার কুল গেল, শীল গেল, কে কিরূপ মর্য্যাদা পাইল তাহাই তখন একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। বল্লাল কুলীনদিগের কুললক্ষণ রক্ষার পর্য্যবেক্ষণ জন্য যে ঘটকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাপ্তিযোগের অনুপাতে স্তাবকতা বা কুৎসারটনা দ্বারা দেশ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সেনরাজত্বে সংস্কৃতের নবচর্চ্চা ঘটক-কারিকারই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। যখন সকলেই সমাজ লইয়া ব্যস্ত, রাজমন্ত্রণা-গৃহ সামাজিক বিচারে কোলাহলময়, মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মস্তিষ্ক কুলের কূটতর্কে বিলোড়িত, তখন দেশের দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না।

বৃদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণপণ্ডিত দ্বারা পরিবৃত হইয়া শাস্ত্র ও পরলোকচর্চ্চায় স্বচ্ছন্দে নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। গৌড় হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলীনের বাস হইয়াছিল। সকলেই নবদ্বীপে রাজার সভায় আসিতেন, কিন্তু আসিতেন কুলমর্য্যাদার জন্য, রাজকার্য্যের জন্য নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নবদ্বীপে শাসনকেন্দ্রস্বরূপ কোন রাজধানী ছিল না। বৃদ্ধ রাজার প্রাসাদ রক্ষার জন্য সামান্য সংখ্যক প্রহরী মাত্র ছিল। এই সময়ে মুসলমান আক্রমণ হয়।

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার * নামক খিলিজীবংশীয় এক অজ্ঞাতনামা বিকটমূর্ত্তি তুর্ক সৈনিক, দিল্লীশ্বর কুতবউদ্দীনের নিকট হইতে এক জায়গীর পাইয়া মগধে আসেন। সেখানে দেশ লুণ্ঠনাদি দ্বারা যথেষ্ট ধন সঞ্চয় ও সৈন্যসংগ্রহ করেন এবং বিহারদুর্গ হস্তগত করিয়া লন। জিগীষা জাগিলে থামে না। বঙ্গের অবস্থা তাঁহার

* ইঁহার পুরা নাম ইকতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ-ই-বক্ত ইয়ার খিলিজী। বক্ত-ইয়ার ইঁহার পিতার নাম। সুতরাং বঙ্গবিজেতাকে ইক্‌তিয়ার উদ্দীন বা সংক্ষেপতঃ মহম্মদ খিলিজী নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

জানিতে বাকী ছিল না। যখন তিনি বঙ্গবিজয়ের কল্পনা করিতেছিলেন, তখন গৌড়ের ষড়্যন্ত্রকারিগণের সহিত উপঢৌকনের আদানপ্রদানে পূর্ব্বেই বঙ্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এদেশের কখনও পরাজয় হয় নাই। উপঢৌকনের গৌরব রক্ষার জন্য ফলিতজ্যোতিষীর ভাগ্যগণনা দেশময় লোককে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। দেশের দুর্ভাগ্য বক্ত-ইয়ার বা ভাগ্যবানের পুত্রের ভাগ্যে পরিণত হইল। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার বঙ্গযাত্রা করিলেন, কিন্তু গৌড়ে না আসিয়া তিনি প্রথমেই নবদ্বীপে গেলেন; কারণ, জানিতেন বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন এইস্থানেই বাস করিয়াছিলেন।

মীনহাজ-ই-সিরাজ নামক একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের তবকাত-ই-নাসারি * নামক গ্রন্থে বঙ্গাধিকারের প্রসঙ্গ আছে। ঐতিহাসিক মীনহাজ বঙ্গ-বিজয়ের প্রায় ৬০ বৎসর পরে গৌড়ে আসিয়া সমসুদ্দীন নামক একজন বৃদ্ধ সৈনি-কের পুরাতন গল্প হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখে কালিমা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন মহম্মদ সৈন্য-সামন্ত জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ 'নোদিয়া' রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, প্রহরীদিগের হত্যাসাধন করত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ হইতে বৃদ্ধ রাজা 'লছমনিয়া' † জগন্নাথে বা পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন। বঙ্গবিজয়-কাহিনীর ইহাই আবার একমাত্র প্রমাণ।

কিন্তু এ অলৌকিক দিগ্বিজয়কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র অভি-শাপ দিয়া বলিয়াছেন :—"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" ‡ অথচ

---

* Tabaqat-i-Nasiri by Minhaj-i-Saraj Abu-Umr.-Usman, son of Mahammad-i-Minhaj Al-Jarjani, translated from Persian, by Major H. G. Raverty, 1881.

† কেহ কেহ লছমনিয়াকে শুদ্ধ ভাষায় লাক্ষ্মণেয় করিয়া তদ্দ্বারা লক্ষ্মণ সেনের পুত্রকে বুঝিয়াছেন। তদনুসারে কেহ বলেন কেশবসেনই এই লছমনিয়া। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেখ শুভোদয়াতে লছমনিয়াকে স্পষ্ট ভাবে বল্লালের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। মুসলমানেরা লছমন অর্থাৎ লক্ষ্মণের নামের শেষে অবজ্ঞাসূচক আলেফযোগ করিয়া লছমনিয়া করিয়াছেন; লছমনিয়া ও লছমন একই কথা। [সাহিত্য, ১৩০১, বৈশাখ]

‡ বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

এই কথা দেশী বিদেশী শত লেখনীমুখে চর্ব্বিতচর্ব্বণে এমনভাবে এই বাঙ্গালীর কলঙ্ক দ্বারে দ্বারে ছড়াইয়া দিয়াছে, যে কোন প্রাদেশিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে গেলেও এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকা যায় না। সম্প্রতি সেন-রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আলোক-পাতে এই একমেবাদ্বিতীয়ং বৃদ্ধ সৈনিকের রঞ্জিত বর্ণনা বিচারসহ হয় না; * এবং সে বর্ণনা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করিলেও বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতা সপ্রমাণ হয় না। † হয়ত লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়াছেলেন; যেমন তিনি জীর্ণতনু লইয়া বৃদ্ধ হিন্দুর মত রাজ্যত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য গৌড় হইতে নবদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন, তেমনই মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে অদৃষ্টভীত স্বজন ও অমাত্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, স্বল্প প্রহরি-বেষ্টিত একপ্রকার অরক্ষিত রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথযাত্রা করিতে পারেন; কিন্তু তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গাধিপ ছিলেন না, এবং তাঁহার পলায়নে বঙ্গদেশ বিজিত হয় নাই।‡ একবার যেমন মহম্মদ খিলিজী মগধে ওদন্তপুরীতে বৌদ্ধবিহার লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে কিল্লা ফতে করিবার ভুল বুঝিয়া ছিলেন, এবারও তেমনই লক্ষ্মণসেনের পরিত্যক্ত নোদিয়া রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া দেখিলেন, এখানে রাজধানী নাই। ওদন্তপুরীর মুণ্ডিতশীর্ষ শ্রমণের পরিবর্ত্তে এখানে চতুর্দ্দিকে শিখাতিলক-সম্বলিত ব্রাহ্মণেরই বাস এবং তাঁহারাও অধিকাংশ পলায়িত। যদি নবদ্বীপেই রাজধানী থাকিবে, তবে মুসলমানেরা এখানে কোন শাসনকেন্দ্র করিলেন না কেন?

নদীয়ালুণ্ঠনের পর মহম্মদ গৌড় যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ ১২০০ খৃষ্টাব্দে

---

* শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, "লক্ষ্মণসেনের পলায়নকলঙ্ক" প্রবন্ধ, প্রবাসী ১৩১৫, অগ্রহায়ণ।

† গৌড় রাজমালা ৭৬-৭ পৃঃ

‡ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরে লক্ষ্মণ সেন জীবিত ছিলেন না। ডাক্তার কিলহর্ণ প্রথমতঃ এই মতাবলম্বী ছিলেন, পরে তাহা পরিত্যাগ করেন। রাখাল বাবু কুলগ্রন্থ ও দানসাগরাদি গ্রন্থের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া দুই এক খানি খোদিত লিপির অস্পষ্ট উক্তি হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৮ পৃঃ] তাহার মত সত্য হইলে লক্ষ্মণ সেনের পলায়নকাহিনী উড়িয়া যইবে।

এই ঘটনা হয়। * গৌড়ে কেশব সেন দুই বৎসর কাল সবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন। তখন গৌড় মুসলমানের করায়ত্ত হয়। এড়ু মিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, কেশব সেন সৈন্য সামন্ত সহ পূর্ব্ববঙ্গে এক রাজার নিকট আশ্রয় লন। † সে রাজার নাম পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন তিনি বিশ্বরূপ সেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ এই রাজা কেশবের নিকট বল্লালী কৌলীন্য সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বরূপের সে তথ্য অবিদিত থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে জ্যোতির্বর্ম্মা সেনরাজগণের সামন্তস্বরূপ চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহার পুত্র হরিবর্ম্মদেব। এই হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব বালবল্লভীভুজঙ্গ। সম্ভবতঃ কেশব সেন এই হরিবর্ম্মার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। ‡ যাহা হউক, পরে তিনি কিছুকালের জন্য বাগড়ী অঞ্চলে

---

* এই পাঠ ন বিজয়ের তারিখ লইয়া নানা বিতণ্ডা হইয়াছে। ব্লকম্যান সাহেবের মতে ১১৯৮—৯ খৃঃ অব্দ। রিভারিজ আকবর নামা হইতে দেখান যে লসং ১১১৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয় [J. A, S. B. 1818, Part 1, p. 2] কিলহর্ণ তাহাই সমর্থন করেন (Indian Autiquary, Vol. XIX] মীনহ'জের বর্ণনায় লক্ষ্মণের বয়স ৮০ বৎসর হইলে ১১৯৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গবিজয় হয়। নগেন্দ্র বাবু বলেন ১১১৯ খৃঃ অব্দের পর বল্লাল ৫০ ও লক্ষ্মণসেন ২৭।২৮ বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং বঙ্গবিজয়াব্দ ১১৯৭—৮। [J. A. S. B. 1896, p. 31] সেখশুভোদয়ায় একটি শ্লোক আছে :—"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে। বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরস্কঃ সমুপাগতঃ॥" ইহা হইতে সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় দেখান, ১১২৪ শাকে বা ১২০২—৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয় হয়। [সাহিত্য, ১৩০১, ৩পৃঃ] গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রশস্তি অনুসারে গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খৃঃ অব্দে মগধে রাজ্যারোহণ করেন। (A S. R. Vol. III., No 18) তাহার ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর মহম্মদ কর্ত্তৃক বিহার বিজিত হয়। [J. A. S. B. 1876, pt 1, p 331—2] তাহার পর বৎসর বা 'দোয়ম্ সালে' বঙ্গবিজয় হয় (Ravarty's Tabaqat-i-Nasiri p. 663)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রমাণে ১২০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয়ের তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন [J. A. S. B. 1913 pp. 277, 285] আমরা ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১৫৩ পৃঃ

‡ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ৩২৭ পৃঃ। কিন্তু হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও নিরূপিত হয় নাই। "গৌড়রাজমালায়"ও এবিষয়ে কোন নিশ্চিত তথ্য স্থির হয় নাই। রাখাল বাবু বলেন, বিজয় সেনের বঙ্গাধিকারের বহু পূর্ব্বে হরিবর্ম্মদেব স্বর্গারোহণ করিয়া ছিলেন। [প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ] তিনি সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। * অনুমান হয়, এই সময়েই সুন্দরবন অঞ্চলে জলবিপ্লব হইয়াছিল এবং তাহাতে এ প্রদেশ বাসের অযোগ্য হইলে কেশব সেন বিক্রমপুরে চলিয়া যান। † তথায় বিশ্বরূপ সেন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করিবার পর কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া রাঢ়ের কতকাংশ মাত্র স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন। সেখানে লক্ষ্ণৌর তাঁহাদের রাজধানী হয় এবং উহাই তাঁহাদের দক্ষিণ সীমা ছিল। বহু বৎসর কাল পাঠান রাজ্য গৌড় হইতে লক্ষ্ণৌর পর্য্যন্ত সংকীর্ণ ভূভাগে আবদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেখানে বীরনৃপতি বিশ্বরূপ পাঠানের সমস্ত অভিযান ব্যর্থ

---

* শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে খুল্‌না জেলায় উজিরপুর অঞ্চলে কেশব সেনের রাজবাটী ছিল (বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ৩২৭ পৃঃ) কিন্তু তিনি জানেন না যে উজির-পুর খুল্‌নায় নহে, যশোহরে এবং তথায় কেশব সেনের রাজবাটী ছিল না, এক দাম্ভিকপ্রকৃতিক রাজা কেশব ঘোষের রাজবাটী ছিল। আমরা যথা স্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

† কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে যে গ্রাম শ্রুতিপাঠক বাৎস্যগোত্রীয় ঈশ্বর শর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, উহার পুর্ব্ব সীমা দ্বীগ্রাম, দক্ষিণে শঙ্করপাশা গোবিন্দকেলিনী ভূঃ সীমা, পশ্চিমে শঙ্করগ্রাম এবং উত্তরে বাগুলী বিভগদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বাঘুটিয়া বিভাগদির সন্নিকটবর্ত্তী তালতলা বা অন্য কোন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্তিখানির এইস্থানে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। তজ্জন্য গ্রামের নাম "তালপড়া পাটক" ছিল কিনা, জানা যায় না। তবে এই প্রথম যে "পলাশতালা সগুবাক নালিকেলা", তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নিকটে শঙ্করপাশা আছে, পার্শ্বে গোবিন্দপুর লক্ষ্মীপুর আছে ; নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান দেপাড়া বা দেয়াপাড়া দ্বীগ্রাম হইতে পারে, সেখহাটিকে আমরা শঙ্করগ্রাম বলিয়া অনুমান করিয়াছি। মদন পাড়ে বিশ্বরূপ সেনের (কেশব সেনের ?) তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে. তাহাতে ও এই ঈশ্বর শর্ম্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ শর্ম্মাকে ফরিদপুর কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জকাষ্টী (বর্ত্তমান পিঞ্জারি) গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কেশব সেন গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রসিদ্ধ সেখহাটিতে কিছুকাল রাজত্ব করেন। তখন রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে শ্রুতি পাঠক ঈশ্বর শর্ম্মাকে যশোহরান্তর্গত উপরোক্তস্থান প্রদান করেন। পরে হঠাৎ এইস্থান হইতে প্লাবনাদিজন্য বা অন্যকারণে বাসত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ভ্রাতা বিশ্বরূপ ফরিদপুরে কোটালীপাড়ে বসতি করেন, তখন তিনি কেশব বা তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের নিকট হইতে তথায় একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন।

করিয়া দিয়াছিলেন, এবং "গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র" উপাধিতে * বিশেষিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ বিজয়ের ৬০ বৎসর পরে যখন মীনহাজ গৌড়ে আসেন, তখনও তিনি পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন সেন রাজত্ব দেখিয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের পর দনুজ মাধব এবং পরে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত সবলে পূর্ব্ববঙ্গে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। এ সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে জল-প্লাবন ও নিমজ্জন হেতু বাগড়ীর দক্ষিণাংশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যশোহর-খুল্‌নার উত্তরাংশে যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, তথায় স্থানীয় মাণ্ডলিক জমিদারেরা লাঠির জোরে রাজ্যের গণ্ডী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; এবং দরিদ্র প্রজা সন্তুষ্টিসাধন দ্বারা তাঁহাদের হস্তে নিস্তার পাইলেও দস্যু দুর্ব্বৃত্ত এবং হিংস্র জন্তু দ্বারা বিশেষ বিড়ম্বিত হইত। শরীরের বল ও বীরত্ব তাহাদের একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক বাদ বিচার একমাত্র ব্যবসায় ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ—আভিজাত্য।

বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণাচার ও বৈদিকক্রিয়া কাণ্ড এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের দ্বারা চিরন্তন ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ক্রমে দেশের প্রকৃতিতে এবংসংস্পর্শ দোষে তৎপক্ষে নানা ব্যাঘাত জন্মে। ইহাই দেখিয়া গৌড়মণ্ডলে পুনরায় বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ না পায়, এজন্য মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য সংস্থাপন ও কুলরক্ষার বিধি প্রণয়ন করেন। কালসহকারে পরীক্ষিত হইয়া তাঁহার বংশধরগণের সময়ে সেই সকল বিধি সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বঙ্গব্যাপী এক প্রবল আভিজাত্যের সৃষ্টি করে। সেন-রাজত্বের ইহাই সর্ব্বপ্রধান এবং স্থায়ী কীর্ত্তি। হিন্দু রাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু আভিজাত্যের প্রতিপত্তি যায় নাই। এখনও ইহার ফলে, দেশীয় রাজা না থাকিলেও, সমাজের শাসন চলিতেছে; লোক রাজনীতি ভুলিয়াছে, কিন্তু

---

* "শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণীঃ।
স গর্গযবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ॥"
মদনপাড়ে প্রাপ্ত বিশ্বরূপের তাম্র শাসন, J. A. S. B. 1896, pp. 9—15.

সমাজনীতি ভুলে নাই। বিদ্যাবল, ধনবল, জনবল প্রভৃতি যে বলেই যিনি বলী হউন না, সকলকেই আভিজাত্যের চরণতলে মস্তক অবনত করিতে হয়।

বংশপরম্পরাগত প্রবাদ ও বিবিধ কুলগ্রন্থ হইতে আমরা এই কৌলীন্য সংস্থাপনের প্রমাণ পাই। সেনরাজগণের প্রায় সকলেরই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু অবশ্য ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই সকল তাম্রলিপিতে দেশের অনেক কথা থাকিলেও এই কৌলিন্য স্থাপনের কথাটা নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বল্লালের আভিজাত্য সংস্থাপন এক 'রচা কথা'। * প্রথমতঃ তাম্রশাসনাদি রাজাদের শাসনকালেই প্রস্তুত হয়; তাহাতে সেই সময়ে যে সকল ঘটনা খ্যাতিলাভ করে, তাহারই উল্লেখ থাকে। আজ বঙ্গদেশে কৌলীন্যের যে প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, বল্লাল প্রভৃতির সময়ে তাহা ছিল না। বাস্তবিক ঘটকগণের অসংখ্য কুলকারিকা রচনা ও সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের পর, কৌলীন্য ব্যাপার লইয়া যেরূপ আন্দোলন চলিয়াছে, ইহা ওতপ্রোতভাবে সমাজ-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার মূলগ্রন্থি যেরূপভাবে বিলোড়িত করিতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ব্রাহ্মণের সৎকার ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া হিন্দু রাজা কখনও গর্ব্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা প্রকটিত করিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ কুলগ্রন্থে অনেক কথা অতিরঞ্জিত হইতে পারে এবং পরবর্ত্তী সময়ে পুঁথিলেখকদিগের দ্বারা উহাতে নানা অংশ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া বল্লালী কুলপ্রথা বলিতে কোন জিনিস ছিল না, এরূপ বলা যায় না। দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ঘটকেরা একেবারে বায়বীয় মন্দির গঠন করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। বিশেষতঃ এই কৌলীন্য সম্বন্ধীয় প্রবাদ কথা এরূপ ভাবে বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর আবালবৃদ্ধবনিতা এই বল্লালী আভিজাত্যের সহিত পরিচিত যে, ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। প্রবাদ বাদ দিয়া বোধ হয় জগতের কোন দেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রবাদে রঞ্জিত পল্লবিত কাহিনী থাকিলেও সকল ঐতিহাসিকের নিকট ইহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বল্লালের মত কোন পরিচিত হিন্দু রাজা নাই; বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে

* প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৭ পৃঃ

বঙ্গীয় হিন্দুর ইতিহাসের কিছু থাকে না,—আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্য্যাস এই আভিজাত্য।

আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্‌নাকে সমস্ত বঙ্গের সংক্ষিপ্ত সার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অন্যভাবে না হইলেও ইহা সামাজিক হিসাবে এখনও বঙ্গদেশে এরূপ আদর্শ সংস্থাপন করিতেছে যে, এ প্রদেশকে বঙ্গ সমাজের হৃৎপিণ্ড বলা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের সর্ব্বোচ্চ কুলীনগণ এখানে যেমন সমবেত, এখানে যেমন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ প্রবল সমাজ আছে, অন্যত্র কুত্রাপি একস্থানে তাহা নাই। এজন্য যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের সহিত কৌলীন্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সামাজিক ইতিহাসই এখানকার সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস। আর সেই সামাজিক ইতিবৃত্তের কিছু আভাষ পাইতে হইলে, কৌলীন্য বিধির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানা প্রয়োজনীয়। আমরা এজন্য এখানে সেন রাজগণের প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের স্থূল স্থূল কথাগুলি সংক্ষেপে সঙ্কলিত করিতেছি। *

আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে পরে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণী হয়; উত্তরকালে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ এদেশে আসিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত আদিশূরের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, তাঁহারা সাতশতী বলিয়া খ্যাত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে যশোহর-খুল্‌নায় রাঢ়ীয়দিগেরই প্রধান বাস, তদ্ব্যতীত দুই চারি ঘর বৈদিক ও বহুসংখ্যক সাতশতী আছেন। আদিশূরের সময় হইতে বহু কায়স্থ এদেশে আসিয়া তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে যশোহর-খুল্‌নায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থই অধিক; প্রতাপাদিত্যের সময়ে বহু সংখ্যক বঙ্গজও আসিয়া এদেশে বাস করেন। অন্য দুই শ্রেণীর কায়স্থ নাই বলিলেও চলে। বল্লাল সেনের সময় হইতেই বৈদ্যগণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ এই দুই ভাগে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে প্রধান বঙ্গজ বৈদ্যগণের বাসের জন্য যশোহর-খুল্‌না বিখ্যাত। সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গজ

---

* যাঁহারা এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়", শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্গীয় সমাজ", "কায়স্থকারিকা"র উপক্রমণিকা, বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রণীত "কায়স্থ-কুলদর্পণ," শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষের ব্রাহ্মণাদি প্রবন্ধ, কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্য-কুল-পঞ্জিকা, এবং পুঁথিতে হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও এড়ু মিশ্রের 'কারিকা' ও নুলোপঞ্চাননের "গোষ্ঠী কথা" পাঠ করিবেন।

বৈদ্য ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর কুল-কথাই আমাদের প্রধান আলোচ্য।

বল্লালসেন ব্রাহ্মণাদি জাতির আদর্শ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়স্বরূপ নয়টি কুল-লক্ষণ নির্ণয় করেন :—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্॥ *

আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তান সন্ততি এই সময়ে ৫৬ ঘর হইয়াছিলেন। উহারা ছাপ্পান্ন (৫৬) খানি পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে বাস করিতে-ছিলেন; উক্ত গ্রামসমূহের নামানুসারে তাঁহাদের গ্রামী বা গাঁই সংজ্ঞা হয়। এইজন্য উত্তর কালে কথা হইয়া ছিল ;—

"পঞ্চ-গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।
যদি থাকে দু'এক ঘর, তা সে সাতশতী আর পরাশর।"

বল্লালসেন উক্ত ছাপ্পান্ন গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে কুল-লক্ষণ অনুসারে বিচার করেন। উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বরেন্দ্রে বাস করিতে-ছিলেন, তাঁহারা মূলতঃ ৫৬ গাঁই ভুক্ত হইলেও, আপনাদিগকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের গাঁই সংখ্যা ১০০ হয়। এই ভাবে পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণী হয়। বল্লাল রাঢ়ীদিগের মধ্যে বন্দ্য, মুখুটি, চট্ট, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দ ও ঘোষাল এই অষ্টগ্রামী ব্রাহ্মণ-দিগকে সর্ব্বতোভাবে উক্ত নবলক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগকে মুখ্য কুলীন, অন্য ১৪ গ্রামী ব্রাহ্মণকে গৌণ-কুলীন এবং অবশিষ্ট ২৪ গাঁই ভুক্ত ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি পুনরায় বিচার করিয়া উক্ত মুখ্য ৮ গাঁইভুক্ত কুলীনদিগের মধ্যে ১৯ জনকে বিশেষভাবে সংকৃত করেন। বল্লালের নিকট সম্মানিত কুলীনগণ কেহই প্রতিগ্রহ বা দান গ্রহণ করিতে পারিতেন না। রাজা তাঁহাদিগকে গুণানুসারে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন।

সকল বর্ণের সামাজিক কার্য্যকলাপ ও চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য

---

* এখানে আবৃত্তি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। আবৃত্তি দ্বারা কুলীনদিগের আদান প্রদান ও পরিবর্ত্ত বুঝায়। ইহা দ্বারা কুলধর্ম্মের সমতা হয়। ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ অংশ, ১৪৪ পৃঃ

বল্লালসেন যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কতকগুলি লোককে ঘটক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; বংশাবলী রক্ষণ, সামাজিকের দোষগুণ কীর্ত্তন এবং কৌলীন্য সম্বন্ধীয় মর্য্যাদা নিরূপণ ইঁহাদের ব্যবসায় হইয়াছিল। বল্লাল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্য বংশানুক্রমিক করেন নাই। উহা লক্ষ্মণসেনের সময়ে হইয়াছিল। কুলীনগণের মধ্যে সামাজিক কুলমর্য্যাদা লইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণসেন দুইবার কুলীনদিগের পরীক্ষা করিয়া সমীকরণ করেন; তাহাতে ২১ জন কুলীন সমতুল্য বলিয়া গণ্য হন। এই সময়ে নির্দ্ধারিত হয় যে সপর্য্যায়ে কুলীনে দান গ্রহণই কর্ত্তব্য; উহার অন্যথা হইলে কৌলীন্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। দনুজ মাধবের সময় কৌলীন্য লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। উহার জন্য তাঁহাকে বিভিন্ন কালে ৪ বার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কুলীনের বংশজাত যাঁহারা ২।৩ পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিচিত হন। শ্রোত্রিয়গণও গুণের তারতম্যে নানা শাখায় বিভক্ত হন। পরবর্ত্তী যুগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলীনের মধ্যে মেলবন্ধন দ্বারা কৌলীন্য পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হয় এবং উহা দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে। আমরা যথাস্থানে তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যজাতির মধ্যেও কুলপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি প্রধান। বঙ্গীয় সেনরাজ বংশের আদিপুরুষ সামন্ত-সেন কর্ণাট দেশীয় ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন, এবং তদ্বংশীয়গণের সহিত আদি-শূরের বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছিল। কারিকাদির মতে "আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি। একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি।" শুধু সেনরাজ বংশ নহে, কাশ্মীর রাজ প্রভৃতি অন্য ক্ষত্রিয়ের সহিত আদিশূরের সম্বন্ধের পরিচয় আছে। আবার সেন রাজগণের সহিত, আদি-শূরের বংশ ছাড়া অন্য বৈদ্য সম্বন্ধও হইয়াছিল; শুনা যায় সামন্তসেন এক বৈদ্য-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তদ্বংশীয়েরা বৈদ্য হইয়া যান। বল্লালসেন দান-সাগরে আপনাকে স্পষ্টভাবে ক্ষত্রিয় না বলিয়া সেন বংশকে "ক্ষত্রচারিত্র-চর্য্যামর্য্যাদাগোত্রশৈল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালের মত প্রবলপ্রতাপ নৃপতি বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মানুগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। স্পষ্টবক্তা মুলোপঞ্চানন লিখিয়া গিয়াছেন:—

"বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান।
রাজায় রাজায় বিভা, সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃমাতৃ এক পক্ষ, রাজন্য গোত্রীয়॥"

এতদিনের আন্দোলনের ফলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে বৈদ্যের বৈশ্যত্ব ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এক প্রকার নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈদ্য রাজগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহাদিগকে রাজকীয় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশোদ্ভব নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত ও শ্রীধরদাস মহা-মাণ্ডলিক ছিলেন। সে সময়ে কায়স্থে ও বৈদ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত কায়স্থ বৈদ্যেও বিবাহ চলিতেছে। বিংশ বর্ষ পূর্ব্বেও যশোহর-খুল্‌নার বহুস্থলে উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থে ও বৈদ্যে পরম সম্প্রীতিতে বাস করিতেন। কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রতি এক অনর্থক জিগীষা জাগিয়া সে সম্প্রীতি নষ্ট হইয়াছে। ইহা যশোহর-খুল্‌নার এক মহা অনিষ্টের কারণ। বল্লালসেন বৈদ্য কি কায়স্থ ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। * তবে

---

* এই বিষয় লইয়া এক্ষণে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। এমন কি এই সূত্রে বঙ্গদেশে কায়স্থ বৈদ্যে বিকট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদ্য পক্ষে বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কায়স্থ পক্ষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কায়স্থের উপনয়নে বিরক্ত হইয়া মনে মনে কায়স্থবিদ্বেষী তাঁহারাও কখন কখন বৈদ্য-পক্ষসমর্থনে চেষ্টিত। কোন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আলোচনা ও তর্ক যত অধিক হয়, ততই ভাল। কিন্তু সেই তর্ক ও বিচার যদি জাতীয় বিদ্বেষ ও গালিবর্ষণে পর্য্যবসিত হয়, তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় 'বল্লাল মোহমুদ্গার' প্রভৃতি গ্রন্থে সমগ্র কায়স্থ জাতির উপর তীব্র গালিবর্ষণ করিয়া যে ভাবে লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত প্রবীন প্রগাঢ়পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্তই হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যশোহরবাসী; তিনি জাতিধর্ম্ম জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া 'আদিগেহের' বৈদিক সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার আদিগহ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চায় না। সমগ্র যশোহর তাঁহার পাণ্ডিত্যগৌরবে গৌরবান্বিত। আমাদিগকেও তাঁহার জীবনী কথায় তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চার ইতিবৃত্ত সংকলন করিতে হইবে। তাঁহার মত ব্যক্তির লেখনীমুখে যদি যশোহর-খুল্‌নার লোকের কোন অনিষ্ট হয়, তাহা বড় দুঃখের বিষয়। কায়স্থ বৈদ্য-বিদ্বেষ দেশের এমনই অবস্থা করিয়াছে যে যশোহর-খুল্‌নায় যেখানেই এই দুই জাতির একত্র বাস, সেখানেই ঘোর বিবাদ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্থানীয় সমাজ, এমন কি, স্কুল, বারো-য়ারী, লাইব্রেরী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। ইহাতে দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। সকলেই উন্নতিকামী। বিংশ বৎসর পূর্ব্বে দেশময় আন্দোলনের মধ্যে

উপরিভাগে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে আমাদের বিশ্বাস যে বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও তিনি নিজে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বল্লাল নীচ জাতীয় স্ত্রীগ্রহণ করিলে, লক্ষ্মণসেন কুলরক্ষার জন্য ক্ষমতাবলম্বী বৈদ্যদিগকে উপবীত ত্যাগ করিতে এবং স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, ইহা অপ্রত্যয় করি না। এখনও এইজন্য বল্লালী বৈদ্য ও লক্ষ্মণসেনী বৈদ্য বলিয়া বৈদ্যদিগের দুই শ্রেণী আছে।

এই দুই শ্রেণী যথাক্রমে রাঢ়ী ও বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। রাঢ়ীদিগের আর একটি শাখা ছিল পঞ্চকোটী। রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী বৈদ্যগণ চিরকালই উপবীতধারী ও সদাচারসম্পন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভের সময় বঙ্গজ বৈদ্যগণের উপবীত গ্রহণের চেষ্টা আরব্ধ হয়। বঙ্গজ বৈদ্যগণের মধ্যে কুল ত্রিবিধ:—সিদ্ধ বা মুখ্য, সাধ্য এবং কষ্ট। অনেকে বল্লালের অন্ন দোষে দুষ্ট ও স্থান ভ্রষ্ট হইয়া সাধ্য সংজ্ঞাভুক্ত হন। যাঁহারা সম্পূর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়া শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই কষ্ট। মুখ্য কুলীনদিগের মধ্যে আটজনে প্রথম কৌলীন্য পাইয়াছিলেন; শক্তি-গোত্রীয় দুহি ও শিয়াল, ধন্বন্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পন্থ এবং কাশ্যপ-গোত্রীয় ত্রিপুর ও কায়ু। ইহাদের মধ্যে দুহি, শিয়াল, বিনায়ক ও গয়ি 'সেন' উপাধিযুক্ত ছিলেন; চায়ু ও পন্থের উপাধি ছিল 'দাস' এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাধি ছিল গুপ্ত। দুহির পৌত্র হিঙ্গু পয়োগ্রামে এবং বিনায়কের প্রপৌত্র হিঙ্গু সেনহাটীতে আসিয়া বাস করেন; ক্রমে সেন ও দাস উপাধিধারী সর্ব্বজাতীয় কুলীনেরা

যশোহর-খুল্‌নার উপবীতবিহীন বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজাচারের দাবী করিয়াছেন। আজ কায়স্থসম্প্রদায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের জন্য ব্যস্ত। সবাই উচ্চ হইতে চায়। হস্তবিহীন ঘটকরাজ বলিয়াছেন:—"হাতে ঘুরাইয়া মুলো কয়, সবাই ত উচ্চ হ'তে চায়, দেখি কা'র আছে কত পুণ্য শক্তি।" আসুন, আমরাও তাহাই দেখি। সময় যোগ্যাযোগ্য প্রমাণ করিবে। জাতি বা জাতীয়তার হিসাবে বল্লাল সেনের মত ক্ষেত্রজ পুত্র ও ব্যাভিচারী রাজাকে আপন জাতি বলিয়া টানাটানি করিয়া কায়স্থ বা বৈদ্যের সামাজিক কোন উৎকর্ষ নাই। প্রত্নতত্ত্বদর্শীর হস্তে তাঁহার জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের ভার দিয়া, আসুন, আমরা কায়স্থ বৈদ্য পূর্ব্ববৎ সম্প্রীতিতে পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বাস করি এবং দেশের ও দশের কল্যাণভাজন হই। বৈদ্য পণ্ডিতের অসাধারণ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং দৈবীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসাবিদ্যা ও মসীজীবী কায়স্থের উর্ব্বর মস্তিষ্ক, তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভা এক সময়ে বঙ্গের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। এ পুস্তক তাহার কতকটা আভাস দিবে।

যশোহর-খুল্‌নায় সেনহাটি, পয়োগ্রাম, মূলঘর, ভট্টপ্রতাপ, কালিয়া, বেন্দা প্রভৃতি স্থানে সগৌরবে বাস করিতেছেন। আদান প্রদানাদি দ্বারা ইঁহাদিগেরও কুল-মর্য্যাদার তারতম্য হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের মত কায়স্থগণও কুলের নবলক্ষণ অনুসারে বিচারিত হন। কায়স্থের চারি শ্রেণীর মধ্যে বল্লালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ তৎপ্রদত্ত কুলমর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজগণ বল্লালী আভিজাত্য গ্রহণ করেন এবং এই দুই শ্রেণীর কায়স্থই যশোহর-খুল্‌নার অধিবাসী। তন্মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থই অধিক। যশোহর-খুল্‌নার মত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের এমন সমাজ কুত্রাপি নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন বিখ্যাত "যশোহর সমাজ" সংস্থাপন করেন, তখন এদেশে বঙ্গজগণেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লাল ও লক্ষ্মণের পর বহু বার দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ বা একজাই হইয়াছে। যথাস্থানে উহার বিবরণ দিব। ইহাদ্বারা কুলবিধি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কতটুকু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বঙ্গজ সমাজে এত অধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই; কারণ সেখানে বহুদিন দেশাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত নৃপতি-গণই কুলপতি ছিলেন।

আদিশূরের সময়ে গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন-গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ঘোষ বসু মিত্র দক্ষিণরাঢ়ে কৌলীন্য পান, গুহ বঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন এবং দত্ত ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া নিষ্কুলীন হন। প্রবাদে আছে যে দত্ত (সম্ভবতঃ নারায়ণ দত্ত) সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন :—

দত্ত কা'রো ভৃত্য নয়, শুন মহাশয়
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়॥

এবং এই জন্যই,—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী
অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি॥

এই তিন ঘর ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের অবশিষ্ট মৌলিক। মৌলিকেরা

সিদ্ধ ও সাধ্য দুইভাগে বিভক্ত। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ, দাস ইহারা সিদ্ধ মৌলিক বা 'আটঘ'রে' এবং চন্দ্র, সোম, আদিত্য, রাহা, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক 'বাহাত্তরে' কায়স্থ। সেন-রাজত্বকালে কুলীন-দিগের সহিত কেবল সিদ্ধ মৌলিক বা আটঘরের সহিত আদান প্রদান চলিত। সাধ্যের মতে কয়েক ঘরের সহিতও এখন চলিতেছে। কুলীনেরা এমন সদাচার-সম্পন্ন ছিলেন যে, ব্রাহ্মণের মত ঠাকুর উপাধি লইয়া তাঁহারাও ঘোষ ঠাকুর, বসু ঠাকুর ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত হইতেন। সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইয়া বসুগণ সর্ব্বাধিকারী উপাধি লইয়াছিলেন। এখনও সে উপাধি চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে 'ঠাকুর' বা 'ঠাকুরতা' অনেক কুলীনের উপাধিভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত মকরন্দ ঘোষের ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ে নিশাপতি ও প্রভাকর, দশরথ বসুর ৫ম পর্য্যায়ে শুক্তি ও মুক্তি এবং কালিদাস মিত্রের ৯ম পর্য্যায়ে ধুই ও গুই লক্ষণ-সেনের সভায় বংশানুক্রমিক কৌলীন্য লাভ করেন। উক্ত ছয় জনের বাসস্থানের নামানুসারে যথাক্রমে বালী, আকনা, বাগাণ্ডা, মাহিনগরী, বড়িষা ও টেকা এই ছয়টি সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত ছয় জনই মুখ্য কুলীন ছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততি কুলীনগণ ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত হন। ইহাকে নবরঙ্গ কুল বলে। ইহার মধ্যে ৫টি মূল ও ৪টি শাখা কুল। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ষড়্ভ্রাতৃক বা ছ'ভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ এই ৫টি মূল এবং কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র বা দ্বিতীয় পো, ছ'ভায়া দ্বিতীয় পো, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো ও তেওজ দ্বিতীয় পো বা দোজো পো এই চারিটি শাখা কুল। মুখ্য কুলীনেরা আবার তিন উপবিভাগে বিভক্ত—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। জন্মানুসারে যিনি যেরূপ কুলীন হন, উচ্চকুলে দান গ্রহণাদি দ্বারা তিনি নিজের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিতে বা বাড়িয়া যাইতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ বাড়িতে পারেন, তাঁহাদের কুলকে বাড়িকুল বলে। যেমন কনিষ্ঠ দান গ্রহণের উৎকর্ষে মুখ্য হইতে পারেন, এজন্য তাঁহার নাম বাড়িমুখ্য, তেওজ দান-গ্রহণের আধিক্যে কনিষ্ঠ হন বলিয়া তাঁহাকে বাড়িকনিষ্ঠ বলে। ইত্যাদি।

কুলীনদিগের কোন্ পুত্র কিরূপ কুলমর্য্যাদা লাভ করেন, একটি কুললতিকা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। উহাতে যে ২।৩ পুরুষ মাত্র দেখান হইল, তন্নিম্নে ঐ ভাবেই ক্রমান্বয়ে চলিবে এবং আশা করি উহা হইতে এই জটিল তত্ত্ব সহজে বুঝিয়া লইবার কতকটা সুবিধা হইবে। উহাতে মুখ্য কুলীনের ত্রিবিধ

দক্ষিণরাঢ়ীয় নবরঙ্গ-কুলের পর্য্যায়লতিকা।
প্রবল মুখ্য (জন্মমুখ্য)
১ম পুত্র
জন্ম মুখ্য (১)
২য় পুত্র
জন্ম কনিষ্ঠ (২)
(বাড়ি মুখ্য)
৩য় পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ (৪)
(বাড়ি মুখ্য)
৪র্থ পুত্র
জন্ম তেওজ (৫)
(বাড়ি কনিষ্ঠ)
৫ম পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ
২ পো (৮)
(বাড়ি কনিষ্ঠ)
৬ষ্ঠ পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ
২ পো (৮)
(বাড়ি মধ্যাংশ)
৭ম পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ
২ পো (৮)
(বাড়ি মধ্যাংশ)
১ম পুত্র
জন্ম ছভায়া (৩)
(বাড়ি কনিষ্ঠ)
২য় পুত্র
জন্ম কনিষ্ঠ
দ্বিতীয় পুত্র (৬)
(বাড়ি তেওজ)
১ম পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ (৪)
২য় পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ
২ পো (৮)
(বাড়ি তেওজ)
১ম পুত্র
জন্ম মধ্যাংশ (৪)
(বাড়ি ছভায়া)
২য় পুত্র
জন্ম ছভায়া ২পুত্র (৭)
১ম পুত্র
জন্ম তেওজ
তেওজ ২পো (৯)
মুখ্য কুলীনের শ্রেণী বিভাগ।
প্রকৃত জন্ম মুখ্য
১ম পুত্র
প্রকৃত মুখ্য (১)
২য় পুত্র
সহজ মুখ্য (২)
৩য় পুত্র
সহজ মুখ্য (২)
১ম পুত্র
২য় পুত্র
৩য় পুত্র
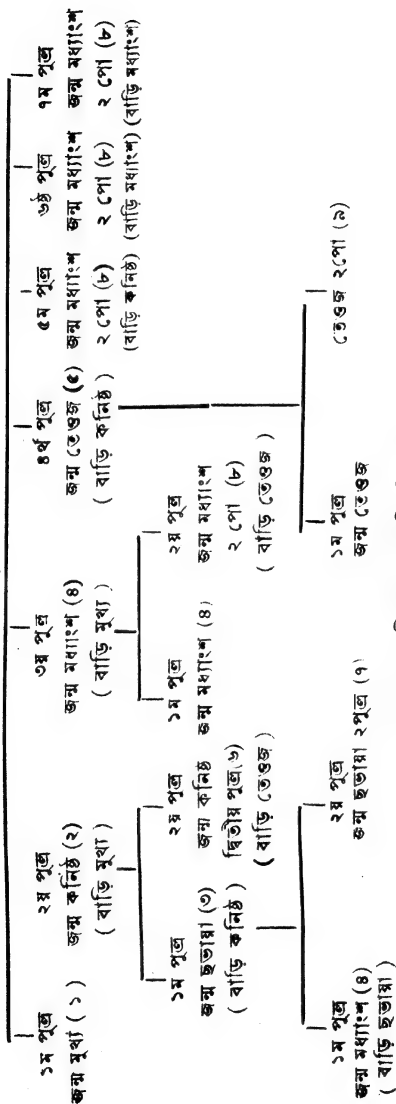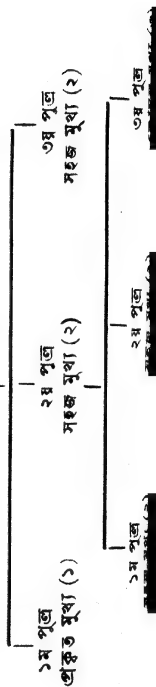
শ্রেণীবিভাগ একত্র দেখাইতে গেলে, বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহা পৃথক্ প্রদত্ত হইল। সুতরাং প্রথম লতিকায় জন্মমুখ্যের দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রকে সহজ ও উহাদের তৃতীয় পুত্রকে কোমল মুখ্য বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে প্রকৃত মুখ্যের ২য় ও ৩য় পুত্র বাড়িলে মুখ্য হন বলিয়া তাহাদিগকে বাড়িসহজ মুখ্য বলে। এই সকল ব্যতীত কুলীনগণের দানগ্রহণ প্রভৃতির বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম নিয়মাদি আছে, উহার লঙ্ঘনে কৌলীন্যের অধোগতি হয়। * দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের পুত্রগত কুল এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বপর্য্যায়ে কুলীন কন্যা গ্রহণ করিলে সকল ভ্রাতার কুলক্ষয় হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বিবাহের পর এবং অন্য ভ্রাতৃগণ মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। যিনি কুলরক্ষা করেন, তাঁহার শ্বশুর-কুলে অর্থাৎ শ্যালকের কুল ভঙ্গ না হয়, তাহা দেখিতে হয়। যে কোন কারণে কাহারও কুলভঙ্গ হইলে তিনি বংশজ-আখ্যা প্রাপ্ত হন।

বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে বসু, ঘোষ ও গুহ এই তিন জন কুলীন। অবশিষ্ট মৌলিক। তাঁহারা মধ্যল্য, মহাপাত্র, নিম্ন মহাপাত্র ও অচলা এই চারিভাগে মোট ৯৩ ঘর। ইহাদের মধ্যে কুল, পুত্র কন্যা উভয়গত। কুল ভঙ্গ হইলে, তাহাকে কুলজ বা বংশজ বলে। উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য যে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গজ কুলীনপ্রধান। তিনি নিজে কুলীন গুহ-বংশোদ্ভব ছিলেন। যশোহর-খুল্‌নায় বঙ্গজ মৌলিক নাই।

বল্লালসেন সর্ব্বজাতীয় লোকের উপর তাঁহার জাতিগঠন নীতি চালাইয়াছিলেন। ইহাতে নবশায়কেরা বাদ পড়ে নাই। যদি উহাদের মধ্যে কেহ কুলীন আখ্যা পায় নাই, তবুও প্রামাণিক বা পরামাণিক প্রভৃতি নানা উপাধি তাহাদের মানের পরিচয় দিত। নবশায়ক যথা :—

গোপো মালী তথা তৈল তন্ত্রী মোদক বারুজী
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥ †

অবশেষে ইহাই সাধারণ ভাষায় দাঁড়াইয়াছিল :—

---

* এই সকল বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বের জন্য কায়স্থ-কারিকা, কায়স্থকৌস্তুভ, কায়স্থকুল-প্রদীপ, কায়স্থকুলদর্পণ, কায়স্থ সমাজ, প্রভৃতি কুলগ্রন্থ দেখিতে হইবে।

† ইহাদের সাহায্যে পুরাকালে পরশুরাম ক্ষত্রিয়-বীর্য্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় ১৭৮ পৃঃ।

তিলী মালী তাম্বুলী, গোপ নাপিত গোছালী,
কামার কুমার পুঁটুলী, এই নব শাখাবলী। *

অর্থাৎ গোপ বা গোয়ালা, মালী বা মালাকর, তিলী (কলুদিগের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই,) তাম্বুল-ব্যবসায়ী বারুজীবী ও তাম্বুলী, নাপিত, মোদক বা কুরি, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় (তাঁতি) এবং শঙ্খবণিক্ (শাঁখারি,) কংসবণিক্ (কাঁসারি) ও গন্ধবণিক্—এই সকল জাতি এই নবশাখা ভুক্ত। ইহাদের জল আচরণীয় এবং ইহারা সদাচারসম্পন্ন। ইহারা পূর্ব্বতন বৈশ্যজাতি হইতে উৎপন্ন এবং এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে বৈশ্যাচার গ্রহণে চেষ্টিত। এই সকল জাতিই সেন-রাজত্বের সময় হইতে যশোহর-খুল্‌নার কোন কোন স্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে বারুজীবিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। তাহারা বিদ্যাচর্চ্চায় ও ধনসম্পদে এক অগ্রগণ্য জাতি।

এই সকল ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে সুবর্ণবণিকেরা প্রধান ছিলেন। কিন্তু বল্লালসেন যেমন কতকগুলি জাতিকে আভিজাত্যে সম্মানিত করেন, তেমনই অন্য কতকগুলি জাতিকে বিদ্বেষবশতঃ সমাজে অপদস্থ করিয়া রাখেন। ইহাদের মধ্যে সুবর্ণবণিক্ ও যোগী জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুবর্ণবণিক্‌গণ পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের ব্যবসায়ে ধনাঢ্য হন। পাল-রাজগণের রাজত্বকালে তাঁহারা অযোধ্যা অঞ্চল হইতে প্রথমে মগধে ও পরে বঙ্গে আগমন করেন। তথায় এই ধনশালী জাতি প্রথমতঃ সগৌরবে গৃহীত ও সুবর্ণবণিক্ বলিয়া পরিচিত হন। পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান হয়, উহাই সুবর্ণগ্রাম নামে বঙ্গের একটি প্রধান বন্দর হইয়াছিল। ইঁহাদের সহিত মগধের বৌদ্ধ নৃপতিদিগের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। বল্লালের সময় ইঁহারা

* গোছালী বলিতে বারুজীবীদিগকে বুঝায়; ইঁহারা এবং তাম্বুলী উভয়ে একই তাম্বুলের ব্যাবসায়ী ছিলেন। যাহারা বরজ নির্ম্মাণ করিয়া পান উৎপন্ন করিতেন, তাঁহাদিগকে বরজিয়া বা বারুজীবী এবং যাঁহারা সেই পান বিক্রয় করিতেন তাঁহারা ছিলেন তাম্বুলী। যাহারা নিজেদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পুঁটুলি বা পোঁটলা বাধিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা পুঁটুলী বলিয়া পরিচিত। শাঁখারি, কাঁসারি, গন্ধবণিক, ও ময়রা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। গন্ধবণিকেরা এক সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র অবাধ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাদিগের ইতিহাস পরে দিব।

ধনবলে এক প্রবল জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তৎকালে বল্লভানন্দ শেঠ (শ্রেষ্ঠী) প্রভৃত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধাভিযানে ব্যয় করেন। সে সময়ে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, পরে অসৌহৃদ্য হয়। সেন-রাজগণ বৈশ্য এবং সুবর্ণবণিকেরাও বৈশ্য বলিয়া নাকি উভয়ের মধ্যে একটা জাতীয় বিদ্বেষ ছিল। বল্লালের যথেচ্ছ শাসনে দেশমধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। বল্লভানন্দ অত্যাচারপীড়িত অনেক লোককে আশ্রয় দিতেন; শুনা যায়, পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ বল্লালের কুলমর্য্যাদা গ্রহণে অসম্মত হইলে, বল্লাল তাঁহাদের প্রতি কুপিত হন। কালে তাহারা শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বল্লভানন্দ তাহাদের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সময়ে বল্লাল পুনরায় অর্থ ঋণ চাহিলে, তাহাতে বল্লভানন্দ অস্বীকৃত হন। বস্তুতঃ তাঁহার নেতৃত্বে সুবর্ণবণিকেরা বল্লালের দ্বারে আভিজাত্য প্রত্যাশী হয় নাই। এজন্য বল্লালের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তাঁহাদিগকে নানাভাবে অপমানিত করেন; তাঁহাদের উপবীত ছিন্ন করেন, এমন কি দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই অত্যাচারপ্রপীড়িত সুবর্ণবণিকেরা কতক সুন্দরবন অঞ্চলে, কতক উড়িষ্যায় এবং কতক রাঢ়ে সরস্বতীকূলে সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহা হইতে কটকী, সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি সমাজ হইয়াছে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদ পরমভক্ত উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্-কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাঁহারা সুন্দরবন অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে যশোহরের উত্তরে ভূষণা অঞ্চলে বর্ত্তমান মামুদপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। এক্ষণে যশোহর-খুলনায় প্রায় দশ সহস্র সুবর্ণবণিকের বাস।

সুবর্ণবণিক্‌গণের মত যোগী জাতিকে বল্লালী কোপে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র। এই যোগী বা জুগীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা আদিনাথ, মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসম্প্রদায়ভুক্ত যোগী বা সন্ন্যাসিগণের মতাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে যখন বঙ্গীয় তান্ত্রিকতা বৌদ্ধমত বা সদ্ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, তখন গোরক্ষনাথ সেই মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা হঠযোগের ফলে নানা অদ্ভুত

প্রক্রিয়া দেখাইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দলভুক্ত হইতেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের কোন জাতিবিচার ছিল না। রাজা গোপীচন্দ্র কিরূপে এক হাড়িজাতীয় যোগীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বল্লালের সময়ে ইঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন, উত্তর কালে ইঁহারা নূতন শৈবমত অবলম্বন করেন। * ইঁহারা প্রকাশ্য বৌদ্ধ, ইঁহাদের জাতিবিচার বা অন্নবিচার ছিল না, এইজন্য ইঁহাদের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় বল্লাল ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। তদবধি ইঁহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যশোহর-খুল্‌নার বহুস্থানে বহুসংখ্যক যোগীর বাস। ইঁহারা এতদঞ্চলে বাস করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বধর্ম্মাচার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার অনেক নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। স্থানান্তরে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

বল্লাল এই দুই জাতির উপর যেরূপ অত্যাচার করেন, কৈবর্ত্তদিগের উপর তেমন সদয় হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কৈবর্ত্তগণ পূর্ব্বকালে ধীবর ছিল। সূর্য্য মাঝি নামক এক ধীবর লক্ষ্মণসেনকে আনিয়া দিয়া কিরূপে বল্লালের তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যমাঝি যেমন সূর্য্যদ্বীপের সম্পত্তি পুরস্কার পাইয়াছিল, তেমনি বল্লাল তাহাদের জল আচরণীয় করিয়া দেন। তদবধি তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হয়। দাস ও নাবিক। দাস ব-কৃষিব্যবসায়ী (হেলে) কৈবর্ত্তদিগের জল ব্যবহার্য্য, কিন্তু নাবিক বা মৎস্য-ব্যবসায়ী-(হেলে) দিগের জল অস্পৃশ্য। উহারা আবার চণ্ডাল জাতীয় মৎস্য ব্যবসায়ী-(জালিয়া) দিগের হইতে পৃথক্ হইয়া আপনাদিগকে মালো বলিয়া পরিচয় দেয়। যশোহর-খুল্‌নায় আদিযুগ হইতে বহু মালো বাস করিতেছে।

---

* It is stated in Pagsam Jon Zau (by Sampo Khanpo, a renowned Buddhist teacher of Tibbet), that about (13th century) this time foolish Jogis, who were followers of Buddhist Jogi Goroksha became Civaite Sannyasis. J. A. S. B. 1898 part 1, p. 25; Dr. Oldfield's Nepal; vol. II p. 264

দ্বিতীয় অংশ—ঐতিহাসিক।

(২) পাঠান রাজত্ব।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস।

—:০:—

পাঠান-রাজত্ব।

—•:*:•—

প্রথম পরিচ্ছেদ—তামস যুগ।

দুর্দ্দিন একাকী আসে না। ব্যক্তিগত জীবনে বা দেশের ইতিহাসে সেই একই কথা। বঙ্গদেশ যখন পাঠানের হাতে স্বাধীনতা হারাইল, তখন শত দুর্দ্দৈব আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল। যশোহর-খুল্‌নার অবস্থা আরও শোচনীয়। শুধু শাসন বা সমাজ সম্বন্ধীয় বিপ্লব নহে, প্রাকৃতিক বিপ্লবও তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। আমরা প্রাকৃতিক বিবরণে এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, সেনরাজত্বের পূর্ব্বে যেমন কয়েকস্থানে কয়েকটি বিপ্লব হইয়াছিল, সেনরাজত্বের অবসানের প্রাক্কালেও সেইরূপ সুন্দরবন অঞ্চলে, যশোহর-খুল্‌নার দক্ষিণাংশে একটি প্রবল প্লাবন ও অবনমনে বহুবিস্তৃত প্রদেশ নিম্ন হইয়া জলমগ্ন হয়। খুল্‌নার অধিকাংশ এবং যশোহরের দক্ষিণদিকে কতকাংশ এইভাবে নিম্ন হইয়া বাসের অযোগ্য হয়। ইহার বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না। কারণ পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরের মধ্যে এই অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, এবং এই যুগে দেশের লোক অরাজকতার মধ্যে নানাবিধ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সর্ব্বদা এরূপ শঙ্কিত থাকিত যে তাহারা কোনও প্রকার পুঁথিপত্রে দেশের অবস্থার কোন বিবরণ রাখিয়া যায় নাই। খুল্‌নার দক্ষিণভাগের অধিবাসিগণ কতক বিনষ্ট, কতক বাসত্যাগ করিয়া উত্তর মুখে পলায়ন করিয়াছিল। উত্তরভাগে যাহারা আত্মরক্ষা

করিয়াছিল, তাহারা নিজের প্রাণ ও জাতিমান রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত ছিল যে, পরের কথার খবর লইতে অবসর পাইত না এবং অত্যাচারী আগন্তুকগণের সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। এই ভাবে প্রায় দুইশত বৎসর গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দ হইতে ১৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরকে আমরা তামস যুগ বলিতে পারি। কারণ এ যুগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন।

এই বিপ্লব উত্তরদিকে ভৈরব নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; তখন ভৈরব ও ভদ্র উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ট লোকের বসতি ছিল। এই সময় হইতে ঐ প্রদেশ হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, এবং অদ্য পর্য্যন্তও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। জমি নিম্ন হইলে জলমগ্ন হয়, ক্রমে পলিদ্বারা ভূমি উচ্চ হইতে থাকে; উচ্চভূমিতে প্রথমতঃ জঙ্গল হয়; জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস-ভূমি হইয়া পড়ে; উহাদের উৎপাতে নিকটবর্ত্তী জনস্থান ত্যাগ করিয়াও লোকে অন্যত্র পলায়ন করিতে থাকে; এইজন্য যতদূর বিপ্লব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও উত্তরে অনেকদূর পর্য্যন্ত লোকের বাস উঠিয়াছিল। তাহার নিকটে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে সবলে হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত। এজন্য অধিবাসী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে সাহসী ও সবল হইতে হইয়াছিল।

শুধু হিংস্র জন্তুর উৎপাত নহে, দেশে তখন উৎপাত অনেক। প্রধান উৎপাত অরাজকতা। হিন্দুরাজত্ব গিয়াছে, মুসলমান রাজত্ব প্রকৃতভাবে আরব্ধ হয় নাই, এই সন্ধিযুগে দেশে রাজা নাই বলিলেও চলে অথবা দেশের রাজা একজন নহে, যে যেথানে পারে দশজনে রাজত্ব করিতেছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে। পশ্চিমে গৌড়ে পাঠানগণ রাজপাট বসাইয়াছিল, পূর্ব্বভাগে রামপালে সেনরাজগণ তখন বঙ্গের কর্ণধার, মধ্যে সমতট অঞ্চলে ভীষণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। গৌড়মণ্ডলে পাঠানেরা তখনও ভাল ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ সেনরাজগণের বিক্রমে তাহাদের পূর্ব্বমুখী গতি রুদ্ধ হওয়ায়, তাহারা স্বচ্ছন্দে রাজ্যবিস্তার করিবার মত নিরাপদ্ হইতে পারে নাই। পূর্ব্বদিকে সেনগণ মুসলমান-শত্রুকে প্রতিহত করিলেও তাহাদিগকে দেশান্তরিত করিবার মত শক্তিশালী ছিলেন না; এজন্য তাহারাও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া অজানিত শত্রুর মুখে পড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং

সমতট শাসন করে কে? যশোহর-খুল্‌নার যে অংশে বিপ্লবের পর হিন্দু বৌদ্ধ-প্রজা বাস করিতেছিল, তাহারা দস্যু দুর্ব্বৃত্তের উৎপাতে মহাবিভ্রাটে পড়িয়াছিল।

গৌড় অধিকার করিয়াই পাঠানেরা বঙ্গের রাজা হয় নাই। তাহাদিগকে বঙ্গ অধিকার করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। পাঠান আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ কখনও তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিয়াছিল কিনা ঘোর সন্দেহ। মহম্মদ খিলিজীর পরবর্ত্তী পাঠান রাজারা সর্ব্বদা দেশীয় জমিদার ও প্রজার সহিত অধিকার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাহাতে আবার দিল্লীর সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন মগধে আসিয়াছিলেন, তখন লর্ড ক্লাইবের মত তাঁহাকে কেহ চিনিত না, মানিত না। পরে তিনি বঙ্গ অধিকার করিয়া যখন দিল্লীশ্বর কুতব উদ্দীনকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি কুতবের নির্দ্দেশমত বঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি শত্রুর দেশে আত্মপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দিল্লীশ্বরের সহায়তার প্রত্যাশায় তাঁহার অধীনতা ঘোষণা করেন। তখন হইতে বঙ্গদেশ দিল্লীর সহিত রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত হয়। নতুবা তখন আর্য্যাবর্ত্তে দিল্লীর মত বহুস্থান ছিল, বঙ্গদেশকে বিশেষভাবে দিল্লীর ছন্দানুবর্ত্তী হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। এই দিল্লীর অধীনতার ফলে বঙ্গদেশে ভীষণ রাজত্ব-বিভ্রাট হইয়াছিল।

দুই চারি বৎসর রাজত্ব করিতে করিতে কোন পাঠান রাজা হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বা গুপ্তশত্রুর অসির আঘাতে দেহত্যাগ করিলে, সিংহাসন লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত। দিল্লী হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন একজন, স্থানীয় পাঠানেরা নির্ব্বাচন করিত আর একজন, হয় ত বীরবিক্রমে এক তৃতীয় ব্যক্তি উভয়ের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া রাজগদি কাড়িয়া লইতেন। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্যাপার বহুদিন চলিয়াছিল। পাঠকগণ প্রয়োজন বোধ করিলে বাঙ্গালার ইতিহাসে সে দীর্ঘ রাজতালিকা পাঠ করিতে পারেন। আমাদের তাহার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ গৌড়ে কে রাজা হয় বা না হয়, যশোহর-খুল্‌নায় তাহার খবর পৌঁছিত না। সেখানে রাজা ছিলেন দুই চারিজন ভূমিভিদ ভূম্যধিকারী। ইতিহাসে তাঁহাদের কথা নাই।

পাঠানেরা ছিল নবাগত পরদেশীয়। তাহারা তখনও বঙ্গদেশকে আপন দেশ

বলিয়া মানিয়া লয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে যেমন তাহারা হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা জন-হিতৈষণার বিনিময়ে শান্তিসুখ লাভ করিত বা শিল্প-সুষমায় বঙ্গভূমিকে শোভাময়ী করিয়াছিল, সেদিন এখনও আসে নাই। পরের দেশে আসিয়া এখন প্রথম কার্য্য আত্মরক্ষা এবং তৎপরে অর্থসংগ্রহ বা রাজ্য-বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক পদে পদে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, পূর্ব্বতন রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াও রাজ্য জয় হয় নাই। প্রজায় মানে না, তুর্ক সেনানীকে যেখানে সেখানে বিড়ম্বিত করে, উদ্রিক্ত হইয়া সবলে আক্রমণ করিতে আসিলে, প্রজারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়; প্রাণ দেয়, তবুও ধর্ম্ম দিতে চায় না; অর্থভাণ্ডার মাটীর তলে পুতিয়া বা জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া যায়, তবু তদ্দ্বারা নবাগত শাসকের সম্মান রক্ষা করে না। এ বড় বিষম দায়। দেশ জয় করিয়াও যদি দেশের রাজস্ব করগত না হয়, তাহাতে ভীষণ বিরক্তি ও অন্ধতা আসে। পাঠানদিগেরও তাহাই আসিয়াছিল।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে স্বর্গের রাস্তা বন্ধ, ইহাই ইস্‌লাম বা খৃষ্টধর্ম্মের মূল সূত্র। যাঁহারা খাঁটি মুসলমান বা খৃষ্টান তাঁহারা দৃঢ়রূপে এমতে বিশ্বাসবান্। সুতরাং অন্য কোন কারণে না হউক, পরহিতরতির জন্য স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করা তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন। মুসলমানদিগের মধ্যে যে কোন উপায়ে এই কর্ত্তব্য পালন করার প্রথা চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহা হইতেই অসির সাহায্যে ধর্ম্মমত প্রচারের কথা উঠিয়াছে। অন্য দেশে সে ভাবে ধর্ম্মমত প্রচারিত হউক বা না হউক, পাঠান-আমলে বঙ্গদেশে যে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এখানে উপায়ান্তর ছিল না। হিন্দুর মত স্থিতিশীল বা পরিবর্ত্তনের বিরোধী জাতি জগতে নাই। সে জাতির দর্শনশাস্ত্র এত উন্নত যে কথার বশে তাহাদিগকে বশীভূত করা একেবারে অসম্ভব। অথচ তাহাদের ধর্ম্মাচার মুসলমান হইতে এত ভিন্ন, এত বিরুদ্ধ যে হিন্দুরা আচারে ব্যবহারে হিন্দু থাকিলে, তাহাদিগের নিকট হইতে পাঠানেরা কোন প্রকার সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারিত না। সুতরাং হিন্দু বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া লওয়াই ধর্ম্ম বা রাজনীতি সব দিক্ হইতেই পাঠানের সাধনা হইয়াছিল। ইহার জন্য তাহারা হিন্দু বৌদ্ধের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে এদেশের বহুসংখ্যক লোক মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তজ্জন্যই আজ

দেখিতে পাই বঙ্গের অনেক স্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। ইহারা সকলেই পরদেশাগত মুসলমানের বংশধর নহে, প্রত্যুত ইহার অধিকাংশ হিন্দু সমাজের নানা স্তর হইতে ধর্ম্মান্তরিত। বল প্রয়োগ না করিলে লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত কি না তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার-প্রতিপত্তি হইতে বুঝা যাইতেছে। দেড়শত বর্ষের চেষ্টার ফলে এখনও খৃষ্টানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় রহিয়াছে, বলা যায়। খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলেও এতদ্দ্বারা শান্তিপ্রিয় খৃষ্টীয় সম্রাটের সহৃদয়তার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

ধর্ম্মপ্রচারের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য কারণেও তখন বল প্রয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল। অত্যাচার না করিলে অর্থাগম বা রাজ্য বিস্তারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দেশে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই অত্যাচারের ফল হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধগণ অধিক ভোগ করিত। বৌদ্ধদিগের উপর এই অত্যাচার সেনরাজত্বের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেনরাজগণ সামাজিক শাসন বা অন্যবিধ গুপ্ত কৌশলে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করা ব্যতীত দেববিগ্রহ বা মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিতে পারিতেন না। বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেব হিন্দুদের দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বৌদ্ধদিগের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও বুদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধনীতির প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল না, পরন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলে হিন্দুরা সকলেই প্রণাম করিতেন। সেনরাজগণ সময়ে সময়ে একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-দিগকে নির্য্যাতন করিতেন। শ্রমণ ব্রাহ্মণে চিরকাল বিরোধ ছিল; সেনরাজগণ কোন বৌদ্ধমঠের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বানু-গত আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ অল্পে অল্পে মঠের জমি করায়ত্ত করিয়া লইতেন; বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ বিবাদপ্রিয় ছিলেন না; বিবাদ হইলেও তাহাতে কায়স্থের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরাই জয়লাভ করিতেন।

পাঠান বিজয়ের পর মুসলমান কর্ত্তৃকই এইরূপ অত্যাচার অধিক হইতেছিল। মূর্ত্তিমাত্রেই ইস্‌লামের চক্ষুঃশূল; তাহাতে আবার দেশময় বৌদ্ধমূর্ত্তি। অহিংসা-ধর্ম্মী বৌদ্ধেরা কিছু নিরীহ; তাহারা কোন মঠ বা সংঘারামে একত্র অধিক সংখ্যাতে বাস করিত। বিহারসমূহে বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিত, ইহা মগধবিজয়ী পাঠানের জানা ছিল। সুতরাং একটি বিহার আক্রমণ করিলে যেমন অপরিমিত

অর্থ পাওয়া যাইত, তেমনই এক সময়ে অসংখ্য লোককে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করা যাইত। এইরূপ একটি বিহার ধ্বংসের কথা মীনহাজুদ্দীন স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গে আগমনের পূর্ব্ববৎসর মহম্মদ খিলিজী মগধে ওদন্তপুরী নামক স্থানে বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর ও পরিখা-পরিবেষ্টিত প্রাসাদমালা দেখিয়া উহাকে রাজধানী কল্পনা করিয়া আক্রমণ করেন। সে প্রাসাদের অধিবাসিগণ দ্বার বদ্ধ করিয়া কিছুকাল আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পাঠান বীরের নিকট অব্যাহতি পাইল না। মহম্মদ বক্তিয়ার পশ্চাদ্ভাগ হইতে বীরবিক্রমে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ে অসংখ্য লোকের হত্যাসাধন করিয়া অপরিমিত ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিলেন। সে স্থানের অধিবাসীর অধিকাংশই মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ এবং তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছিল। সেখানে রাশি রাশি পুস্তক ছিল; সে সকল পুস্তক কি বিষয়ক তাহা জানিবার জন্য হিন্দুদিগের সন্ধান করা হইল, কিন্তু সে হতভাগ্যদিগের প্রায় সবই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অবশেষে মুসলমান বিজেতা জানিয়া বিস্মিত হইলেন যে সেই দুর্গ বা নগরী কোন রাজধানী নহে, তাহা একটি বিরাট্ বিদ্যামন্দির বা বৌদ্ধবিহার। * ইহাই মুসলমান ঐতিহাসিকের নিজের কথা। এই ত মাত্র একটি বিহারের কথা, পাঠানেরা এমন যে কত বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারামের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা ব্রাহ্মণ ও রাজসৈন্যে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, বিদ্যামন্দিরকে রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভুল করে, অগ্রে রক্তস্রোত বহাইয়া পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আলেকজেন্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকাগারের ধ্বংসকারী মুসলমানের বংশধরগণ ধর্ম্মপ্লাবিত মগধবঙ্গে আসিয়া কত স্থানে কত কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। এই অত্যাচার যে ঐতিহাসিক সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা পাঠানদিগের নূতন নহে। রাজ্যজিগীষু জাতি মাত্রেই পররাজ্যের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে সে অত্যাচারকাহিনী আছে। হিন্দু বৌদ্ধে, শাক্ত বৈষ্ণবে বিবাদসূত্রেও অত্যাচার কম হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে "গতস্যানুশোচনা নাস্তি।"

যতদিন পর্য্যন্ত পাঠানগণ অস্থিরভাবে কেবলমাত্র অর্থের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, বঙ্গদেশে বাসস্থান স্থির করে নাই, ততদিন এইভাবে অত্যাচার চলিয়াছিল।

* Raverty's Tabaqat-i-Nasiri P. 552.

অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া জঙ্গলাকীর্ণ সমতটে বা হিন্দুশাসিত নদীবহুল পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা মঠ ছাড়িয়া পলাইত না, মঠগুলি অনেক সময়ে প্রাচীন রাজধানীর নিকটে অবস্থিত ছিল, এজন্য বৌদ্ধদিগের উপর মুসলমানের অত্যাচার অধিক পড়িয়াছিল। কতক নিহত হইত, কতক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। আর যে সকল নিম্নশ্রেণীর জাতির দূরদেশে যাইবার সংস্থান ছিল না, তাহারাও মুসলমান হইত, মুসলমানী কথা কহিত, মুসলমানী সাজে সাজিত, কিন্তু ধর্ম্মের বিশেষ ধার ধারিত না। পূর্ব্বেও যে ভাবে অন্নসংস্থান করিত, পরেও তাহাই করিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা যে সকলেই মঠে বাস করিত, সংসারধর্ম্মত্যাগী ছিল, তাহা নহে। অনেক গৃহস্থ বৌদ্ধ বুদ্ধপ্রচারিত সারনীতির মর্ম্ম জানিত না, তাহারা বিকৃত মতের পক্ষপাতী হইয়া সদ্ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পূজা করিত। এই ধর্ম্মপূজক বৌদ্ধগণ পাঠানের হস্তে এমন ভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল, যে অবশেষে তাহারা প্রাণের দায়ে পাঠানের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের যশোগান করিত। এমন কি তাহারা নবাগত যবনকে ধর্ম্মাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। রামাই পণ্ডিত-কৃত শূন্য পুরাণের শেষভাগে 'নিরঞ্জনের উষ্মা" নামক যে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, উহাতে এই বিষয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে :—

ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার, মুখেত বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হইল মহাঁমদ, বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গণেশ হইল গাজী, কার্ত্তিক হৈল কাজি, ফকির হৈলা জত মুনি॥ *

লোকে কথায় বলে "শক্তকে সবাই ভক্ত", এখানে ধর্ম্মভক্তদিগের অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। পাঠানেরা "জোর যার, মুল্লুক তার" এই নীতি ঘোষণা করিয়া বাষ্পসিক্ত বঙ্গের অধিবাসীদিগকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশীয় লোকেরা জাতি, প্রাণ ও অধিকার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করিত,

* সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "শূন্য-পুরাণ" ১৪১ পৃঃ

সর্ব্বদা একস্থান হইতে অন্যত্র পলায়নের জন্য এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিত যে তাহারা এ যুগে কোন মৌলিক চিন্তা বা বিদ্যাচর্চ্চা করে নাই, কোন ইতিবৃত্ত, গোষ্ঠীকথা বা বংশকারিকাদির রচনা করে নাই ; এমন কি এ যুগে বৌদ্ধগণ কোন পুস্তক রচনা ত দূরের কথা, কোন প্রাচীন পুঁথি হাতে লিখিয়া নকল করিতেও পারিত না। এ পর্য্যন্ত এ যুগে মাত্র তিন খানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল, দেখা গিয়াছে। সে তিনখানিই বৌদ্ধ পুঁথি এবং উহা তিন জন কায়স্থে নকল করিয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণ মিত্র যে পুঁথিখানি নকল করেন, তাহার নাম, "সভাতরঙ্গিণী"। বিদ্যাচর্চ্চাদির যখন এই দশা, তখন সে যুগের ইতিহাস কেন পাওয়া যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই এ যুগকে তামসযুগ বলিয়াছি।

এই যুগে কিছুদিন পর্য্যন্ত যশোহর-খুল্‌নায় পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণের শাসন চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু কেহ বিদ্রোহী হইলে তাহা দমন করিবার সাধ্য ছিল না ; কারণ বিদ্রোহিগণ আবশ্যক হইলে পশ্চিম বঙ্গের পাঠান শাসকের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করিত ও এককালীন কিছু অর্থাদি উপঢৌকন দিয়া দেশের মধ্যে নিজের স্বাধীনতা কিনিয়া লইত। এইরূপে বর্ত্তমান যশোহরের উত্তরাংশে মাগুরা ও ঝিনেদহ মহকুমার অন্তর্গত প্রদেশে সে সময় কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সময় হইতে শৈলকূপার উন্নতি আরম্ভ হয়। হিন্দুর মধ্যে অনেক আত্মকলহ পাঠানের রাজ্যবিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

এইভাবে ২০।২২ জন পাঠান নৃপতি দিল্লীর অধীন থাকিয়া ১৪০ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশ শাসন করে। তন্মধ্যে শতাধিক বৎসর কাল পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের করায়ত্ত হয় নাই। ফিরোজ সাহের সময় পূর্ব্ববঙ্গ অধিকৃত হইয়াছিল। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে ফকরউদ্দীন পূর্ব্ববঙ্গে এবং সামসুদ্দীন ইলিয়াস পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইলিয়াসই পরে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন পাঠান নৃপতি হন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে আখ্যাত হয়। ইলিয়াস সবল হস্তে দেশ শাসন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যে দেশে নানা অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময় দেশীয় জমিদারেরা প্রাধান্য লাভ করেন। গণেশ পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তিনি

গৌড়াধিপকে নিহত করিয়া রাজা হন। * তিনি, তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এ সময়ে হিন্দু বা দেশীয়দিগের উপর অত্যাচার হয় নাই; যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পুনরায় শাস্ত্রচর্চ্চাদি আরম্ভ করেন। এ সময়ে যশোহর-খুল্‌নায় রীতিমত বসতি স্থাপন ও সমাজ বন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা এক্ষণে তাহারই কথা বলিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বসতি ও সমাজ।

রজনীর অন্ধকার বিগত হইলে যেমন তরুণারুণভাতি সুপ্ত জগতকে প্রদীপ্ত করে, তামস-যুগ অতিবাহিত হইলেও তেমনই দেখা গেল, যশোহর-খুল্‌নার যে সকল অংশ নিম্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়াছিল, তাহাও আবার উন্নত ও পরিষ্কৃত হইয়া সভ্য সমাজের বসতিভূমি হইতেছে। যাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা যে কোন দূরবর্ত্তী বিদেশ হইতে আসিতেছিলেন, তাহা নহে। সেনরাজত্বের অবসান হইল, প্রাকৃতিক বিপ্লব হইল, পাঠান অধিকারের প্রাক্কালে দেশময় অরাজকতা চলিতে লাগিল, এইরূপ নানাবিধ কারণে লোকে নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছিল; আবার যখন রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্ত স্থিরভাব ধারণ করিল, দেশের ভূমি উন্নত হইয়া শস্যক্ষেত্রের উপযোগী হইল, পাঠানেরা বঙ্গদেশে বসতি নির্দ্দেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার জন্য দেশের লোকের সহায়তা চাহিল, তখন দেশে শান্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বসতি, নূতন সমাজ গঠিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভৈরব নদের উত্তরভাগে প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিশেষ প্রকোপ হয় নাই, সেখানে লোকে তত অধিক স্থান পরিত্যাগ করে নাই,

---

* "Raja Kans from the testimony of Coins appears to have reigned from 810 A.H. to 817 A.H. or 1407 to 1414 A.D., but he appears to have actually usurped the Government earlier in 808. A. H."—Reyaz—us—Salatin, edited by M. A. Salam, P. 113 note. ইহার পূর্ব্বেও পাঠান-রাজসভায় আমীররূপে গণেশ দেশের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

সুতরাং সেখানকার সামাজিক পরিবর্ত্তনও অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল। সে অংশে নূতন অধিবাসীদিগকে স্থান দিবার উপায়ও অধিক ছিল না; এজন্য যখন পাঠান-রাজত্বের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বৈদ্য কুলীনগণ এ দেশে আগমন করিতে ছিলেন, তাঁহারা জনবহুল উত্তরভাগ ত্যাগ করিয়া বিরলবাস দক্ষিণাঞ্চলকেই অধিক পচ্ছন্দ করিয়াছিলেন। নদীর পলিতেই ভূমি উচ্চ হয়; এজন্য অবনমিত স্থানে প্রথমে নদীর কূলই জাগে ও বসতির যোগ্য হয়। এজন্য যখন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণভাগের ভৈরব, ভদ্র, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদীকূলেই এই বসতি হইতেছিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, যখন খাঁ জাহান আলী প্রভৃতি সামন্তগণ সুন্দরবন আবাদ করিবার অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভৈরবের কূল দিয়া পূর্ব্বমুখে এবং কপোতাক্ষের কূল দিয়া দক্ষিণমুখে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের গতিবিধির জন্য ঐ পথে নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং সেই রাস্তার দুই ধারে তাঁহাদের জলাশয় ও মস্‌জিদ প্রভৃতি কীর্ত্তিচিহ্ন সমূহ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথের অনেক স্থানে পূর্ব্ব হইতে লোকের বসতি নূতন করিয়া স্থাপিত হইতে ছিল; যাহা বাকী ছিল, উহাদের সহচর ও সহায়কগণ এবং পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণের কার্য্যকারকগণ সে সকল স্থান পূরণ করিয়া ছিলেন। ঐ সকল নদীগুলির কূলে কূলে বা সন্নিকটে এক্ষণে যাহাদের বসতি আছে, তাহাদের বংশের পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিলে অধিকাংশ স্থানেই দেখা যাইবে, পাঠানরাজগণের সহিত তাহাদের কোন না কোন প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ আছে। পাঠানরাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুদেরও গুণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং কার্য্যতঃ সে সমাদরের পরিচয় দিতেন।

যাহারা এইভাবে নূতন বসতি স্থাপন করিল, তাহারা আসিল কোথা হইতে? ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া নূতন দেশের নূতন বাসিন্দা না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে অধিকাংশ বিপ্লবের পূর্ব্বেও এই দেশের লোক ছিল। বিপ্লবের জন্য স্থানান্তরিত হইয়া তাহারা যশোহরের নানাস্থানে বা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন বিভাগে গিয়া কয়েক পুরুষ

বসতি করিয়াছিল। পরে কতক সে সকল স্থান হইতে অত্যাচার-পীড়িত হইয়া, কতক পর্য্যাপ্ত শস্যলোভে, কতক বা অজানিত দূর প্রদেশে নূতন রাজার মত প্রতিপত্তি বিস্তারের কল্পনায় এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। অনেক কালের পতিত বা নবোত্থিত ভূমিতে যেমন ফসল ভাল হয়, তেমনই যাহারা নূতন প্রদেশে নববিক্রমে বসতি স্থাপন করে, তাহাদেরও বংশ বা বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাঠান আমলে এইজন্য যশোহর-খুল্‌নার দক্ষিণাংশে নানা বিষয়ে উন্নতি বা অবস্থান্তর দেখা গিয়াছিল।

কনোজাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ আদিশূরের নিকট হইতে গঙ্গাতীরে ভূমিলাভ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। বল্লালসেনের সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্য পাইয়া ছিলেন, তাঁহারা ঐ প্রদেশেই বসতি করিতেছিলেন। গঙ্গা ছাড়িয়া দূরে যাইতে তাঁহারা সম্মত ছিলেন না। পাঠান রাজত্ব আরম্ভ হইলেও তাঁহারা সেই প্রদেশ ছাড়েন নাই। অবশেষে কোন স্থানে জাতি-ধর্ম্মের উপর অত্যাচার, কোথায় বা অরাজকতা, স্থানের অভাবে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, এবং কখনও বা রাজকার্য্যের জন্য অন্যত্র যাইবার আবশ্যকতা তাঁহাদিগকে স্থানত্যাগ করাইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে কুলমর্য্যাদা ও সমাজসমস্যা লইয়া অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। ইহা ব্যতীত যে উদরান্নের সংস্থান একটা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা অনেক সময় ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের এই দারিদ্র্যের সুযোগ পাইয়া অনেক অকুলীনও নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ উঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতেন। এইভাবে যে সকল কুলদোষ ঘটিয়াছিল, পরে তাহার পরিহারকল্পে সমাজের বন্ধন আরও কঠোর করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্যও স্বচ্ছন্দ জীবিকার লোভে কুলীনগণ গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া অনেকে যশোহর-খুল্‌নায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে যাহারা আনিয়াছিল, তাহারা এ প্রদেশের অধিবাসী ছিল। সে কাহারা ?

শ্রোত্রিয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ, মৌলিক কায়স্থ, নবশায়ক, নানা জাতীয় বণিক্‌ ও নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যশোহর-খুল্‌নার অধিবাসী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈদ্যগণ কেবলমাত্র খুল্‌নাজেলায় সেনহাটিগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে এদেশে বৈদ্য ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

ত্রয়োদশ শতব্দীর পর অন্য বৈদ্য কুলীনেরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলীনেরা এ প্রদেশে বাস করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে শ্রোত্রিয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এবং মৌলিক কায়স্থেরা বিপ্লবগ্রস্ত প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে মৌলিক কায়স্থগণই নূতন উপনিবেশের অগ্রদূত হইতেন। তাঁহারা স্থান নির্ব্বাচন করিতেন, জঙ্গল আবাদ করিতেন, প্রবল শত্রু বা হিংস্রজন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতেন, বিস্তৃত প্রদেশ দখল করিয়া সবিক্রমে শাসন করিতেন, পাঠান-রাজদরবারে সৈন্য পরিচালনা, মন্ত্রণা, রাজস্ব সংগ্রহ, এবং হিসাব ও তহবিল রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর রাজকার্য্যে মৌলিক কায়স্থগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন; এবং তাহার পুরস্কারস্বরূপ রাজসরকার হইতে রায়, চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, মুস্তৌফি, নিয়োগী, সরকার প্রভৃতি নানা সম্মানিত উপাধি লাভ করিতেন। এ সব উপাধি যে ব্রাহ্মণের নাই, তাহা নহে; তবে কায়স্থের তুলনায় কম। ব্রাহ্মণগণ এই মৌলিক কায়স্থগণেরই গুরু-পুরোহিতরূপে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের অনেকে সেই সকল নিষ্কর ভূমি এখনও ভোগ করিতেছেন। কায়স্থগণই তাঁহাদিগকে বসতি করাইতেন ও প্রতিপালন করিতেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার এ উপযুক্ত স্থান নহে, তবে এই সকল মৌলিক কায়স্থগণ যে তৎকালে তাঁহাদের কার্য্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে, দান দাক্ষিণ্যে ও ব্রাহ্মণপালনে যথেষ্ট ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার প্রকাশ্য সাক্ষ্য দেয়।

শুধু ব্রাহ্মণকে নহে, কুলীন কায়স্থদিগকে ইঁহারাই আশ্রয় দিতেন ও প্রতিপালন করিতেন। বল্লালী মর্য্যাদা মানিয়া লইয়া, ইঁহারাই তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন, এবং "বোস ঠাকুর" "ঘোষ ঠাকুর"দিগকে মাথায় করিয়া লইয়া অন্নদান ও ভূমিদান করিয়া পূজা করিতেন। এখনও কুলীন কায়স্থদিগকে অধিকাংশস্থানে কোন মৌলিক বংশের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিতে হয়। আজ যদি এই সকল মৌলিক বা আদিম কায়স্থগণের অধস্তন পুরুষের দুরবস্থায় সুযোগ পাইয়া ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ তাঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তির উপর কশাঘাত করেন, তবে তাহা নিতান্তই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, এই সকল সুলক্ষণযুক্ত কায়স্থগণ বল্লালী ব্যবস্থায় কৌলীন্য পাইলেন না কেন? কৌলীন্য কয়জনে পাইয়াছিলেন? তাহার বিচারই বা করিয়াছিল কে? কনোজাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা শূর ও সেন রাজগণের বৃত্তিভুক্ হইয়া রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেছিলেন। পুরুষানুক্রমে রাজদরবারে আপনাদিগের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া স্তাবকতাদ্বারা রাজপ্রীতি আকর্ষণ করাই তাঁহাদের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিচারসভায় ইঁহাদেরই বংশধরগণ অধিক সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। রাজবিচারে ইঁহারাই বিচারের সার সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যেও আবার দত্তবংশীয়গণ ভৃত্যত্ব হইতে একটু নিবৃত্ত হওয়া মাত্র কৌলীন্য-বিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দত্তরাই ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপাত্র, মহাসামন্ত প্রভৃতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। লক্ষ্মণসেনের দরবারে দত্তের প্রাধান্য এত অধিক ছিল যে কৌলীন্যলাভ তাহার নিকট নগণ্যই ছিল। মৌলিক কায়স্থেরা সেই সময় নানা কার্য্যব্যপদেশে বঙ্গরাজ্যের নানা ভাগে কার্য্যে নিরত ছিলেন; রাজধানীতে অনবরত যাতায়াত তখন অনায়াসগত ছিল না। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং কর্ম্মনিষ্ঠ মৌলিক কায়স্থগণ আভিজাত্যের জন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে রাজধানীতে আনাগোণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কৌলীন্যলাভে বঞ্চিত হইবার ইহাই অন্যতম কারণ।

বল্লালের কৌলীন্যপ্রথা দেশমধ্যে এক ভেদনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে সামাজিকের দোষগুণ বিচার ও জাতিমর্য্যাদায় কে বড় কে ছোট ইহাই লইয়া দেশের সর্ব্বজাতীয় লোক এমন ভাবে ব্যতিব্যস্ত ও অনন্যকর্ম্ম হইয়াছিল, যে দেশের অবস্থার দিকে কেহ বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করে নাই। কে কাহার অন্নগ্রহণ করিবে, অন্নগ্রহণ না করিয়া কিরূপে শত্রুতা সাধন করা যায়, এই সকল সামাজিক কথা লইয়া লোকের এত অধিক মাথাব্যথা হইত যে, প্রকৃত অন্ন কোথা হইতে হয়, দেশের অন্ন দেশে থাকিবে কিনা, সে সকল চিন্তা তাহারা একেবারেই পরিহার করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়ে তাহারা এতই উদাসীন হইয়াছিল যে, পাঠান বিজয়ের পরে দেশের কি পরিবর্ত্তন হইল,

তদ্বিষয়ে অধিকাংশ লোকেরই উদ্বোধন হয় নাই। এক্ষণেও বল্লালী নীতির কুফল ফলিতেছে, লোকের সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি সামাজিক শাসনকে কলঙ্কিত করিতেছে। দেহবল, জ্ঞানবল, ধনবল, সকল বলের অভাব সামাজিক নির্য্যাতন দ্বারা পূর্ণ করা হইতেছে, এবং সামাজিক শাসনের নামে কত ষড়্‌যন্ত্র, নীচত্ব ও মিথ্যাচার যে দেশের মধ্যে বিনামূল্যে বিকাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কৌলীন্য-পরিপ্লাবিত দেশে মৌলিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সামাজিক উন্নতির একমাত্র উপায় হইয়াছে অর্থ। ইহা এখনও যেমন, পূর্ব্বেও তেমনি ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোহর-খুল্‌নার দক্ষিণে যে প্রাকৃতিক বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার পরে ভৈরব, ভদ্র বা কপোতাক্ষ প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় নদীর কূলে যেখানে যখন বসতি স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেই এতদঞ্চলের আদিম অধিবাসিগণ পুনরায় বাস করিয়াছেন। ইঁহারা বিপ্লবাদি কারণে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই সকল অধিবাসীর মধ্যে মৌলিক কায়স্থগণ প্রধান। তাঁহারা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, এবং সেই বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত প্রাচীন সমতটে বাস করিতেন। * ক্রমে তাঁহারা কৌলীন্যের প্রভাবে নবাগত কুলীন কায়স্থগণের সংস্পর্শে ও প্ররোচনায়, বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বৈষ্ণব হন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় মৌলিক কায়স্থগণ অধিকাংশই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কুলীন বংশজগণ তান্ত্রিক শাক্ত। তান্ত্রিক গুরুর প্রভাবে বঙ্গজ বৈদ্যগণ প্রায় সকলেই শাক্ত হন। মৌলিক কায়স্থগণ কুলীনদিগের প্রতিষ্ঠা করেন, কুলীনগণ গুরু-পুরোহিত ব্যতীত কোথায়ও থাকিতেন না। সুতরাং মৌলিকগণকেও কুলীনের গুরু-পুরোহিত মানিয়া লইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের বসতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই কুলীন আত্মীয় এবং ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে মৌলিক কায়স্থগণের

"The kayasthas, if we exclude the descendants of those who are recognised as kulinas among the Dakshina Radhiya and Vangaja Communities and who were Bhahmanic in their tendencies, were mostly Buddhists. These are all Maulikas i. e. they originally belonged to this country, a Buddhist country"

M. M. Haraprasad Sastri's Introduction to N. N. Vasus' "Modern Buddhism" p. 20.

ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এখন অনেক স্থলে মৌলিকদিগের অবস্থা এত শোচনীয় এবং তাঁহাদের আশ্রিত কুলীনগণ এত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন যে কোন কায়স্থপ্রধান গ্রামে কুলীনগণই প্রধান এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতার কীর্ত্তিকথা লুপ্তগাথায় পরিণত হইয়াছে।

আমরা সাধারণভাবে যে কয়েকটি কথা বলিলাম, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহার সত্যতা লক্ষিত হইবে, কারণ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর এইরূপ মন্তব্যে উপনীত হইয়াছি। এ বিষয়ে সকল দৃষ্টান্ত এখানে প্রদান করা দুঃসাধ্য এবং অনর্থক ও বটে। সুতরাং ভৈরব-ভদ্রকূলে কতকগুলি স্থানের বসতির বিষয় উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপতঃ কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভৈরবনদ যশোহরে প্রবেশ করিবার পর সিঙ্গিয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার পূর্ব্ব-মুখেই আসিয়াছে। তৎপরে উহার গতি ক্রমশঃ দক্ষিণমুখী হইয়া বিপ্লবগ্রস্ত প্রদেশ দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। সিঙ্গিয়ার উত্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিপ্লব গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সিঙ্গিয়ার পর হইতে যশোহর-কূলে নূতন বসতি হইতে থাকে। সেখান হইতে নদীর দুইধারে ক্রমান্বয়ে মৌলিক কায়স্থগণের আদিবাস দেখিতে পাওয়া যাইবে। চেঙ্গুটিয়ায় কল্কীশ গোত্রীয় রায় চৌধুরী দত্তগণ বিখ্যাত। ইঁহারা বালীর দত্ত, উত্তর কালে সুবিখ্যাত সেনাপতি কালিদাস ও শ্রীরাম এই বংশ উজ্জ্বল করেন। কালিদাসই বাঘুটিয়ার ঘোষ ও জঙ্গলবাধালের বসু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। দেয়াপাড়ার দেববংশ বহু প্রাচীন। ইঁহারা সাধারণতঃ চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব বলিয়া এক্ষণে খ্যাত। পাঠান আগমনের পূর্ব্ব হইতে ইঁহারা এদেশের অধিবাসী ছিলেন। পাঠান-সরকারে চাকরী করিয়া যশস্বী হইয়া ইঁহারা নানা উপাধি লাভ করেন এবং যশোহর-খুলনার নানাস্থানে বসতি করিয়াছিলেন। দেয়াপাড়ার মজুমদার, ভাটিয়াপাড়ার বক্সী, কসুন্দীর সরকার, পাঁজিয়ার সরকার, রুদাঘরার হালদার, সাধুহাটীর সরকার, সুবলহাটির হালদার, ও কোটাকোলের সরকারগণ এই দেববংশীয়। এই সকল স্থানেই ইঁহারা বহু কুলীন কায়স্থ ও সুব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তপনভাগের দাসগণও এইরূপ বিখ্যাত। তাঁহারা নড়াইলে শোলপুর ও ভয়া-খালি প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। আফরার ও শঙ্করপাশার সেনগণ ভৈরব-কূলে অবস্থিত। ইঁহারা বিখ্যাত দ্বিগঙ্গার সেনবংশীয়, যশোহরে সিরিজদিয়া

ও চণ্ডীবরপুর, খুল্‌নায় মঘিয়া, বনগ্রাম, চিংড়াখালি এবং বরিশালে রায়েরকাটিতে এই একই বংশের অতুল সম্মান। শেষোক্ত চারিস্থানে ইঁহারা রাজোপাধিধারী এবং মঘিয়া, বনগ্রাম, চিংড়াখালি ভৈরবের কূলে অবস্থিত। শঙ্করপাশার নিকটে বর্ণীবিছালীর সিংহবংশ বিখ্যাত। ইঁহারাই তথাকার বসুদিগের প্রতিষ্ঠাতা। এখান হইতেই ইঁহারা ভৈরবকূলে বেলফুলিয়ার অন্তর্গত আইচগাতিতে বাস করেন, তথায়ও তাঁহারা কুলীনগণের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পত্তিশালী এবং দেব-দ্বিজ-সেবক। ভৈরবদিয়া আর একটু অগ্রসর হইলে পাইকপাড়ার দত্তগণ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। ইঁহারা দত্তদিগের বটগ্রাম সমাজভুক্ত, ঢাকুরিয়ার মজুমদারগণ এই বংশীয়। বালী সমাজের দত্তগণ যশোহর-খুল্‌নায় বহুস্থানে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভৈরব-কূলেই তাঁহাদের বাস অধিক। বাসড়ী, মুক্তীশ্বরী ও সিদ্ধিপাশার দত্ত, সেনহাটির মুস্তৌফি এবং রাঙ্গদিয়া ও শ্রীপুর-বনগ্রামের দত্তগণ এখনও স্ব স্ব স্থানে সমাজের প্রধান ব্যক্তি এবং বহু কুলীন ও ব্রাহ্মণের আশ্রয়দাতা। এই দত্তবংশীয়েরাই কাল্‌নার দত্ত এবং নড়াইলের জমিদার। সিদ্ধিপাশার অপর পারে দামোদরের ব্রহ্ম, আর একটু অগ্রসর হইলে বারাকপুরের সেন, মহেশ্বরপাশার গুহবংশীয় মজুমদারগণ বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারা বহু কুলীন আনিয়া বসতি করাইয়া-ছিলেন। মহেশ্বরপাশায় ঘোষ বসু মিত্র সর্ব্বজাতীয় কুলীনের বাস। ভৈরবপথে আরও অগ্রসর হইলে বেলফুলিয়ার ভদ্রগাতিতে ভদ্রবংশীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে ক্ষমতাশালী ছিলেন। বেলফুলিয়ার রায়চৌধুরী উপাধিধারী বসুবংশীয় জমিদার-গণ এই ভদ্রদিগের প্রতিষ্ঠিত। তৎপরে নন্দনপুরের নন্দীগণ এক সময়ে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা তথায় বসু ও মিত্র কুলীনদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভৈরবপথে আলাইপুর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে, মৌভোগের আদি বাসিন্দা বিষ্ণুবংশীয় বিনোদ খাঁ। তিনিই এখানে বাগাণ্ডাসমাজের বসুকুলীন-দিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনোদ বিষ্ণু পাঠান আমলে খাঁ উপাধি ও প্রভূত ভূসম্পত্তি জায়গীর পান। যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বিষ্ণুগণ এই একই বংশীয়। মৌভোগের পর নলধার ভঞ্জ চৌধুরিগণ বিখ্যাত। তাঁহারা এক সময়ে সমগ্র খড়রিয়া পরগণার অন্যতম জমিদার ছিলেন; নলধার ও নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহারা বহু কুলীন কায়স্থকে বসতি করাইয়াছিলেন। কালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নল্‌তার ভঞ্জগণ এই একই কুলোদ্ভূত। সেই নল্‌তার নামানুসারে এখানে

দ্বিতীয় নল্‌তা ক্রমে নল্‌টা ও নল্‌ধা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া
সময়ে প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইলে এইরূপ আরও মৌলিক কায়স্থের বসতি দেখা যাইবে। নল্‌ধা ও রাজপাটের রাহা, উত্তর পাড়ার দেববংশীয় নিয়োগী, রাখালগাছী ও হাউলীর নাগ ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত। রাহাগণ মজুমদার উপাধিভূষিত হইয়া যশোহরে পবহাটী ও বাগডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে সম্মানিত বংশ বলিয়া পরিচিত আছেন। উত্তর পাড়ার নিয়োগীগণ ধন্য পীতাম্বরের সন্তান বলিয়া খ্যাত এবং গোষ্ঠীপতি কুলভুক্ত। ইঁহাদের কথা বিশেষ ভাবে পরে আলোচিত হইতেছে। রাখালগাছির নাগবংশ খুল্‌না-জেলায় একডাকে পরিচিত এবং অতিশয় সম্মানিত। তাঁহারা সে অঞ্চলে বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাঙ্গদিয়ার দত্তবংশ ও মথিয়া প্রভৃতি স্থানের সেনবংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

কপোতাক্ষকূলেও এইরূপ মৌলিক কায়স্থগণের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোদখানার চৌধুরিগণ বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা দেব-উপাধিধারী মৌলিক কায়স্থ। হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যশোহরে আসেন। ভৈরবকূলে বারবাজারে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিবাস বলিয়া কথিত হয়। * কিন্তু তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। তবে বোদখানায় ইঁহাদের বাস ছিল, তাহা তথাকার গড়বেষ্টিত রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ হইতে এখনও স্পষ্ট জানা যায়। এই বোদখানা হইতে ক্রমে ইঁহারা নদীয়ার গঙ্গানন্দপুরে, খুল্‌নার মলইগ্রামে, এবং ক্রমে ক্রমে যশোহরের সন্নিকটবর্ত্তী নয়াপাড়াগ্রামে, এবং কপোতাক্ষতীরে বাড়ুলীগ্রামে বাস করেন। নিয়োগী উপাধিধারী ইঁহাদের এক শাখা খুল্‌নার উত্তরপাড়াগ্রামে আছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হরিদেব সপ্তগ্রামের সন্নিকটে বাস করেন, তাঁহার অধস্তন সপ্তমপুরুষ পীতাম্বর দেব। ইনি নবাব-দরবার হইতে খাঁ উপাধি এবং বহু সৎকার্য্যের ফলে সাধারণের নিকট ধন্য পীতাম্বর বলিয়া খ্যাত হন। ইঁহারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সুবিখ্যাত শিবদাস চৌথণ্ডী; তিনি মলই পরগণার জমিদারী পান, তথা হইতে তাঁহার বংশধরগণ হরিঢালী ও রাড়ুলী গ্রামে উঠিয়া যান। এ সকল স্থানই কপোতাক্ষের কূলে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই রাড়ুলীর রায়বংশ সমুজ্জ্বল

* Westlands' Report P. 156.

করিয়াছেন। শিবদাস চৌথণ্ডীর ভ্রাতার বংশে অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। তৎপুত্র রত্নেশ্বর যশোহর-নওয়াপাড়ায় বসতি করেন। রত্নেশ্বরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রতিকান্ত, কালীকান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। ইঁহারা গোষ্ঠীপতি। শোভাবাজারের রাজবংশীয়গণ ইঁহাদিগের জ্ঞাতি। এই গোষ্ঠীপতি দেব-বংশ বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং নবরঙ্গকুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কায়স্থ-সমাজের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে ইঁহাদের স্থান অতি উচ্চে।

শুধু এই দেব-বংশীয়গণ নহেন, কপোতাক্ষকূলে সাগরদাঁড়ি ও তালার দত্ত, হরিঢালীর গুহমজুমদার, ভদ্রকূলে ভেরচির সিংহ প্রভৃতি মৌলিক কায়স্থগণ পাঠান আমলে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মৌলিক কায়স্থগণের মত এদেশে মৌলিক ব্রাহ্মণ অধিবাসীও ছিলেন। তাঁহাদের উপলক্ষেও কায়স্থ-দিগের গুরু-পুরোহিতরূপে শ্রোত্রিয় ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ ক্রমে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। মৌলিক অর্থাৎ সাতশতী ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে শ্রোত্রিয়দিগের সহিত আদান-প্রদান করিয়া মিশিয়া গিয়াছেন; অনেকস্থানে তাঁহারা এক্ষণে কষ্টশ্রোত্রিয় এবং এমন কি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। * ভৈরবকূলে অনেক স্থলে ইঁহারা বসতিস্থাপন করিয়া সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। মর্য্যাদাপ্রাপ্ত শ্রোত্রিয়গণ ইঁহাদের পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন। মহেশ্বরপাশার সিঙ্গুরাবল্লভ, সেনহাটীর কাটানি, শ্রীফলতলার দাস্কুড়ী ও আজগড়ার ডাইয়া গাঁই ভুক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশেষ পরিচিত। সাতক্ষীরার জমিদারবংশীয়েরা কাটানি গাঁই। মহেশপুর ও দক্ষিণ ডিহির গুড়, পিটাভোগের কুশারি, সেনহাটির কাঞ্জারি, সেনহাটি ও ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের পাকড়াশী (সর্ব্ববিদ্যা বংশ), সেনহাটির হড়, এবং ভৈরবকূলে নানাস্থানে ডিংসাই, কুসুমকুলি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ বসতি নির্দ্দেশ করিয়া যশোহর-খুল্‌না পবিত্র করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গুড়দিগের এক অংশ পতিত হইয়া "পীরালি" হন; কলিকাতার ঠাকুরবাবুরা কুশারি বংশীয়। সর্ব্ববিদ্যা ও কাঞ্জারীগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের গুরু এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয়। স্থানান্তর ইঁহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এস্থলে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে মৌলিক কায়স্থগণ ও পরে

* সম্বন্ধ নির্ণয়, ২৯০ পৃঃ।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসিয়া কিরূপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিপ্লবপ্লাবিতদেশে কিরূপে সামাজিকগণের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে পাঠানেরা নানা সূত্রে এদেশে প্রবেশ করে এবং তাহাদের সাময়িক অত্যাচারে ও নবশাসন প্রবর্ত্তনে দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। খুল্নায় পাঠান আসিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রদ্বীপে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হওয়ায় খুল্নার অধিকাংশ সে রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। দনুজমর্দ্দন দেব সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দনুজমর্দ্দন দেব।

পাঠান-বিজয়ের প্রথম দুইশত বর্ষ বঙ্গদেশে কিরূপ অরাজকতায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে রাজা গণেশ কিছুকালের জন্য পাঠানদিগের হস্ত হইতে গৌড় রাজ্য কাড়িয়া লন। কয়েক বৎসর পরে গণেশের মৃত্যু হইলে (১৪১৪) রাজ্যমধ্যে পুনরায় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। এই সময়ে দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া এক রাজ্য সংস্থাপন করেন। শীঘ্রই খুল্নার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। সুন্দর বনের মধ্যে দনুজমর্দ্দনের যে রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাই এ বিষয়ের অন্যতম প্রমাণ।

খুল্না-জেলার দক্ষিণাংশে খোলপেটুয়া নদীর কূলে অবস্থিত বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উক্ত মুদ্রাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। * তথাকার একটি মুসলমান কবর খনন করিবার সময়ে এই প্রাচীন মুদ্রাটী পাইয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে দিয়াছিল এবং তিনি দয়া করিয়া

* বর্ত্তমান ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ জন্য আমাকে বহুবার সুন্দরবন অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। উহার মধ্যে একবার ১৯১১ অব্দে ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে আমরা খোলপেটুয়ার কূলবর্ত্তী বিছটগ্রামে যাই, তথা হইতে নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরে গিয়া উক্ত মুদ্রাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। স্বনামধন্য রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী এইবার আমার সহযাত্রী ছিলেন। মুদ্রাটির জন্য বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ।

উহা আমার হস্তে প্রদান করেন। মুদ্রাটির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব উহার বাঙ্গালা অক্ষর। বাঙ্গালা অক্ষরের প্রাচীন মুদ্রা আর দেখি নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও অদ্যাবধি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং তাহাতে কিরূপ বাঙ্গালা অক্ষর উৎকীর্ণ ছিল, তাহা জানি না। ইণ্ডিয়ান মিউ-জিয়ামের বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যো-পাধ্যায় এম-এ মহোদয় আমার এই মুদ্রার অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং ইহা যে কিরূপে কতকগুলি তর্কসঙ্কুল ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। * মুদ্রাটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। উহা এক্ষণে তত্রত্য মুদ্রাবিভাগে রক্ষিত হইতেছে। †

আমার এই মুদ্রা প্রাপ্তির পূর্ব্বে মালদহের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় এইরূপ দুইটি রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হন। উহা তিনি মালদহে উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন কালে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি দনুজমর্দ্দন দেবের এবং অপরটি মহেন্দ্র দেবের। রাধেশ বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে রঙ্গপুর শাখা পরিষদের পত্রিকায় উক্ত মুদ্রা দুইটি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ও উহাদের আলোক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ‡ তাহা হইতেই আমরা চিত্রানুলিপি দিলাম। এক্ষণে মুদ্রাত্রয়ের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

---

* প্রবাসী, ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯, শ্রাবণ।

† বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া আমরা ইহার "উদ্ধার করিয়া বঙ্গের হিন্দুরাজত্বের একটি তর্কসঙ্কুল অধ্যায়ের সুমীমাংসার সহায়" হইয়াছি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা" ১৩২০, ১৬৮ পৃঃ।

‡ এই দুইটি মুদ্রা পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়; সাঁওতাল কৃষক উহা পুরাতন মালদহের এক দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে; তাহার নিকট হইতে মালদহের "গৌড়দূত" নামক সাপ্তা-হিক পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা উহা সংগ্রহ করিয়া রাধেশ বাবুকে প্রদান করেন। মুদ্রা দুইটি রাধেশ বাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পর কলিকাতায় হারাইয়া যায়। পূর্ব্ব প্রকাশিত আলোকচিত্র হইতে উহার চিত্রানুলিপি প্রকাশিত করিলাম। এই অনুলিপির জন্য পরম শ্রদ্ধেয় "প্রবাসী"সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত রাখাল
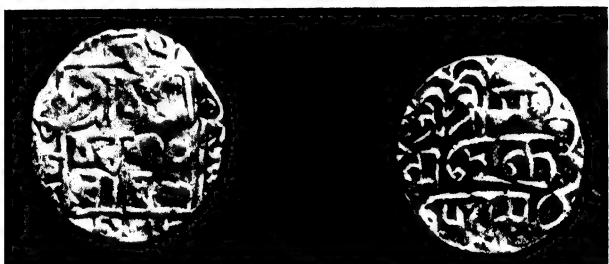
দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত

চন্দ্রদ্বীপ মুদ্রা

২৭৫ পৃঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

৮ রাধেশ বাবুর আবিষ্কৃত (১) মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা :—
গোলাকৃতি, ওজন ১৭০ গ্রেণ, পরিধি ৩⅛ ইঞ্চি। উহার প্রথম পৃষ্ঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে—"শ্রীশ্রীমন্মহেন্দ্র দেবস্য"; দ্বিতীয় পৃষ্ঠে—"শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ, পাণ্ডুনগর, শকাব্দ ( ) ৩৩৬।"

(২) দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা :—
আকার প্রায় গোল, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩⅛ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে বঙ্গাক্ষরে—"শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেব"; দ্বিতীয় পৃষ্ঠে চতুষ্কমধ্যে "শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ" ও উহার বাহিরে "পাণ্ডুনগর, শকাব্দা ( ) ৩৩৯"।

এই দুইটি মুদ্রাতেই marginal deletion বা পার্শ্বক্ষয়ের জন্য তারিখের সহস্রাঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য মহা অসুবিধা হইয়াছিল। উক্ত পার্শ্বক্ষয়ের কথা না ভাবিয়া বঙ্গাক্ষরযুক্ত মুদ্রা দুইটিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রাধেশ বাবুকে সুধী-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার জন্য দায়ী নহেন। তিনি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনই নির্দ্দেশ না করিয়া পারেন নাই। আমাদের মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে এই সহস্রাঙ্ক কাটিয়া যাওয়ার কথা সহজে ধরা যাইত না।

আমাদের আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা :—
গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি ৩¾ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠে ষড়্ভুজের মধ্যে বঙ্গাক্ষরে—"শ্রীদনুজমর্দ্দন দেব"; দ্বিতীয় পৃষ্ঠে—"শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ, শকাব্দা ১৩৩৯, চন্দ্র দ্ব ( ) প।"

ইহাতে তারিখটি অতি সুস্পষ্ট ভাবে আছে। উহাতে ১৩৩৯ শকাব্দা বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ হয়। রাধেশ বাবুর মুদ্রায় ১ এই সহস্রাঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে, ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায়। তাহা হইলে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ১৩৩৬ শকাব্দা বা ১৪.৪ খৃষ্টাব্দ এবং দনুজমর্দ্দনের অপর মুদ্রায়ও ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ হয়। স্বাধীন রাজা না হইলে কেহ স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন না। সুতরাং মুদ্রাত্রয় হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে মহেন্দ্র দেব পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ার স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বের১৪১৪ খৃষ্টাব্দের একটি মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে; তাহার পর দনুজ-

---

বাবু ও আমার যে দুইটি প্রবন্ধ দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা সম্বন্ধে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঐ সময় মুদ্রাগুলির আলোকচিত্র দেওয়া হইয়াছিল। প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ।

মর্দ্দন দেব পাণ্ডুনগরে রাজা হন (১৪১৭)। তিনি যে বৎসর রাজা হন, সেই বৎসরই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক মুদ্রা প্রচার করেন। ইঁহারা উভয়েই "দেব" উপাধিধারী কায়স্থ এবং "শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ" উপাধি-ভূষিত শাক্ত হিন্দু। মুদ্রা হইতে এই যে কয়েকটি তথ্য প্রমাণিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সংশয়শূন্য।

এক্ষণে এই দনুজমর্দ্দন কে? তিনি কোথা হইতে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন? এ সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আছে। আমরা এক একটি করিয়া সংক্ষেপে সবগুলি বিচার করিব।

(১) "বল্লালসেনের কায়স্থজাতীয়া উপপত্নীর পুত্র কালু রায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করেন। দনুজদমন রায় তাঁহার বংশধর।" * অবশ্য এখানে দনুজদমন ও দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। এ মতের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। সমস্ত প্রবাদ-কাহিনী ইহার বিরোধী। এ মতের পরিপোষক গ্রন্থকার বিনা প্রমাণে ইহা উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) লক্ষ্মণসেনের পৌত্র দনুজমাধব বহুবৎসর পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দনুজমাধব বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দ্বারা নানা নামে পরিচিত হইয়াছেন। দনুজ, দনৌজা, ধিনুজ রায় (Stewart), নোজা (Raja Nodja, Tieffenthaler), নৌজা (আবুল ফজল), দনুজ রায় (Jiaddin Barni and Elliot), দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দন এবং দনুজদমন—এ সকলই একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ বিক্রমপুরের দনৌজামাধব এবং চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি। †

---

* শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ১১৯ পৃঃ।

† The Emperor occupied Sonargaon having been joined in advance by Dhinwaj Rai, Zamindar of the City, with all his troops. This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have been a grandson of Ballal Sen.—Dr. Wise, J. R. A. S. 1874, No. 1, p. 83.

It is not improbable that the founder of this family (Chandradwip family) is the same person as the Rai of Sonargaon by name Dhanuj Rai". *Ibid* No. 3, p. 206 *See* also N, N. Vasu, J. R. A. S. 1896. p. 35. শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় সমাজ, ৭৯ পৃঃ।

দনুজমাধব বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বুলবন পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মঘীসুদ্দীন তোগ্রলকে দমন করিতে স্বয়ং বঙ্গদেশে আসেন। এ সময়ে দনুজমাধব সৈন্য দিয়া নৌপথে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। * দনুজমাধবের সহিত বুলবনের এক সন্ধি হয়। কিন্তু তৎপরে অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থান মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে, দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং স্বকীয় গুরুদেব চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশানুসারে নবোত্থিত দ্বীপে তিনি যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, গুরুদেবের নামে তাহার নাম রাখেন—চন্দ্রদ্বীপ। † চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়গণ এই দনুজমাধবের বংশধর। এই রাজবংশীয় কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা সম্মানিত গোষ্ঠীপতি কায়স্থ। সুতরাং ইহা দ্বারা বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ প্রমাণের বলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুবিখ্যাত "বিশ্বকোষে" বল্লালের কায়স্থত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন কিনা তাহা প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। তবে আমরা এখানে দেখাইতেছি যে, বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন একব্যক্তি নহেন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু সেন-রাজগণের সময় নির্দ্ধারণ জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির জরনালে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ঘটক-কারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দনুজমর্দ্দনের বংশীয় জয়দেবকে "চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো দেব-বংশসমুদ্ভবঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করত প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে "পুনশ্চ" দিয়া ফরিদপুরের এক বৃদ্ধ ঘটকের বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন যে উক্ত পংক্তি "চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো সেনবংশসমুদ্ভবঃ" এইরূপ হইবে। ‡ সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত "দেব"ও যে দৈবাৎ "সেন" হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। এখানে 'সেন' প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পাঠান্তর কুলগ্রন্থের উপর সাধারণের আস্থা কমাইয়া দিতেছে।

---

* Stewart's History of Bengal, (Bangabasi Edition, p. 82), Elliot. Vol. III. p. 116.

† শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র কৃত "চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ

‡ J. R. A. S. 1896, part I. p. 37.

দ্বিতীয়তঃ নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বলিতেছেন যে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর ২০ বৎসরের মধ্যে দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের প্রকৃত রাজত্ব শেষ হয়। তাহা হইলে ধরিতে পারি ১৩০০ অব্দে দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পর ৪ জন চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। পঞ্চম রাজার নাম পরমানন্দ রায়। ৪ জনের রাজত্বকাল মোট ১৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। দনুজমাধব ১২৫০ অব্দে সুবর্ণগ্রামে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। তাহা হইলে তিনি ১৩০০ অব্দের পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। যদি তাঁহার রাজত্ব আরও ১৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে পরমানন্দের রাজত্ব ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়াছে, বলিতে পারি। কিন্তু আইন আকবরীতে পাইতেছি যে আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্পবয়স্ক যুবক। * তাহা হইলে এই ১২০ বৎসর কালের কি গতিবিধান করা যায়, বুঝিতে পারিতেছি না।

তৃতীয়তঃ বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে পাঠান বিজয়ের পর লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন এবং পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। † সুতরাং (১২০০ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিজয় ধরিলে) ১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজত্ব ছিল। তাহা হইলে ৭০ বৎসর রাজত্বের পর অতিবৃদ্ধ দনুজমাধবকে চন্দ্রদ্বীপে নবরাজ্য পত্তন করিতে হয়। ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ দনুজমাধবই বিক্রমপুরের শেষ সেনরাজা নহেন, তাঁহার পরেও তদ্বংশীয়গণ প্রায় একশতবর্ষ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ সমস্ত সন্দেহের নিরসন পক্ষে আমাদের নবাবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনের রজতমুদ্রাই অকাট্য প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাত্রয় হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে দনুজমর্দ্দনের রাজ্য প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪১৭। যে দনুজমাধব ৩০ বৎসর রাজত্বের পর ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আর ১৩৭

---

* Gladwin's Ain-i-Akbari, published by I. P. Society, p. 304 Beveridge's Bakarganj, p. 27.

† প্রতাপাদিত্য (শ্রীনিখিলনাথ রায়), উপক্রমণিকা, ৬৭ পৃঃ।

বৎসর পরে বাঁচিয়া থাকিয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সুতরাং নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইল যে বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমৰ্দ্দন এক ব্যক্তি নহেন। সেন-বংশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ কায়স্থ-কুলোদ্ভব দেব-বংশীয় দনুজমৰ্দ্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। "নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমৰ্দ্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।" * সুতরাং যাঁহারা এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন ধরিয়া লইয়া সেনরাজগণকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণান্তরের আশ্রয় লইতে হইবে। এক্ষণে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, এ দনুজমৰ্দ্দন কে?

সম্প্রতি কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্তসম্বলিত যে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। এই পুঁথিখানি ১৬২২ শকে বা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে অন্য একখানি পুঁথি হইতে নকল করা হয়। পুঁথিখানিকে প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। † দেব-বংশীয়েরা রাজকীয় কার্য্যে

---

* গৌড়ের ইতিহাস (শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী), ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

† ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের পুড্ডাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিকট এই কুলগ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়গণ ইহা যে একখানি দুইশত বৎসরাধিক কালের প্রাচীন পুঁথি এবং প্রামাণিক কুলগ্রন্থ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু তাঁহার "শাশ্বতী" পত্রিকায় টীকা টিপ্পনী সহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন। গ্রন্থখানি বটুভট্ট নামক একজন ঘটক দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। পুঁথির শেষ "শকনরপতেরতীতাব্দা ১৬২২ সৌরবৈশাখস্য পঞ্চম দিবসে" বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় এই গ্রন্থখানিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন "ইহা হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত, নতুবা ইহা কৃত্রিম। বর্ত্তমানযুগের শত শত কুলপঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 'প্রাচীনীকৃত'।" দনুজমৰ্দ্দনের মুদ্রা সম্বন্ধে আমি ও রাখাল বাবু উভয়ে "প্রবাসী" পত্রে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উহার মধ্যে রাখাল বাবু যে সকল অনুমান করিয়াছিলেন, কুলগ্রন্থের বিবরণীতে অবিকল তাহাই খাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া রাখাল বাবু মনে করেন রাধেশ বাবু ও আমার মুদ্রার আবিষ্কারের পর এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনুমানের যাথাথ্য বর্ণে বর্ণে মিলিতে দেখিলে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়াই গ্রন্থখানিকে অপ্রামাণিক বলা সঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস রাখাল বাবু এ গ্রন্থখানি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইলে তাঁহার মত প্রত্যাহার করিতে পারেন। এই বিষয় লইয়া "শাশ্বতী" পত্রে যথেষ্ট বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছে এবং গ্রন্থখানির দুইটি পাতার আলোকচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে (শাশ্বতী, ১৩২০, শ্রাবণ, ২৪০—২৫৬ পৃঃ)

সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের বংশেতিহাসের সহিত প্রাদেশিক ইতিহাসের সম্বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান কুলগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি রাষ্ট্রকাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই কুলগ্রন্থ হইতে দেব-বংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য জানিতে পারি।

অতি প্রাচীনকালে দেবগণ হরিদ্বার হইতে আসিয়া কর্ণসুবর্ণনগরে বাস করেন। ইঁহারা ক্ষত্রজ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভব। কর্ণসুবর্ণের রাজা কর্ণসেনের নির্দ্দেশমত দেব-বংশীয়েরা শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলম্যান এই সপ্তগোত্রে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণ কুলনায়ক ছিলেন। তাঁহারা কণ্টকদ্বীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই শাণ্ডিল্য-দেবকুলে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র দনুজারি। পাঠান-বিজয়কালে তিনি সেনরাজগণের সামন্তস্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বন্দ্যবংশীয় মকরন্দের পুত্র দাশরথিকে কণ্টকদ্বীপে স্থাপন করেন ও তাঁহার পাঁচপুত্রকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন এবং চণ্ডীপরায়ণ বন্দ্য-বংশের শিষ্য হওয়ায় দেব-বংশীয়েরা "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ" উপাধি গ্রহণ করেন। (আমরা মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রায় এই উপাধি উৎকীর্ণ দেখিয়াছি।) দনুজারির পুত্র হরিদেব কণ্টকদ্বীপ হইতে পাণ্ডুনগরে গমন করেন। হরিদেবের পুত্র নারায়ণ এবং নারায়ণের দুই পুত্র—পুরন্দর ও পুরুজিৎ। তন্মধ্যে পুরন্দর সন্ন্যাসী হন। পুরুজিতের আদিত্য নামে মহাতপা পুত্র জন্মে। আদিত্যের দুই পুত্র—শ্রীশ্রীচণ্ডী-পরায়ণ দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। তিনি যবনদিগকে দূরীভূত ও কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরে দেবরাজ্য স্থাপন করেন। * এই কুলগ্রন্থের আবিষ্কারের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অনুমান করিয়াছিলেন যে "রাজা গণেশ বা কংস-নারায়ণের মৃত্যুর পর যদু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন।" † মহেন্দ্র দুষ্টঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তৎপুত্র দনুজমর্দ্দন রাজা হন। তিনি

---

* "যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ।
পাণ্ডুয়ায়াং দেবরাজ্যমনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম্‌॥"

† প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ ৩৮৮ পৃঃ।

কাত্যায়নীর মন্দির
মাধবপাশা, চন্দ্রদ্বীপ। [২৮১ পৃঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন জন্য সপরিবারে সমুদ্রোপকূলে গমন করেন এবং রণচণ্ডীর প্রসাদে একটি নবোত্থিত দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিয়া গুরুর প্রীতির জন্য উহার নাম রাখেন চন্দ্রদ্বীপ। * মুদ্রা হইতেও আমরা দেখিয়াছি যে, দনুজমর্দ্দন পাণ্ডুনগরে রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরই চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিতে থাকেন।

দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে এবং পরে তদ্বংশীয় কন্দর্প-নারায়ণ মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ায় কমলাসাগর দীঘি এবং মাধবপাশায় দুর্গাসাগর দীঘি (১৪৪০´×৯৮০´) ও বিরাট রাজবাটীর বহুসংখ্যক জীর্ণগৃহ পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এইস্থানে এখনও দনুজ-মর্দ্দনের ইষ্টদেবী কাত্যায়নীর মূর্ত্তির পূজা হইতেছে। দনুজমর্দ্দনের রাজ্য পশ্চিমে যশোহর ও পূর্ব্বে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যে খাঁ জাহান আলী প্রভৃতি পাঠান সামন্তগণ বলেশ্বরের পূর্ব্বপারে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। খাঁ জাহানের গতি বাগের হাট আসিয়াই রুদ্ধ হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনের পর তদ্বংশীয় বহুপুরুষ চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলায় রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু সে দিন আর নাই, এক্ষণে দনুজমর্দ্দনের হীনাবস্থ বংশধরেরা নির্জীবভাবে মাধবপাশায় বাস করিতেছেন। †

---

* প্রচলিত প্রবাদে এই গুরুদেবের নাম চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী এবং এখানে দেখিতে পাইতেছি চন্দ্রাচার্য্য। মোটকথা, গুরুদেবের চন্দ্র নাম হইতেই যে চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি, ইহাই বোধ হয়। কিন্তু আমরা দনুজমর্দ্দনের বহুপূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, এই দ্বীপ চন্দ্রবৎ হ্রাস বৃদ্ধি পাইত বলিয়া উহাকে চন্দ্রদ্বীপ বলিত (এড়ু মিশ্র)। দনুজমর্দ্দনের পূর্ব্বেও এ দ্বীপ অনেকবার উঠিয়াছে পড়িয়াছে, এবং একবার উত্থানের পর দনুজমর্দ্দনের রাজ্য স্থাপিত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ১৩৯—৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† দনুজমর্দ্দনের বংশাবলী পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—খাঁ জাহান আলী।

পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্ব হইতেই মুসলমান দরবেশগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশে আসিতেছিলেন। খৃষ্টীয় মিশনরী বা ধর্ম্মযাজকগণ যেমন ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির পক্ষে রাষ্ট্রবিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, এই মুসলমান আউলিয়া বা ফকিরগণও সেইরূপ মুসলমান প্রতিপত্তির ভিত্তি পত্তন করেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সাহ জালাল উদ্দিন তাব্রেজী বঙ্গে আসিয়া চিরঘৃণিত মুসলমানের জন্যও হিন্দুর নিকট হইতে ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বুজরুক অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম ছিলেন। সেই অদ্ভুত ক্ষমতাকে বুজরুকী বলিত এবং উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল। লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে যখন জালালউদ্দীনের প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি দেখিলেন সেই দুর্ব্বেশ (দরবেশ) জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইতেছেন। দরবেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" গর্ব্বিতভঙ্গিতে লক্ষ্মণসেন আত্মপরিচয় দিলেন। ফকির বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বলিতেছ পৃথিবীর রাজা; ঐ যে বক মৎস্য ধরিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে মৎস্য পরিত্যাগ করিতে বল, সে অবশ্য রাজার কথা শুনিবে।" লক্ষ্মণ বলিলেন "বক তির্য্যক্‌যোনি, জ্ঞানহীন, সে আমার কথা শুনিবে কেন? তোমার ক্ষমতা থাকে, উহাকে আদেশ কর।" ফকির বককে মৎস্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিবামাত্র সে তাহা ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। লক্ষ্মণসেন অবাক্ হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন ইন্দ্রদেব এই দরবেশ আকৃতি ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। * এই যে ঝঙ্কার লাগিল, তাহাতে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের অসি অপেক্ষাও অধিক শক্তি দেখাইয়া ছিল। হিন্দু চিরকাল আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট দাসানুদাস; ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভরতা জাগিলে সে শক্তি সর্ব্বধর্ম্মীতে জাগে। মুনি-ঋষি এই শক্তিতে হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছেন,

---

* "দুর্ব্বেশমাস্থায় সাক্ষাদিন্দ্র ইহাগতঃ"—সেকশুভোদয়া। সাহিত্য, ১৩০১, ১০—১১ পৃঃ

মুসলমান দরবেশও এই শক্তিবলে সেই হিন্দুর রাজ্যে ইসলামধর্ম্মের বিজয়পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাহ জালালউদ্দীন শেষে এইরূপ বহু বুজরুকী দেখাইয়া নবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে পাঠানেরা যত দেশ জয় করিয়া যেখানে সেখানে রাজপাট বসাইতে লাগিলেন, তত এই রূপ দরবেশগণ এদেশে আসিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ধর্ম্মের খাতিরে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু দরবেশগণও নির্য্যাতনের মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারের জন্য জলন্ত স্বার্থত্যাগর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আত্মবলিদানের উপর আজ ইসলামধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতেছে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এইরূপ বহু দরবেশ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ঢাকার বাবা আদম ও শ্রীহট্টের সাহজালালের নাম বিখ্যাত। এই সকল দরবেশগণ এত অধিক শিষ্যপরিবৃত হইতে হইতে অগ্রসর হইতেন যে তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায় সৈন্যশ্রেণীর মত বোধ হইত। দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন ঢাকায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন রাজধানী রামপালের নিকটবর্ত্তী আবদুল্যাপুর গ্রামে বাবা আদম দলবল সহ আগমন করেন, এবং হিন্দুদুর্গের ভিতর গোমাংস-খণ্ড নিক্ষেপ করায় রাজার বিষ-নজরে পড়েন। * রাজার সহিত আদমের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে তিনি আদমের হত্যা সাধন করেন। আদমের মৃত্যুতে মুসলমানেরা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রমে বহুসংখ্যক দরবেশ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া দেশময় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। এই সময়ে মীর সৈয়দালী তাব্রেজী বা সৈয়দালী পাতশা বহু অনুচর সহ ঢাকার অন্তর্গত ধামরাই অঞ্চলে আসেন। ধামরাই নগরে বড় দরগা উক্ত তাব্রেজীর নাম রক্ষা করিতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন অংশে বিভক্ত ছিল। উহার গৌড় অংশের রাজা ছিলেন গোবিন্দ। এইজন্য সেই রাজা গোবিন্দকে গৌড়-গোবিন্দ বলিত। হিন্দুনৃপতি গৌড়-গোবিন্দ গোবধ-নিবারণ জন্য জনৈক মুসলমানের উপর অত্যাচার করিলে, সেই কথা দিল্লীতে

---

* J. R. A. S. Vol XIII part 1, p. 285, বিক্রমপুরের ইতিহাস ৪৭ পৃঃ। রামপালে বল্লাল-বাড়ীর সন্নিকটে বাবা আদমের মসজিদ আছে ।

পৌঁছিল। তাহাই সাহ জালাল নামক * এক দরবেশের আগমনের কারণ। এ সময় সামসুদ্দীন ইলিয়াস বঙ্গের স্বাধীন রাজা, তাঁহার পুত্র সেকন্দর শ্রীহট্ট প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্ত্তা। সাহ জালাল শ্রীহট্টে আসিয়া নানা অমানুষিক ক্রিয়া দ্বারা এক প্রকার বিনা রক্তপাতে গৌড়-গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন; কিন্তু রাজ্য নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা সুলতান সেকন্দর সাহকে দেন। † সাহ জালাল প্রথমতঃ ১২ জন শিষ্য লইয়া যাত্রা করেন, পথে আসিতে আসিতে তাঁহার শিষ্য বা আউলিয়া (ফকির) গণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহার মধ্যে প্রধান ৩৬০ জন আউলিয়া দ্বারা শ্রীহট্ট বিজিত হয়। এইজন্য শ্রীহট্টকে "৩৬০ আউলিয়ার মুল্লক" বলে। ‡

প্রবাদ-মুখে যখন ইতিহাসের কথা রক্ষিত হয়, তখন এক স্থানের ঘটনা অন্যত্র পুনরভিনীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ইসলামধর্ম্ম-প্রচারকগণের এইরূপ ১২ জন সঙ্গী লইয়া আসা ও পরে সে সংখ্যা ৩৬০ হইয়া যাওয়া একটি প্রবাদ। অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে, বিশেষতঃ যশোহর-খুল্‌নায় খাঞ্জালির ইতিহাসে।

---

* লক্ষ্মণসেনের সময়ের দরবেশের নাম সাহ জালালউদ্দীন তাব্রেজী। জালালউদ্দীন তাঁহার নাম, তিনি তাব্রিজ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া তাব্রেজী বলিয়া খ্যাত। শ্রীহট্টের সাহ জালালের নাম সাহ জালাল ইমনি। তিনি ইমন সহর হইতে আগত এবং সাধারণতঃ সাহ জালাল বলিয়া খ্যাত।

সাহিত্য, ১৩০১, ২ পৃঃ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ,২য় খঃ ১১ পৃঃ।

Bloch's Archaeological Survey Report, 1903, p. 24.

† "Sylhet appears to have been conquered by a small band of Mahammadans in the reign of Bengal king Shamsuddin in 1384 A. D. The Supernatural powers of the last Hindu King, Gour Govinda, proved ineffectual against the still more extraordinary powers of the Fakir Shah Jalal, who was the real leader of the invaders". W. W. Hunter, Statistical Accounts, Assam Vol II. কিন্তু এখানে সামসউদ্দীন বলিতে সম্ভবতঃ সামসুদ্দীন ইলিয়াসকেই বুঝাইতেছে। কারণ হাণ্টার সাহেব দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্র সেকন্দর নহেন এবং দ্বিতীয় সামসুদ্দীনকে নিহত করিয়া রাজা গণেশ রাজ্যলাভ করেন। যাহা হউক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট বিজয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

‡ "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় আউলিয়াদিগের নাম দিয়া এই ৩৬০ সংখ্যাপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩৮—৪১ পৃঃ।

১২ মাসে ও ৩৬০ দিনে বৎসর ধরা হইত বলিয়া, এই দুইটি সংখ্যা হিন্দু মুসলমানের নিকট কিছু অধিকতর পরিচিত বলিয়া মনে হয়। চিরপরিচিত সংখ্যা দ্বারা সংজ্ঞাজ্ঞাপন করিলে তাহা সকলেই মনে রাখিতে পারে না। জানি না, এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশের মূলে এরূপ কোন তথ্য নিহিত আছে কি না। তবে এই মাত্র জানি যে যশোহর খুল্‌নায়ও একটি প্রবাদ আছে যে, সাহ জালালের সমসময়ে, বার জন ফকির ধর্ম্মপ্রচারার্থ যশোহর অঞ্চলে আসিয়া ভৈরবতীরে যে স্থানে প্রথম আস্তানা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম হইয়াছিল বারবাজার। এই বার জনের নায়ক ছিলেন খাঁ জাহান আলী। তিনি যখন বাগেরহাটে স্থায়ী হাবেলী বা বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তখন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ জন হইয়াছিল। এই শিষ্যগণের জন্য তিনি বাগেরহাট অঞ্চলে ৩৬০টি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও ৩৬০ টি দীঘি খনন করেন। উহার অনেকগুলি এখনও আছে। আমরা সে শিষ্যসম্প্রদায়ের কথা শেষে তুলিব, প্রথম দেখা যাউক এই খাঁ জাহান আলী কে?

দীর্ঘকাল সুশাসনের পর এবং বহু পুণ্যকর্ম্মে দেশ অলঙ্কৃত করিয়া যে দিন তোগলক-কুলতিলক দিল্লীশ্বর ফিরোজসাহ নবতি বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিলেন (১৪৮৮), সেইদিন হইতে দিল্লীতে এক ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সিংহাসন লইয়া মহা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল। ৫ বৎসরে পাঁচ জন রাজা পার হইলেন। অবশেষে সম্রাট্ হইলেন ফিরোজের এক নাবালক পৌত্র মামুদ তোগলক। একে অরাজকতা, তাহাতে এক নির্জ্জীব বালক শাসকের পদে সমাসীন; সুতরাং অচিরে দেশময় এক বিপ্লব উপস্থিত হইল; যাহা কিছু বাকী ছিল তাহাও ৪ বৎসর পরে নরদস্যু তৈমুরলঙ্গের নৃশংস আক্রমণে (১৩৯৮) তাহাও শেষ হইয়া গেল, দিল্লী শ্মশানে পরিণত হইল। পলায়িত মামুদ ফিরিয়া আসিয়া ২০ বৎসর কাল নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন বটে, কিন্তু দেশ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শাসন-বহির্ভূত ছিল।

এই মামুদের এক উজীর ছিলেন, খাজা জাহান। তিনি সুযোগ পাইয়া বালক মামুদের রাজ্যের প্রারম্ভেই (১৩৯৪) জোনপুরে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি এমন প্রবলপ্রতাপে শাসন করিতে থাকেন যে সম্রাট্ তাঁহাকে "মালিক-উস-শর্ক" (পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যসমূহের অধিপতি) উপাধি প্রদান করিতে

বাধ্য হন। * তবে তিনি কার্য্যতঃ একপ্রকার স্বাধীন হইলেও নিজের নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন নাই এবং চিরকাল আপনাকে প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশেও এক প্রকার অরাজকতা চলিতেছিল।

ফিরোজসাহ বঙ্গের অধিপতি সামসুদ্দীনইলিয়াসের পুত্র সেকন্দর সাহকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন। এই সেকন্দরের সময়ে সাহ জালাল শ্রীহট্টে আসেন। সেকন্দরসাহ বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া রাজস্ব নির্ণয় করেন এবং তথায় সর্ব্বত্র এক দৃঢ়শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার ব্যবহৃত মাপকাটিকে সেকন্দরীগজ বলা হয়। এই সাধু প্রকৃতিক নরপতি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন বলিয়া "পীর" (দেবতা বা saint) আখ্যা পান। তিনি "পাঁচ পীরের" অন্যতম, সে কথা পরে বলিব। সেকন্দরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রাজা গণেশ বাঙ্গালার রাজত্ব কাড়িয়া লন। প্রথম কয়েক বৎসর গণেশকে আত্মরক্ষার জন্য এত বিব্রত থাকিতে হইত, যে তিনি সুশাসনের দিকে কোনরূপ দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে খাজা জাহান বঙ্গে অবির্ভূত হন।

এই খাজা জাহান, খোজা বা নপুংসক ছিলেন, তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। † তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসনভার দিয়া ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ও পুণ্যকার্য্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পূর্ব্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরম্ভের পূর্ব্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত

---

* "The founder of the Jaunpur dynasty was the eunuch Khwajah-i Jahan, Uizir of Sultan Mahmud II. of Delhi. In A. H. 796 (A. D. 1394) he had been governor of the Eastern Provinces of the Delhi Empire with the title of Malik-us-Sharq [East)." H. N. wright, Catalogue of coins vol. II. p. 206. Elphinstone's History BK. VI. p. 359. Stewart's History p. 110.

† "Mahmud first bestowed the title of Sultan-us-Sharq on Malik Sarwar, a eunuch who already held the title of khajah Jahan" Reyaz-us. Salatin, edited by M. A. Salam, p. 114.

হইয়াছিলেন, সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া বোধ হয়। নবরাজ্য পত্তনের কয়েক-বর্ষ মধ্যে পুত্রহীন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার রাজ্য লইয়া ভীষণ রক্তকাণ্ড চলিত; কিন্তু তাহা হয় নাই। ইব্রাহিম এমন দৃঢ় হস্তে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, যে তাঁহার ভয়ে ও কৌশলে গণেশের পুত্র যদুকে মুসলমান হইতে হইয়াছিল এবং যদুর বংশধরকে আত্মরক্ষার জন্য তৈমুর-লঙ্গের পুত্র সাহরুখের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল। সাহরুখের সহিত বিবাদ করা অনর্থক এবং হয়ত অনিষ্টকর হইতে পারে বলিয়া ইব্রাহিম বঙ্গেশ্বরের বন্দীদিগকে মোচন করেন। এই সুযোগে খাঁজাহান পূর্ব্বদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে এক প্রকার স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন ও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন।

যশোহর-খুলনার "খাঞ্জালি পীর" বা খাঁ জাহান আলি এবং জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ সাধারণ প্রবাদে চলিয়া আসিতেছে, তিনি দিল্লীশ্বর মামুদসাহের সময় জায়গীর পাইয়া বঙ্গে আসেন; কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে দিল্লীশ্বর মামুদ (তোগলক) শর্কী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার আমলেই খাঁ জাহান উক্ত শর্কী বা পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্যের অধিপতি হন এবং বঙ্গে আসেন। দ্বিতীয়তঃ ঢাকায় একটি মস্‌জিদের দ্বারদেশে একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়, উক্ত মস্‌জিদ যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি একজন খাঁ, মামুদ সাহের রাজত্ব কালে তঁহার উপাধি ছিল খাজা জাহান"; * উক্ত মস্‌জিদের নির্ম্মাণ তারিখ ১৪৫৯ অব্দের ১৩ই জুন। ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন যে এই খাজা জাহান ও বাগেরহাটের খাঁ জাহান এক ব্যক্তি। উক্ত লিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে খাঁ মামুদ সাহের রাজত্বকালে খাজা জাহান উপাধিধারী ছিলেন, তিনিই ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং শর্কী শাসক খাজা জাহান ও খাঁ জাহান আলি এক ব্যক্তি। উক্ত মস্‌জিদ বঙ্গেশ্বর নাসির সাহ বা নাসির উদ্দীন মামুদ সাহের (১৪৪২—১৪৬০) সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত লিপিতে যে মামুদ সাহের কথা আছে, তিনি দিল্লীশ্বর মামুদ সাহ (১৩৯৪—১৪১৪) বলিয়াই

* "A khan whose title is Khaja Jahan in the reign of Mahmud Shah". J. A. S. B., Part I, 1872 pp. 107-8. Khulua Gazetteer p. 27.

বোধ করি, তাহারই সময়ে খাজা জাহান উপাধি হয়। বিশেষতঃ বঙ্গেশ্বর নাসির সাহ বলিয়াই খ্যাত, মামুদ সাহ বলিয়া তেমন পরিচিত নহেন; কারণ দিল্লীতে ও বঙ্গে বহু সংখ্যক মামুদ সাহ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ একটি সন্দেহ হইতে পারে যে খাজা জাহান যখন পালিত পুত্রের হস্তে জৌনপুরের রাজ্যভার দিয়া বঙ্গে আসেন তখন তিনি অবশ্য প্রবীণ বয়স্ক ছিলেন, সে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কথা; তাঁহার সমাধিতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ আছে, ১৪৫৯। তাহা হইলে সেই প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তি আরও ৫৯ বৎসর কিরূপে বাঁচিয়াছিলেন? ইহারও উত্তর আছে। সবলে রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৬ বৎসর পরে খাজা জাহান বঙ্গে আসেন; তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসরের অতিরিক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; তখন তাঁহার পালিত পুত্র ইব্রাহিম ২০।২৫ বৎসর বয়স্ক থাকিতে পারেন; ইব্রাহিম ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম অধিক বয়স্ক হইলে ৪০ বৎসর রাজত্ব করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। খাঁ জাহান যদি ৪০ বৎসর বয়সে বঙ্গে আসিয়া থাকেন, তবে তৎপরে আর ৫৯ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ১০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকা বিচিত্র নহে। খাঁ জাহানের মত সাধু পীরগণ খুব দীর্ঘজীবী হইতেন। সাহ জালাল তাব্রেজী ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। খাঁ জাহান যে অতি বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বিদেশে জীবনলীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমাধিলিপির আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়।*

চতুর্থতঃ তিনি যে বঙ্গে আসিয়া ৫৯ বৎসর ছিলেন, তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্য-ক্ষেত্র ও অসংখ্য পুণ্যকীর্ত্তির তুলনায় তাহা অতিরিক্ত বোধ হয় না। তিনি যে জীবনের অন্ততঃ শেষ দশ বর্ষ কাল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝা যায়। তাঁহার সমাধিমন্দির ও প্রস্তরফলকসমূহ যেরূপ বহু যত্নে দূরদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা কারুকার্য্যরঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা সময় সাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি নিজের সমাধির জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাগের হাটে তাঁহার যে সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে

* Sunder's Antiquities of Bagirhut pp. 8-15.

অন্ততঃ ২০বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে পয়গ্রাম কস্‌বায় তাঁহার রাজধানী অন্ততঃ ১০ বৎসর কাল ছিল। তৎপূর্ব্বে সুন্দরবনের নানা স্থান আবাদ করা এবং যশোহর ও বারবাজারে অধিষ্ঠান করা প্রভৃতি কারণে ১০।১২ বৎসরের কম হয় নাই। ইহা হইতে মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে ৫৯ বৎসর কাল অতিরিক্ত গণনা নহে।

পঞ্চমতঃ খাঁ জাহান সাহ জালাল প্রভৃতি দরবেশের মত সাধু চরিত্র ছিলেন; কিন্তু তিনি ঠিক তাঁহাদের মত কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারার্থ শিষ্যপরিবৃত হইয়া আসেন নাই। তাঁহার সহিত সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর ধনদৌলত সকলই ছিল, তিনি রাষ্ট্রবিজয়ী সেনাপতির মত বীর প্রতাপে রাজ্য জয় করিতে করিতে কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিতে রাখিতে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার কার্য্যগণ্ডী যশোহর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে খাজা জাহানের মত পদস্থ ও ক্ষমতাশালী শাসন কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গে বা গৌড় রাজ্যে তখন যতই অরাজকতা বা গণ্ডগোল থাকুক, জৌনপুরের সুবিখ্যাত খাজা জাহান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তেমন বিনারক্তপাতে দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত না, ইহা নিশ্চিত।

যাহা হউক, আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে জৌনপুরের শাসন কর্ত্তা খাজা জাহান ও যশোহর-খুল্‌নার খাঁ জাহানালী একব্যক্তি। * প্রবাদ এই—হিন্দু মুসলমান ঘটিত কোন গুরুতর বিবাদের মীমাংসা জন্য তিনি সসৈন্যে বঙ্গে আসেন। আসিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। গঙ্গাপার হইয়া নদীয়ার মধ্যদিয়া ভৈরবের কূল দিয়া তিনি প্রথম বারবাজারে উপনীত হন। হয়ত তৎসন্নিকটেই তাঁহার কার্য্য ছিল এবং সেখানে থাকিয়া সেই কার্য্যের মীমাংসা করেন। এই বারবাজারেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাঁ জাহানের কার্য্যকাহিনী।

খাঁ জাহান আলী কে, তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের অনুমানের পরিপোষণ জন্য কতকগুলি প্রমাণও দিয়াছি। তিনি

---

* অন্য কেহ কেহও এইরূপ মনে করিয়াছেন। ব্লকম্যানের অনুমানের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি পল্লীচিত্র, ১৩২০, ভাদ্র, শ্রীমোতাহারউল হক্ লিখিত "খাজাহান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যিনিই হউন, তিনি যে সুন্দর-বনাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ভার তিনি দিল্লী হইতে পাইয়াছিলেন, বোধ হয়; কারণ বঙ্গের কর্ম্মচারী স্বকীয় কার্য্যস্থান বাগের হাটের নাম খালিফাতাবাদ রাখিতেন না। তিনি নিজে স্বাধীনও ছিলেন না, কারণ তিনি নিজনামে কোন মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন বলিয়া একাল পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যদি তিনি জৌনপুরের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহানই হন, তাহা হইলে ইব্রাহিম সাহের মৃত্যুর পর (১৪৪০) তাঁহাকে দিল্লী বা বঙ্গের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে হইয়াছিল। জৌনপুরের গর্ব্ব ইব্রাহিমের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হয়। তখন দিল্লী ও জৌনপুর রাজ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল; এ সময়ে নাসির উদ্দীন মামুদ সাহ বঙ্গের রাজা, (১৪৪২—৬০) তাঁহার রাজত্ব শান্তিতে নির্ব্বাহ হইতেছিল। এই রাজত্বকালেই খাঁ জাহানের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি স্থাপিত হয়।

খাঁ জাহান সদলবলে প্রথমে বারবাজারে আসিয়া অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ বারজন ফকির ধর্ম্মপ্রচারার্থ এ প্রদেশে তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বারবাজারের নূতন নাম রাখেন। পূর্ব্বে এইস্থানের নাম সম্ভবতঃ ছাপাই নগর বা চাম্পাই নগর ছিল। খাঁ জাহান ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আসিলে ফকিরেরা তাঁহার অনুচরভুক্ত হন। এমন আরও কত অনুচর জুটিয়াছিল। এই সময়ে বার বাজারে কতকগুলি দীঘি ও মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধপ্রধান স্থান বলিয়াই এস্থানে পাঠানদিগের প্রথম আস্তানা হয়। তখন প্রাচীন বৌদ্ধগণ কতক কতক মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে এবং কতক কতক স্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে পলায়ন করে। খাঁ জাহান বারবাজারে কয়েক বৎসর অনুচরবর্গ সহ অবস্থান করিয়াছিলেন।

বারবাজার হইতে বহির্গত হইয়া খাঁ জাহান ও তাঁহার অনুচরবর্গ প্রথমতঃ যশোহরে উপনীত হন। খাঁ জাহান এখানে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহার সহচর দুইজন সাধু ফকির এখানে স্থায়ী ভাবে থাকিয়া যান। এ সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। খাঁ জাহান তাঁহার সহযাত্রী গরিবসাহ ও বেরামসাহ নামক দুই ফকিরকে তাঁহার

বারবাজারের মস্‌জিদ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য
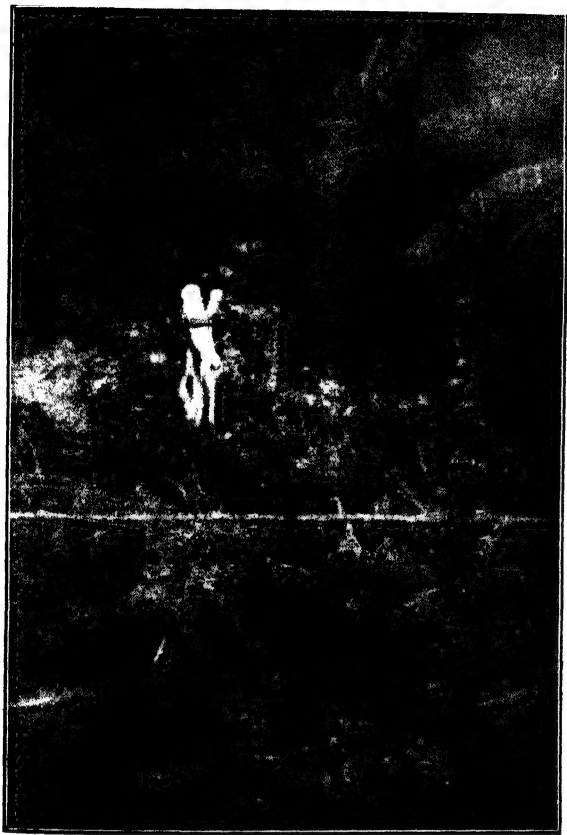
Printed by K. V. Seyne & Bros.

ও অনুচরবর্গের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পূর্ব্বে প্রেরণ করেন। উহারা যশোহরে পৌঁছিয়া খাদ্যের চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু সময় মত খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল না। খাঁ জাহান পৌঁছিয়া দেখিলেন খাদ্য প্রস্তুত নাই, এজন্য তিনি এস্থানে অবস্থান করিলেন না এবং গরিবসাহ ও বেরামসাহকে সঙ্গে লইলেন না। তদবধি ঐ দুইজন এইস্থানে রহিয়া গেলেন। এটি একটি গল্প কথা। মোটকথা, খাঁ জাহানের উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানধর্ম্ম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি ভৈরবকূলে মুড়লীতে একটি প্রধান কেন্দ্র সংস্থাপন করিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি সহর হইল। উহার নাম হইল মুড়লী-কস্‌বা। কস্‌বা শব্দে সহর বা নগর বুঝায়। এইরূপ ভাবে সহর প্রতিষ্ঠা করিয়া খাঁ জাহান অগ্রসর হইতে থাকিলেন। মুড়লীতে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে গরিবসাহ ও বেরামসাহকে রাখিয়া গেলেন। তাঁহারা নানা বুজরুকী বা অলৌকিক শক্তি এবং সাধুজীবনের আদর্শ দেখাইয়া বহু লোককে মোহিত ও বশীভূত করিলেন। অনেকে মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল; যাহারা মুসলমান হইল না, তাহারাও ফকিরদিগকে দেবতার মত ভক্তি করিত। এখনও সে ভক্তি চলিতেছে। এখনও দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেও মোকর্দ্দমা করিতে বা অন্য কার্য্যে যশোহরে আসিলে গরিবসাহের দরগায় সেলাম ও সিন্নী না দিয়া কোন কার্য্য করে না। পুরাতন কস্‌বায় যশোহরের ফৌজদারী আদালতের অনতিদূরে ভৈরবকূলে গরিবসাহের ক্ষুদ্র মস্‌জিদটি সর্ব্বজাতীয় লোকের তীর্থস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বেরামের দরগা আরও পশ্চিমদিকে গেলে সাহেবদিগের গোরস্থানের সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধুতা যে জাতিভেদের গণ্ডীর বহির্ভূত এবং সর্ব্বজাতির ভক্তির জিনিস, এই সাধু ফকিরদিগের দরগা তাহা শিক্ষা দিতেছে।

মুড়লী-কস্‌বা হইতে খাঁ জাহানের প্রচার-বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হয়। একদল সোজা দক্ষিণমুখে কপোতাক্ষের পূর্ব্বধার দিয়া ক্রমে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; অন্যদল পূর্ব্বদক্ষিণমুখে ক্রমে ভৈরবের কূল দিয়া বাগেরহাট অঞ্চলে পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পথে দুইটি রাস্তা বা জাঙ্গাল প্রস্তুত হইয়া যায়। বারবাজার হইতে যে রাস্তা যশোহর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বনাম গাজীর জাঙ্গাল। আমরা গাজীর কথা পরে বলিব। জনৈক গাজী বারবাজারে মুসলমানপ্রতিপত্তি স্থাপনা করেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত গাজীর জাঙ্গাল

নাম হইয়াছিল। যশোহর হইতে দুইদিকে দুইটি খাঞ্জালির জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়াছে।

এক প্রবীণ পুরুষ খাঁ জাহানের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন; তাঁহার অন্য কি নাম ছিল জানা যায় না; তিনি সাধারণতঃ বুড়া খাঁ নামেই পরিচিত। ইঁহার সঙ্গে ইঁহার পুত্র ফতে খাঁ ছিলেন। উভয়ই সাহস, কর্ম্মতৎপরতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দক্ষিণদিকে আবাদ পত্তন ও ধর্ম্মপ্রচারের ভার এই পিতা-পুত্রের উপর দিয়া, নিজে ভৈরবতীর দিয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুড়া খাঁ ফতে খাঁ বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত ও সাধু ফকির সঙ্গে লইয়া মুড়লী হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া প্রথমতঃ খাঁনপুরে অবস্থান করেন। তাঁহারা রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে, খাঁ জাহানের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে উভয়পার্শ্বে দীঘি খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। খাঁনপুরে বহুলোকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদবধি বহু নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের বাস জন্য এ স্থান পবিত্র হইয়াছিল; এখনও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী, কিন্তু সে নিষ্ঠা এক্ষণে বিবাদ-বিসম্বাদে পর্য্যবসিত হওয়ায় অধিবাসীরা মোকর্দ্দমার খরচে উৎসন্ন যাইতেছে। এখান হইতে খাঁ জাহানের দল কেশবপুরের পথে বিদ্যানন্দকাটির নিকট আসিয়া আড্ডা করেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বিদ্যানন্দকাটি একটি প্রাচীন গ্রাম, এখানে পাঠানযুগের পূর্ব্বকালীন কীর্ত্তিচিহ্নও ছিল এবং বহুসংখ্যক বৌদ্ধের বাস ছিল। বিদ্যানন্দকাটির দীঘি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; সম্ভবতঃ কোন পুরাতন বৌদ্ধযুগের দীঘি পুনরায় খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ হাত এবং প্রস্থ ৭০০ হাত হইবে। প্রতিবৎসর এই দীঘির দক্ষিণ পাহাড়ের উপর দোলপূজার দিন খাঁ জাহানের উদ্দেশ্যে মেলা হয়। খাঁ জাহান এতদঞ্চলের লোকের নিকট পীর বা দেবতার মত সম্মানিত হন। লোকের গাভী দুগ্ধবতী হইলে প্রথম দুগ্ধ তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া যায়। একসময় এমন ছিল যে স্থানীয় লোকে কোন ইমারত নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে খাঁ জাহানের স্মৃতি-স্থানের উপর একখানি ইট না লাগাইয়া কার্য্যারম্ভ করিত না। উক্ত দীঘি খনন করিবার সময় খাঁ জাহান স্বয়ং কিছুদিন আসিয়া এখানে ছিলেন এবং হয়ত তাঁহার কোন অনুচরের স্মৃতিরক্ষা জন্য তাহার নামানুসারে নিকটবর্ত্তী সারবাবাদ

বা সারবাবাজ নাম হইয়াছে। এই সারবাবাদেও পার্শ্ববর্ত্তী মীর্জাপুরে কতকগুলি "খাঞ্জালি" দীঘি আছে। বিদ্যানন্দকাটির দীঘি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, আমরা এখানে সে সকল অনর্থক গল্পের অবতারণা করিতে চাহি না। তাহার একটি গল্প আছে যে এই দীঘি খনন কালে বাগেরহাটের ঠাকুর-দীঘির খননকালের মত একটি যোগী মূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল; * ঠাকুরদীঘির ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির মত এখানেও কোন বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

বিদ্যানন্দকাটি হইতে খাঁ জাহানের অনুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। এই রাস্তার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি উহা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। একটি রাস্তা যশোহর, খাঁনপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি ও তথা হইতে মাগুরাঘোনা, আটারই, জেয়ালা, বারুইহাটির পূর্ব্বধার, তালা, চাপানঘাট, খলিননগর, গঙ্গারামপুর, ঘোষ-নগর, কপিলমুনি, রামনাথপুর, গদাইপুর, মঠবাড়ী দিয়া পাইকগাছায় গিয়াছে। সেখানে শিবসা নদী পার হইয়া লক্ষ্মীখোলা, গজালিয়া, আলমতলা দিয়া মস্‌জিদ-কুড়ে মিশিয়াছে; তথা হইতে আমাদি ও পরে গভীর অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী বেদকাশী নামক স্থানে গিয়াছে। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। মাগুরাঘোনায় একটি মস্‌জিদ ও দীঘি ছিল। দীঘি এখনও আছে, মস্‌জিদের চিহ্নও বিলুপ্ত হয় নাই। এই মস্‌জিদে একখানি পাথর ছিল। আরসনগরে একটি মস্‌জিদ ও দীঘি ছিল। সে দীঘি এখনও আছে, উহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। এখনও উহাতে বেশ জল থাকে। দীঘির পশ্চিমকূলে ৪৫´×৪০´ একটি মস্‌জিদ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে।

এই মস্‌জিদে একখানি পাথরে ডগরা অক্ষরে আরবী ভাষায় একটি লিপি ছিল। পাথরখানি এখনও আছে। এখনও উহার পাঠোদ্ধার করা হয় নাই। পাথরের একটা ছাপ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে পড়া যায় নাই। ভালভাবে পুনরায় ছাপ লওয়া আবশ্যক। পাথরখানি সাহাজী নামক এক ফকির জঙ্গলের মধ্যে মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষের উপর পান। উহা হইতে পঞ্চমপুরুষে সিরাজ, মফেজ ও অহেদ সেখ বর্ত্তমান। ইহারা পুরুষানুক্রমে দুগ্ধাদি দিয়া পাথরখানির পূজা করিয়া আসিতেছে। পাথরখানি অন্য কাহাকেও দিবে না। পাথরের পরিমাণ ১´—৯½´´×৯½´´×৪½´´, ওজন প্রায় পঁচিশ সের।

পাইকগাছার নিকট মঠবাড়ীতে প্রাচীন মস্‌জিদাদির ভগ্নাবশেষ আছে; লস্করবেড় নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। ইহাকে লস্কর দীঘি বলে; দীঘির জল অতি মিষ্ট, এখনও বৎসর ভরিয়া যথেষ্ট জল থাকে এবং নিকটবর্ত্তী লোকের জলকষ্ট হইতে দেয় না। মস্‌জিদকুড়েই বুড়া খাঁ ফতে খাঁ প্রধান আস্তানা করিয়াছিলেন। স্থানটির প্রকৃত নাম আমাদি, উহারই উত্তরাংশে বুড়া খাঁ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, সুন্দরবনের বিপ্লবে ঐ স্থান অনেককাল পর্য্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া থাকে। সেই জঙ্গল কাটিয়া মাটী খুঁড়িয়া যখন মস্‌জিদ বাহির হয়, তখন সে স্থানের নাম রাখা হয়, মস্‌জিদকুড়।

মসজিদকুড়ের বিখ্যাত নবগুম্বজ মস্‌জিদ সুন্দরবন প্রদেশের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার উভয়দিকে তিনটি করিয়া মোট ৯টি গুম্বজ। তন্মধ্যে
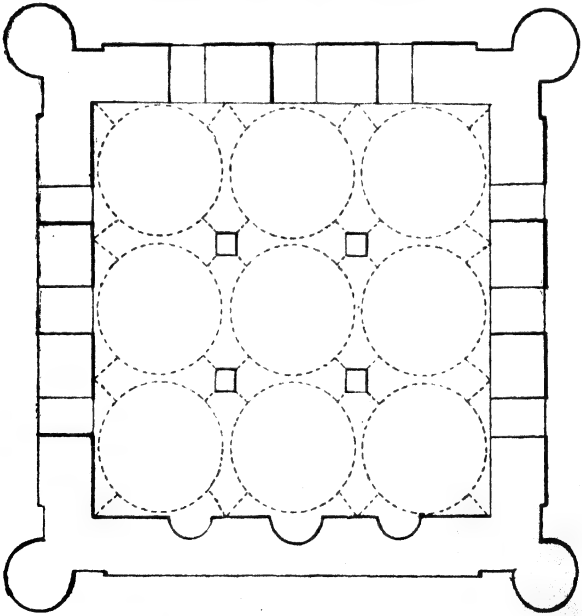
সর্ব্বমধ্যবর্ত্তী গুম্বজটি কিছু বড়। চিত্রে ভুলক্রমে তাহা প্রদর্শিত হয় নাই।

মসজিদ কুড়ের মস্‌জিদ। ২৯৫ পৃঃ

সমগ্র মস্‌জিদের ভিতরের মাপ ৪০´×৪০´, ভিত্তি ৭´ ফুট। চারি কোণে ৪টি মিনার আছে। পশ্চিমদিক বন্ধ; সেদিকে ভিতরে তিনটি মিরহাব বা কুলুঙ্গ (Niche) আছে। অপর তিনদিকে তিনটি করিয়া খিলান ও খোলা দরজা। প্রত্যেক দিকেই মধ্যবর্ত্তী দরজাটি কিছু বড়। সকল মস্‌জিদের মত ইহারও পূর্ব্বদিকে সদর ছিল, সেদিকে কার্ণিসে ও খিলানের উপরে ইষ্টকে কারুকার্য্য আছে। কতকগুলি ইষ্টকে পদ্ম উৎকীর্ণ; কতকগুলিতে একপ্রকার মালা বা রজ্জু নানাভাবে বিলম্বিত ও সংযুক্ত; কেহ কেহ বলেন উহা বঙ্গেশ্বর নাসিরউদ্দীন মামুদ সাহের রাজচিহ্ন। * এরূপ জড়োয়াবৃত্ত বাগেরহাটে ষাট গুম্বজের গায়েও আছে। বেষ্টনপ্রাচীর ব্যতীত মধ্যস্থানে চারিটি স্তম্ভের উপর গুম্বজগুলি গঠিত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি প্রত্যেকে ইষ্টকভিত্তির উপর ৮।৯ ফুট উচ্চ; কিন্তু উপযুক্ত ভার সহ্য করিবার মত সম্পুষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। তাহাতে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি; ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন। † খিলান ও গুম্বজের গঠন এত সুন্দর যে বোধ হয় এক্ষণে স্তম্ভগুলি সরাইয়া লইলেও তাহারা ঠিক থাকে।

এই সুন্দর মস্‌জিদটি বড় হীন অবস্থায় আছে। মিনার কয়েকটির শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মস্‌জিদের উপর সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, খিলানের ইটগুলি লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছে; স্তম্ভের মাথা দিয়া বর্ষার সময় জল পড়ে; উহাতে স্তম্ভ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং মস্‌জিদের ভিতর জল জমিয়া বর্ষাকালে অব্যবহার্য্য হয়। সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পুরাকীর্ত্তি রক্ষার জন্য বহুস্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত সুন্দরবন অঞ্চলে এই সুন্দর কীর্ত্তিমন্দির রক্ষার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। এদেশে যাতায়াতের অসুবিধাই কি এই অবহেলার কারণ? যেখানে সকলে যায়, সকলে দেখে, সকলে তাহারই রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু এই লবণাক্ত বায়ুর রাজ্যে—নিঃস্ব নিরক্ষর কৃষকের

---

* Khulna Gazetteer P. 183.

† বর্ত্তমান পুস্তক, ২০২-৩ পৃঃ, Westland's Report, P. 16-17.

দেশে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার ভার লওয়া যে কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মস্‌জিদের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত কপোতাক্ষ, অন্য তিনদিকে গড়খাই ছিল। এখনও দক্ষিণদিকে একটি পরিখা খালের আকারে আছে। নদীর দিক্ হইতে মস্‌জিদের ফটো লওয়া হয়। মস্‌জিদকুড়ের দক্ষিণ গায়ে আমাদি গ্রাম। আমাদি পুরাতন গ্রাম; ইহার সম্বন্ধে কিছু প্রাচীন কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদি গ্রামে পশ্চিম দিকে নদীর কূলে বুড়া খাঁ ও ফতে খাঁ উভয়ের কবর ছিল। অল্পদিন হইল বুড়া খাঁর কবর ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া গিয়াছে; এখনও একটি গোলক-চাঁপা ফুলের গাছতলায় ফতে খাঁর সমাধির ভগ্নাবশেষ আছে। এখনও বহু হিন্দু মুসলমানে এই সমাধি স্থানে মানসা করে এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ ফুলের গাছটির গাত্রে ইষ্টকখণ্ডসমূহ ঝুলাইয়া রাখিয়া যায়।

বুড়া খাঁ যে শুধু ধর্ম্মপ্রচার জন্য এখানে ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল, রাজ্য শাসন ও জমিপত্তন। তাঁহার সমাধিস্থানের অনতিদূরে তাঁহার গড়বেষ্টিত কাছারী বাড়ী ছিল; এখনও গড়ের এবং বাড়ীর ভগ্নাংশের নানা চিহ্ন আছে। দুইদিকে নদী ও অপর দুইদিকে খনিত খালে পরিখার কার্য্য করিয়াছিল। এই খালকে এক্ষণে খান্‌কা বলে। নিকটে যে প্রকাণ্ড "কালিকা" দীঘি আছে, তাহা জনৈক প্রাচীন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি-কৃত। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। * সম্ভবতঃ এই জন্যই এখানে বুড়া খাঁ কর্ত্তৃক কোনও পুষ্করিণী খনিত হয় না। ইন্দ্রনারায়ণের সময় নির্দ্দেশ করা যায় নাই। তিনি যদি বুড়া খাঁর পরবর্ত্তী যুগের লোক হন, তাহা হইলে হয়ত পাঠান আমলের দীঘিকে নিজের বলিয়া প্রচারও করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না:

বুড়া খাঁ ফতে খাঁ শুধু আমাদিতে থাকিতেন এবং অন্যত্র যাইতেন না, তাহা নহে। বাগেরহাটে বুড়া খাঁর দীঘি আছে। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর-ঈশ্বরীপুরে ও তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই দুইস্থানে বুড়া খাঁর আস্তানা ছিল বলিয়া প্রদর্শিত হয়। বেদকাশী আবাদে যে অতি প্রকাণ্ড "কালী-খালাস খাঁ"

---

* ২০৪ পৃঃ

বুড়াখা ফতেখার সমাধি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

দীঘির কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে *, সে খালাস খাঁ এই বুড়া খাঁর অনুচর ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কেবল খালাস খাঁ নহেন, দক্ষিণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বুড়া খাঁর আরও কয়েকজন অনুচর বিগ্যানন্দকাটি হইতে পশ্চিমমুখে আসিয়া কপোতাক্ষের কূল দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে একজন ছিলেন; তাঁহার নাম জানা যায় না। গোপালপুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর খাঞ্জালী মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে নদীর পাহাড়ের উপর মাটী ফেলিয়া উচ্চ করিয়া তাঁহার উপর মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোপালপুর হইতে দক্ষিণদিকে কপোতাক্ষের কূলদিয়া অগ্রসর হইলে মেহেরপুরে পীর মেদ্দীন বা মেহের উদ্দীনের সমাধিমন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এ মস্‌জিদটি খুব ছোট, বাহিরে ১৬´—৩´×১৬´—৩´, চারিকোণে চারিটি গাত্রলগ্ন মিনার, একটিমাত্র দরজা (৫´×২´—২´), উহার পার্শ্বে উপরিভাগে কারুকার্য্য করা ইষ্টক আছে। মস্‌জিদের সম্মুখে একটি বেদী, পরে চারিপাশে প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের দ্বারে একটি সুন্দর বকুলগাছ ছায়াদানে স্থানটির গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। বাহিরে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে; উহাও ইষ্টকের বেদী দ্বারা চিহ্নিত। উত্তরের দিকে একটি পাকা ইন্দিরা ও কূয়া আছে। মেহেরপুর হইতে আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে মাগুরা নামক গ্রামে পীর জয়ন্তী নামক ফকিরের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিও খাঁ জাহান আলীর অনুচর হইতে পারেন। এই ফকিরের যথেষ্ট পীরোত্তর আছে। অম্বুবাচীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে। কপোতাক্ষ বাহিয়া আর একটু অগ্রসর হইলে, সুজনসাহা বা সতিন্‌সা গ্রামে এক সুজনসাহ ফকিরের আস্তানা দেখিতে পওয়া যায়। ইহারা সকলেই খাঁ জাহানের অনুচর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পয়ঃগ্রাম কস্‌বা।

মুড়লী কস্‌বা হইতে খাঁ জাহান আলী স্বয়ং সৈন্য ও অনুচর সহ ভৈরবকূল দিয়া ক্রমে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাস্তা নির্ম্মাণ, দীঘি খনন ও মস্‌জিদ গঠন তাঁহার কার্য্য ছিল। এই সকল কীর্ত্তিদ্বারা তাঁহার যাত্রাপথ

---

* ৭৪ পৃঃ দেখুন।

সুচিহ্নিত হইয়াছে। খাঁ জাহান আলীর এই সকল কীর্ত্তিকে সংক্ষেপতঃ "খাঞ্জালী" কীর্ত্তি বলে। খাঞ্জালী হইতেও আরও সংক্ষেপ হইয়া "খাঞ্জাই" বা "খাঞ্জে" কথা হইয়াছে। যেমন খাঞ্জেপুর, খাঞ্জেদীঘি, খাঞ্জাই ইট প্রভৃতি। আমরা এই বিবরণীতে এই সকল সর্ব্বজনবিদিত কথাই ব্যবহার করিব। যশোহর-খুল্‌নায় এমন লোক নাই, যে খাঞ্জালী কথা জানে না; কিন্তু উহা যে খাঁ জাহান আলী নামের অপভ্রংশ তাহা অতি অল্প লোকেই জানে। বারবাজার হইতে মুড়লী দিয়া বাগেরহাট পর্য্যন্ত প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা এখনও সর্ব্বলোকের নিকট খাঞ্জালী রাস্তা নামে পরিচিত আছে। এই রাস্তা তাহার গতিপথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এই রাস্তার পার্শ্বে তাঁহার চারিটি সহর ছিল। ১ম, বারবাজার,—ইহা বহু প্রাচীন স্থান বলিয়া খাঁ জাহান আলী কর্তৃক কস্‌বা বা সহর নামে অভিহিত হয় নাই; ২য়, মুড়লী কস্‌বা,—ইহা প্রাচীন মুড়লীর পশ্চিমপার্শ্বে খাঁ জাহান আলীর নব প্রতিষ্ঠিত সহর; এই সহরে গরিব সাহ ও বেহরাম সাহ অধিষ্ঠান করেন। ৩য়, পয়ঃগ্রাম কস্‌বা,—মুড়লী হইতে ২১।২২ মাইল পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ৪র্থ, হাবেলী কস্‌বা বা খালিফাতাবাদ,—বর্ত্তমান বাগেরহাট, ইহা যশোহর হইতে অন্যূন ৫৬ মাইল পূর্ব্বে ভৈরবকূলে অবস্থিত। আমরা প্রথম দুইটীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এক্ষণে অপর দুইটী অর্থাৎ পয়ঃগ্রাম ও বাগেরহাটের কথা বলিব।

খাঁ জাহান আলী একজন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। লোকমুখে অনেক অদ্ভুত কার্য্য তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। প্রবাদের গালভরা ভাষায় অনেক কথা বলা হয়, তাহাতে গল্পও জমে বেশ; কিন্তু তাহার যোলআনা বিশ্বাস করিয়া লওয়া যায় না। তবে যোলআনা না ধরিলেও তাহাতে কতক সত্য থাকে, তাহার উপর অবস্থা স্থাপন করাও দুর্ব্বুদ্ধিতা নহে। লোকে বলে খাঁ জাহানের ষাটহাজার সৈন্য ছিল, উহাদের অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের মত একখানি বাজে অস্ত্র ছিল কোদাল। যুদ্ধবিগ্রহ সব সময়ে চলিত না, আবশ্যকও হইত না, লোকে পাঠানসৈন্য দেখিলে বশ্যতা স্বীকার করিত। বিশেষতঃ লোকে খাঁ জাহানের জন-হিতৈষণায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সুতরাং সৈন্য-দিগকে অনেক সময় নিষ্কর্ম্মা থাকিতে হইত; খাঁ জাহান তাহাদিগের হস্তে কোদাল দিয়া কর্ম্ম দিয়াছিলেন। আজকাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শান্তিময় রাজ্যে

নিষ্কর্ম্মা সৈন্যদিগকে ফুটবল কিনিয়া দিয়া কর্ম্মঠ রাখিতেছেন, খাঁ জাহানের আমলে তাহা ছিল না। যুদ্ধ বাধিলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত, নতুবা কোদাল কেহ কাড়িয়া লইত না, অবাধে রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে দেশময় পুণ্যকীর্ত্তি রাখিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইত। এই প্রণালী একটি শিক্ষার বিষয়; এমন ভাবে দেশের ও দশের স্থায়ী উপকারের উপায় আর নাই। উত্তরকালে রাজা সীতারাম রায়ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উভয়ের জলদান-পুণ্যে যশোহর-খুল্‌নার অনেক স্থানে জলদুর্ভিক্ষ নাই। বহুসংখ্যক কোড়াদার, বেলদার বা খননকারী সৈন্য হস্তগত থাকায়, অনেক স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তা বা পুষ্করিণী হইত। রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে খাঁ জাহান আলী অগ্রসর হইতেন, আবার কোনস্থানে খাদ্যাদি সংগ্রহ বা অন্য কোন কারণে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে হইলে, তাহার বেলদার সৈন্যগণ অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া ফেলিত। ইহাই লোকে সামান্য অতিরঞ্জিত করিয়া বলে, খাঁ জাহান আলী একরাত্রিতেই প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া ফেলিলেন, এবং তিনি নাকি রাত্রিতেই এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেন। এমন কি রাত্রি ভরিয়া পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ হইত এবং সে কার্য্য সেই অবস্থাতেই সেখানে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। শুধু পুষ্করিণী খনন নহে, রাত্রির মধ্যেই মস্‌জিদ গঠনও হইত। কিন্তু ইমারাত গঠনের জন্য ইট ও মালমসল্যা চাই, তাহা তিনি সঙ্গে লইয়া ঘুরিতেন না, ইহাও লোকে ভুলিয়া যায়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, তিনি বহুলোকের অধিনায়ক বলিয়া এই সকল কার্য্য যে স্বল্পায়াসে, অতি সামান্য সময়ে সম্পন্ন করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুড়লী হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণকোণে রামনগর গ্রামে খাঁ জাহান একটি বড় দীঘি খনন করেন। উহাকে এক্ষণে সাহাবাটীর দীঘি বলে। এখনও উহাতে বারমাস জল থাকে। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। কেহ কেহ এইজন্যই ইহাকে হিন্দুদীঘি বলিতে চান। কিন্তু তাহা সত্য নহে। হিন্দুর দীঘি উত্তর দক্ষিণে এবং মুসলমানের দীঘি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ করিয়া খনন করিবার নিয়ম আছে। খাঁ জাহান সে রীতি মানেন নাই। তাহার কারণ ছিল; হিন্দুরা পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ পুষ্করিণীর জল কোন বৈধকার্য্যে ব্যবহার করেন না, মুসলমানদিগের উত্তর-

দক্ষিণে দীর্ঘ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। সুতরাং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হইলে উহার জল সর্ব্বজাতিতে সমভাবে লয়। জলদাতার ইহাই প্রধান লক্ষ্য বিষয়। খাঁ জাহান আলী এ বিষয়ে কোন নিয়ম না মানিয়া, উভয়-প্রকারের অসংখ্য দীঘি খনন করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি হিন্দুর খনিত প্রাচীন জলাশয়ের সংস্কার করিয়াছিলেন, সে সকল স্থলে তাহার দীঘি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ না হইয়া পারে নাই।

সিঙ্গিয়া, সেখহাটি প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া আসিয়া যেখানে ভৈরব ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণবাহী হইতেছিল, সেইস্থানে পয়ঃগ্রামে খাঁ জাহান আর একটি কস্‌বা বা নগরী স্থাপন করিলেন। তাঁহার রাস্তা সোজাভাবে গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল এবং উহা তাঁহার নূতন নগরীকে দুইভাগে বিভক্ত করিল। যে ভাগ রাস্তার দক্ষিণে থাকিল, তাহার নাম দক্ষিণডিহি এবং যে ভাগ রাস্তার উত্তরে থাকিল, তাহার নাম উত্তরডিহি। এই উত্তরডিহি নদীর তীরে; সেইভাগে খাঁ জাহানের আবাসস্থান ও মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। উত্তরডিহির যে অংশে তাঁহার আবাসবাটিকা ছিল, তাহার নাম খাঞ্জেপুর। খাঞ্জালীর পূর্ব্বোক্ত প্রধান রাস্তা হইতে অন্য একটী ৫০ ফুট বিস্তৃত রাস্তা উত্তরমুখে উত্তরডিহির মধ্য দিয়া নদীর দিকে গিয়াছে। ইহাই খাঞ্জালীর সহরের প্রধান রাস্তা। উহা হইতে বামে দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর বহুরাস্তা নির্গত হইয়া সহরটীকে চককাটা মত করিয়াছে। এই সকল রাস্তার দুইপার্শ্বে লোকের বসতি হইয়াছিল। এখনও অনেক বসতি আছে, কিন্তু জঙ্গলই অধিক। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া দেখিলে সরলরেখার মত সোজা রাস্তাগুলিকে আধুনিক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা বলিয়া বোধ হয় না; পরন্তু ইহারা যে কোন কৃতী পুরুষের উদ্দেশ্য ও কল্পনানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত উত্তরবাহিনী বড় রাস্তার দুই পার্শ্বে একস্থানে দুইটি পুষ্করিণী আছে, উহার একটিতে আঁধার পুকুর ও অন্যটিকে সানের পুকুর বলে। সানের পুকুরের দক্ষিণ পাহাড়ে মৃত্তিকা নিম্নে ইট পাওয়া গিয়াছে। সেখানে যে বান্ধা ঘাট ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। খাঁ জাহানের পর কোন বিপ্লববশতঃ এই সকল স্থানে কিছুকালের জন্য লোকের বাস ছিল না, তাহাতেই এই সকল পুকুর ও কীর্ত্তি-চিহ্ন সম্বন্ধে বহুপ্রবাদের সূত্র হারাইয়া গিয়াছে। অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। উক্ত বিপ্লব সময়ের

একটি বিরাট্ তেঁতুলগাছ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী তেঁতুলগাছ আর দেখি নাই। গাছটির বেড় ঠিক ২৫ ফুট, উহা এত উচ্চ যে প্রায় এক মাইল দূরে নদী হইতে দেখা যায়।

উক্ত বড় রাস্তা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া যেখানে ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখে পয়ঃগ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেখানেই উহার বামভাগে নদীর খুব সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড উচ্চ ঢিপি কোন পূর্ব্বকীর্ত্তির সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। ঢিপিটি ১০০´×১০০´ ফুট, উহা পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে ৮´ ফুট উচ্চ। এখানে বাগের হাটের ষাটগুম্বজের মত কোন বৃহৎ নমাজের স্থান বা দরবার গৃহ ছিল। শুনিয়াছি নিকটবর্ত্তী মধ্যপুর গ্রামে কোন এক ইংরাজ কোম্পানি নীলের কুঠি করিবার জন্য এই বিরাট্ ভগ্নগৃহ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বিলুপ্ত করিয়াছিল। এই ঢিপির উপর ৩২´×১৭´ ফুট স্থানে ১´ ফুট উচ্চ করিয়া একটা পাকা বেদী করিয়া উহার পশ্চিম দিকে একটি আধুনিক ইদগা স্থানীয় লোকে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে। নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক লোকেরা প্রধান প্রধান নমাজের উৎসবে এইস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ইদগার নিকটে একখানি অতি সুন্দর কষ্টিপাথর (Slate) আছে; উহার পরিমাণ ৩´×১´—৮´´। ঢিপির নিম্নে আর একখানি রাজমহল বা চট্টগ্রামের পাথর আছে। এই পাথর ঠিক ষাটগুম্বজের স্তম্ভের পাথরের মত। এ পাথরখানি ১´—৮´´×১´—৮´´×৯´´ ইঞ্চি। আরও কত পাথর ছিল এবং তাহা কোথা হইতে কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা কে জানে? নীলকরেরা অনেকস্থানে ভ্যাণ্ডালদিগের মত ভীষণ অত্যাচার করিয়া দেশের অনেক পুরা-কীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে। সেরূপ অত্যাচার যে করা যায়, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুভবও করিতে পারিবেন না।

পয়ঃগ্রাম কস্‌বা একসময়ে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এখনও বাস করিতেছেন। বোধ হয় এতগুলি খাঁটি উচ্চবংশীয় উন্নতিশীল মুসলমান পরিবার একত্র হইয়া যশোহর-খুলনার অন্য কোন স্থানে নাই। ইহাদের অনেকে পশ্চিমদেশ হইতে আগত সম্ভ্রান্ত মুসলমান অধিবাসীর বংশধর এবং কতক, যে সকল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদেরই অধস্তন পুরুষ। কথিত আছে, খাঁ জাহানের পয়ঃগ্রাম নিবাসকালে পীরালী সম্প্রদায়ের প্রথম উৎপত্তি হয়।

দক্ষিণডিহি প্রাচীন স্থান। ইহার দক্ষিণ ডিহি নামকরণ খাঁজাহানের সময় হইতে হয়। পূর্ব্বে ইহা পয়ঃগ্রামই ছিল। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে এখানে রায়চৌধুরী বংশীয়েরা বাস করেন। যখন খাঁ জাহান পয়ঃগ্রামে আসেন, তখন রায়চৌধুরিগণ তথাকার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, কনোজাগত দক্ষের বংশধর। দক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীর মুর্শিদাবাদের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে গুড়-গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন।* তজ্জন্য এই বংশীয়গণ গুড়ী বা গুড়গ্রামী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই বংশীয় শরণ বল্লালসেনের চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণ কুলীনের অন্যতম। পরে দনৌজামাধবের সমীকরণে ও দত্তখাসের ব্যবস্থায় গুড়-গ্রামিগণ সাধ্যশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন। শরণের প্রপৌত্র ভবদত্ত পশ্চিম বঙ্গের পাঠান শাসন কালে গুণগরিমায় খাঁ উপাধি পান। ব্রাহ্মণের খাঁ উপাধি হেতু লোকে তাঁহাকে "বামন খাঁ" বলিত। ভবদত্তের পৌত্র রঘুপতি আচার্য্য শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কাশীবাস কালে পাণ্ডিত্যের জন্য দণ্ডীদিগের নিকট হইতে একটি স্বর্ণদণ্ড উপহার প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহার উপাধি হয় কনকদণ্ডী। তদবধি তাঁহার বংশীয়গণ কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত।

বল্লালসেনের সময় সূর্য্যমাঝি নামক একজন ধীবর অদ্ভুত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সূর্য্যদ্বীপের রাজত্ব পাইয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই সূর্য্য-মাঝির এক অধস্তন পুরুষ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান মাঝি বলিয়া পরিচিত হন। প্রবাদ এই পূর্ব্বোক্ত কনকদণ্ডীর পুত্র রমাপতি এই সুলতান মাঝিকে বিনষ্ট করিয়া সূর্য্যদ্বীপ অধিকার করিয়া লন। রমাপতির চারিপুত্র সর্ব্বানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও অমৃতানন্দ। তন্মধ্যে অমৃতানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করেন। জ্ঞানানন্দের পুত্র জয়কৃষ্ণ; তৎপুত্র নাগরনাথ ও দক্ষিণানাথ। মুসলমান ধর্ম্মাশ্রিত সুলতান মাঝির উপর অত্যাচারের সময় হইতে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান শাসন কর্ত্তৃগণ রমাপতি ও তদ্বংশীয়দিগের উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন; কিন্তু গৌড়াঞ্চলে সিংহাসন লইয়া এরূপ গণ্ডগোল চলিতেছিল যে এদিকে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ রাজা গণেশের সময় নাগর ও দাক্ষিণানাথ উভয় ভ্রাতা হিন্দু নরপতির সাহায্যাদি করিয়া সন্তোষ বিধান করেন, এবং তাহার ফলে রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ খণ্ড, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ।

ইঁহারা দুই ভ্রাতায় কালে চেঙ্গুটিয়া পরগণা দখল করিয়া লন, এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ প্রদেশে সদর্পে শাসনদণ্ড পরিচালন জন্য দক্ষিণডিহি অঞ্চলে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ বলেন এই দুইভ্রাতার মধ্যে বিভাগসূত্রে উত্তরডিহিও দক্ষিণডিহি নামকরণ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবের কূলে উত্তরদিকে থাকেন উহাই উত্তরডিহি, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণানাথ দক্ষিণডিহি পাইয়া ছিলেন। কেহ কেহ দক্ষিণডিহি নামের সহিত দক্ষিণানাথের নামেরও সম্বন্ধ স্থাপন করেন। নাগর রায় সাধারণের সুবিধার জন্য এই প্রদেশে এক হাট স্থাপন করেন.সেই "নাগরের হাট" বর্ত্তমান বেজের ডাঙ্গা ষ্টেশনের সন্নিকটে ছিল। এখনও লোকে সেস্থান প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহা হউক রায়চৌধুরিগণই দক্ষিণডিহি ও উত্তরডিহি নামে স্থান ভাগ করেন বা খাঁ জাহান আসিয়া তাহার নব প্রতিষ্ঠিত সহরের ঐরূপ ভাগ করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে এইটুকু নিশ্চয়তা আছে যে খাঁ জাহানের আগমনের পর ও দক্ষিণডিহিতে রায়চৌধুরিগণ বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন।

নাগরনাথ নিঃসন্তান। দক্ষিণানাথের চারি পুত্র ছিল—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। দক্ষিণানাথের মত তাঁহার পুত্রগণ প্রতাপান্বিত ছিলেন না, কারণ খাঁ জাহানের আগমন কালে তাঁহাকে কেহ বাধা দিয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। বাধা দিলেও তাহা যে বিফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু খাঁ জাহানের শাসন প্রতিষ্ঠার পর কামদেব ও জয়দেব এই উভয় ভ্রাতায় নবাগত পাঠানবীরের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া বসিয়া ছিলেন। খাঁ জাহানও এই ভাবে তাহাদিগকে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত করায়ত্ত করিয়াছিলেন। শুধু করায়ত্ত রাখা নহে, কৌশলে তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাই এদেশীয় পীরালি বংশের উৎপত্তির মূল।

প্রবাদ আছে বারবাজার ত্যাগ করিয়া, যেমন খাঁ জাহান ভৈরবের কূল দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, জনৈক সুচতুর ব্রাহ্মণ তাঁহার পথপ্রবর্ত্তক ছিলেন। এমন কি, এরূপও কথিত হয় যে এই ব্রাহ্মণই খাঁ জাহানকে বঙ্গদেশে আনিবার মূল। গ্রাম্যবিবাদ ঘটিত প্রতিহিংসাই ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে প্রবৃত্তি করাইয়াছিল। সম্ভবতঃ চেঙ্গুটিয়া পরগণার অধিকারী দক্ষিণ ডিহির রায়চৌধুরী মহাশয়গণের সহিতই উক্ত বিবাদ হয় এবং তাহাতেই বোধ হয় ব্রাহ্মণকে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে

অনল প্রদান করিতে প্রলুব্ধ করে; কারণ প্রতিহিংসার অসাধ্য কিছু নাই। ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ধর্ম্ম বা রাজ্যলোভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কি নাম ছিল, জানি না, জানিয়াও বিশেষ কাজ নাই; এখন তাঁহার নাম হইল মহম্মদ তাহের। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পাশবিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। পয়ঃগ্রাম কস্‌বার নবাব হইলেন খাঁ জাহান আলি এবং তাঁহার উজীর হইলেন মহম্মদ তাহের। আর রায়চৌধুরীদিগের মত বহু ভূপতি ভয়ে তাঁহাদের দ্বারস্থ হইলেন। শীঘ্রই খাঁ জাহান পয়ঃগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য বিস্তার ও কৃষি পত্তনের উদ্দেশ্যে বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পয়ঃগ্রামে তৎপ্রদেশীয় শাসন কর্ত্তৃত্ব মহম্মদ তাহেরের উপরই রাখিয়া গেলেন।

যে জাত্যন্তর বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে,তাহারই গোঁড়ামি অধিক বাড়িয়া থাকে। মহম্মদ তাহেরের তাহাই হইয়াছিল। তাহার গোঁড়ামির মাত্রা এত চড়িয়া গেল যে তাহার ধর্ম্মরঙ্গ দেখিয়া স্থানীয় হিন্দু মুসলমানে তাহাকে "পীর আলি" করিয়া লইল। পীর আলি নব ধর্ম্মানুশাসনে নানাভাবে হিন্দু বৌদ্ধ নানা জাতিকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যাহারা প্রকৃত ভাবে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা "পীর আলি মুসলমান" বলিয়া চিহ্নিত হইল, এবং যাহারা ঐরূপ মুসলমানের সহিত সংশ্রব দোষে মুসলমান না হইয়াও সমাজ-চ্যুত হইল, তাহারা কেহ পীর আলি ব্রাহ্মণ, পীর আলি কায়স্থ, পীর আলি নাপিত ইত্যাদি থাকিয়া গেল। এইরূপ পীর আলি বা পীরালি হিন্দু ও মুসলমান যশোহর-খুল্‌নার বহুস্থানে বাস করিতেছেন। পীরালিগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে অপদস্থ হইয়া পীরালি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

দক্ষিণডিহি নিবাসী পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরীর চারি পুত্রের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব মহম্মদ তাহেরের অধীনে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হন। মুসলমানের অধীন হইয়া চাকরী করিলেও রায়চৌধুরিগণ অত্যন্ত সম্মানিত এবং পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, এজন্য ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণতনয় মহম্মদ তাহেরকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, মুখ ফুটিয়া বিশেষ কিছু বলিতে

পারিতেন না। ধর্ম্মান্তরিত মহম্মদ তাহেরও তাঁহাদের গোঁড়ামি সহ্য করিতে পারিতেন না; এবং তাঁহার প্রতি সেই নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের অস্পষ্ট ঘৃণার ভাব যে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এমন নহে। ফলতঃ দুইদিকেই অন্তরাকাশে মেঘ সঞ্চয় হইতেছিল। নবদীক্ষিত পীর-আলি গোঁড়া হিন্দুকে স্বীয় মতে আনিয়া প্রতিশোধ লইবার কল্পনা পোষণ করিতেছিলেন। একদিন রোজা বা উপবাসের দিনে মহম্মদ তাহের ও কামদেব, জয়দেব প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক-ব্যক্তি তাহার নিজের বাটী হইতে একটি সুগন্ধি কলম্বা লেবু আনিয়া উপহার দিল। পীর আলি উহার ঘ্রাণ লইতেছিলেন এমন সময় কামদেব বলিলেন, "হুজুর, ঘ্রাণ লইলে যে অর্দ্ধেক ভোজন হয়, আপনি যে গন্ধ গ্রহণ করিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন?" এবং সঙ্গে সঙ্গে "ঘ্রাণেন চার্দ্ধভোজনং" বলিয়া সংস্কৃত শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন। পীর আলি বাহিরে একটু অপ্রতিভ হইলেন বটে, কিন্তু হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং কামদেবের বিদ্রূপের বিকট প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

গোপনে পরামর্শ স্থির হইল। একদিন তিনি প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গকে দরবারে আহ্বান করিলেন। দরবার-গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে পলাণ্ডু প্রভৃতি সংযোগে গো-মাংস রন্ধন করা হইতেছিল। প্রজারা সকলে আসিলেন, কামদেব জয়দেবও যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দরবার-গৃহ পলাণ্ডু প্রভৃতি মসল্লার গন্ধে ভরপূর হইয়াছিল। কামদেব প্রভৃতি নাকে কাপড় দিয়া বসিয়াছিলেন। তখন কঠোর বিদ্রূপাত্মক স্বরে পীর আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ চৌধুরী, নাকে কাপড় কেন?" কামদেব মাংস গন্ধের কথা উল্লেখ করিলেন। অমনি পীর আলি বলিলেন, "সেখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে, তাহা হইলে তোমাদেরও অর্দ্ধেক ভোজন করা হইয়াছে; সুতরাং জাতি গিয়াছে।" হিন্দুগণ শিহরিয়া উঠিলেন। কামদেব ও জয়দেবকে ধরিয়া জোর করিয়া তাহাদের মুখে সেই মাংস দেওয়া হইল, অনেকে সে দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। দুই ভ্রাতা জাতিচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। মহম্মদ তাহের তাহাদিগকে কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব জন্য

অন্য দুই ভ্রাতা রতিদেব ও শুকদেব পীর আলি ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহাই ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে পীরালি থাকের উৎপত্তি।

খাঁজাহানের আগমন ও পীরালিদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঘটকদিগের পুঁথিতে এইরূপ আছে ঃ—

খান্ জাহান মহামান পাদশা নফর
যশোরে সনন্দ ল'য়ে করিল সফর॥
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।
পূর্ব্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি;
মুসলমানী-রূপে মজে হারাইল জাতি।
পীর আলি নাম ধরে পিরাল্যা গ্রামে বাস; *
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হ'ল সর্ব্বনাশ।

---

* পাঠান বিজয়ের প্রারম্ভ হইতেই নবদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দুসমাজের উপর মুসলমানদিগের অত্যাচার আরব্ধ হয়। ক্রমে ক্রমে অনেক ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হন এবং তাঁহারা নবদ্বীপের সন্নিকটে পারোলিয়া বা পীরলিয়া গ্রামে বাস করেন। সে গ্রাম এখনও আছে। মহম্মদ তাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ঘটকেরা বলেন তিনি কোন মুসলমান স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন। স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগে যে কারণেই হউক তিনি মুসলমান হইয়া পীর আলি নামে অভিহিত হন এবং পীরলিয়া গ্রামে বাস করেন। পীরোলিয়া গ্রামের নামে তিনি পীর আলি হন বা তিনি "পীরালি" বলিয়া গ্রামের নাম পীরালিয়া বা পীরাল্যা হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই পীরাল্যা গ্রামের নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের অত্যাচারবশতঃ এক সময় নবদ্বীপ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ভক্ত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই,—

"পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে;
বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।"

এরূপ কথিত হইয়াছে যে এই উৎপাতের জন্য—

"বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥"

সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় ছাড়িল জিগীর ॥ *
গুড়-বংশ-অবতংস রায় রাঁয়ে ভাতি, †
অর্থলোভে কর্ম্মদোষে মিলিল সংহতি।
ধনবলে কৈল ভ্রম হৈল উচ্চ মাথা।
নানা জনে রটাইল নানা কুৎসা কথা।
আঙ্গিনায় ব'সে আছে উজীর তাহির
কত প্রজা ল'য়ে ভেট করিছে হাজির।
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল।
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল ॥
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপূর হইল ;
বাহবা বাহবা বলি নাকেতে ধরিল ॥
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন,
ব'সে ছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে,
ঘ্রাণেতে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে ॥
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির,
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোঁহের মনে কৈল স্থির ॥
দিন পরে মজলিস করিল তাহির ;
জয়দেব, কামদেব হইল হাজির।

* জিগীর = উচ্চ চীৎকার, জয়োল্লাস।

† আদি পীরালিদিগের সহিত "রায় রাঁইয়া" উপাধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটকরাজ ফুলোপঞ্চানন যেখানে পীরালির উল্লেখ সেখানেই "রায় রাঁয়ে" উপাধি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন,

"রায় রাঁয়ে সুকৃপণে, পীরালী দ্বিজ নন্দনে"

অন্যত্র, "ভাল খেল্‌লে ঠাকুরালি, রায় রেঁয়ে পীর আলী,
ফুলের মুখে বসে ঠাকুর।"

বিশ্বকোষ, ১১ খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ

গুড়বংশীয় রায় চৌধুরীগণের রায়রাঁইয়া উপাধি ছিল কি না বলা যায় না।

দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন,
শত শত বক্‌রি আর গো-মাংস রন্ধন ॥
পলাণ্ডু লশুন গন্ধে সভা ভর পূর
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল,
ফাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল।
কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন,
হাসিয়া কহিল ধূর্ত্ত তাহির তখন।
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে
ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি ত চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।
উপায় না ভাবিয়া দোঁহে প্রমাদ গণিল,
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল।
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর,
থতমত হ'য়ে দোঁহে হইল অস্থির।
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত
পীড়ালি হইল তারা হইল জাতিভ্রষ্ট।
কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার
ব্রাহ্মণ সমাজে প'ড়ে গেল হাহাকার ॥
তখন ডাকিয়া দোঁহে আলি খাঁজাহান্।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাথান ॥ *
সেই গোলে গুড়বাসে বিধি বিড়ম্বনা।
শত্রুগণে জাতিনাশে করিল কল্পনা।
পীরালি অখ্যাতি দিল ঘ্রাণ মাত্র দোষ,
সর্ব্বদেশে রাষ্ট্র হ'ল কুগ্রহের রোষ।

* এই সিঙ্গি বর্ত্তমান সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান।

সংসর্গে পড়িল যারা তাহারাও মজিল,
গুড় পীরালি দোষ বলি ঘটকে বুঝিল ॥
কিছুকাল পরে তারা মার্জ্জিত হইল;
ঘটকের করুণায় সুঘর মিলিল।
ধনে মানে হ'য়ে হীন কুটুম্ব স্বঘর,
সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর।
পীরালি রহিল পড়ি কুলাচার্য্য ঘোষে।
রচিল পীরালি কথা নীলকান্ত শেষে" ॥ *

কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন জায়গীর পাইয়া নিকটবর্ত্তী সিঙ্গিয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহারা হঠাৎ মুসলমান হইলেও হিন্দু-আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে সে বংশে বহুপুরুষ লাগিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা অন্য মুসলমানের সহিত বিবাহাদি কার্য্য করিতেন না, উভয়ের বংশে পরস্পর বিবাহপ্রথা চলিয়াছিল; ক্রমে যখন এইরূপ পীরআলি মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল মুসলমানের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা বহুপুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দুর মত নাম রাখিয়াছেন, শিবপূজা, শিবরাত্রিব্রত, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, গো-মাংস ভোজন করিতেন না, বাড়ীতে কুক্কুট পুষিতেন না, তুলসীসেবা, গাড়ু ব্যবহার, আলিম্পন (আলপনা) দেওয়া, বিবাহাদি উপলক্ষে পীড়ি চিত্রিত করা, প্রভৃতি রীতি প্রচলিত ছিল। এমন কি পূর্ব্বসম্পর্কিত হিন্দু আত্মীয়ের বাটীতে অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া জমি বা অর্থ যৌতুক দান করিতেন। এখনও অনেক হিন্দু এইভাবে প্রাপ্ত জমি ভোগ করিতেছেন। সিঙ্গিয়া জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও এমন লোক জীবিত আছেন শুনিয়াছি যে তাঁহাদের পিতামহী পর্য্যন্ত শিবপূজা করিতেন। সিঙ্গিয়া অঞ্চলে যেমন অনেকগুলি গ্রামে পীরালি মুসলমানের বাস আছে, সাতক্ষীরা অঞ্চলে কুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে, যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুর থানায় ঐরূপ অনেক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পীরালি সংজ্ঞা-ভুক্ত। প্রেসিডেন্সীবিভাগের স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর

* কুশদহ, ১৩২১, শ্রাবণ, ১৬১-৩ পৃঃ।

শ্রীযুক্ত মকলুব আহম্মদ খাঁ চৌধুরী এম, এ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুৎফ আহম্মদ বি, এ মাতঙ্গীরার অন্তর্গত পীরালিবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

খাঁজাহানের আমলে পীর আলি মহম্মদ তাহেরের প্ররোচনায় যাঁহারা মুসলমান হন, তাঁহারা পীরালি আখ্যা পান বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এইভাবে যে সকল প্রসিদ্ধবংশ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই পীরালি। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে জনৈক হিন্দু, মুসলমান হইয়া চাঁদ খাঁ নামধারণ করেন এবং নবাবের অধীন হাবিলদার ও পরে মীরমুন্সী হন। প্রবাদ আছে প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে যখন চাঁদ খাঁ পীরালি হন, তখন ১৪০০ ব্রাহ্মণ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চাঁদ খাঁ সাতক্ষীরার অন্তর্গত চাঁদপুরে বাস করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে শ্রীরামপুর, কুলিয়া, কোমরপুর, পলাশপোল, হেলাতলা, নগরতলা, গণপতিপুর, পাথরঘাটা, হাকিমপুর, রসুলপুর প্রভৃতি স্থানে ২।৩ শত ঘর পীরালি মুসলমানের বাস হইয়াছে। উক্ত চাঁদ খাঁ হইতে ৯ম ও ১০ম পুরুষ জীবিত আছেন।

পয়ঃগ্রামের সন্নিকটে খাঞ্জেপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠান আমল হইতে বহুসংখ্যক উচ্চবংশীয় মুসলমানের বাস হইয়াছিল। উহারা পীরালি নহেন। উহাদের বংশধরগণ এতৎপ্রদেশে মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত রহিয়াছেন। ইঁহাদের জাতিগৌরব বিদ্যা-গৌরবে প্রমাণিত ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, সবরেজিষ্টার, উকীল, হেড্‌মাষ্টার প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এত অধিক সংখ্যক উচ্চ-চাকুরিয়া মুসলমান একত্র বোধ হয় যশোহর-খুল্‌নার অন্য কোন গ্রামে পাওয়া যায় না।

রায় চৌধুরীবংশীয় শুকদেবের বংশধরগণ সংশ্রব-দোষে সমাজে নিন্দিত ও আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একটি পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাকেই ব্রাহ্মণদিগের পীরালি থাক বলে। শুকদেবের পুত্র গৌরীদাস ও কালাচাঁদ বিখ্যাত ছিলেন। কালাচাঁদই দক্ষিণডিহিতে কালাচাঁদ অর্থাৎ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহার জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। খাঁজাহানের সঙ্গে যে সকল পাঠানস্থপতি এদেশে আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ উহাদেরই সাহায্যে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি এক্ষণে এক প্রকার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

কালাচাঁদের মন্দির,
দক্ষিণ ডিহি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

কিন্তু তবুও উহার স্থাপত্যে, গুম্বজে ও খিলানে, মুসলমানী ধরণের সজীব আভাস পাওয়া যায়। কালাচাঁদ বিগ্রহ এখনও আছেন; কিন্তু তাঁহার মন্দির অব্যবহার্য্য হওয়ায়, এক্ষণে নিকটবর্ত্তী একটি ইষ্টকগৃহে তাঁহার যথাবিধি পূজা চলিতেছে। নিকটবর্ত্তী সিকিরহাটে যে ৺কালীবাড়ী আছে, তাহাও এই রায় চৌধুরী বংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

গৌরীদাসের প্রপৌত্র হরিবল্লভ যশোহরের অন্তর্গত হল্‌দা মহেশপুরে গিয়া বাস করেন এবং অপর প্রপৌত্র রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ দক্ষিণ ডিহি থাকিয়া যান। রমাবল্লভের পৌত্র মনোহর প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সেনানায়ক ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গেশ্বর দায়ুদ খাঁর রাজত্বকালে কার্য্যগৌরবে "লস্কর খাঁ চৌধুরী" উপাধিলাভ করেন। মনোহরের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি অপরিমিত আহার করিতে পারিতেন। এমন কি প্রবাদ আছে তিনি একমণ ভোজ্য দ্রব্য উদরসাৎ করিতে পারিতেন; তজ্জন্যই তাঁহার নাম হইয়াছিল—"মুন্‌কে মনোহর"। মনোহরের দুই পুত্র; উপানন্দ ও শুভেন্দ্র। তন্মধ্যে উপানন্দের বংশধরেরা দক্ষিণ ডিহি এবং শুভেন্দ্রের পুত্রগণ জগন্নাথপুর, মহাকাল, সেখহাটি, বুঞ্জীকারা, নরেন্দ্রপুর, চেঙ্গুটিয়া, ঘোপেরঘাট প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। এই সকল স্থানে ইঁহাদের অধিকাংশ বংশধরগণ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। *

রায় চৌধুরীগণ সমাজে নিন্দিত হইবার পর পুত্রকন্যার বিবাহ জন্য মহাবিড়ম্বিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা অর্থবলে ও কার্য্যকৌশলে সমাজকে বাধ্য করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইভাবে আরও অনেক বংশ তাঁহাদের সহিত সংশ্রবদোষে পতিত হইতে থাকেন। ইহার মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশ † বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর বাবুরা

---

* রায় চৌধুরীগণের বংশাবলী পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। এখনও গুড় চৌধুরীবংশীয় বহুব্যক্তি মহেশপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের জমিদারী আছে। ইঁহারা পূর্ব্বে বেনাপোল, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাস করেন; কিন্তু সে সব স্থানে বংশলোপ হইয়াছে।

† কথিত আছে, ঠাকুর-বংশের এক পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারি খুলনা জেলা পরিত্যাগ করিয়া, কালীঘাটের সন্নিকটে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে গোবিন্দপুরে জেলে, মালো, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নিম্নজাতির বাস ছিল; তাহারা নবাগত ব্রাহ্মণকে "ঠাকুর" বলিয়াই ডাকিত। তদবধি পঞ্চানন ও তাহার বংশীয়গণের ঠাকুর উপাধি সর্ব্বজন বিদিত

ভট্টনারায়ণের সন্তান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সিদ্ধশ্রোত্রিয়। তাঁহারা কুশারি গাঞি ভুক্ত। খুল্‌নাজেলায় ভৈরবকূলবর্ত্তী পিঠাভোগ ও ঘাটভোগ গ্রামে কুশারিদিগের বাস ছিল। পিঠাভোগের কুশারিগণ গোষ্ঠীপতির বংশ বলিয়া সম্মানিত। ঢাকা ও বাঁকুড়ায়ও কুশারিদিগের বাস আছে। পিঠাভোগের কুশারিবংশীয় পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ উক্ত রায় চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া পীরালি হন। * সম্ভবতঃ ইনি আদি পীরালি শুকদেবের কন্যা বা পৌত্রী বিবাহ করেন। পুরুষোত্তম হইতে ঠাকুরবংশে ১৫।১৬ পুরুষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে উভয়বংশে বহু বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে। † সমৃদ্ধ ঠাকুর বংশের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু রায় চৌধুরীদিগের অনেকে কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের আদি নিবাস দক্ষিণডিহি প্রভৃতি স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রাচীন মন্দির এখনও প্রাচীন কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ঠাকুর-বংশ ব্যতীত অন্য যে সকল বংশ এইভাবে পীরালি হন, তন্মধ্যে চেঙ্গুটিয়ার মুস্তৌফি বংশ বিখ্যাত। ইঁহারা ফুলিয়ার মুখটীবংশ। ফুলিয়া গ্রামবাসী ১৬ পর্য্যায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের অধস্তন সন্তান মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া পীরালি হন। নাট্য-রঙ্গমঞ্চে হাস্যরসের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া যিনি অমর হইয়াছেন, সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফি এই মঙ্গলানন্দের অধস্তন পুরুষ। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তৌফি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও অন্যতম বিশিষ্ট কার্য্যকারকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন। ‡ ঠাকুর ও মুস্তৌফিবংশ ব্যতীত আর যে সকল ব্রাহ্মণ, অথবা কায়স্থ প্রভৃতি জাতি পীরালি হইয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

হইয়া যায়। শুধু এবংশের নহে, আরও অনেক বংশে এরূপ ঠাকুর উপাধি ছিল। ব্রাহ্মণকে অন্য জাতিতে সাধারণতঃ ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করে। তবে কীর্ত্তিগৌরবে কলিকাতার ঠাকুর-বংশের মত আর কেহ অনন্যোপাধিক হন নাই।

* বিশ্বকোষ, পীরালি-প্রবন্ধ, ১১ খণ্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা।

† ৺জয়রাম আমীন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কবিচূড়ামণি রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুণেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুরবংশীয় বহুখ্যাতনামা ব্যক্তি উক্ত রায় চৌধুরী বংশে বিবাহ করেন।

‡ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" যে পীরালিকাণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাহা প্রধানতঃ এই অক্লান্ত সাহিত্যসেবী ব্যোমকেশের লেখনীপ্রসূত।

কালাচাঁদের বর্ত্তমান মন্দির,
দক্ষিণ ডিহি।

৩১০ পৃঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—খালিফাতাবাদ।

খাঁ জাহান আলি পয়ঃগ্রামে মহম্মদ তাহেরকে রাখিয়া, স্বয়ং সসৈন্যে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার অভ্যস্ত প্রণালী মত তিনি গতিপথে রাস্তা নির্ম্মাণ এবং পার্শ্বে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। পয়ঃগ্রাম হইতে বাহির হইয়া তিনি কোন্ দিকে যাইবেন, তাহা সম্ভবতঃ স্থির ছিল না; তিনি প্রথমতঃ ভৈরব নদ পার হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে যাইতে থাকেন। লোকে এখনও তাহার পারঘাট দেখাইয়া থাকে। এই ঘাট পার হইয়াই কস্‌বায় আসিতে হইত। ক্রমে এ ঘাট সুপরিচিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী সময় এক ব্যক্তি এখানে পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করেন, উহার ভগ্নচিহ্ন আছে।

খাঁ জাহান প্রথমতঃ বাসুড়ী গ্রামে আস্তানা করেন। তথায় একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে। এই জলাশয়ের পরিমাণ ৫৫০×৪৫০ হাত হইবে। তীরভূমি লইয়া এই দীঘি ৭০ বিঘা জমি অধিকার করিয়াছিল। বর্ত্তমানকালে দীঘির অবস্থা খারাপ হইয়াছে; উহা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে; গ্রীষ্মকালে উহাতে ৫।৬ হাতের অধিক জল থাকে না। দীঘির পাহাড়ে যথেষ্ট ফলবৃক্ষ আছে; দক্ষিণ পাহাড়ে চৈত্র পূর্ণিমায় মেলা বসিয়া দীর্ঘকাল থাকে। খাঞ্জালী পীরের নামে বহু লোক মানসা করে এবং সিন্নী দেয়। পূর্ব্বে মেলার বিশেষ জাঁকজমক ছিল, এখন তাহা নাই। কিই বা আছে?

বোধ হয় খাঞ্জালী সাহেব নড়াইল অঞ্চলে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী বিলের অবস্থা দেখিয়া বা অন্য কোন কারণে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবকূল বাহিয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তদনুসারে তিনি ফিরিয়া পুনরায় শুভরাঢ়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়েন। যে বিলে খাঁ জাহানের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার নাম চাঁদের বিল। এ প্রদেশে চাঁদ সওদাগর নামে এক ব্যবসায়ী বাস করিতেন। ইনি পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত চাঁদ বা চন্দ্রধর সওদাগর নহেন; প্রবাদ আছে, এখানকার চাঁদ সওদাগর মুসলমান। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে অসংখ্য মুসলমান বাওয়ালীর বাস ছিল। তাহারা সুন্দরবন হইতে কাঠ কাটিয়া এবং অন্যবিধ নানা ব্যবসায় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিত। তখন শুভরাঢ়ার পূর্ব্বভাগে যে লেবুখালির খাল ছিল, উহা নাকি ভৈরব অপেক্ষাও বড় ও প্রবল ছিল। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরীসমূহ প্রধানতঃ এই লেবুখালির শোভা বর্দ্ধন করিত। শুভরাঢ়া গ্রামের একাংশে "সদার বাড়ীর পুকুর," "পুঁড়ার পুকুর" প্রভৃতি এবং তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ইষ্টকরাশিপূর্ণ জঙ্গলসমূহ চাঁদের সহিত যে ঐতিহাসিক সংশ্রব ছিল, তাহা প্রবাদমুখে কীর্ত্তন করিতেছে। চাঁদ সওদাগর খাঁজাহানের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী লোক তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ পয়ঃগ্রাম প্রদেশে পাঠান রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর, এই সকল স্থানে নানা ব্যবসায়ীর বসতি হয়; চাঁদ সওদাগর উহাদের অন্যতম।

শুভরাঢ়া গ্রামে ভৈরবকূলে একটি খাঞ্জালী মস্‌জিদ আছে। ইহাতে একটি মাত্র গুম্বজ, চারিকোণে চারিটি মিনার ছিল। মস্‌জিদের ভিতরের মাপ, ১৬′—১০″×১৬′—১০″ ইঞ্চি, উচ্চতা ২৫′ ফুট। বাহিরের মাপ এক মিনারের মধ্যবিন্দু হইতে অন্য মিনারের মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত ২৮′—৬″ ইঞ্চি। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে তিনটি দরজা আছে। পূর্ব্বদিকে সদর দরজা, উহার খিলান ১১′ ফুট উচ্চ এবং ৪′—১০′ প্রস্থ। এই মস্‌জিদে অতি প্রকাণ্ড ও অতিক্ষুদ্র সব রকমের ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইটের পরিমাণ ১২″×১০″ হইতে ৪″×৩″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা যায়। মন্দিরের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তবুও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে এখানে নমাজ হইয়া থাকে।

খাঞ্জালী শুভরাঢ়া হইতে রাণাগাতি, গোপীনাথপুর, নাউলী দিয়া ধূলগ্রামে উপনীত হন। তখন রাণাগাতির খাল ছিল কিনা সন্দেহ। নাউলী হইতে ধূলগ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড খাঞ্জালী রাস্তা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; উহার পার্শ্বে একটি খাঞ্জালী দীঘিও আছে। ধূলগ্রাম হইতে সোজা নদীর কূল দিয়া সিদ্ধিপাশার মধ্য দিয়া রাস্তা করিতে করিতে, খাঁজাহান বারাকপুর উপনীত হন। তখন মুজদখালির খাল ছিল না। বারাকপুর নাম খাঁজাহানেরই প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। পাঠান আমলে যেখানে যেখানে সৈন্যাবাস স্থাপিত হইত, সেখানেই বারাকপুর বা বারিকপুর নাম দেওয়া হইত। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে। বারাকপুর হইতে খাঁজাহান ঘোষগাতি, দীঘলিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া স্বনির্ম্মিত পথে সেনহাটির পশ্চিমাংশে উপস্থিত

হন। এই স্থানে তিনি পূর্ব্ব হইতে আহারের ব্যবস্থা রাখিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সে জন্য পরে ঐ স্থানের নাম ফরমাইজখানা হইয়াছিল। তথা হইতে সেনহাটি, চন্দনীমহল দিয়া আতাই নদী পার হইয়া শোলপুরের পথে সেনের বাজারে উপনীত হন। বারাকপুর হইতে সেনের বাজার পর্য্যন্ত ৮।৯ মাইল রাস্তা এক্ষণে খুল্‌না-মুজদ্‌খালি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তা নামে পরিচিত। ইহা এক্ষণেও এ প্রদেশের একটি বিখ্যাত রাজপথ।

সেনের বাজার তখন একটি প্রধান বন্দর ছিল। খাঞ্জালীর রাস্তাদ্বারা ইহার পসার আরও বাড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সেনের বাজার যেখানে আছে, পূর্ব্বতন সেনের বাজার তাহা অপেক্ষা প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ছিল; উহারই অপর পারে ছিল প্রাচীন খুল্‌না বা বর্ত্তমান রেণীগঞ্জ। এখন যেখানে খুল্‌না সহর, সেস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই সুন্দরবনের আরম্ভ ছিল। খাঞ্জালী সেনের বাজার হইতে নদীপার হইয়া তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটি প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া ক্রমে রাঙ্গদিয়া, মধুদিয়া ভেদ করিয়া বাগেরহাটের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তখন বাগেরহাট নাম হয় নাই। তিনি যে স্থানে প্রথম উপনীত হইয়া সৈন্যাবাস সংস্থাপন করেন, উহারই নাম রাখেন বারাকপুর। সেই স্থানেই তাঁহার প্রথম দীঘি খনিত হয়।

এই দীঘির নাম ঘোড়া দীঘি। প্রবাদ এই—একটি ঘোড়া যতদূর দৌড়াইয়া গিয়াছিল, তত দীর্ঘ করিয়া এই প্রকাণ্ড দীঘিকা খনিত হয়। ইহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০০×৬০০ হাত হইবে। ইহার জল খুব ভাল; সীতারামের দীঘি ব্যতীত এমন সুন্দর জল নিম্নবঙ্গের কোন জলাশয়ে আছে কিনা সন্দেহ। এ দীঘি অত্যন্ত গভীর, ইহার জল কখনও শুকায় না; ইহাতে বারোমাস গভীর জল থাকে। এই সকল প্রকাণ্ড জলাশয় এক অপূর্ব্ব জলদান-পুণ্যের মহিমা বিঘোষিত করে। ইহাদের বিশাল বিস্তারে জলদাতার হৃদয়ের বিশালত্ব প্রকটিত হইতেছে। কোন কোন বিষয়ে পাঠানের আগমনে আদিম অধিবাসী হিন্দুর উপর অত্যাচার হইয়াছিল সত্য; কিন্তু এই বীর সন্ন্যাসী খাঁ জাহান আলির অবিশ্রান্ত জন-হিতৈষণায় সে সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জল ব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর অপরিমিত অর্থ ধূলিমুষ্টির মত দেশময় ছড়াইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু জলদুর্ভিক্ষ ঘুচিতেছে না এবং এরূপ চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিও

সংস্থাপিত হইতেছে কিনা সন্দেহ। কারণ এই যে, এখন সব কাজ অর্থে করিতে হয় এবং সব কাজ অর্থে হয় না এবং গবর্ণমেণ্ট শত কাজের মধ্যে এই কাজের জন্য সমগ্র দৃষ্টি দিতে পারেন না। তখন অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল; নবাগত সেনাপতি স্বকীয় কীর্ত্তি রক্ষার জন্য একাগ্র চেষ্টায় সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে বিনা ব্যয়ে স্বল্পায়াসে দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং তাহার কার্য্যক্ষেত্রও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, জলদানের মত পুণ্য নাই এবং এ পুণ্যের উপযুক্ত ক্ষেত্রই ভারতবর্ষ।* খাঁ জাহান আলি এই পুণ্যে সমস্ত জাতীয় অধিবাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাহারই বলে তিনি আজ হিন্দু মুসলমান উভয়জাতি দ্বারা পীর বা দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেছেন।

ঘোড়া দীঘি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং ইহারই পূর্ব্ব পার্শ্বে খাঞ্জালীর সুবিখ্যাত ষাট্‌গুম্বজ বা সাত গুম্বজ নামক বিরাট্‌ কীর্ত্তিমন্দির। এই ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও সাধারণ মস্‌জিদের নিয়মানুসারে পূর্ব্বদিকে ইহার সদর। ইহার বাহিরের মাপ ১৫৯′—৮″ × ১০৪′—৬″ এবং ভিতরের মাপ ১৪৩′—৩″ × ৮৮′—৬″ ইঞ্চি †; ভিত্তি—৮ ফুট; গৃহের ভিতর গুম্বজের ছাদের উচ্চতা প্রায় ২১ ফুট। সমস্ত গৃহে পূর্ব্বপশ্চিমে ৭টি করিয়া মোট ১১ সারিতে

* বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজবাগ্মী মহামতি বার্ক কর্ণাটদেশীয় জলাশয় প্রসঙ্গে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, খাঞ্জালী ও সীতারামের জলপুণ্য সম্বন্ধে তাহা অবিকল উক্ত হইতে পারে:—"These are the manuments of real kings, who were the fathers of their people; tastators to a posterity which they embraced as their own. These are the grand sepulchres built by ambition, but by the ambition of an insatiable benevolence which; not contented with reigning in the dispensation of happiness during the contracted tenure of human life, had strained with all the reachings and graspings of a vivacious mind to extend the dominion of that bounty beyond the limits of nature and to perpetuate themselves through generations of generations as the guardians, the protectors and the nourishers of mankind.

† বাবু গৌরদাস বসাক বাগেরহাটে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবার সময় এই সকল স্থান পরিদর্শন করেন এবং খাঞ্জালীর কীর্ত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে যে সকল পরিমাণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি ঠিক নহে। গৌরদাস বাবু ভিতরের মাপ ১৪৪′ × ৯৬′ দিয়াছিলেন।
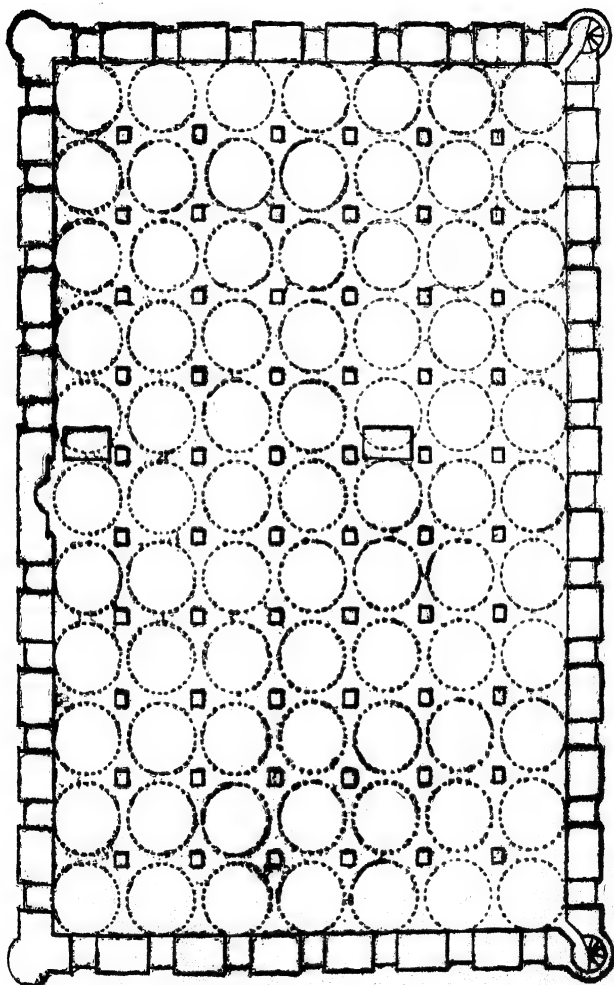
ষাটগুম্বজ

৭৭টি গুম্বজ আছে; উহারা বেষ্টনপ্রাচীর ও মধ্যবর্ত্তী (১০ × ৬) অর্থাৎ ৬০টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বদিকে সদর দরজার সোজাসুজি একসারি অর্থাৎ ৭টি গুম্বজ কিছু বড়; ভিতর হইতে ঐ ৭টি চৌচালা ঘরের মত দেখা যায়। উহার উত্তরে ৫ সারি ও দক্ষিণে ৫ সারিতে ৭০টি গুম্বজ সম্পূর্ণ গোলাকৃতি। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত মাপ লইলে গুম্বজগুলি ১৩′ × ১৩′ ফুট হইবে। উত্তর এবং দক্ষিণ প্রাচীরে ৭ সারি গুম্বজের মুখে ৭টি করিয়া ১৪টি দরজা এবং পূর্ব্বদিকে ১১ সারির মুখে ১১টি দরজা—মোট দরজার সংখ্যা ২৫টি; ইহার সবগুলিই খোলা; ইহা ব্যতীত পশ্চিম প্রাচীরে একটি মাত্র দরজা আছে; সেটি সম্ভবতঃ বন্ধ থাকিত। কোন মস্‌জিদে পশ্চিম দিকে দরজা থাকে না; এখানে বোধ হয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা বলিয়া এবং উহার পশ্চিমদিকে দীঘি আছে বলিয়া সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজাগুলি বাহির হইতে ছোট দেখায়, উহার প্রস্থ ৩′ – ৪″ ইঞ্চি এবং ভিতরে প্রস্থ ৬′ -- ২″ ইঞ্চি। পূর্ব্বদিকের ১১টি দরজার মধ্যে সদর দরজার প্রস্থ ৯′ – ৭″ ইঞ্চি এবং অপরগুলি ৫′ – ১০″ ইঞ্চি; উহার কোন কোনটি ৬′ – ২″ ইঞ্চিও আছে। গৃহটির চারি কোণে চারিটি মিনার আছে; উহারা ছাদ হইতে ১৩′ ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে পূর্ব্বদিকের দুইটি মিনারের মধ্যে ঘুরাণ সিঁড়ি আছে এবং ঐ দুইটি পশ্চাদ্ভাগের দুইটি মিনার অপেক্ষা উচ্চ; উহার একটির নাম রোসন কোঠা বা আলোক ঘর, অন্যটির নাম আঁধার কোঠা। মুয়াজিম এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে 'আজান' দিতেন অর্থাৎ মুসলমানদিগকে নমাজের জন্য এই বিরাট্ মস্‌জিদ বা ভজনালয়ে আহ্বান করিতেন।

ষাট্-গুম্বজ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিত; ইহা একটি বিরাট্ মস্‌জিদ ছিল, প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে নমাজ পাঠ হইত এবং ইহা শাসনকর্ত্তা খাঁজাহানের প্রধান দরবার-গৃহ ছিল। এখানে প্রাতঃকাল হইতে রীতিমত দরবার বসিত, সমবেত প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ, তাহাদের নানা প্রার্থনার উত্তর এবং অভিযোগের বিচার চলিত; সেই সকল কার্য্য চলিবার সময়ে নমাজের কাল উপস্থিত হইলে, মুসলমান প্রজাগণ ঐ গৃহেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িতেন। সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে উহার সোজাসুজি পশ্চিমদিকের বদ্ধপ্রাচীরের গাত্রে একটি প্রস্তর-বেদী ছিল; উহার উত্তরদিকে মধ্যস্থানে আরও দুইটি

ইষ্টক-বেদী ছিল। নমাজের সময় উহার একটি বেদীতে খাঁজাহান, এবং অন্য দুইটিতে প্রধান মৌলবীগণ দণ্ডায়মান হইতেন এবং অন্য সময়ে খাঁজাহান ও তাঁহার উজীর উত্তরদিকের দুইটি ইষ্টক-বেদীতে সমাসীন হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

এই বিরাট্ অট্টালিকাকে ষাট্‌গুম্বজ বলে কেন, ইহা একটি বিবেচনার বিষয়। এ বিষয়ে নানা মত আছে। গুম্বজ হিসাবে নাম হইলে, ইহাতে ৭৭টি গুম্বজ আছে বলিয়া সাতাত্তর গুম্বজ এইরূপ নাম হইত। এই সাতাত্তর কথায় সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশে সাত গুম্বজ হওয়া বিচিত্র নহে; আবার পূর্ব্ব পশ্চিমে গুম্বজের সারি গণনা করিলে, সাতটি সারি আছে বলিয়া সাত গুম্বজ হইতেও পারে। দূরে রাস্তা হইতে দেখিলে মস্‌জিদের উপরিভাগে গুম্বজগুলি সাতটি বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইতেও সাত গুম্বজ হইতে পারে। মস্‌জিদটিকে সাধারণ লোকের ভাষায় "ষাট্‌গুম্‌টে" এবং ষাট্‌গুমট্ বা ষাট্‌ঘোমট বলে; মস্‌জিদের গুম্বজগুলি ষাট্‌টি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। কিন্তু গুমট্ বা ঘোমট শব্দে স্তম্ভ বুঝায় বলিয়া জানি না। সুতরাং স্তম্ভের হিসাবে যে নামকরণ হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কেহ বলেন ঘোমট শব্দে দরজা বুঝায়; মস্‌জিদটিতে ৬০টি দরজা আছে, এজন্য ইহাকে ষাট্‌ঘোমট বলে।* ইনি চক্ষুদিয়া দেখিয়া বিবরণ লিখেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত, কারণ গৃহটির ষাট্‌টি দরজা নাই। মস্‌জিদ হইতে বাহিরে যাইবার পথগুলিকে দরজা ধরিলে ২৬টির অধিক দরজা নাই, আর খোলা খিলানের সব-গুলিকেই যদি দরজা ধরা যায়, তাহা হইলে দরজার সংখ্যা ১৬২টি হয়। সুতরাং দরজার হিসাবে নাম হয় নাই। যাহা হউক, নামের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। আমরা ইহাকে ষাট্‌গুম্বজ বা সাতগুম্বজ এই উভয় নামে অনির্ব্বিশেষে উল্লেখ করিয়াছি।

ষাট্‌গুম্বজের পূর্ব্বভাগে প্রকাণ্ড সদর তোরণ ছিল, উহার দুই পার্শ্বে গৃহ ছিল। সম্ভবতঃ এখানেও বিষয়াদি কার্য্য হইত। এ সমস্ত গৃহগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ষাট্ গুম্বজেরও সে দিন আর নাই। এক সময়ে ইহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল; বিস্তৃত হর্ম্ম্য জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল, মিনারগুলি ও গুম্বজের অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; খাঁজাহানের অন্যান্য অনেক

* ঐতিহাসিক চিত্র, পৌষ (১৩১৭), ৩৯৭ পৃঃ।

মস্‌জিদের দশা যাহা হইয়াছিল, ইহার তাহা বাকী ছিল না, ইষ্টকাদি খসাইয়া লইয়া লোকে অন্য কাজে ব্যবহার করিত। কিন্তু সদাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ইহার সামান্য সংস্কার ব্যবস্থা হইয়াছে; জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে; সমস্ত কম্পাউণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং একজন বেতনভোগী চৌকিদার নিযুক্ত আছে। ষাট্‌গুম্বজের চারিটি মিনারের শীর্ষ গুম্বজ সম্পূর্ণ সংস্কৃত হইয়াছে; ২৮টি গুম্বজের উপর অল্প অল্প মেরামত করা হইয়াছে, ১৫টি গুম্বজ এখনও ভগ্ন বা শীর্ষশূন্য অবস্থায় আছে, অপর ৩৪টি গুম্বজের উপর হস্তস্পর্শ হয় নাই; উহাদের উপরিভাগের জমাট খসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব স্থাপত্য-কৌশলে গুম্বজ এখনও সুদৃঢ় রহিয়াছে। গুম্বজ গঠন কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা সংস্কারের সময় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকগণ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থায় দিল্লী আগ্রার পুরাকীর্ত্তি রক্ষার নিয়মিত চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতেছে, সেই কীর্ত্তিমন্দির রক্ষাবিষয়ক আইন এখানে প্রযুক্ত হইলে নিম্নবঙ্গের একটি প্রধান কীর্ত্তি রক্ষিত হইবে। প্রস্তরবিহীন খুল্‌না জেলায় ষাট্‌গুম্বজের মত বিরাট্‌ অট্টালিকা যে মর্ম্মর-স্বপ্নের স্থান অধিকার করিতেছে, তাহা সত্য কথা।

খাঁ জাহানের খালিফাতাবাদ সহর পশ্চিমে ঘোড়াদীঘি হইতে পূর্ব্বদিকে চারি মাইল দূরবর্ত্তী ভৈরবনদের কূল পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ভৈরবের প্রাচীন খাত বা মগরার খাল হইতে দক্ষিণে ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাড়াপাড়ার বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সহরের বাহিরে ও উত্তর এবং পশ্চিমদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের ও সহচরবর্গের নানা কীর্ত্তি দেখা যায়। প্রবাদ এই— ৩৬০ জন আউলিয়া বা ধর্ম্মপ্রাণ ফকির তাঁহার সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সংখ্যার সত্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহার সহচরের সংখ্যা যে শতাধিক ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কথিত আছে, প্রত্যেক সঙ্গীর জন্য তিনি একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন; এখনও শতাধিক এবম্বিধ মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

খাঁ জাহানের সহচরগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়াছে; গরিবসাহ, বেরাম সা; বুড়া খাঁ, ফতে খাঁ; পীর খাঁ, মীর খাঁ;

ষাট গুম্বজ বাগেরহাট।

চাঁদ খাঁ, এক্তিয়ার খাঁ, বক্তার খাঁ; আলম খাঁ, আনর খাঁ; সাহাদাদ খাঁ, সন্দেশ খাঁ (সাতোষ খাঁ), সের খাঁ, বাহাদুর খাঁ, দরিয়া খাঁ, দিদার খাঁ, গঙ্গা খাঁ, মহম্মদতাহের খাঁ (পীর আলী) ও আহম্মদ খাঁ (জিন্দা পীর)। এতদ্ব্যতীত মেহেরউদ্দীন, পীর জয়ন্তী প্রভৃতি যে আরও কয়েকজন খাঁজাহানের অনুচর বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কয়েকজনের মধ্যে গরিবসাহ ও বেরামসাহের সমাধি যশোহরে আছে এবং বুড়া খাঁ ফতেখাঁর সমাধি আমাদি গ্রামে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা বাগেরহাটেও আসিতেন, তাহার পরিচয় আছে। ষাট্‌গুম্বজ হইতে ২।৩ মাইল পশ্চিমদিকে সায়েড়া গ্রামে ভুটিয়ামারির হাটের দক্ষিণে গরিবসাহের দীঘি ও চেল্লাখানা বা সাধনস্থান ছিল। একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার ঢিপির মধ্যে একটি গুহাতে এই চেল্লা ছিল। এখন সাধারণ লোকে ঐ স্থানকে ছিলেখানা বলিয়া থাকে। খালিফাতাবাদে বুড়া খাঁর দীঘি এখনও আছে।

ষাট্‌গুম্বজ হইতে ক্রমে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে আমরা খাঁ জাহান ও তাঁহার সহচরগণের নামীয় নানা কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাইব। ষাট্‌গুম্বজ হইতে একটি রাস্তা উত্তরমুখে ভৈরবের কূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঐ রাস্তারই পূর্ব্বপার্শ্বে খাঁজাহানের গড়বেষ্টিত আবাসবাটী ও তাহার সংলগ্ন মস্‌জিদ ছিল। নদীর তীরে গড়বেষ্টিত বাড়ীর সদর দ্বার ছিল। বেষ্টনপ্রাচীর ও গড়ের চিহ্ন এখনও আছে। ১৫০´×১২০´ ফুট পরিমিত স্থানে ইষ্টকস্তূপসমূহ পূর্ব্বকীর্ত্তির আভাস দেয়। সেই স্তূপের ভিতর একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ পড়িয়া আছে। এখনও সাধারণ লোকের মুখে গল্পকথায় শুনিতে পাওয়া যায়, খাঁ জাহানের সোণাবিবি ও রূপাবিবি নামক দুই স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেন। এজন্য সাধারণ লোকে ইহাকে সোণাবিবির বাড়ী বলে। দুই স্ত্রী থাকিলেই ঝগড়া হয়; সোণাবিবি ও রূপাবিবির মধ্যেও ঝগড়া বিবাদ হইত। তাহার ফলে একজন বিষ খাইয়া বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরে ঝাঁপ দিয়া মরেন; ঐ পুকুরকে এখনও বিষপুকুরিয়া বলে; অন্য জন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ঘোড়া-দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোণে সমাহিত হন, ঐ সমাধিস্থানকে বিবিজানের মস্‌জিদ বলে। খাঁ জাহানের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে আলোচনা

করিয়াছি * তাহাতে তিনি নপুংসক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার যে কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাহা সত্য। বাগেরহাট অঞ্চলে কোন স্থানে কোন কীর্ত্তিচিহ্নে বা গল্পগুজবে প্রসঙ্গক্রমেও খাঁ জাহনের সন্তানাদির কথার উল্লেখ নাই। তিনি আজীবন অতি পবিত্রভাবে জীবনলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ প্রবল পরাক্রম এবং রাজকীয় প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তিনি সাধারণ পাঠান রাজার মত ইচ্ছা করিলে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাঠান আমলের বহু অত্যাচারের কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু খাঁ জাহান আলি বা তাঁহার অনুচর-সম্প্রদায় কখনও কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়বিজয় যদি দেবতার চিহ্ন হয়, তবে খাঁ জাহান ও তাঁহার আউলিয়াদিগকে পীর বলিতে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি হইতে পারে না। এই সকল প্রসঙ্গ হইতে অনুমান হয়, সোণাবিবি, রূপাবিবি তাঁহার বিবাহিতা বা রক্ষিতা স্ত্রী ছিলেন না। হয়ত তাঁহার দুইটি পরিচারিকার এইরূপ নাম ছিল। তাঁহার বিবাহিতা কোন স্ত্রী থাকিলে, তাহার সমাধি খাঁ জাহানের সমাধির পার্শ্বে দেখা যাইত, সহরে এক কোণে অতি হীনাবস্থায় একটি একগম্বুজ মস্‌জিদে দেখা যাইত না।

যেখানে নদীর উপর খাঁ জাহানের বাটীর তোরণ ছিল, ঐ স্থান হইতে একটি রাস্তা পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে আসিয়া ষাট্‌গুম্বজের রাস্তায় মিশিয়াছে, অন্য একটি রাস্তা পশ্চিম-দক্ষিণমুখে মগরাগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয় রাস্তা মগরার খালের কূল দিয়া সোজা পূর্ব্বমুখে গিয়াছিল। উক্ত তোরণদ্বারের অপর পারে গ্রাম্যরাস্তা ও মগরার রাস্তার মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে, উহাই কোতয়ালী চৌতারা, অর্থাৎ এইস্থানে সহরের অধ্যক্ষ বা কোতোয়াল সসৈন্যে অধিষ্ঠান করিতেন। ভৈরবের যে প্রাচীন খাতকে এক্ষণে মগরার খাল বলে, তাহাই ছিল মগরানদী। মগরানদী এখানে একটি বাঁক ঘুরিয়া অপর পারে বাগমারা গ্রাম গঠন করিয়াছিল। তাহার সেই বাঁকের মাথায় নগরপালের অবস্থান যে যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ অনুগত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নগর নির্ম্মাণের নিমিত্ত দূরদেশ হইতে যে প্রস্তরাদি নানা দ্রব্যজাত

* ২৮৬ পৃঃ।

আনীত হইত, তাহা এই কোতোয়ালী চৌতারার সন্নিকটে অবতরণ করাইয়া লওয়া হইত। সেই অবতরণস্থানের নাম ছিল জাহাজঘাটা। এখনও একটি ভূপ্রোথিত প্রস্তরস্তম্ভ সেই জাহাজঘাটার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে খাঁজাহান স্বকীয় সহরের গঠন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ষাট্‌গুম্বজ হইতে জাহাজঘাটা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, উহারই উভয় পার্শ্বে নানা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ছিল, এইজন্য এইস্থানেই প্রথম সহর প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হয়। জাহাজঘাটার প্রস্তরস্তম্ভ যে কোন পুরাতন হিন্দুমন্দিরের অংশবিশেষ তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। * উহার গাত্রে একটি অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী-মূর্ত্তি ছিল বলিয়াই খাঁ জাহান এই স্তম্ভটিকে কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রয়োগ করেন নাই; যে গুলির গাত্রে এমন পরিস্ফুট মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল না বা যাহার মূর্ত্তিচিহ্ন সহজে বিলুপ্ত করা গিয়াছিল, তাহাই দিয়া তিনি নিজের বাড়ী বা ষাট্‌গুম্বজ নামক দরবারগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তিনি যে সমস্তই পরের পাথর লইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার আবশ্যকমত সমস্ত পাথরই যে সেখানে সঞ্চিত ছিল, এমন হইতেও পারে না। স্তম্ভ ব্যতীত অন্য পাথরেরও তিনি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-গৃহের ভিত্তিমূল হইতে মাটীর উপর তিন ফুট পর্য্যন্ত সমস্তই পাথরে গঠিত। এ সকল পাথর কোথা হইতে আসিল?

শুনা যায়, তিনি আবশ্যকীয় প্রস্তর চট্টগ্রাম হইতে আনিয়াছিলেন। পাঠান আমলে সুন্দরবনের এ অংশ চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়ে চট্টগ্রাম সহরে বায়াজিৎ বোস্তান নামক একজন প্রসিদ্ধ বুজরুগ বা অদ্ভুতকর্ম্মা সাধু বাস করিতেন। + খাঁ জাহান যখন জনৈক পরিচিত ব্যক্তির নিকট পত্র

---

* ২০৩ পৃঃ।

+ বায়াজিৎ পূর্ব্বে পারস্যের অন্তর্গত বোস্তান নগরের সুলতান ছিলেন। একটি দৈব ঘটনায় তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, তিনি হঠাৎ সংসার ত্যাগ করেন এবং চট্টগ্রাম সহরের উত্তরাংশে এক দরগা স্থাপন করিয়া অবস্থান করেন। (বিজয়া, ১৩১৯, কার্ত্তিক ৭৩ পৃঃ) প্রবাদ এই, তিনি দৈববলে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন। "তাজ-কেরাত-উল-আউলিয়া" নামক মুসলমানী গ্রন্থে এই সাধুর জীবনচরিত লিখিত আছে।

লিখিয়া চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুনিয়া এই ফকির বলিয়াছিলেন যে "দেড়বুড়ির ভারাণী, তা'র চাটিগাঁয় বরাত" অর্থাৎ সামান্য একজন লোক, সে দ্রব্যাদির জন্য চাটিগাঁয় পত্র লিখিয়া পাঠায়। * যাহা হউক, অবশেষে বায়াজিৎ খাঁ জাহানের ধন প্রতিপত্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হন। খাঁ জাহানও তাঁহার শিষ্যতুল্য হন এবং সাধুর সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক সময় চট্টগ্রাম যাইতেন। † চট্টগ্রামের সহিত ক্রমে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যে খাঁ জাহান খালিফাতাবাদ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এক রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। ষাট্‌গুম্বজ হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বমুখে বর্ত্তমান বাগেরহাট সহরের দিকে গিয়াছে, ঐ রাস্তাই কাড়াপাড়া রাস্তা ছাড়িয়া একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বাসাবাটী গ্রামের মধ্য দিয়া পুরাতন ভৈরব ও বলেশ্বরের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বাগেরহাটে পূর্ব্বদিকে এখন যেমন দড়াটানা প্রবল নদী, তখন সে নদী ছিল না। রাস্তাটি ভৈরবের বাঁকের মাথা দিয়া বৈটপুর, কচুয়া, চিংড়াখালি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া হোগ্‌লাবুনিয়ার নিকট বলেশ্বর পার হইয়া বরিশাল জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। কারণ ঐ প্রদেশের অনেকাংশ নানা বিপ্লবে সমুদ্রগর্ভস্থ ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মেঘনার মোহনার সন্নিকটে যে বাঙ্গালা নামক সহর ছিল,

---

সাধু ফকির হইবার অনেক কাল পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সংসার ত্যাগ না করিয়াও সাধু হওয়া যায়। তাহার সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরিপোষণ জন্য একটি কথা প্রচলিত আছে, "বাজীৎ বোস্তান, আগে মস্তান (উদাসীন), শেষে পস্তান" (অনুতপ্ত হন)।

* যাহারা ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া সেই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে "ভারাণী" বলে। "বুড়ি" অর্থে পয়সা। দেড় পয়সার: ভারাণী অর্থাৎ অতি সামান্য লোক। এক্ষণে সামান্য ব্যক্তির উচ্চ আশা দেখিলেই খুল্‌না জেলায় এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু এ প্রবাদের সহিত খাঁ জাহানের জীবনের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকে জানেন না।

† "At chittagong Khan Jahan was want to visit a great Mahamedan saint Bayazid Bortan. The needly discovered Mss. History of Chittagong gives a good deal of information concerning this holy man."—Hunter's Statistical Accounts vol. II, P. 230. আমরা চেষ্টা করিয়াও এই হস্তলিখিত পুস্তকের সন্ধান পাই নাই।

যাহার সমৃদ্ধি-গৌরবের কথা মার্কোপলো ও বহু পটুর্গীজ প্রভৃতি ভ্রমণকারী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই; উহা সম্পূর্ণরূপে ভীষণ সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা দ্বারা "বাঙ্গালা" নগরীর সহিত খালিফাতাবাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেও পারে। যাহা হউক, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটি জঙ্গলাবৃত রাস্তা খাঞ্জালীর রাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমরা জানি।

চট্টগ্রাম হইতে খাঁ জাহান অনেক প্রস্তর আনিতেন। সে সকল প্রস্তর-বোঝাই নৌকা বলেশ্বর ও ভৈরবের পথে মগরার খালে প্রবেশ করিত এবং পূর্ব্বোক্ত জাহাজঘাটায় অবতরণের পর গোশকটে করিয়া নানাস্থানে নীত হইত। কোতোয়ালী চৌতারা হইতে একটি রাস্তা পশ্চিমমুখে গিয়াছিল, ঐ রাস্তার বামে দক্ষিণে অনেকগুলি মসজিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহার একটিকে লোকে "ছিলেখানা" বলে; এখানে নিশ্চয়ই কোন ফকিরের সাধন-ক্ষেত্র ছিল। চৌতারা হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহার দক্ষিণে বিষপুকুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলি মস্‌জিদ ছিল। ইহার মধ্যে দিদার খাঁর নামীয় নবগুম্বজ মস্‌জিদটি সুন্দর। ইহার ভিতরের মাপ ৪০´×৪০´ ফুট; ভিত্তি ৭´ ফুট; পশ্চিমদিকে দরজা নাই, অন্য ৩দিকে ৩টি করিয়া নয়টি দরজা, প্রত্যেকটির প্রস্থ ৬´–৩´´ ইঞ্চি। গুম্বজের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীটি কিছু বড়, উহার ভূমিপরিমাণ ১৪´×১৪´, অপর ৮টি প্রত্যেকে ১২´–৬´´ ইঞ্চি। চারিটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর গুম্বজগুলি প্রতিষ্ঠিত।

এই মস্‌জিদ ছাড়িয়া আর একটু অগ্রসর হইলে ষাট্‌গুম্বজের প্রধান রাস্তার সহিত মিলন হয়; ঐ স্থান হইতে সোজা পূর্ব্বমুখে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিলে বাগেরহাট সহর পাওয়া যায়। মিলনস্থানের দক্ষিণদিকে কাঁঠালতলা ও বাদামতলা নামক ক্ষুদ্র পল্লী এবং উত্তরদিকে বাগমারা গ্রাম। বাগমারায় আনরখাঁ মস্‌জিদ ও দীঘি আছে এবং কাঁঠালতলার মধ্যে গঙ্গাখাঁ ও অন্যান্য নামীয় আরও কয়েকটি মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। ক্রমে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে দক্ষিণে রণবিজয়পুর গ্রামের মধ্যে খাঁজাহানের দরগা, দরিয়া খাঁ ও আহম্মদ খাঁর মস্‌জিদ ও দীঘি, এবং কাঁঠালগ্রামের মধ্যে কাটানি মস্‌জিদ দেখা যায়। বামভাগে কৃষ্ণনগর গ্রামের মধ্যে হোসেন সাহের নামীয় মস্‌জিদ ও

দীঘি, হাবসীখানা, এক্‌তিয়ার খাঁর প্রকাণ্ড দীঘি ও মস্‌জিদ এবং অবশেষে দশানিগ্রামের মধ্যে বুড়াখাঁর দীঘি দেখা যায়। হোসেন সাহের প্রসঙ্গ পরে তুলিব, বুড়াখাঁর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্তিয়ার খাঁর দীঘি ছাড়িয়া আসিলে দক্ষিণদিকে কাড়াপাড়ার রাস্তা। ইহারই পশ্চিম গায়ে প্রায় আধমাইল দীর্ঘ পচা দীঘি। দৈর্ঘ্যের তুলনায় ইহার বিস্তার কিছু কম। এরূপ দীর্ঘ দীঘি এতদঞ্চলে আর নাই। তবে ইহার জল ভাল নহে; সম্ভবতঃ তজ্জন্যই ইহার নাম হইয়াছে পচা দীঘি।

সামান্য কয়েকটিমাত্র কীর্ত্তির কথা বলা হইল। প্রদত্ত মানচিত্রে অন্য কতকগুলি কীর্ত্তির স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরও কতগুলি যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমস্ত প্রাচীন সহরের জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে যেখানে সেখানে মস্‌জিদের ধ্বংসচিহ্ন দেখা যায়। সমস্ত প্রদেশ ভরিয়া অনুসন্ধান করিলে ৩৬০টি মস্‌জিদ ও দীঘির কথা অপ্রত্যয় করিবার কারণ থাকে না। কতকগুলি বিলুপ্ত-কীর্ত্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে; ঠাকুর দীঘির দক্ষিণে ঘুঘুখালির ডহরের মধ্যে সাতোষ খাঁর দীঘির পশ্চিম পারে যে মস্‌জিদ দণ্ডায়মান ছিল, তাহা কেহ কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে; মগরা গ্রামে একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ জনৈক মুসলমান অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে; ঐ ব্যক্তি খাঁজাহানের বাড়ীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত মস্‌জিদটিও ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিয়াছে; কোতোয়ালী চৌতারার সুন্দর অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে; কাঁঠালগ্রামে বসুবাটীর ভিতর যে দুইটি মস্‌জিদ ছিল, তাহার কতকদ্বারা তাহাদের নিজের বাটী নির্ম্মিত ও কতক অন্যের নিকট বিক্রীত হইয়াছে। উক্ত বাটীতে ২।৩টি হাবসিখানা ছিল, তাহা আর নাই। উহার প্রত্যেকটির ভিতর সুগভীর কুয়া ছিল; কুয়াগুলি ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত এবং উপরিভাগে গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। রণবিজয়পুর গ্রামে একটি বাড়ীতে মস্‌জিদ ও পুকুর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, জনৈক মুসলমান উহা ভাঙ্গিয়া লইয়া নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে পল্লীতে ষাট্‌গুম্বজ অবস্থিত, উহাকে সুন্দরের ঘোষণা বলে, ঐ গ্রামেও বাদামতলায় কয়েকটি মস্‌জিদ ছিল, তাহা লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে। যে যে প্রকারে পাইয়াছে, ইট লইয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ যাহার হয় নাই,

সে বাড়ীর সদর দরজা, ঘরের সিঁড়ি প্রভৃতি নানা কাজে ইট লাগাইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রামেও খাঞ্জালী কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। আফরা গ্রামে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ল'র দীঘি, থলসীগ্রামে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ বুড়াখাঁ দীঘি, পাঁচালী গ্রামে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সরাফকাঁদি দীঘি, বাদখালিগ্রামে তালপুকুরিয়া ও দৌলতের পুকুর, রাজাপুরে হাজিবুনিয়া নামক পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ পুকুর খাঞ্জালীরই জলদান-পুণ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

——o——
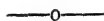
সপ্তম পরিচ্ছেদ—খাঁ জাহানের শেষ জীবন।

রাজশক্তির আনুগত্যই রাজভক্তি নহে। শুধু বলের দ্বারা দেশ শাসিত হয় না। প্রজার ভক্তি আকর্ষণ করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, পাঠানেরা দেশ জয় করিতে পারিতেন, অধিকার বা শাসন বিস্তার করিতে জানিতেন না। অসির সাহায্যে দেশ জয় করা যায়, মনের উপর আধিপত্য লাভ করা যায় না। দৈবক্রমে অসিজীবীর সাহায্য করিতে বহু-সংখ্যক মুসলমান সাধু এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহারাই অগ্রদূত হইয়া দেশমধ্যে নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দৈবীশক্তি ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া লোক বশীভূত করিয়াছিলেন। খাঁ জাহান ইঁহাদের অন্যতম। দুর্দ্ধর্ষ সুন্দরবন প্রদেশে তিনি না আসিলে, কোনক্রমে মুসলমান ধর্ম্ম বা প্রভুত্ব প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। খাঁ জাহানের জীবনে চরিত্রশক্তি ও রাজকীয় শক্তি উভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় খাঁজাহান একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী।

তাঁহার জীবনের তিনটি প্রকৃতি; তিনি চরিত্রে সাধু, জনহিতৈষণা তাঁহার ধর্ম্ম এবং শাসন ও ধর্ম্ম বিস্তার তাহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সাধুতা, হিতৈষণা ও শাসন বিস্তার এক সঙ্গে চলিত। খাঁ জাহানের সৈন্য ছিল, তাহারা আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারিত; কোন কোন স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অধিক বার যুদ্ধ করিতে হয় নাই। বাগেরহাটের কাছে রণবিজয়পুর, রণজিৎপুর, রণভূমি, ফতেপুর প্রভৃতি কতকগুলি স্থান আছে। ইহাদের সহিত কাহার কোন্ যুদ্ধের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মোট কথা,

শাসন-প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাঁহার জনহিতকর কার্য্যের জন্য মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও সাধুচরিত্র দেখিয়া ভক্তিমান্ না হইয়া পারে নাই। সাধারণ লোকের এই ভক্তি ও প্রীতি শুধু তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদিগের মুখ্য সাধনা যে সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিল, তাহা নহে; ইহা দ্বারা সমস্ত পাঠান ও এমন কি, মুসলমান জাতিকে কতকটা আত্মীয় ও আপনজনের মত দেখিতে হিন্দুদিগকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহারই ফলে ক্রমশঃ পাঠানগণ কোষবদ্ধ অসি লইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরের দেশে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের এমন ভিত্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না।

হিন্দুর দেশে ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা নব-মত সংস্থাপন করা অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার দৃষ্টান্ত অতীব জ্বলন্ত হয়। খাঁ জাহান দেশমধ্যে অসংখ্য জলাশয় খনন করিয়া জলকষ্ট দূরীভূত করিলেন; সুপ্রশস্ত এবং ছায়াবহুল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া যাতায়াতের প্রণালী সুগম করিলেন; নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব বলিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহার কতক দান প্রভৃতি সৎকার্য্যে প্রজার মধ্যে বিতরণ করিতেন, কতক মস্‌জিদাদি ইরামত নির্ম্মাণ করিতে গিয়া দেশীয় শ্রমজীবী-দিগের হস্তে পৌঁছাইয়া দিতেন, অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ প্রজার জন্য মৃত্তিকাগর্ভে গচ্ছিত রাখিতেন। তাঁহার সময় হইতে প্রচার হইয়াছিল যে, তিনি ৩৬০ বিঘা জমিতে অপরিমিত ধনরাশি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। একথা সত্য। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বহুলোকে তাঁহার হর্ম্যাদির ভিতর বা অন্যত্র মৃত্তিকা-নিম্নে যথেষ্ট অর্থ পাইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। লোকে বলিয়া থাকে, বাগের-হাটের নিকটবর্ত্তী প্রধান প্রধান সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদারবংশের উন্নতিলাভের ইহাই মুখ্য কারণ। এমন কি, এখন দুইজন লোকে একত্র কোন জমিতে হলকর্ষণ করে না, পাছে হঠাৎ ধন পাইলে উহার বণ্টন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, খাঁ জাহান আলির এইরূপ ধন পুঁতিয়া রাখিবার একটি উদ্দেশ্য ছিল। জমি গভীর করিয়া খনন করিলে, তাহার

উর্ব্বরতাশক্তি বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়; এদেশীয় কৃষকেরা স্বল্প পরিশ্রমে ধান্য জন্মাইতে পারে বলিয়া তাহাদের জমি রীতিমত চাষ করে না; কিন্তু অনেকে অর্থের লোভে যথেষ্ট গভীর করিয়া গর্ত্ত করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জমি উল্টাপাল্টা হইলে উহার শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাস্তবিকই এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে তিনি সঞ্চিত অর্থ লুক্কায়িত রাখিতেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এইভাবে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তিমন্দিরগুলির অনেক অনিষ্টও হইয়াছে; লোকে ধনের লোভে ষাট্‌গুম্বজ প্রভৃতি মস্‌জিদের নানাস্থানে ভিত্তিগাত্র ভাঙ্গিতে গিয়া মূলকীর্ত্তির বিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অন্য উদ্দেশ্য না থাকিলেও এই আশায় অনেক মস্‌জিদ খুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ষাট্‌গুম্বজে যেস্থানে তিনি একটি উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে প্রস্তরের আড়ালে যথেষ্ট অর্থ ছিল, এবং তাহা প্রাচীরগাত্র ভাঙ্গিয়া কোন ব্যক্তি আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। এরূপ নির্শন বহু মস্‌জিদে পাওয়া যায়।

খাঁ জাহান আলি রাস্তা নির্ম্মাণে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কোন কার্পণ্য ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া মাটী ফেলিয়া দীর্ঘপথ সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা সহজ ব্যাপার নহে। স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরীর শোভাবর্দ্ধন এবং তাঁহার নাগরিক প্রজাগণের সুবিধার জন্য তিনি খালিফাতাবাদে রাস্তাগুলি পাকা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তবে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এমন পাকা রাস্তা নিম্নবঙ্গে কোথায়ও ছিল না। এই রাস্তা পাকা করিবারও তাঁহার একটা সুন্দর প্রণালী ছিল। তিনি আধুনিক প্রণালীর মত এক পরদা ইষ্টক পাতিয়া তাহার উপর খোয়া ফেলিয়া রাস্তা করিতেন না; হয়ত তিনি বুঝিতেন যে সেরূপ রাস্তা দুই চারি বৎসর মেরামত না করিলে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। খাঞ্জালী ইটের আকার কিছু ছোট ছিল; উহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে পাঁচ ছয় ইঞ্চি করিয়া এবং দুই ইঞ্চিরও কম পুরু ছিল। ইটগুলি এখনকার মত ফর্ম্মায় ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইত না। খাঞ্জালী এই ইট অভগ্ন অবস্থায় লইয়া তাঁহার রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাস্তাতে লম্বালম্বি পাঁচ সারি ইট থাকিত, প্রত্যেক সারিতে ২ খানি করিয়া ইট এবং সারিগুলি সমদূর-

বর্ত্তী ছিল। দুই দুইটি সারি মধ্যে চারি পাঁচখানি ইট এড়োএড়িভাবে বসান হইত। কোন ইটই "পট"গাথা, অর্থাৎ চিৎ করিয়া লাগান হইত না; লম্বা-লম্বি এড়োএড়ি সব ইটগুলিই "খাদরী" করিয়া অর্থাৎ পাশাপাশি কা'ত করিয়া বসান হইত। দুইটি লম্বা সারির মধ্যে প্রায় ২ ফুট বিস্তৃতি থাকিত। সাধারণতঃ খাঞ্জালীর পাকা রাস্তার বিস্তৃতি প্রায় ১০ ফুট। সহরের মধ্যে প্রধান প্রধান রাস্তা এবং এমন কি চট্টগ্রামের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারও কতকদূর পর্য্যন্ত এই ভাবে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ শত বৎসর এই সকল পাকা রাস্তার কোন প্রকার সংস্কার হয় নাই, তবুও ইহা ঠিক আছে। অবশ্য স্বার্থপর লোকের খনিত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরাকীর্ত্তি নষ্ট করিয়া দশজনের অপকার করে, এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। রাস্তার ইট লইয়া লোকে সামান্য সামান্য গৃহকার্য্যে লাগাইয়াছে; অনেকস্থলে উচুনীচু হইয়া পড়িয়াছে। তবুও খাঞ্জালীর রাস্তা অন্য কোন গ্রাম্য রাজপথ অপেক্ষা কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নহে।

শক্তিসম্পন্ন মুসলমানদিগের মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম আছে, তাঁহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া যান। এই সকল সমাধিস্থান তাঁহাদের জীবদ্দশায় মস্‌জিদরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং মৃত্যুর পর উহার মধ্যে শবদেহ সমাহিত করিয়া তাহার উপর সমাধিবেদী নির্ম্মিত হয়। এমন কি, সমাধির উপর কোন্ পাথরখানি কি ভাবে বসাইয়া বেদী গঠিত হইবে, কোন্ পাথরে কি কি লিপি উৎকীর্ণ থাকিবে, তাহাও সমস্ত ঠিক হইয়া থাকে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া কর্ম্মী পুরুষ কোরাণ হইতে নিজের পছন্দ মত স্থান উদ্ধৃত করিয়া এবং অনেক সময়ে স্বয়ং বা মৌলবী দ্বারা নিজের পছন্দমত লিপিকথা রচনা করিয়া রাখিয়া যান। মৃতব্যক্তির অনুচরবর্গ সমাধি গঠন করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থলে মৃত্যুর তারিখটি মাত্র লিখিয়া রাখে। এই প্রণালীতে ইতিহাসের পক্ষে একটা অসুবিধা হয়; নিজের গুণের পরিচয় স্বয়ং কেহ স্পষ্ট করিয়া লিখে না এবং পরবর্ত্তী লোকের জন্যও সে সব লিখিবার স্থান পর্য্যন্ত থাকে না। এজন্য সমাধিলিপি পাঠ করিলে ধর্ম্মগ্রন্থের উদাস নীতিকথা যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু মৃতব্যক্তির পরিচয় বিষয়ে কেবল মাত্র তাঁহার নাম ও মৃত্যু তারিখের উপর নির্ভর

করিতে হয়। খাঁ জাহান আলির বেলায়ও একথা বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে।

যাট্‌গুম্বজ হইতে ১ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং বাগেরহাট হইতে ৩ মাইল পশ্চিমদিকে গেলে, একটী রাস্তা দক্ষিণমুখে গিয়াছে, দেখা যায়। এই রাস্তায় প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিয়া খাঁ জাহান আলির একটি প্রধান জলাশয়ের কূলে উপনীত হইতে হয়। এই দীঘির নাম "ঠাকুর দীঘি"। আমরা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে এই দীঘির কথা উল্লেখ করিয়াছি।* শিববাড়ীতে এখনও যে বুদ্ধ প্রতিমার পূজা হইতেছে, উহা এই দীঘির মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল; বুদ্ধ ঠাকুর পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই এ দীঘির নাম "ঠাকুর দীঘি" হয়। সম্ভবতঃ এস্থলে পুরাতন বৌদ্ধ আমলে একটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পুষ্করিণী ছিল। কোন বিপ্লব বা পরজাতীয় আক্রমণের সময়ে বুদ্ধমূর্ত্তি সেই পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রতি হিন্দুর অত্যাচার-বশতঃ এরূপ দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র নহে। খাঁ জাহান আলি সেই প্রাচীন পুষ্করিণীর খাতে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করেন, তৎসম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী আছে, আমরা পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এ দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান, এক একদিকে প্রায় ১৬০০ ফুট হইবে। ইহার পাহাড়ের উপর এমন ভীষণ নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে যে, তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করা বা জলাশয় পরিমাপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শুধু উত্তর পাহাড়টির কতকাংশ একটু পরিষ্কৃত আছে, কারণ সেখানে ৬০ ফুট প্রশস্ত এক প্রকাণ্ড বাঁধা ঘাট রহিয়াছে। ঐ ঘাটের উপর খাঁ জাহানের সমাধি-মন্দির।

জলাশয়ের উপরিভাগের অধিকাংশ দামদলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তবুও জল অতি নির্ম্মল এবং সুস্বাদু; সেই স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সলিলের কূলে দণ্ডায়মান হইলে, কিছুদূর পর্য্যন্ত বিচরণশীল ক্ষুদ্র মৎস্যটি এবং এমন কি, তলভূমিস্থ শুভ্র বালুকাকণাগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায়; আর মুখ উন্নত করিয়া দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সেই বহুদূর বিস্তৃত বিশাল জলাশয় যে এক মহান্ দৃশ্য প্রকটিত করে, এবং তাহার অমেয় গভীরতার যে সন্দিগ্ধ আভাস দেয় তাহা বাস্তবিকই উপভোগের বিষয়। খাঁ জাহান

* ২০৫-৭ পৃষ্ঠা।

সাধ করিয়া এই জলাশয়ে কালাপাড় ও ধলাপাড় নামক দুই কুমীর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; হয়ত এই কৃত্রিম জলাশয়কে স্বাভাবিক জলাশয়ের মত সর্ব্বপ্রকার জীব-জন্তুতে পূর্ণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং মানুষের চিরশত্রুকে অভ্যাস দ্বারা অনপকারী করিয়া তুলিবার খেয়ালও এই ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা বলা যায় না। নদীর সহিত সংযোগবিশিষ্ট নিকটবর্ত্তী বিল হইতে কুমীর আসিয়া এই বিরাট্ দীঘিতে পড়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হয়ত শেষে তাহাদিগকে খাদ্য দিয়া বশীভূত করিয়া খাঁ জাহান তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, খাঁ জাহানের সে কালাপাড়, ধলাপাড় এখন আর নাই, তাহাদের পরে বহুপুরুষ পার হইয়াছে। কিন্তু সেই বীরপুরুষেরা নরমাংস-লোভ পরিহার করিয়াছিল, বলিয়া তাহাদের বংশধরগণও সেগুণ পাইয়াছে। এখনও ঠাকুর দীঘিতে এবং ঘোড়া দীঘিতে কতকগুলি কুমীর আছে; তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে না, তবে তাহাদের নিকট খাদ্যের দাবি করিবার জন্য স্নানের সময় নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাসিয়া থাকে। খাঞ্জালী এখন একজন পীর। সে পীরের নিকট হিন্দু-মুসলমানে সির্ণী মানসা করে; এবং কুমীরদিগকে খাওয়াইলে খাঞ্জালী পীরকে তুষ্ট করা হয়, এই বিশ্বাস পোষণ করে। কত লোক যখন তখন সির্ণী দিতে আসে, খই চিড়া, চিনি বাতাসা; মোরগ পায়রা—এমন কি, দুই এক হিন্দুতে পাঁঠা পর্য্যন্ত সির্ণী দেয়। এই সকল নৈবেদ্য দ্রব্য উৎসর্গ করিবার জন্য তাহারা দীঘির কূলে দাঁড়াইয়া কালাপাড় ধলাপাড়কে "আয় আয়" বলিয়া ডাকে, তখন কালাপাড় ধলাপাড়ের বংশধরেরা ঘাটের পার্শ্বে চারিদিক্ হইতে মাথা উচু করিয়া ভাসিতে থাকে এবং খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে অনেক সময় সিঁড়ির উপর আসিয়াও উহা লইয়া যায়। মৎস্যে খায়, কুমীরে খায়, তাহাতেই জীবভক্ত কীর্ত্তিমান্ খাঁ জাহানের পারলৌকিক তুষ্টি-সাধন হয়। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে ঠাকুর দীঘির কূলে একটি প্রকাণ্ড খাঞ্জালী মেলা হইয়া থাকে, বহু দূরবর্ত্তী স্থানের হিন্দু-মুসলমান এ মেলায় আসিয়া থাকে। যিনি সকল জাতিকে ভালবাসেন, তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন।

প্রবাদ আছে, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খাঁ জাহান ভগবানের নিকট কোথায় তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া-

খাঁজাহানের সমাধি মন্দির।
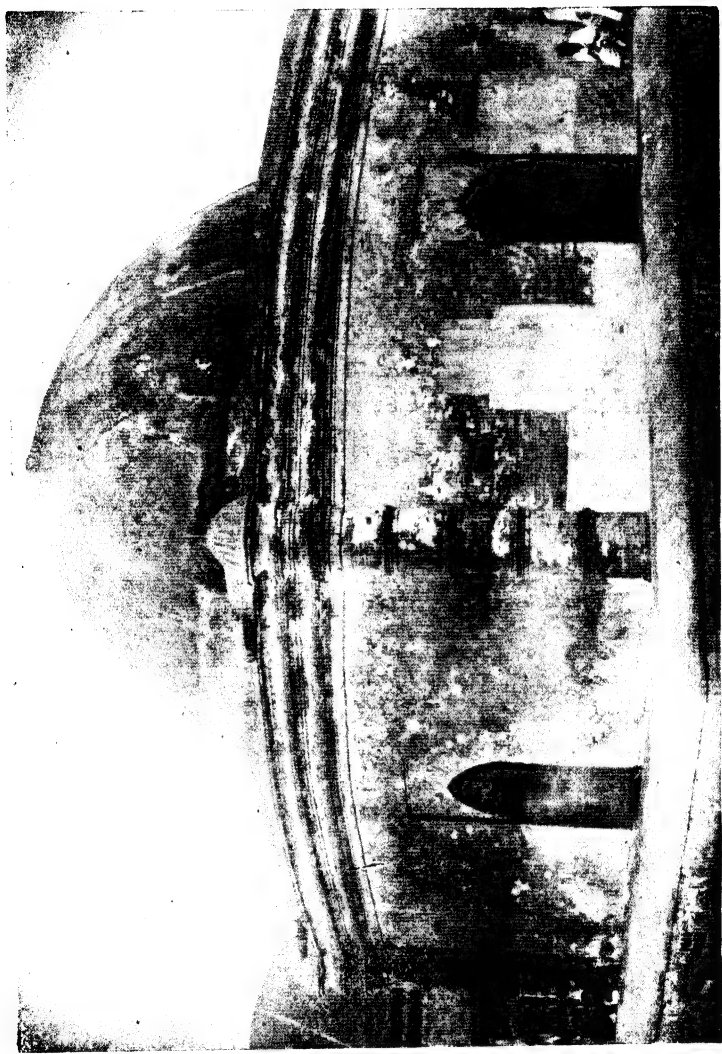
ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে ভগবান্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তিনি উক্ত দীঘি খনন ও তাহার উত্তর তীরে স্বীয় সমাধি-মন্দির স্থাপন করেন। হিন্দুর মত মুসলমানেরাও শবদেহ উত্তরশিয়রে রাখে, এবং কবরের মধ্যেও সেই ভাবে সমাহিত করে। এজন্য হিন্দু-মন্দিরের মত মুসলমানের সমাধি-মন্দির দক্ষিণদ্বারী হইয়া থাকে। ঠাকুর দীঘির ঘাট হইতে উপরে উঠিলে একটি বেষ্টনপ্রাচীরের ভিতর সুন্দর একটি একগম্বুজ এমারত দেখা যায়; উহারই মধ্যে খাঁ জাহান চিরনিদ্রায় অভিভূত। উক্ত বেষ্টনপ্রাচীরের বাহিরেও আর একটি প্রাচীর ছিল, এবং নগর হইতে সমাধিস্থানে আসিতে হইলে সেই বহিঃপ্রাচীরের তোরণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। এখন সে দ্বার ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সমাধি-মন্দির সমচতুষ্কোণ; উহার বাহিরের মাপ ৪৬´×৪৬´ ফুট। উহার চারিকোণে চারিটি স্তম্ভ দেওয়ালের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছ। উহারা মিনারের মত উচ্চ হইয়া উঠে নাই। খাঁ জাহান নিশ্চিতই জানিতেন, লবণাক্ত দেশে কোন অট্টালিকায় মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ ফুট পর্য্যন্ত লোণা ধরে; ঐ অংশে ভাল ইট দিলেও তাহা অল্প বিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইজন্য খাঁ জাহান তাঁহার সমাধি-মন্দিরকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, উহাতে মৃত্তিকা হইতে তিন ফুট উপর পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ প্রস্তরদ্বারা গাঁথাইয়া ছিলেন। এই সকল পাথর তিনি চট্টগ্রাম হইতে আনাইতেন। প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট প্রস্থ, এবং ৯ ইঞ্চি পুরু দেখা যায়। গৃহটির ভিত্তি ৮´—৩´´ ইঞ্চি। ইহার বাহিরের দেওয়াল চতুষ্কোণ বটে, কিন্তু ভিতরের দেওয়াল অষ্টকোণ। এই অষ্টকোণ দেওয়াল ২৪´ ফুট উচ্চ হইয়া সেখান হইতে একটি গোলাকার গুম্বজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুম্বজের উপরিভাগে নানাবিধ কারুকার্য্য করা ছিল। এখন কারুকার্য্য নাই। তবে গুম্বজের উপর জমাট এত শক্ত ও সুন্দর যে এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বিনা মেরামতে এই সমাধি-গৃহ এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে।

সমাধি-মন্দিরের দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তিনটি দরজা। উত্তর দিকে কোন দরজা নাই। দরজা গুলি ৬´—১০´´ বিস্তৃত। উহাদের উপর পাথর ছিল, পাথরের গায়ে সম্ভবতঃ এক একখানি করিয়া লোহাও ছিল। তাহা নষ্ট

হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হইতে এক একটি ৪″—২″ লোহার কড়ি বসাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-গৃহের মেজে রঙ্গীণ পাতলা ইষ্টক বা টালিতে মণ্ডিত ছিল। গৃহের মধ্যস্থলে খাঁ জাহানের সমাধি-মঞ্চ। প্রথমে মেজের উপর একটি ইষ্টকবেদী। এ বেদীটিও ঐরূপ টালি (tile) দ্বারা আবৃত ছিল; এখন টালি-গুলি নাই। এই ইষ্টকবেদীর উপর প্রথমতঃ একটি তাক ৬ থানি বড় বড় কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা গঠিত; তাহার উপর আর একটি পাথরের তাক, তাহাও ঐরূপ ৪ থানি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বোপরি একখানি অর্দ্ধগোলাকৃতি ৬′ ফুট দীর্ঘ সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর। এই শীর্ষ প্রস্তরখানি ও তাহার নিম্নবর্ত্তী দুই স্তরের প্রস্তরগুলি সকলই আরবী ও পারসীক লিপিতে সম্পূর্ণ সমাবৃত ছিল। লিপিগুলি খোদিত নহে; সকলগুলি সুন্দর ভাবে সযত্নে উৎকীর্ণ। এই লিপি-ভাস্কর্য্যে যে যথেষ্ট সময় ও শ্রমকৌশল লাগিয়াছিল, তাহাতে দ্বিমত নাই। আমরা ভাষান্তরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ লিপিগুলির সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। *

সমাধিবেদীর শীর্ষপ্রস্তরের উত্তরগাত্রে মুসলমান-ধর্ম্মের সেই চিরপ্রসিদ্ধ সার মত উৎকীর্ণ আছে ঃ—"ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; মহম্মদ তাঁহার রসুল (ধর্ম্মোপদেশক) বা প্রতিনিধি।" ঐ অর্দ্ধগোলাকৃতি প্রস্তরের উপরিভাগে প্রথম দুই লাইনে আছে ঃ—"হে ভগবান্! আমাকে সয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা কর; আমি তোমার দয়ার্দ্র, করুণাময় নামে আরম্ভ করিতেছি।" ইহারই নিম্নে উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান ১০৪ টি চতুষ্কোণক্ষেত্র দ্বারা পূর্ণ। উহার প্রথম ৫টি চতুষ্কোণের মধ্যে আছে ঃ—"ঈশ্বর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি"—- ইহারই পর অবশিষ্ট ৯৯টি চতুষ্কোণের মধ্যে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে এক একটি বিশেষণ শব্দ লিখিত রহিয়াছে। উহার সবগুলি এখানে অনূদিত করিবার প্রয়োজন নাই; কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—"রাজা রাজ-রাজেশ্বর, সত্য, নিত্য, অনন্ত, অমূল্য, অতুল্য, আদি, অন্ত, প্রকাশিত, জাগ্রত,

* মহামতি ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে কতকগুলি লিপির মূল ও ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। Westland's Report p. 22, Antiquities of Bagerhat by Babu G. D. Basak J. A. S. B. Vol 36, (1867-8) Mr, D. H. E. Snnder's Antiquities of Bagerhat.

গুপ্ত, লুপ্ত, রক্ষক, শাসক, পালক, স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, শ্রোতা, দর্শক, সর্ব্বব্যাপক, জ্ঞানী, ন্যায়বান্, বিচারক, বিবেচক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, পথের আলো, পথিকের সঙ্গী প্রভৃতি। এই ৯৯টি বিশেষণের নিম্নে লেখা আছে :—"ঈশ্বরের তুলনা নাই; তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা; তিনি (সকলের) তুষ্টিসম্পাদন করেন; তিনি সর্ব্বপ্রধান প্রভু, শ্রেষ্ঠ সহায়ক।" অর্দ্ধগোলাকৃতি পাথরের দক্ষিণের দিকে আরবীয় ভাষায় আছে :—"প্রধান পুরুষ, খাঁ জাহান আলির এই সমাধি স্বর্গীয় কাননের অংশবিশেষ। ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপালু হউন। ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জেলহজ্জ তারিখ।"

শীর্ষপ্রস্তরের নিম্নবর্ত্তী প্রস্তরের তাকের উপরিভাগে চারিধার ঘুরাইয়া লেখা আছে :—

"লুব্ধ লিপ্সা মমতায় ভুলি' ভগবান্,
সংসারচিন্তায় তুমি রয়েছ মগন;
সময় আসিবে যবে একথা ভাবিবে
মৃত্যু সন্নিহিত হ'লে এ চিন্তা জাগিবে;
আছয়ে নরক, তাহা ত্বরায় জানিবে,
নরক দর্শনে শেষে কষ্ট উপজিবে;
তোমার কাজেতে হ'বে তোমার বিচার
তাহাতে সন্দেহ নাই কিছু মাত্র আর।"

এই প্রস্তরপীঠের পূর্ব্বপার্শ্বে নিম্নলিখিত উপাসনা লিপিগত আছে :—

"হে জাগ্রত ভগবান্! তুমি অনন্ত, তুমি পাপীর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিয়া থাক; তুমি গৌরবময়, পবিত্র; তুমি রাজরাজেশ্বর, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি চৈতন্য-স্বরূপ; তুমি স্রষ্টা, তুমি স্বর্গমর্ত্ত্যের গঠনকর্ত্তা; আমাকে নরক হইতে নিস্তার কর।"

এই প্রস্তরপীঠের পশ্চিমপার্শ্বে আছে :—

"হে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা যাঁহাকে পূজা করিবে, আমি তাঁহাকে পূজা করিব না; আমি যাঁহাকে পূজা করিব, তোমরা তাঁহাকে পূজা করিবে না; তোমরা যাঁহাকে পূজা কর, আমি তাঁহার পূজা করি না; আমি যাঁহার পূজা করি, তোমরা তাহার পূজা কর না; তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের আছে এবং আমার ধর্ম্ম আমার আছে।"

এই প্রস্তরপীঠের দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ এবং তন্মধ্যে একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। চতুষ্কোণের চারিকোণে আরবীয় ভাষায় আছে ঃ—

কে মরিল———জনৈক প্রবাসী ;

তিনি মরিলেন— —(ধর্ম্মের জন্য) আত্মোৎসর্গ করিয়া।

বৃত্তটির মধ্যেও আরবীয় ভাষায় লিখিত আছে ঃ—

"যিনি ঈশ্বরের দাসানুদাস, যিনি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও কৃপাভিখারী, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধির (মহম্মদের) বংশধরগণের আত্মীয়, যিনি সুধীবর্গের প্রকৃত বন্ধু এবং অবিশ্বাসীর শত্রু, যিনি মুসলমানের সহায় এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নাম আলঘ খাঁ জাহান। (ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপাযুক্ত হউন)। তিনি ঊর্দ্ধতন (স্বর্গ) লোকের আশায় ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জেলহজ্জ বুধবারে এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৭শে জেলহজ্জ তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।"

ইংরাজীগণনানুসারে খাঁ জাহানের মৃত্যুতারিখ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর হইবে। খাঁ জাহান যে অত্যন্ত অধিক বয়সে জরাজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই প্রাণস্পর্শী স্বরচিত মর্ম্মগাথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজের লিপি নিজেই লিখিয়া গিয়াছিলেন, তারিখটি মাত্র অন্যলোকে পরে বসাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত প্রস্তুত না থাকিলে একদিনের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিমঞ্চ নির্ম্মাণ করা যায় না।

দুইটি পাথরের স্তরের উপর একখানি শীর্ষপ্রস্তর দিয়া খাঁ জাহানের সমাধি নির্ম্মিত হয়। উহার উপরিস্থ পাথরের স্তরের উপরিভাগে বা পার্শ্বদেশে যে সমস্ত লিপি আছে, আমরা তাহার কথা বলিয়াছি। নিম্নবর্ত্তী প্রস্তরপীঠেও এরূপ অনেক লিপি আছে। উহার অনেকগুলি একরূপ অস্পষ্ট বলিয়া এখনও পক্ষোদ্ধার হয় নাই। সাণ্ডার্স সাহেব সেগুলিকে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত পবিত্র ধর্ম্মগাথা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই নিম্নস্থ পাদপীঠেই দক্ষিণ-দিকে কয়েকটি সুন্দর তত্ত্ববাণী আছে। উহার কতক আরবীয়, কতক পারসীক ভাষায় লিখিত। আমরা কবিতায় উহার যথাযথ অনুবাদ প্রদান করিলাম ঃ—

"জগতে ক্রন্দন ল'য়ে খুলি' এজীবন,
কত বা যাতনা কষ্ট করে আক্রমণ!
পরীক্ষার নাহি পার জীবন ভরিয়া
(কিন্তু) সব শেষ করে শেষে মরণ আসিয়া।
মৃত্যুই নিশ্চিত, ভাই, মৃত্যুই নিশ্চয়,—
জীবন-উদ্যানে তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায়,
মরণ নিশ্চয়, ভাই, মরণ নিশ্চয়।
জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর,
অন্য শত্রু হ'তে এর প্রভেদ বিস্তর,
দুষ্ট সয়তান আছে অরাতি তোমার
ট'লাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার;
সকল সমাজে দেখি এই রীতি আছে—
দুর্ব্বল লভয়ে ক্ষমা সবলের কাছে;
ক্ষমা নাই—দয়া নাই—মৃত্যু দুর্নিবার,
মরণ নিশ্চিত, ভাই, আছয়ে সবার।"

জীবন্মুক্ত পুরুষের মত দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া ভক্ত সাধু যে উদাসপ্রাণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাধি-বেদীর নানা লিপিতে সেই উদাস ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তির সহিত তাহার এই মৃত্যুনীতির মিলন করিয়া বহুদর্শক তাহার সমাধি গাত্র হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারেন।

খাঁ জাহানের সমাধিমন্দির হইতে পশ্চিমের দরজা দিয়া বাহির হইলেই পীর আলি মহম্মদ তাহেরের সমাধি। ইনি খাঁ জাহানের উজীর বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পীরালি ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্তে ইঁহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মহম্মদ তাহের এখানে মারা যান নাই; এখানে মাত্র তাহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাথা রহিয়াছে। খাঁ জাহানের সমাধির মত উহার উপরে কয়েকটি লিপি আছে; আর আছে:—"এই স্থান স্বর্গীয় কাননের অংশবিশেষ এবং ইহা এক বিশেষ বন্ধুর সমাধি, তাহার নাম মহম্মদ তাহের, তারিখ ৮৬৩ জেলহজ্জ।" বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ব্বে সেই একই জেলহজ্জ মাসে মহম্মদ তাহেরের জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান।

সমাধির উপরিভাগটি প্রায় খাঁ জাহানের সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছু নাই, একটি সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।

পীর আলির সমাধি পার হইলেই মধ্যবর্ত্তী বেষ্টনপ্রাচীর শেষ হইল। তাহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড এক গুম্বজ ইষ্টকগৃহ আছে; উহাকে বাবুর্চিখানা বা রন্ধনশালা বলা হয়। খাঁ জাহান শেষ জীবনে যখন সমাধিমন্দিরে বাস করিতেন, তখন তিনি প্রত্যহ অসংখ্য দীন দুঃখী বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইতেন। উহাদের জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি বহুসংখ্যক বাবুর্চি এই গৃহের মধ্যে প্রস্তুত করিত। ইহা এখনও ভাল অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার বাহিরের মাপ ৪০´×৪০´; ভিতরের মাপ ২৬´×২৬´ ফুট, ভিত্তি ৭ ফুট। গৃহটির পশ্চিমে কোন দরজা নাই; উত্তরে দক্ষিণে একটি করিয়া দরজা আছে এবং পূর্ব্বদিকে আছে তিনটি, উহার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী দুইটির প্রত্যেকের বিস্তার ৩´—৬´´ ইঞ্চি এবং মধ্যবর্ত্তী বড় দরজাটির বিস্তার ৬´ ফুট; উত্তর দক্ষিণের দরজার প্রত্যেকের বিস্তার ৪´—১০´´ ইঞ্চি। গুম্বজের উচ্চতা প্রায় ৩৬´ ফুট।

বাবুর্চিখানা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঠাকুরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে একটি মস্‌জিদ আছে, উহাকে জেন্দাপীরের মস্‌জিদ বলে। এই জেন্দাপীর খাঁ জাহানের একজন প্রিয় অনুচর এবং বিখ্যাত বুজরুক ছিলেন। খাঁ জাহান নিজে যেমন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি অন্য কোন ফকিরকে সেইরূপ বুজরুকীতে পারদর্শী দেখিলে, তাহাকে আনিয়াও নিজের দলভুক্ত করিয়া লইতেন। প্রবাদ আছে, তিনি চাঁদ খাঁ, বাঘ খাঁ নামক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দুই ভ্রাতাকে ফরিদপুর হইতে আনাইয়া খালিফাতাবাদের নিকটবর্ত্তী ধোপাখালি গ্রামে বসতি করাইয়া ছিলেন। জেন্দাপীরও এইরূপ একজন প্রিয় সদস্য। জেন্দাপীর তাঁহার নাম নহে, ইহা একটি উপাধি মাত্র। এই ফকিরের প্রকৃত নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। শ্রীহট্টে সাহ জালালের সঙ্গী শিষ্যগণের মধ্যেও এক জেন্দাপীর ছিলেন, দেখিতে পাই; শ্রীহট্টে জিন্দা বাজার ইঁহারই নামে স্থাপিত। খাঁ জাহানের জেন্দাপীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আছে; তন্মধ্যে একটি এখানে দেওয়া যাইতেছে। কথিত হয়, জেন্দাপীর এমনই ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন যে প্রতিরাত্রিতে নমাজের পর তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পাইতেন এবং প্রত্যহ

প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এই সমস্ত অর্থ পুণ্যকর্ম্মে ব্যয়িত করিতেন ; সঞ্চয়ার্থ কিছুই রাখিতেন না। একদিন তাঁহার স্ত্রী ঐ অর্থ হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন ; তাহার পর হইতে সেরূপ ঈশ্বরদত্ত অর্থপ্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেল। তাহার কয়েকদিন পরেই পীর সাহেব একখানি কোরাণ হাতে লইয়া, উহা পাঠ করিতে করিতে, কবরে প্রবেশ করেন, আর উঠেন নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে অদ্যাবধিও তিনি সেই কবরমধ্যে কোরাণ পাঠে নিরত আছেন ; নিষ্ঠবান্ মুসলমানগণ সে পাঠধ্বনি শুনিতে পান।

যে সকল কীর্ত্তিচিহ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া গেল, তাহা ব্যতীত আর শত শত চিহ্ন সমস্ত খালিফাতাবাদে যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। সে সকলের প্রকৃত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হয় নাই। যেথানে এক্ষণে বাগের-হাট সহর, এখানে খাঞ্জালীর বাগান ছিল ; উত্তরকালে সেই বাগানে যে হাট বসিয়াছিল, তাহাই বাগেরহাট নামে অভিহিত হয়। বাগেরহাট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক অনুমান আছে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫ মাইল এর উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল, এই বিস্তৃত স্থান লইয়া প্রাচীন খালিফাতাবাদ সহর হইয়াছিল ; সহরকে হাবেলী কস্‌বাও বলিত। খালিফাতাবাদ সহর বহু বিস্তৃত পরগণা ছিল। খালিফাতাবাদ সহর এক্ষণে বাগেরহাট, দশানি, কৃষ্ণনগর, বাসাবাটী, কাড়াপাড়া, রণবিজয়পুর, কাঁটাল, কাঁটালতলা, বাদামতলা, সুন্দরের ঘোনা বারাকপুর, মগরা প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রামে বিভক্ত হইয়াছে।

খাঁ জাহান প্রথম জীবনে যেরূপ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন, শেষভাগে বোধ হয় তাহা ছিল না। তখন সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর মামুদ সাহের সহিত তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, বঙ্গীয় সুলতানের প্রতিনিধি-স্বরূপ তিনি রাজ্যস্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, খালিফাতাবাদ অর্থাৎ খালিফা বা প্রতিনিধির সংস্থাপিত নবোত্থিত রাজ্য। খাঁ জাহান প্রকাশ্য-ভাবে স্বাধীন হইয়া যে রাজ্যশাসন করেন নাই, তাহার কয়েকটি প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ তিনি নিজ নামে কোন মুদ্রা অঙ্কিত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ঢাকায় একটি মস্‌জিদের দ্বারদেশে যে খাজা জাহানের নামাঙ্কিত লিপি পাওয়া গিয়াছিল, তিনি এবং খালিফাতাবাদের খাঁ জাহান অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

সে লিপির মর্ম্মার্থ এই যে উক্ত মস্‌জিদ মামুদ সাহের রাজত্বকালে খাজা জাহান নামধেয় এক খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। * উহাতে যে তারিখ আছে, তাহা ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে খাঁ জাহান বঙ্গেশ্বর মামুদ সাহের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ নাসির উদ্দীন মহম্মদ সাহের ৪৫৮ হিজরী বা ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত একটি মুদ্রায় প্রথম আমরা মধুমতীর কূলবর্ত্তী মামুদাবাদের উল্লেখ পাই। সুতরাং মামুদসাহই উক্ত মামুদাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা অনুমিত হইতে পারে। † সুতরাং এতদঞ্চলে মামুদসাহের রাজ্য ছিল। চতুর্থতঃ মামুদসাহের পর তৎপুত্র বার্ব্বাক সাহ বঙ্গেশ্বর হন। সুন্দর বনের মধ্যে, বরিশালের অন্তর্গত পটুয়াখালি সব্‌ ডিভিসনে মস্‌জিদবাড়ী নামক স্থানে একটী প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত মস্‌জিদ আছে। উহাতে যে একখানি পারস্যলিপি ছিল, তাহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ লিপির মর্ম্ম এই "ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াছেন, যিনি একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবেন ঈশ্বর তাঁহার জন্য ৭০টি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এই মস্‌জিদ সুলতান মামুদসাহের পুত্র, ধর্ম্ম ও রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আবুল মুজঃফর বার্ব্বাক সাহের রাজত্বকালে, ৪৭০ হিজরীতে (১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ), মুয়াজ্জম উজিল খাঁ দ্বারা নির্ম্মিত হয়।" ‡ সুতরাং খালিফাতাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলও যে বার্ব্বাকসাহের শাসনাধীন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খাঁ জাহানের মৃত্যুর পর, খালিফাতাবাদ রাজ্য খাঁ জাহানের কোন সুযোগ্য অনুচরের হস্তে শাসনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে অনেকে বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত ফকিরেরা বংশানুক্রমে খাঁ জাহানের সমাধি-গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং তজ্জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিবৃত্তি ভোগদখল করিতেছেন।

---

* H. Blochmann. Notes on Arabic and Persian Inscriptions, J. A. S. B. Part I pp. 107-8.

† Indian Museum catalogue Vol. II p. 164; Jessore Gazetteer p. 25.

‡ J. A. S. B. (1860) Vol. IV. p. 406.
Beveridge's History of Bakarganj p. 39.

অষ্টম পরিচ্ছেদ—হুসেন সাহ।

বঙ্গেশ্বর মামুদ সাহের মৃত্যুর পর (১৪৬০) তৎপুত্র বার্ব্বাক সাহ কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম আবিসিনীয় বা হাবসী দাস ও খোজা-দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। হাবসীদিগের দ্বারা একদল উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গঠিত হইয়াছিল। ইহারা নগররক্ষী ও শরীর-রক্ষী রূপে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। সুযোগ পাইয়া দলে দলে হাবসীগণ গৌড়ে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং নগরে বিষম অশান্তির সৃষ্টি হইল।* বার্ব্বাকের বংশধরেরা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর পারিলেন না। হাবসী খোজাগণ অন্দরে প্রবেশ লাভ করিয়া স্বেচ্ছামত প্রভুহত্যা করত যাহাকে ইচ্ছা রাজতক্তে বসাইতে লাগিল। ইহাদের অত্যাচারে অনবরত গুপ্তহত্যা চলিল। অবশেষে তাহারা রাজবংশ নিপাত করিয়া আপনাদের একজনকে রাজসিংহাসনে বসাইল; তখন দেশময় এক ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন সাহ এই অরাজকতা হইতে দেশের উদ্ধার সাধন করেন।

হুসেন সাহের ত্রিংশবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল বঙ্গেতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। দেশে শান্তি, প্রজার সমৃদ্ধিবৃদ্ধি এবং সাহিত্য ও ধর্ম্মের উন্নতি— ইহাই এ যুগের প্রকৃতি। দুঃখ কষ্টের মধ্যে কোন সুখশান্তিময় যুগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, যশোহর-খুল্‌নার লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, "সে হুসেন সাহের আমল আর নাই।" মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত পাঠানযুগে হুসেন সাহের রাজত্ব। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও ধর্ম্মপ্রচারে এই যুগে বঙ্গ পবিত্র হইয়াছিল। আর সে পবিত্র ধর্ম্মের উৎসাহদাতা হইয়া হুসেন সাহ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তাই জনৈক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত হসন, জগতভূষণ, সেহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগপুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান॥"

---

* Through caprice of fortune these low foot soldiers for a considerable time played an important part in the state "Ain-i-Akbari, Jarret, Vol. II p. 149. "ফেরিয়া ডি সোসা"র ইতিহাসে এ যুগের জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড়ের ইতিহাস ১০০ পৃঃ।

এই হুসেন সাহ কে? তিনি পূর্ব্বোক্ত মামুদ সাহের বংশধর নহেন, তাহা জানি। হাবসীবংশীয় মুজঃফর সাহ যখন গৌড়ের রাজা, তখন হুসেন রাজ-সরকারে উজীর ছিলেন। মুজঃফরের ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হয়, হুসেন ছিলেন তাহার নেতা। কিন্তু সহজে মুজঃফর দমিত হন নাই। চারিমাসকাল অজস্র রণরঙ্গ ও নরহত্যা চলিয়াছিল, তৎপরে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলে সকলে মিলিয়া হুসেনকে রাজা করিল; * তখন তাঁহার নাম হইল, সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহ। এই সর্ব্বজনপ্রিয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি রণকুশল উজীর কে? তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমরা সেই অন্ধকারের মধ্যে দুই একটী আলোকপাত করিতে পারি; এবং তাহারই ফলে দেখা যাইবে, গৌড়েশ্বর হুসেনের সহিত যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের কিছু সম্বন্ধ আছে।

রিয়াজ-উস্-সালাতিন হইতে আমরা জানিতে পারি হুসেন সাহ তুর্কিস্তানের অন্তর্গত তরমুজ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আসরাফল হুসেনী। † তিনি মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশীয় এবং হুসেনী শাখার অন্তর্গত। আসরাফল বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কানগরের সরিফ বা নগরপাল ছিলেন, এজন্য হুসেন সাহকে সরিফ-ই-মেকি (মক্কী) বলিত। ঘটনাক্রমে আলাউদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতা ইউসফ পিতার সহিত বঙ্গদেশে আসেন। প্রবাদ আছে, যখন তাঁহারা বঙ্গে আসেন, তখন তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল এবং হুসেনের বয়সও খুব কম। কেহ বড়লোক হইলে, তাহার শৈশব-জীবনের অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। হুসেন অতি সামান্য অবস্থা হইতে এত বড়লোক হইয়াছিলেন, যে তাঁহার শৈশবের কথা শেষে একপ্রকার লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গে আসিবার পর কোন আকস্মিক বিপদে হুসেনের

---

* 'During the period of his vizarat he used to treat the people with affability. The nobles looked upon him as their friend, patron and sympathiser; when Mujaffar was slain, people selected syed Sheriff Maki to be their king". Riaz-us-Salatin.

† গৌড়ের কদম রসুল মস্‌জিদে ৯৩৭ হিজরী বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হোসেনের পিতার নাম আছে। J. A. S. B. (1892) p. 338.

পিতার মৃত্যু হয় এবং বালকেরা নিঃসহায় অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লয়। জনশ্রুতি আছে, হুসেন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালী করিতেন। * এই ব্রাহ্মণ শেষে হুসেনের কৃপায় বলশালী হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজপুকুরিয়ায় রাজার মত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল জমিদারের মত বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের নাম রামচন্দ্র খান। বেনাপোল রেলওয়ের ষ্টেশনের অনতিদূরে রামচন্দ্রের বাটীর বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা পরে তাঁহার কথা বলিব।

এদেশে কতকগুলি মামুলী গল্প আছে। হঠাৎ যদি কেহ নীচ অবস্থা হইতে বড়লোক হন, তবে তাঁহার শৈশবকালে দেখা যায়, তিনি কোথায়ও নিদ্রিত হইলে সর্পে আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া দান করে। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন গঙ্গু হইতে আরম্ভ করিয়া কত শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৃপতিদিগের বাল্যেতিহাসে এই চিরাগত গল্প একই ভাবে আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র একদা দেখিলেন, তাঁহার গো-রাখাল হুসেন প্রান্তরে এক বৃক্ষতলে নিদ্রিত রহিয়াছে, তাহার মস্তকের উপরে দুইটি সর্পে ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়া রহিয়াছে; তদবধি তিনি বুঝিলেন বালকের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, এজন্য তিনি নিরাশ্রয় বালককে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হুসেন সে স্নেহের মূল্য কড়া-গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন। হুসেন রামচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতেই সম্ভবতঃ খাঁ জাহান আলি তাঁহার উচ্চবংশের পরিচয় অবগত হন এবং তাঁহাকে খালিফাতাবাদ লইয়া যান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাঁ জাহানের সময়ে অনেক উচ্চবংশীয় সৈয়দ প্রভৃতি মুসলমানগণ তাঁহার সহিত বঙ্গে আসেন। উহাদের কতক প্রথমতঃ পয়ঃগ্রামে বাস করেন; খাঁ জাহান খালিফাতাবাদে গেলে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে তথায় গিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে কয়েক ঘর খুল্‌না জেলার আলাইপুরের সন্নিকটে চাঁদপুরে বাস করেন। তাঁহারা খাঁ জাহানের শাসনাধীনে বিচারকের কার্য্য করিতেন। এজন্য তাঁহাদিগের "কাজি" উপাধি হইয়াছিল। এক্ষণে এই বংশীয়েরা "আলাইপুরে কাজি" বলিয়া খ্যাত। খাঁ জাহানের শেষ জীবনে বা

* কেহ কেহ এই ব্রাহ্মণের নাম চাঁদ ঠাকুর ও তাহার বাড়ী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চাঁদপাড়ায় ছিল বলিয়া গল্প শুনিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারা গৌড়ে গিয়া প্রতিপত্তির সহিত কাজির কাজ করিতেন। চাঁদপুরের কাজিগণ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। অধ্যাপকের টোলের মত তাঁহাদের বাড়ীতে বহু ছাত্র থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত। খাঁ জাহান হুসেনের শিক্ষাবিধানের জন্য তাঁহাকে চাঁদপুরে কাজিদিগের বাড়ীতে রাখিয়া দেন। অল্পদিন মধ্যেই হুসেন বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অবশেষে তাঁহার উচ্চবংশীয়তার পরিচয় পাইয়া কাজিদিগের মধ্যে একজন তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন।*

চাঁদপুরের অবস্থান লইয়া অনেক তর্ক আছে। ব্লকমান সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে খুল্‌নার পূর্ব্বদিকে ভৈরবতীরে আলাই-পুরের সন্নিকটেই চাঁদপুর অবস্থিত। আল্লাউদ্দীন হুসেনের নামানুসারে আলাই-পুরের নাম হইয়াছে। † প্রাচীন ম্যাপে আলাইপুরের নাম থাকুক বা না থাকুক, তৎসন্নিকটে চাঁদপুর বা চাঁদের বাজারের নাম আছে। আলাইপুর হইতে এক-মাইল পূর্ব্বদিকে গেলেই চাঁদের বাজার, উহার অপর পারে অর্থাৎ ভৈরবের উত্তরপারে চাঁদপুর নামক গ্রাম। উহার একাংশে এখনও "কাজিডাঙ্গা" নামক স্থান আছে। সেখানে ২১টি পুকুর এবং ভগ্ন মস্‌জিদাদির ইষ্টকস্তূপ আছে, কিন্তু এক্ষণে তথায় কোন মুসলমানের বাস নাই। ঐস্থানে এক্ষণে কয়েক ঘর মুচি বাস করিতেছে। কাজিডাঙ্গা এক্ষণে ঘাটভোগের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। কাজিডাঙ্গার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে চাঁদপুরের মুসলমানগণের মধ্যে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কাজিডাঙ্গায় কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস ছিল; উহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে বিল এবং অন্য দুইদিকে গড়খাই ছিল।

---

* "The cazy of Chandpore, having been informed of his illustrious descent, gave him his daughter."

Stewart's History of Bengal p. 126.

† J. A. S. B. (1873) p. 228 note.

"Professor Blochmann is inclined to identify the Chandpore in question near Alaipur or Alauddins town on the Bhairab, east of Khulna in the Jessore District as the place where the Hossain Dynasty of Bengal independent kings, had its adopted home."

Riuz-us-Salatin edited by A. Salam p. 48 note.

এখনও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গড়ের বাহির হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা প্রান্তর ও গ্রাম পার হইয়া, ভৈরবের কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও ঐ রাস্তার অনেক স্থান নিকটবর্ত্তী লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তবুও একটু যত্ন করিয়া দেখিলে সোজা প্রশস্ত রাস্তাটি বাহির করা যায়। এত প্রশস্ত পথ সাধারণ কোন গ্রামে নাই। প্রবাদ আছে, হুসেন সাহ গৌড়েশ্বর হইবার পরেও অনেকবার চাঁদপুর আসিয়াছিলেন, তথন তাঁহার রাজতরণী আসিয়া উক্ত রাস্তার মাথায় ভৈরবের ঘাটে লাগিত; তাম্রকূট-সেবননিরত গল্পরসিক বৃদ্ধ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সেস্থান প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু গল্প বলিয়াই ইহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সাধারণ লোকের মধ্যে বহু পুরুষ ধরিয়া যে গল্প চলিয়া আসিতেছে, তাহার অতিরঞ্জনের অন্তরালে কিছু সত্য কথা নিহিত থাকে। এই গল্পের সহিত অন্যান্য ঘটনার সামঞ্জস্য সাধিত হইলে, একটা সজীব তথ্য স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক উপাদান-রূপে গৃহীত হইতে পারে।

কাজিভাঙ্গায় এক্ষণে কাজিদিগের বসতি নাই বটে, কিন্তু তথাকার কাজিগণ খুল্না সহর বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছেন এবং এখনও তাঁহারা এতদঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত বংশ বলিয়া বিশেষিত হইয়া থাকেন। হুসেন সাহের সহিত সম্বন্ধসূত্র তাঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। হুসেন সাহ, তাঁহার ভ্রাতা ইয়ুসফ, পুত্রদ্বয় নসরৎসাহ ও মামুদসাহ এই চারিজনের নামে যশোহর-খুল্নার প্রধান চারিটি পরগণার নাম হইয়াছে। খালিফাতাবাদ অঞ্চলে যে হুসেন সাহের সম্বন্ধ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ আছে। খাঁ জাহানের সহরে হুসেন সাহের প্রকাণ্ড মস্জিদ ও দীঘি আছে। বর্ত্তমান বাগেরহাট সহর হইতে পশ্চিমমুখে তুই মাইল গেলে, ডানদিকে যে সুন্দর দশগুম্বজ মস্জিদ আছে, উহাই হুসেন সাহের মস্জিদ। উহার ভিতরের মাপ ৬৩´ × ২৪´ ফুট; প্রতি গুম্বজের তলদেশের মাপ ১২´ × ১২´ ফুট; এক এক সারিতে ৫টি করিয়া গুম্বজ। প্রাচীরের ভিত্তি ৬´—৩´´ ইঞ্চি। মস্জিদের সন্নিকটে প্রকাণ্ড দীঘি। স্থাপত্য বিষয়ে এই মস্জিদ খাঁ জাহানের অন্য কোন মস্জিদ অপেক্ষা ভিন্ন নহে; একই উপাদানে একই প্রকার স্থপতির হাতে গড়া। সম্ভবতঃ ইহা খাঁ জাহানের মৃত্যুর প্রাক্কালে বা অব্যবহিত পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হুসেন সাহ গৌড়েশ্বর হইলে তাঁহার প্রভুত্ব প্রথমে তাঁহার এই পূর্ব্ব পরিচিত প্রদেশেই

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ দেখা গিয়াছে, তাঁহার প্রথম মুদ্রা ফতেহাবাদ বা ফরিদপুরের টাঁকশালেই মুদ্রিত হয়।* হুসেনের রাজত্বকালে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎসাহ খালিফাতাবাদের টাঁকশাল হইতে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। কেহ বলেন নসরৎসাহ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া কিছুকাল খালিফাতাবাদে বাস করেন, তখনই স্বনামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় না; সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে হুসেন সাহ পুত্রকে পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিবার এবং নিজ নামে মুদ্রাঙ্কনের ভার দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে যে একুশটি স্থানে টাঁকশাল ছিল বলিয়া জানা যায়,† খালিফাতাবাদ তাহার অন্যতম খালিফাতাবাদের তিন প্রকার রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহার দুইটি নসরৎ সাহের নামাঙ্কিত এবং তৃতীয়টি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্ত্তী সুতলান, আবুল মুজঃফর মামুদসাহের (তৃতীয় মামুদসাহ) নামাঙ্কিত। প্রথম দুইটির তারিখ ৯২২ হিজরী বা ১৫১৬-৭ খৃষ্টাব্দ এবং তৃতীয়টির তারিখ ৯৪২ হিজরী বা ১৫৩৫-৬ খৃষ্টাব্দ। প্রথমটির ওজন ১৫৪ গ্রেণ এবং আকার এক ইঞ্চি অপেক্ষা কিছু কম অর্থাৎ $\frac{৯}{১০}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট; দ্বিতীয়টির ওজন ১৬৩$\frac{১}{২}$ গ্রেণ ও ব্যাস ১ ইঞ্চির কিছু অধিক; তৃতীয়টির ওজন ১৬৮ গ্রেণ এবং ব্যাস ০৯৮ অর্থাৎ ১ ইঞ্চির কিছু কম। এই তিন প্রকার মুদ্রাই কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।‡

---

* "Hussein first obtained power in the adjacent district of Faridpur or Fathahabad, where his first coin was struck in in 899 A. H." Riaz-us-Salalin p. 129 (note).

† স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বকালে বঙ্গে নিম্নলিখিত ২১টি স্থানে টাঁকশাল ছিল:—লক্ষ্ণৌতি (গৌড়), ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), সোণার গাঁও, মুয়াজ্জামাবাদ (সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ), সহরিনো (গঙ্গাতীরে), গিয়াসপুর (গৌড়ের সন্নিকটে), ফতাহাবাদ (ফরিদপুর), হুসেনাবাদ, খালিফাতাবাদ (বাগের হাট), মুজঃফরাবাদ (পাণ্ডুয়ার সন্নিকটে), চট্টগ্রাম, মহম্মদাবাদ (২টি), আরকাণ, তাণ্ডা, রোটাসপুর, জিন্নতাবাদ (গৌড়), নসরতাবাদ, বার্ব্বাকাবাদ, চালিস্তান (কামরূপের সন্নিকটে)। ইহার মধ্যে সুলতান হুসেন সাহই ৬।৭টি টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যশোহর খুল্‌নায় নানাস্থানে এখনও যথেষ্ট সংখ্যক হুসেনসাহী মুদ্রা পাওয়া যায়।

‡ Stalics Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta" by H. Nelson wright, Vol II. pp 135-40.

নসরৎ সাহের মুদ্রা

মামুদ সাহের মুদ্রা

খালিফাতা বাদের মুদ্রা

[৩৪৭ পৃঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রায় পারস্যভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই ঃ—

প্রথম পৃষ্ঠ—"রাজা, রাজতনয়, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান্ এবং ধর্ম্মভীরু আবুল, মুজঃফর,"—

অপর পৃষ্ঠ—"নসরৎ সাহ, রাজা, হোসেনীবংশীয় রাজা হুসেন সাহের পুত্র। জগদীশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার রাজ্য রক্ষা করুন। খালিফাতাবাদ, ৯২২।"

তৃতীয় প্রকার মুদ্রায়ও ঐরূপ আছে। প্রথম পৃষ্ঠ—"রাজা, রাজতনয়, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান্ ও ধর্ম্মভক্ত আবুল মুজঃফর মামুদ, খালিফাতাবাদ, ৯৪২"—

অপর পৃষ্ঠ—"সাহ. রাজা, সুলতান হুসেন সাহের পুত্র, জগদীশ্বর তাঁহাকে, তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব রক্ষা করুন।"

এই মুদ্রা হইতে জানা যায় যে খালিফাতাবাদ অঞ্চলের সহিত হুসেন ও তদ্বংশীয়দিগের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আবার মাতুলালয়ের মত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কাহারও সহিত হয় না। নসরৎ সাহ পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে কেন সমস্ত দেশ ছাড়িয়া এ প্রদেশে আসিয়া থাকিতেন, তাহাও ইহা হইতে অনুমান করা যায়। স্থানীয় লোকে চাঁদপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আলাইপুর, খোজাডাঙ্গা, সামন্তসোণা, কাজিদিয়া, হোসেনপুর, ইউসফপুর প্রভৃতি গ্রামের সহিত হুসেনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। * তাঁহার সৈন্যেরা যেখানে শিবিরবদ্ধ ছিল, তাহাই কাজিদিয়া; কাজিদিয়া শব্দের ঐরূপ অর্থও আছে। † হুসেনের কোন আত্মীয়ের বাড়ী ছিল বলিয়া একটি গ্রামের হোসেনপুর নাম হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি একত্র পর্য্যালোচনা করিলে হুসেন সাহের সহিত চাঁদপুরের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। চাঁদপুর হইতে হুসেন পরে গৌড়ের রাজসরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ যে উজীর হইয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গী সব্ ডিভিসনের মধ্যে 'এক আনা

---

* সামন্তসোণায় ৪০ বিঘা জমিতে হুসেনের এক গড় ছিল। বর্ত্তমান মুন্সী খয়রাতুল্যা সর্দ্দারের প্রপিতামহ সমস্ সর্দ্দার ঐ গড়ে বাস করিতেন, শুনা যায়।

† "সহিদ-ই-কারবোলা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

চাঁদপাড়া' নামে একটি গ্রাম আছে। এইস্থানে সুবুদ্ধিরায় নামক একজন সমৃদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। কথিত আছে নবাব সরকারে প্রবেশ লাভের পূর্ব্বে হুসেন এই সুবুদ্ধিরায়ের বাড়ীতে কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা সুবুদ্ধি একটি দীঘি খনন করিতেছিলেন, উহার তত্ত্বাবধানকর্ম্মে তিনি যুবক হুসেনকে নিযুক্ত করেন এবং পরে কোন দোষ পাইয়া তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। * হুসেন গৌড়েশ্বর হওয়ার পরে, পূর্ব্ব প্রভু সুবুদ্ধিরায়কে চাঁদপাড়া গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; যবনের দান লইতে সুবুদ্ধি রায় অস্বীকৃত হইলে, হুসেনই উহার এক আনা মাত্র কর ধার্য্য করিয়া দেন। তদবধি ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে, এক আনা চাঁদপাড়া। হুসেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে চাবুকের কথা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইলে কোন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাহা দেখিতে পান। তখন স্ত্রীর প্ররোচনায় হুসেন সুবুদ্ধিরায়কে জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন। হুসেন চাঁদপুরে কাজির কন্যা বিবাহ করেন এবং পরে চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধিরায়ের চাকরী করেন। কেহ কেহ ইহা হইতে চাঁদপুর ও চাঁদপাড়া অভিন্ন গ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; এজন্য কাজির কন্যার নিকট চাবুকের ব্যাপারটা অনেকদিন পরে জানিতে পারা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা হইয়াছে। * বাস্তবিক চাঁদপুর ও চাঁদপাড়া এক গ্রাম নহে। চাঁদপুর খুল্‌না জেলায় এবং চাঁদপাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হয়ত চাঁদপাড়া গ্রামে চাঁদপুরের কাজিদিগের কোন পরিচয়সূত্রে, হুসেন তথায় যাইতে পারেন। তথা হইতে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হন। সৈয়দ বংশীয়দিগের রাজত্বকালেই তিনি রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ভাগ্য ও প্রতিভার পথ সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত থাকে। তাই গোপালন-নিরত নগণ্য বালক স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন গৌড়ের রাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়া বিশালবিস্তীর্ণ রাজ্য রামরাজ্যের মত শাসন করিয়াছিলেন। সে রাজ্য শুধু বঙ্গে

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী।
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল,
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।" চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

সুবুদ্ধিরায় গৌড়াধিপ ছিলেন না ; "গৌড় অধিকারী" পাঠ বোধ হয় ঠিক নহে। রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে ২০৩ বৎসরের অধিক প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহাতে গৌড় শব্দ নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৩৮৬ পৃঃ।

সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আরাকাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—সর্ব্বত্রই প্রজারা তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম, উদার শাসনপ্রণালী এবং উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইত। এই বিখ্যাত নরপতির বাল্যলীলা-ভূমিরূপে খুল্‌নার কিছু গৌরব করিবার আছে। উহাই আমরা এখানে আলোচনা করিয়াছি, নতুবা তাহার রাজত্বের বিস্তৃতবিবরণী প্রদান করা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

—০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ—রূপসনাতন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গেরও একটা বিশেষত্ব আছে। মহারাষ্ট্রের বিশেষত্ব শিবাজী, রাজপুতনার বিশেষত্ব বীরত্ব, পঞ্জাবের শিখনীতি, অযোধ্যাদি প্রদেশের রামকথা, বিহারের জৈনবৌদ্ধ-বিহার আর বঙ্গের বিশেষত্ব চৈতন্যধর্ম্ম। জগতে যাহা কেহ কখনও শুনায় নাই, বঙ্গদেশ চৈতন্যের মুখে ভগবানের সেই নামের মহিমা শুনাইয়া, বহুদেশের চৈতন্য-সম্পাদন করিয়াছে। অস্ত্রেশস্ত্রে নহে, শাস্ত্রতর্কে নহে, বঙ্গ শুধু অশ্রুপাতে নামানুকীর্ত্তনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রেম বঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করিয়া চৈতন্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। আর সে রূপের মহিমায় শিক্ষা দীক্ষা, শাস্ত্র ইতিহাস, তান্ত্রিক বামাচার, মায়াবাদীর শুষ্কতর্ক ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে দীনা বঙ্গভাষা সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গের মত প্রবলতা ও পবিত্রতা পাইয়া ধন্য হইয়াছিল; আর বাঙ্গালীর জাতীয়তা এক নবপ্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া ভারত প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছিল।

কোন নদীর স্থানবিশেষে জলোচ্ছ্বাস হইলে, তাহার নাম বাণ; আর পার্ব্বত্য জলোচ্ছ্বাস যখন নদীর দু'কূল ছাপাইয়া দেশ ভাসাইয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার নাম বন্যা। স্থানবিশেষে প্রচলিত অবস্থার বিপক্ষে মুষ্টিমেয় লোকের যে উত্থান তাহার নাম বিদ্রোহ; আর সমস্ত দেশ ভরিয়া প্রতিষ্ঠিত অবস্থার বিরুদ্ধে অগণিত জনসংঘের যে আন্দোলন, তাহার নাম বিপ্লব। বাণের মত বিদ্রোহ স্থানিক ও সাময়িক; বন্যার মত বিপ্লব দেশব্যাপী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিদ্রোহের

মূল বাহ্যিক কিন্তু বিপ্লবের কারণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে। পাঠানযুগে বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে যে বিবাদ, তাহা বিদ্রোহের সংজ্ঞাভুক্ত; আর হুসেন সাহের আমলের সুবর্ণযুগে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক যে দেশময় ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল, তাহা বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে সমস্ত ইয়ুরোপের গতিমতি ফিরাইয়া দিয়াছিল, চৈতন্য বিপ্লবে বঙ্গকে এক নূতন ছাঁচে গড়িয়াছে। কিন্তু চৈতন্য যে বিপ্লবের প্রবর্ত্তক, তাহার পথ বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইতেছিল। চৈতন্যের জন্মে নবদ্বীপ পবিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু শত শত চৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গের প্রতিবিভাগ তখন সে আন্দোলনের পোষকতা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। নগণ্য যশোহর-খুল্‌নাও তখন সে যজ্ঞের আহুতি দিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। চৈতন্য কেন্দ্রমূর্ত্তি হইলেও, রূপসনাতন বা হরিদাসের মত তাঁহার ভক্ত পার্ষদগণ যে তাঁহার পার্শ্বদেশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যশোহর-খুল্‌নার রূপসনাতন ও হরিদাস স্বীয় স্বীয় জন্মপল্লীর গণ্ডী ছাড়াইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দেশের সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছেন। আমরা রূপসনাতনের পুণ্যকথা এখানে বলিয়া পরে হরিদাসের পবিত্র প্রসঙ্গ তুলিব।

পাঠান-রাজত্বের শেষাংশে চৈতন্যই প্রধান চরিত্র। তাঁহাকে বাদ দিয়া বঙ্গের ইতিহাসের কথাও চলে না, জেলার ইতিহাসও হয় না। জেলায় জেলায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বাদ দিলে চৈতন্যের প্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। রূপসনাতনের অকুণ্ঠিত শাস্ত্রজ্ঞান ও হরিদাসের অলৌকিক প্রেমোন্মাদ একত্র করিলে চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়। তাই যশোহর-খুল্‌না চৈতন্য ছাড়া নহে।

সুলতান হুসেন সাহ হিন্দু-প্রতিভার বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুর মধ্য হইতে তাঁহার উচ্চ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিতেন। রাজত্বের প্রথম হইতে তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলতিলক গোপীনাথ বসু। এই গোপীনাথকে তিনি উপাধি দিয়াছিলেন পুরন্দর খাঁ। পুরন্দর খাঁর পর তাঁহার প্রধান অমাত্য বা উজীর হইয়াছিলেন রূপ ও সনাতন। সনাতন শেষজীবনে বৈষ্ণবতোষিণী নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী তাঁহার অনুমতিক্রমে উহার সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহারই নাম "লঘুতোষিণী"। লঘুতোষিণী হইতে রূপসনাতনের

বংশপরিচয় পাই। ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক বিবরণ আর কিছু হইতে পারে না ; উহাই এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

কর্ণাট দেশে জগদ্‌গুরু নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধদেব। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর, কনিষ্ঠ হরিহর। উদ্ধত হরিহর জ্যেষ্ঠকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে রাজা হন। রূপেশ্বর সপত্নীক পৌলস্ত্যদেশে পলায়ন করেন। * তথায় তাঁহার পদ্মনাভ নামে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র হয় (১৩০৮ শক)

স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিণী-তটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ,
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপ-পূজ্যপাদঃ ক্রম
ভুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী।" †

অর্থাৎ পদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস করিতে সমুৎসুক হইয়া, রাজা দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটি গ্রামে বসতি করেন। পদ্মনাভের পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, মুকুন্দ। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমার। তিনি—

"কিঞ্চিদ্ দ্রোহমবাপ্য সংকুলজনি র্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।"

অর্থাৎ বিশেষ কোন বিবাদের জন্য তিনি জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে উঠিয়া যান। তথায় তাঁহার তিন পুত্র জন্মে ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ ও কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপম। বল্লভের পুত্রই সুবিখ্যাত জীব গোস্বামী।

এই বর্ণনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে পদ্মনাভ যখন নৈহাটিতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তখন তিনি দনুজমর্দ্দন নামক এক রাজার দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মহেন্দ্রদেব যবনকুল নাশ করিয়া ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরে এক রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দনুজমর্দ্দনদেব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া এক রাজ্যস্থাপন

---

* পৌলস্ত্য দেশ নামক কোন বিশেষ দেশ আছে বলিয়া জানি না। পৌলস্ত্য কুবেরের অন্য নাম। উত্তর দিক্‌ই কুবেরের রাজ্য। সুতরাং রূপেশ্বর উত্তর দিকে আসিয়া ছিলেন, ইহাই বোধ হয়। কর্ণাট হইতে বঙ্গ উত্তর দিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ রূপেশ্বর এই সময়ে বঙ্গেই আসিয়াছিলেন। সেনরাজগণও পূর্ব্বে কর্ণাট হইতে এদেশে আসেন।

† বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

করেন। দনুজমর্দ্দন দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রূপেশ্বর কর্ণাট ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আসিলে সম্ভবতঃ রাজধানীর সন্নিকটে গৌড় বা পাণ্ডুনগরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে দেববংশীয় রাজগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়া অসম্ভব নহে। যে বিভ্রাটে দনুজমর্দ্দন পাণ্ডুনগর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পদ্মনাভেরও পাণ্ডুনগর ত্যাগ করিতে হয়। দনুজমর্দ্দনের রাজ্যস্থাপনের পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে গিয়া তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই নিকট হইতে ভূমিবৃত্তি পাইয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে বাস করেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে এই ঘটনা হইতে পারে। গঙ্গাতীরে তাঁহারা দুই পুরুষ বাস করিয়াছিলেন; তাহাতে ৫০ বৎসর কাটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং পদ্মনাভের পৌত্র দ্বিজবর কুমারের গঙ্গাবাস ত্যাগের কাল ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ আনুমানিক ধরিতে পারি।

"ভক্তি রত্নাকর" নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, কুমার নৈহাটি পরিত্যাগ করিয়া ফতেহাবাদ সরকারে গিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম ফতেহাবাদ। কিন্তু ফতেহাবাদ সরকার বহু বিস্তৃত ছিল। আইন আকবরি হইতে জানিতে পারি, এই বিস্তৃত ফতেহাবাদ সরকার পূর্ব্বকোণে সন্দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া খালিফাতাবাদ, ইউসফপুর, রসুলপুর অর্থাৎ খুল্‌না-যশোহরের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল। কুমার এই বিস্তৃতরাজ্যের কোথায় বাস করিয়াছিলেন?

আমরা স্থানীয় অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে ব্রাহ্মণকুলতিলক কুমার প্রাচীন সেখহাটি, জগন্নাথপুর, তপনভাগ, দেয়াপাড়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণপ্রধান পল্লীর সন্নিকটে বিস্তীর্ণ ভৈরবনদতীরে চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ নামক গ্রামে বসতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। * তখন চেঙ্গুটিয়া পরগণার নামকরণ হয় নাই। ঐ স্থান ইউসফপুর পরগণার এবং ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল। এই প্রেমভাগে কুমারের লোকবিশ্রুত পরম ভক্ত পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। যে ভগবৎপ্রেমের লীলারঙ্গে এক সময়ে সমগ্র ভারতভূমি বিপ্লাবিত হইয়াছিল, সে প্রেমের আদি প্রস্রবণভূমি আজ শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে! যাঁহারা

---

* বিশ্বকোষে ও চেঙ্গুটিয়ার সন্নিকটে রূপসনাতনের মঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ২১শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ।

মথুরা বৃন্দাবনের অসংখ্য লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষ্ণলীলা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের জন্মভূমির গুপ্ততত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার কেহ নাই!

যশোহর জেলায় চেঙ্গুটিয়া নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমদিকে প্রেমভাগ গ্রাম অবস্থিত। সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষায় উহা এক্ষণে পমভাগ হইয়াছে। প্রেমভাগ এক্ষণে নদী হইতে সামান্য দূরে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যখন ভৈরব জগন্নাথপুরের দক্ষিণ সীমা দিয়া প্রবাহিত হইত, তখন প্রেমভাগ নদীর সন্নিকটে ছিল। এক সময়ে তপনভাগ বা তপোবন ভাগ এবং প্রেমভাগ পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম ছিল এবং উহা সেখহাটি বা জগন্নাথপুরেরই অংশ-বিশেষ ছিল। পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। * এই প্রেমভাগে কুমারের প্রথম পুত্র সনাতন ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে, রূপ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস অবলম্বন ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। † রূপ ২৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে এবং সনাতন তাহারও ২।১ বৎসর পরে সংসার ত্যাগ করেন। সনাতন ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ও রূপ ১৫৫৯ অব্দে লোকান্তরিত হন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে চৈতন্যদেব বয়সে সনাতন অপেক্ষা পাঁচ বৎসর ছোট এবং রূপ অপেক্ষা চারি বৎসর বড়। রূপ সনাতন অপেক্ষা অগ্রে সংসার ত্যাগ করেন বলিয়া তাঁহারই নাম অগ্রে কথিত হয়।

সনাতন অতি অল্পবয়সে হুসেন সাহের রাজসরকারে প্রবেশ করেন, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে রূপও তাঁহার সহায়ক হন। অল্পদিনে উভয়ভ্রাতা হুসেনী রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠেন। হুসেন সাহ সনাতন ও রূপকে যথাক্রমে "সাকর মল্লিক" ও "দবীর খাস" উপাধি দিয়াছিলেন। গৌড়ে রামকেলিতে তাঁহাদের বাসাবাটী ছিল; তথায় উভয় ভ্রাতার খনিত দীঘি ও অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। চৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে উভয় ভ্রাতা উহাতে বিমুগ্ধ হন; অবশেষে গৌড়ে চৈতন্যের

২২৫—৬ পৃষ্ঠা।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান ॥" চৈঃ চঃ।

দর্শনলাভ করিয়া উভয়ে এমন আত্মহারা হন যে রাজপ্রতিম শক্তি-সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। অগ্রে রূপ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন, পরে সনাতন ব্যগ্র হইলে হুসেন তাঁহাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া বন্দী করেন; তখন সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ছুটিয়া গিয়া চৈতন্যের কৃপালাভ করেন। উভয় ভ্রাতায় ৪০ বৎসরেরও অধিককাল মথুরা বৃন্দাবনে ধর্ম্মসাধনায়, শাস্ত্র-চর্চ্চায় এবং ভক্তিগ্রন্থরচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা যেমন অসাধারণ পণ্ডিত, তেমনি সর্ব্বত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসী। জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলনে তাঁহাদের মধুর চরিত্রকথা অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে আশঙ্কায় আমরা সে মধুর কথা বলিবার লোভ অত্যন্ত অনিচ্ছায় সম্বরণ করিলাম। * আজ্ যে মথুরা বৃন্দাবনের যেখানে সেখানে কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন করিতেছে, আজ যে ব্রজমণ্ডলে বৃন্দাবনধাম বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি, বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, রূপসনাতন তাহার মূল। এ বিষয়ে যশোহরবাসীর যথেষ্ট গৌরব করিবার আছে।

সংসার ত্যাগ করিবার পর গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয় বোধ হয় কখনও জন্মস্থান প্রেমভাগে আসেন নাই। তবে তাঁহারা যখন গৌড়ে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন, তখনই তাঁহাদের সহিত আদি নিবাসের কিছু সম্পর্ক ছিল। তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতেছে। † রূপসনাতনের কীর্ত্তিচিহ্নগুলিকে চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ তাঁহাদের জলাশয়সমূহ। সরকারী রাস্তা হইতে প্রেমভাগ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুকুর সর্ব্বপ্রথমে দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সর্ব্বপ্রথমে (১) সদরপুকুর। ইহার দক্ষিণের ঘাটটি প্রস্তরদ্বারা বাঁধা ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে ইংরাজ আমলে একবার সরকারী রাস্তার পুল নির্ম্মাণের ইট প্রস্তুত করিবার জন্য পুষ্করিণীর খাতের দক্ষিণদিকে গর্ত্ত খনন করা হয়, তখন সেই পুরাতন বাঁধাঘাটের প্রস্তর-

* চৈতন্য দেবের সমস্ত চরিত-গ্রন্থে এবং ভক্তমালে ভক্ত পাঠক রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অপরূপ চরিত্র পাঠ করিবেন। বিশ্বকোষে "সনাতন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বিশ্বকোষেও চেঙ্গুটিয়ার সন্নিকটে রূপসনাতনের মঠের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, ২১শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ।

ভিত্তি দেখা গিয়াছিল। এই দক্ষিণ পাহাড়ের সন্নিকটে রূপসনাতনের বসতি বাড়ী ছিল। এখনও সেখানে স্থানে স্থানে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। (২) চা'ল ধোয়ানীর পুকুর—বর্ত্তমান হাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। (৩) মধ্যপুষ্করিণী বা বামনের পুকুর; ইহা সদর পুকুরের পূর্ব্বধারে অবস্থিত; এ পুকুরে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। (৪) মধ্যপুকুরের পূর্ব্বদিকে কাণাপুকুর। (৫) সরকারী রাস্তার পশ্চিমে এক্ষণে ধোপার পুকুর নামে অভিহিত। (৬) ছোটপুকুরিয়ার, ইহা বর্ত্তমান বাহিরঘাট গ্রামের মধ্যে পড়িয়াছে। (৭) হটপুকুরিয়া—বেলের রাস্তার পশ্চিম গায়ে অবস্থিত। এই ৭টি পুষ্করিণী রূপসনাতনের সময়ে খনিত বলিয়া কথিত। সাংরাজ নামে আর একটি পুরাতন খাত ছিল, কিন্তু উহা এই সাতপুকুরের অন্তর্ভুক্ত নহে।

দ্বিতীয়তঃ রূপসনাতনের মঠবাড়ী। পমভাগের সীমার মধ্যে সিঙ্গিয়াবাওড়ের পশ্চিমধারে একটি আমবাগান আছে; উহা মঠবাড়ী নামে খ্যাত। এখানে রূপসনাতনের একটি বিখ্যাত দেবমন্দির ছিল; সে মন্দির এক্ষণে মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পাটবাড়ী। প্রেমভাগের গায়ে গাদগাছি গ্রামে ২৫ বিঘা জমিতে বিস্তৃত বাগান ছিল। এ বাগে ফলের বৃক্ষই অধিক ছিল। বাগানের মধ্যে পুকুর ছিল। এখানে পাটপূজা, দেউলপূজা, দোলপূজা প্রভৃতি উৎসব হইত। এইজন্য ইহার নাম ছিল পাটবাড়ী। চতুর্থতঃ ফুলবাড়ী—উক্ত বাগানের সন্নিকটে কয়েক বিঘা জমিতে সুন্দর ফুলবাগান ও পুকুর ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী উত্তমনগর গ্রামেও কিছু কিছু কীর্ত্তিচিহ্ন ছিল। পুরুষানুক্রমে এই সকল স্থানের অধিকার রূপসনাতনের বংশীয়গণের ছিল।

রূপসনাতনের অন্য কোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিবার সম্ভব। তাঁহার খ্যাতি-লাভের কোন কারণ ছিল না। তাই তাঁহার নামও কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। রূপের সংসার ত্যাগের পর যখন সনাতন রাজকার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন একদা হুসেন সাহ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—

> "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার
> জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার
> হেথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব-কার্য্য নাশ

সম্ভবতঃ রাজকার্য্য উপলক্ষে রূপসনাতন রামকেলিতে বাস করিবার পর উক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন চাকলার কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে প্রেমভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের সময় হইতে চন্দ্রদ্বীপেও একটি বাড়ী ছিল। ঐস্থানে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বাস করিতেন। এই বল্লভের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী। জীব অতি শিশুকালে রামকেলিতে জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের সহিত বাস করিবার সময় চৈতন্য-দেব তথায় গিয়াছিলেন। জীব গোপনে মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। রূপসনা-তনের গৃহত্যাগের পর জীবও নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তখন তিনি চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। "ভক্তিরত্নাকরে" আছে :—শ্রীজীব

"অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল। *
চন্দ্রদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে।
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥
শ্রীজীব সঙ্গের লোক বিদায় করিয়া।
ফতেয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লইয়া॥"

এই ফতেয়া হইতে ফতেহাবাদের অন্তর্গত প্রেমভাগই বুঝাইতেছে। এথান হইতে জীব প্রথমতঃ নবদ্বীপ, পরে কাশীতে বিখ্যাত গুরুর নিকট বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী" হইতে জানা যায় জীব ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ যান। † রূপসনাতনের দেহত্যাগের পর জীবই বৃন্দাবনে প্রধান গোস্বামী হন। বৃন্দাবনের আচার্য্যপদে মহাপ্রভু রূপসনাতনকে বরণ করিয়াছিলেন। তথাকার আচার্য্যদিগের মধ্যে যে ছয়জন গোস্বামী বৈষ্ণবজগতে সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে রূপসনাতন এবং জীবই প্রধান।

* তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র, সুতরাং ১৪৫৫ শক। সেই বৎসরই চৈতন্য দেহ ত্যাগ করেন।

† বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ,
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।"

প্রেমভাগ প্রভৃতি স্থানে প্রবাদ আছে, সনাতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকৃতই অত্যাচারী ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণের জমি আত্মসাৎ করিয়া লন। এই ব্রাহ্মণ এই ঘটনা বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপকে জানান। শ্রীরূপ তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকের আগুক্ষর কয়েকটি একখানি পাথরের উপর লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করেন; ব্রাহ্মণ উহা উক্ত ভ্রাতাকে দেখাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। উক্ত ভ্রাতাও সেই উপদেশে প্রেমভাগের বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে যান। সে শ্লোকটি এই :—

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইহার আগুক্ষরসম্বলিত "যরইন" অঙ্কিত একখানি প্রস্তরফলক বহুকাল প্রেমভাগে ছিল। * এমন কি দুই একজন বৃদ্ধলোকে তাহা দেখিয়াছেন বলিয়াও শুনা গিয়াছে। এই গল্পটি আবার সনাতনের উপরও আরোপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীরূপের নিকট হইতে উক্ত প্রস্তরখানি পাইয়া সনাতন সংসার ত্যাগ করেন। † কিন্তু সনাতন ব্যতীত শ্রীরূপের অন্য কোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা না থাকিলে, উক্ত পাথরখানির প্রেমভাগে থাকা অসম্ভব হয় এবং হুসেন সাহের চাকলা ছারখার করার তিরস্কারের সামঞ্জস্য করা যায় না। এসম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে; প্রেমভাগের পুকুরগুলি, মঠবাড়ী, ফুলবাড়ী, পাটবাড়ী, উত্তম নগর প্রভৃতি স্থানগুলি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণখণ্ডের গোস্বামিবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও কতকাংশ তাঁহাদের আছে; অবশিষ্ট কোন প্রকারে নড়াইলের জমিদারগণ আত্মাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই

---

* কেহ কেহ বলেন উক্ত লিপিতে শ্লোকটির আদ্যক্ষর ও শেষাক্ষর লইয়া "যরীরলাইয়নয়" এই অষ্টাক্ষর লেখা ছিল। বঙ্গীয় সমাজ ১২১ পৃঃ।

† চৈতন্য চরিতামৃতে আছে যে রূপের পত্র পাইয়া সনাতন কার্য্য ত্যাগ করেন, কিন্তু এরূপ কোন শ্লোকের কথা নাই।

গোস্বামিগণ নিশ্চিতই রূপসনাতন বা তাঁহাদের কোন ভ্রতার বংশধর। রূপ-সনাতন রাজকার্য্যের জন্য প্রভূত ভূসম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন, এবং কর দিয়া উহা ভোগদখল করিতেন। ভক্তিরত্নাকারে তাহার উল্লেখ আছে। প্রেমভাগ প্রভৃতি স্থান উক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। এখনও প্রেমভাগের কোন কোন স্থান তদ্‌বংশীয়গণের অধিকারভুক্ত আছে। ইহাও যশোহরের একটা বিশেষ গৌরবের বিষয়। প্রেমভাগে সদর পুকুরের দক্ষিণতীরে একটি বোধন-বিল্বমূলে শ্রীরূপের হস্তাঙ্কিত পাথরখানি নাকি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। সেই স্থানে ২।১ বৎসর রূপসনাতনের জন্য উৎসব হইয়াছিল। সে উৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে নির্জ্জীব রাজ্যের একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

——o——
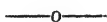
নবম পরিচ্ছেদ—হরিদাস।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যেমন প্রাচীদেশ রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হয়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহারই মতে তাঁহারই প্রাণে অনু-প্রাণিত হইতেছিল। প্রভাত-পক্ষীর প্রথম কাকলীর মত কোন কোন দিক্‌ হইতে তাহার নবমত ঝঙ্কারিত হইতেছিল। নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই চৈতন্যের সার নীতি। কিন্তু অনন্যসাধনায় এ নীতি প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, হরিদাস। কীর্ত্তনপ্রথা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। স্তব্ধরজনীর নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া তিনি ভগবানের নামানুকীর্ত্তন দ্বারা পরলোকের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া-ছিলেন। যে দেশে তান্ত্রিকমতে অতি সঙ্গোপনে মনে মনে সংক্ষিপ্ত বীজমন্ত্র জপ করিবার প্রথা ছিল, সেই দেশে সর্ব্বজনশ্রুতিযোগ্য উচ্চকণ্ঠে ইষ্টদেবের পূর্ণ নাম উচ্চারিত করিবার পদ্ধতি তিনিই দেখাইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক যজ্ঞের কথা আছে, তন্মধ্যে জপ-যজ্ঞ একটি। প্রাচীন মনু-সংহিতায়ও এই যজ্ঞের কথা আছে। কিন্তু সে যজ্ঞে কিরূপে পূর্ণাহুতি দিতে হয়, আধুনিক যুগে হরি-দাসের সাধন-জীবনই তাহার সজীব দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে।

বৈষ্ণবযুগে কত হরিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন! তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন "কীর্ত্তনিয়া" হরিদাস; আমরা যাহার কথা বলিব, তিনি সাধারণতঃ যবন-

হরিদাস নামে পরিচিত। ইহাকে ব্রহ্ম হরিদাসও বলে। * ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুঢ়নে অবতীর্ণ হন।

"বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।"

(শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যভাগবত)

এই বুঢ়ন কোথায়? বুঢ়নের অবস্থান বিষয়ে অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। † অতি প্রাচীনকালে বুঢ়ন একটি দ্বীপ ছিল; আমরা এই বৃদ্ধদ্বীপ বা বুঢ়ানের কথা পূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ‡ পূর্ব্বে বুঢ়ন যত বড় দ্বীপ ছিল, এখন ইহার আকার তত বড় নহে। বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার বুঢ়ন নামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরগণা এখনও বর্ত্তমান আছে। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গলে" আছে:—

"স্বর্ণ নদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পুর্ব্ব নামে।"

ভক্ত জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক; তাঁহার কথা বড়ই প্রামাণিক। তিনি কেবলমাত্র পরগণার নাম বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি হরিদাসের জন্মপল্লীর নাম দিয়াছেন। ভাটকলাগাছি একটি গ্রামের নাম নহে, উহা জোড়া গ্রাম। বুঢ়ন পরগণায় এখনও স্বর্ণনদী বা সোনাই নদী আছে; এবং উহার কূলে ভাট্‌লা বা ভাটপাড়া এবং কলাগাছি বা কেয়াগাছি নামে দুইটি পাশাপাশি গ্রাম এখনও

---

* হরিদাসের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। কেহ বলেন ইনি প্রহ্লাদের অবতার, কেহ বলেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার অবতার, কেহ বা তাঁহাকে ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদের মিলিত অবতার বলিয়াছেন। ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষপ্রণীত "ভক্তির জয়" ৭৯পৃঃ, বিশ্বকোষ, ২২খণ্ড ৪৮৯ পৃঃ।

† বিশ্বকোষসম্পাদক কোন অনুসন্ধান না করিয়াই বুঢ়ন গ্রামকে বনগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বনগ্রাম হইতে কলাগাছির দূরত্ব অন্ততঃ ২৫ মাইল হইবে। কেহ কেহ স্বর্ণ নদীকে সুরনদী করিয়া লইয়াছেন, এবং সুরনদী বলিতে যমুনার শাখা গঙ্গানদীকে বুঝিয়াছেন। কিন্তু সোনাই এখনও আছে।

‡ ১৩৩ পৃষ্ঠা।

আছে। যশোহর-খুল্‌নায় অন্ততঃ ৭।৮টি কলাগাছি আছে। এইরূপ থাকিলে একটি গ্রামকে বিশেষ করিবার জন্য অন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সহিত উহার যোগ করিয়া দিয়া জোড়ানামে গ্রামের পরিচয় হয়; এ রীতি এদেশে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ভাটলার পার্শ্ববর্ত্তী কলাগাছি গ্রামে হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল। * এখনও সে প্রদেশে এ প্রবাদ আছে; তবে এই দেবরূপী সাধুর জন্মপল্লীতে তাঁহার নামে কোন উৎসব নাই, ইহাই বিচিত্র কথা। হরিদাসের জন্মপুণ্যে খুল্‌না জেলা ধন্য হইয়াছে।

হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রচলিত কথা। বহু-বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি "হীনকুলে জাত"; আবার মুসলমান নরপতি হুসেন সাহ তাঁহাকে "মহাবংশজাত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি মুসলমান বংশে জন্মলাভ করেন। দেবত্ব কোন কুলগত নহে, ইহাই দেখাইতে গিয়া বৃন্দাবন দাস এমতের সমর্থন করিয়াছেন। কেহ বা ভাটকলাগাছিতে জন্ম দেখিয়াই তিনি ভাট-বংশীয় ছিলেন—এইরূপ অদ্ভুত অনুমান প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কলাগাছি ভাটপ্রধান স্থান বলিয়া ভাট-কলাগাছি নাম হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে হরিদাসের ভাট-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যাহা হউক, আমরা দেশীয় প্রবাদাদি হইতে অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে হরিদাস যে হিন্দুসন্তান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জয়ানন্দই তাঁহার পিতামাতার নাম দিয়াছেন ঃ—

"উজ্জলা মায়ের নাম, পিতা মনোহর।"

কেহ কেহ কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, যে হরিদাসের মাতার নাম গৌরীদেবী এবং পিতার নাম সুমতি শর্ম্মা।† কিন্তু আমরা জয়ানন্দের প্রামাণিক বর্ণনা উপেক্ষা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

এক্ষণে প্রশ্ন এই হিন্দুসন্তান কেন যবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। বৈষ্ণব

---

* বনগ্রাম স্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার সুপণ্ডিত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে প্রথম ভুল সংশোধন করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ২৮শ ভাগ ২য় সংখ্যা ১৩০ পৃঃ।

† শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী-প্রণীত "হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত।"

গ্রন্থেই আমরা পাই, হরিদাস ১৩৭২শকে বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। * আমরা দেখিয়াছি এ সময়ে খাঁ জাহানআলি পূর্ণ প্রতাপে খালিফাতাবাদে বা বাগেরহাটে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী মহম্মদ তাহের বা পীরআলি বহুসংখ্যক হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন। সেই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ পূর্ণ ভাবে সাতক্ষীরা অঞ্চলে আসিয়াছিল, তাহারও বিশেষ আভাস দিয়াছি। † সম্ভবতঃ হরিদাসের জন্মের ২।৩ বৎসর পর তাঁহার পিতা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হরিদাস নিজে মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র ছিলেন, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে। পিতার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পর কয়েক বৎসর মধ্যেই হরিদাস পিতামাতা হারাইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন। এসময়ে কলাগাছি প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় হিন্দুই মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় হরিদাস কলাগাছির অপর পারে অবস্থিত হাকিমপুরে গিয়া তথাকার কাজিদিগের আশ্রয় লন। এই কাজিরাও পীরালি মুসলমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হরিদাস হিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; পিতামাতা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলে, তাঁহাকেও মুসলমান হইতে হয় এবং পিতামাতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মুসলমান-গৃহে আশ্রয় লন। তজ্জন্য সাধারণ লোকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিত। প্রচলিত সর্ব্বজাতীয় প্রবাদই হরিদাসের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই মতেরই পোষকতা করে ; অন্য প্রমাণ অভাবে আমরা ইহাই গ্রহণ করিলাম।

এখন দুই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। হরিদাস বহুস্থলে হীনকুলজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এসম্বন্ধ বলা যায় যে তিনি সোণাই নদীর তীরে যে সকল নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু পূর্ব্বে বাস করিত, তাহাদের কাহারও ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; হয়ত তাঁহার উচ্চপ্রকৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বংশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল এরূপ মত প্রচলিত হইয়াছে, তিনি শিশুকালে এক জোলার স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এরূপ গল্পও আছে। ‡ সুতরাং পরবর্ত্তিকালে

---

* "ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্তিত শকমিতে, প্রকট হইলা ব্রহ্মা বুঢ়ন গায়েতে।"

অদ্বৈতপ্রকাশ।

† ৩০৯—১০ পৃষ্ঠা।

‡ যবন হইয়া কিরূপে হরিভক্ত হয়, এই তথ্যের মীমাংসার জন্য হরিদাস সম্বন্ধে অনেক

হরিদাস মুসলমান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হন। এইজন্য বঙ্গাধিপ হুসেন সাহ তাঁহার বিচার করিবার সময়ে তাঁহাকে "মহাবংশজাত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।*

হরিদাস শিশুকাল হইতে ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সম্ভবতঃ হাকিম-পুরের কাজিরা এজন্য তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন। সে বিরক্তি হইতে অযত্ন ও অত্যাচার হওয়াও অসম্ভব নহে। এইরূপ নির্য্যাতনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া হরিদাস ২০ বৎসর বয়সে মুসলমানের গৃহ ত্যাগ করেন এবং বেনাপোল গ্রামের এক জঙ্গলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি নিজের জন্য সামান্য একখানি কুটীর রচনা করেন এবং কুটীরের সন্নিকটে একটি বেদীতে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার সেবা করিতে থাকেন।† এই সময়ে তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য জপ-যজ্ঞ আরম্ভ হয়। তিনি প্রতি মাসে কোটীবার নাম জপ করিবেন,

---

রচিত কল্পিত গল্প প্রচলিত আছে। তাহার একটি এই; হরিদাস ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বালবিধবা ছিলেন এবং পিত্রালয়ে বাস করিতেন। একদা এক সন্ন্যাসী আসিয়া ঐ গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন, সে সময়ে উক্ত বালবিধবা ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর সেবা করেন। বালবিধবা বালিকা বলিয়া পাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিতেন: সন্ন্যাসী ভ্রম-ক্রমে তাঁহাকে সধবা বলিয়াই স্থির করেন এবং যাইবার সময়ে তাঁহাকে পুত্রবতী হইতে আশীর্ব্বাদ করেন। সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ জানিয়া বালিকার পিতামাতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহাদের কোন অনুনয়ে সন্ন্যাসীর কথা ব্যর্থ হইল না। কিছুদিন পরে উক্ত বিধবা এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে পুত্রটিকে একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া সোণাই নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। হাঁড়ি ভাসিতে ভাসিতে কলাগাছি গ্রামে লাগে এবং এক জোলার স্ত্রী উহা পাইয়া বাড়ী লইয়া গিয়া প্রতিপালন করেন। জোলারা এ সময়ে সকলে মুসলমান হইয়াছিল। সুতরাং হরিদাস সাধারণতঃ মুসলমান-কুলজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রোমের ইতিহাসে রমুলাসের জন্মবৃত্তান্তে এইরূপ গল্প আছে। এ গল্পগুলি কতদূর সত্য বলা যায় না।

* হুসেন সাহ বলিতেছেন :—

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হ'য়েছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা ছোড়, হই তুমি মহাবংশজাত!" বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল

† "হরিদাস যবে গৃহত্যাগ কৈলা,
বেনাপোলের বন মধ্যে কতদিন রৈলা।
নির্জ্জনবনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।" চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের তুলসী মঞ্চ।
বেণাপোল

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য
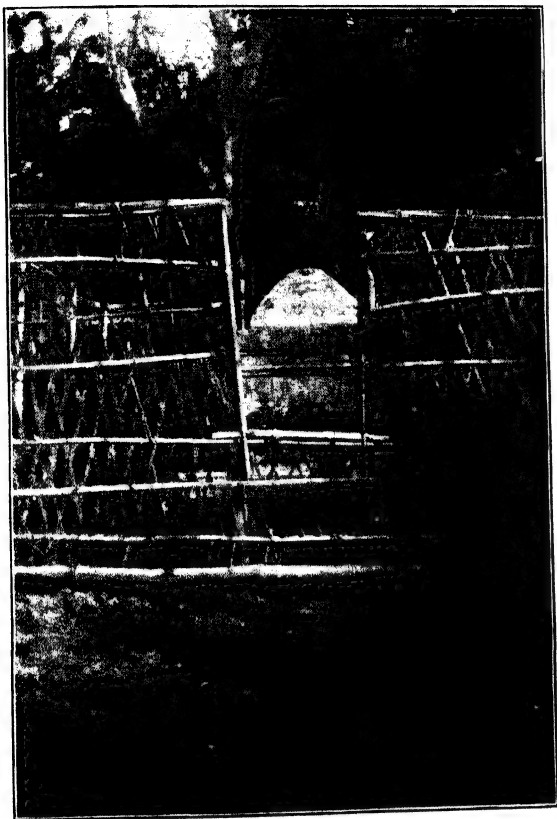
Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং প্রত্যহ অন্ততঃ তিনলক্ষবার জপ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। হরিদাস সাধারণ তান্ত্রিকের মত মনে মনে অনুচ্চারিতস্বরে অস্পষ্টভাবে নাম জপ করিতেন না; তাঁহার জপ অন্যে শুনিতে পাইত; সে জপই একপ্রকার সঙ্গীত ছিল; তানপুরার দ্রুত ঝঙ্কারের মত সে জপ-ঝঙ্কারে শ্রোতা মাত্রেই বিমোহিত হইত। দেবর্ষি নারদের হরিনামঝঙ্কারে কিরূপে আকাশমার্গ মুখরিত হইত, তাহা পুরাণে দেখিতে পাই; ভূতলে হরিদাসের জপের মাধুর্য্যে বঙ্গদেশ আকুলিত হইয়াছিল। কলিতে হরিনাম জপের মত ধর্ম্ম নাই, এতদঞ্চলে হরিদাস তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক; পরে চৈতন্য সে ধর্ম্মদ্বারা দেশ মাতাইয়া জপের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে অগ্নিকুণ্ডে বঙ্গ জ্বালাইয়াছিল, হরিদাস তাহার শিখামাত্র। হরিদাসের জীবনে দেখিতে পারি, সে শিখা সেই অগ্নিকুণ্ডে মিশিয়া অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল। *

হরিদাস যে তুলসী মঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন, উহাই কালে অসংখ্য ভক্ত-সমাগমে মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহার ইষ্টকবেদী প্রস্তুত হয়, আবার কখন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ইষ্টকগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তের কৃপায় তুলসীমঞ্চটি এখনও আছে। সাধুভক্তের অবস্থানের জন্য উহার সন্নিকটে একখানি গৃহও আছে। হরিদাসের উপলক্ষ্যে এখানে বার্ষিক উৎসবও হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বেনাপোল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইলমাত্র দূরে এই তুলসী-মঞ্চ যে পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা যশোহর জেলার একটি গৌরবের স্থান। স্কটের নভেলে বর্ণিত দস্যুর কার্য্যক্ষেত্র দেখিবার উদ্দেশ্যে স্বভাবসুন্দর স্কটল্যাণ্ডের দুর্গম গিরিপথসমূহ জনকোলাহল-ময় হইয়া গিয়াছে; হরিদাসের যজ্ঞ-ক্ষেত্র কি যশোহর ও খুলনার অধিবাসী-দিগকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না?

হরিদাসের কুটীরের প্রায় এক মাইল দূরে কাগজপুকুরিয়া গ্রাম। প্রাচীন কোন মানচিত্রে বেনাপোলের নাম নাই, কাগজপুকুরিয়ার নামই আছে। এই

* বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার "ভক্তির জয়" গ্রন্থে যেস্থানে হরিদাসের সহিত চৈতন্যের মিলন হইল, সেই স্থানেই হরিদাসের জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "প্রবহমাণা নদী সাগরসঙ্গমের অনির্ব্বচনীয় সুখে বিলয় পাইল।" 'ভক্তির জয়'—৮১১ পৃঃ

স্থানে রামচন্দ্র খাঁ নামক জনৈক প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। ইনি ব্রাহ্মণ; ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শান্তিধর; "রাম খাঁ" তাঁহার উপাধি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে সুলতান হুসেন সাহের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; তিনি এই শান্তিধর বা রাম খাঁ হইতে পারেন। সম্ভবতঃ হুসেন সাহই তাঁহাকে রাম খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। মুসলমান-নরপতির অনুগ্রহপুষ্ট রাম খাঁ সদাচারী ছিলেন না; তিনি মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও মুসলমানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে তান্ত্রিক শাক্ত বলিয়া নবপ্রচলিত বৈষ্ণব মতের বিরোধী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত সংযমী লেখক আর নাই; তিনি কাহারও নিন্দা করিতেন না; কিন্তু তিনিও রামচন্দ্র খাঁ সম্বন্ধে সংযমের মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভক্ত হরিদাসকে সকল লোকে পূজা করে, সকল লোক তাঁহার নিকট যায়, তাঁহার গুণে মোহিত হয়, রামচন্দ্র খাঁ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না।

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥" (চৈতন্যচরিতামৃত,)

কিন্তু সাধারণ চেষ্টায় হরিদাসের জপ ভঙ্গ হয় না। তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে একবার কিছু আহার গ্রহণ করেন; আর দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় জপকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও বিশেষ কিছু ছিল না। যে জগৎ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, জগৎ তাঁহার কি করিতে পারে? নিন্দা, বিদ্রূপ বা অত্যাচারে হরিদাসের কিছুই হইল না। তখন রামচন্দ্র খাঁ এক ভীষণ পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

হঠাৎ অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সাধারণ লোকের যাহা হয়, রামচন্দ্রের তাহা হইয়াছিল। তিনি বেশ্যাসক্ত হীনচরিত্র ছিলেন। তাঁহার একটি বেশ্যার নাম হীরা। দুর্বৃত্ত জমিদারের বিপুল অর্থ আকর্ষণ করিয়া হীরা লক্ষমুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল; তাই লোকে বলে তার জন্য তাহার নাম হইয়াছিল লক্ষহীরা। হরিদাসের সর্ব্বনাশ সাধনজন্য রামচন্দ্র এই লক্ষহীরাকে নিযুক্ত করেন। হীরা পরমাসুন্দরী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিল। সে তিন দিনে হরিদাসের মতি হরণ

করিবে বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা করিল। কাগজপুকুরিয়ার সন্নিকটে গন্নড়া-রাজাপুরে হীরার জন্য বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল; রামচন্দ্র ময়ূর-পঙ্খী তরণীতে চড়িয়া যে পথে হীরার বাটী যাতায়াত করিতেন, সে পথে খালের চিহ্ন এখনও আছে; রাজাপুর এক্ষণে লোকশূন্য প্রান্তর হইয়া গিয়াছে। সেখানে হীরার ভিটার ইষ্টকাদি ভগ্নাবশেষ এবং "হীরার পুকুরের" খাত এখনও সেই প্রাচীন কালের সাক্ষ্য দিতেছে।

হাবভাবময়ী হীরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হরিদাসের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। কি দেখিল? দেখিল নির্জ্জন কুটীরে ভক্তসাধু বীণাবিনিন্দিত দিব্য মধুর ঝঙ্কারে হরিনাম জপ করিতেছেন। বেশ্যা বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি জপ শেষ করিয়াই আপনার কথা শুনিব।" হীরা বসিয়া থাকিল, বসিয়া বসিয়া দিন গেল, রাত্রি গেল, ঝঙ্কার আর থামে না, জপ আর শেষ হয় না। তেমনই নিস্পন্দ তনু, নিশীথ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তেমনি মধুর ঝঙ্কার। হীরারও চাঞ্চল্যের সমাধি হইতে চলিল। রাত্রির শেষযামে হরিদাস শৌচাদির জন্য গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "আজ আমার নির্দ্দিষ্ট জপ শেষ করিতে বড় বিলম্ব হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কল্য আসিবেন, আমি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব।" দিবাশেষে হীরা পুনরায় আসিল; রাম খাঁ তাহাকে উদ্রিক্ত করিতে ছাড়েন নাই। সে দিনও হীরা আসিয়া দেখিল—সেই জপনিরত সাধুর তেমনই মধুর মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তি হইতে যেন কি দিব্য জ্যোতিঃ ক্ষরিয়া পড়িতেছে। হীরা বসিয়া রহিল, আজ সকাল সকাল জপ শেষ করিয়া সাধু হীরার ফাঁদে ধরা পড়িবেন। কিন্তু তাহা হইল না। রাত্রি আসিল, হীরা বসিয়া আছে। দূরাগত গ্রাম্য কোলাহল বিলুপ্ত হইল, কিন্তু জপের ঝঙ্কার চলিতেছে। কি মধুর নাম! নামের স্বভাব-শক্তিতে কেমন যে হৃদয়ে আঘাত করে, মানুষকে কেমন উদাস করিয়া দেয়! হীরা ভাবিতে লাগিল "অপার আনন্দ না হইলে লোকে কি এমন করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতে পারে? সাধুর কি আনন্দ, আমারই বা কি আনন্দ, আমার জীবনে কি করিলাম? "পরমুহূর্ত্তে কে যেন রশ্মি টানিয়া ধরিল, হীরা আবার দন্ত কটমট করিয়া সাধুর ভণ্ডামি ভাঙ্গিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু রাত্রি শেষে আবার সেই মধুর

স্বর, আবার সেই দীনতা হীরাকে পরদিন আসিতে বলিল। হীরা সে সানুনয় ভাষায় দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনে আবার হীরা আসিল। কিন্তু সে হীরা আর নাই; বিবেক তাহাকে সংশোধিত করিয়াছে; পূর্ব্বজন্মের কোন্ অজানিত পুণ্যফলে এক অপূর্ব্ব নির্ব্বেদ আসিয়া অলক্ষিতে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সেই হৃদয় লইয়া হীরা সামগায়ীর ঝঙ্কারধ্বনিবৎ আবার হরিনামের মধুর ঝঙ্কার শুনিল। সে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। আজ্ হরিদাস একটু সকালে জপ শেষ করিয়া উত্থান করিবামাত্র হীরা গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভক্তসংস্পর্শে এক সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইল। হীরা বারংবার আত্মকৃত পাপজীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। রাগদ্বেষনির্ম্মুক্ত সাধু তাহাকে অম্লানবদনে ক্ষমা করিলেন। তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, নামমহিমা কীর্ত্তন করিয়া নাম জপ শিখাইলেন। অবশেষে হীরাকে নিজের কুটীরে রাখিয়া স্বয়ং সে দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

হীরা আর সে হীরা নাই; রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন এক, হইল অন্য। পরকে ভুলাইতে হীরাকে পাঠাইলেন, হীরা নিজেই ভুলিয়া গেল। হীরা গুরু হরিদাসের আদেশে বিলাস-বিভ্রাট ত্যাগ করিল, সৌখীন বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মোটা কাপড় পরিল, মস্তক মুণ্ডন করিয়া সযত্নবর্দ্ধিত সুন্দর কেশরাশি জগন্নাথের চরণে সমর্পণ করিবার জন্য তুলিয়া রাখিল।

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

হীরা গৃহবিত্ত শুধু ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল না; সে তাহার পাপার্জ্জিত অর্থ লোকসেবায় নিয়োজিত করিয়া পরমার্থ লাভের পন্থা প্রস্তুত করিয়াছিল। হীরার উপর আদেশ ছিল, সে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অচিরে জগন্নাথ যাইবে। তাহার একটা কারণ, রামচন্দ্র তাহার উপর রাগ করিয়া অত্যাচার করিতে পারেন। কিন্তু সে দেশে রামচন্দ্রকে ভয় করিত না একজন মাত্র, সে হীরা নিজে। সে

নির্ভীকতা হীরার পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল। হীরা নির্ভীক-ভাবে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া কয়েক বৎসর পরে জগন্নাথ যাত্রা করিয়াছিল। জগন্নাথ তখনও বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র; অনেক লোক সে তীর্থে যাইত; কিন্তু তথায় যাইবার পথ এত দুর্গম ছিল যে, লোকে বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া যাইত। বিশেষতঃ বর্ষার প্রারম্ভে পুরীতীর্থের প্রকৃত সময় বলিয়া যাত্রী-দিগের কষ্টের অন্ত ছিল না। এই কষ্ট নিবারণের জন্য হীরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক দীর্ঘ রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহা এখনও "হীরার জাঙ্গাল" নামে খ্যাত আছে। যশোহরের উত্তরাংশে খাজুরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে এই রাস্তার স্থচনা দেখা যায়। সেখানে কোথায়ও হীরার পূর্ব্ববাস থাকিতে পারে। যশোহর হইতে যে বিখ্যাত "কালী পোদ্দারের রাস্তা" বেনাপোল হইয়া বনগ্রাম দিয়া চলিয়া গিয়াছে, উহারও কতকাংশ এই রাস্তার অন্তর্ভূক্ত ছিল! এখনও খাজুরা প্রভৃতি স্থানের লোকে জলময় প্রান্তরের মধ্য দিয়া "হীরানটীর জাঙ্গাল" দেখাইয়া থাকে। এখনও বর্ষাগমে যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর জলরাশিতে ভাসিয়া যায়, তখন এই জাঙ্গালই স্থানীয় লোকের যাতায়াতের একমাত্র পথ হয়। *

হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করিয়া ২।৩ মাইল দূরে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে একস্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অল্পদিনে তাঁহার ভক্তির কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল, হরিদাস এইস্থানে আসিলে, নানাস্থান হইতে বহুলোক আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া রামচন্দ্রকে অভিসম্পাত করিতেছিল। ভক্তের অনুরোধে তিনি যেস্থানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, উহার নাম হইয়াছিল, হরিদাসপুর। এখনও হরিদাসপুর আছে। যশোহর রোডের পাশে

* হীরার কথা কল্পিত উপন্যাস নহে। হীরা জগন্নাথ গিয়াছিল। পথে বৈতরণী তীর্থও পর্য্যটন করিয়াছিল। তাহার যে কেশরাশি দ্বারা খোপা বাঁধিত, উহা মুণ্ডনের পর রাখিয়া দিয়াছিল, এবং পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। এখনও পুরীর প্রাচীন লোকে "হীরার লোটনের" গল্প করিয়া থাকে। দুর্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে এক হীরার কথা আছে। ঐ পুস্তকের অনুসন্ধিৎসু সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সেই হীরা এবং এই লক্ষহীরাকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বৈতরণী পার হইয়া সমুদ্রের ধারে কোথায়ও "বেউশ্যা হীরাদাসির বাসভূমি ছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। শেষ জীবনে তাহার এমন কোন স্থানে বাস করা অসম্ভব নহে। গোবিন্দচন্দ্র গীত। ৯৬-৭, ১০২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শৈবালময়ী নদীর বাঁকের মুখে একটি সুন্দর পুলের সন্নিকটে, হরিদাস ঠাকুরের আস্তানাটি দেখিতে অতি সুন্দর। হিন্দুর মধ্যে যে সেস্থানের সন্ধান রাখে, সে কখনও প্রণাম না করিয়া সেস্থান অতিক্রম করে না। স্থানীয় লোকেরা চিহ্নিত করিবার জন্য সে স্থানটি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই স্থান হইতে হরিদাস গঙ্গাতীর উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিকে চলিয়া যান। এই সময়েই যশোহর খুল্‌নার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হয়। খুল্‌নায় তাঁহার জন্মভূমি এবং যশোহরে তাঁহার বিকাশ-ক্ষেত্র, তিনি ইহার কোন স্থানই দর্শন করিবার জন্য আর প্রত্যাগমন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জন্মলাভে এবং চরিত্রখ্যাতিতে যশোহর-খুল্‌না পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এক ভীষণ বিপ্লবের যুগে তিনি যে নূতন মত ও নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তিনি যে নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যুগ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য যশোহর-খুল্‌নার যথেষ্ট গৌরব করিবার বিষয় আছে।

হরিদাসের পরবর্ত্তী জীবনের সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক নাই, তবুও সে জীবনকথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অতি সংক্ষেপে উহার প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছি। যশোহর ত্যাগ করিয়া হরিদাস কয়েক বৎসর নানাস্থান পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে সপ্তগ্রামের সন্নিকটে চাঁদপুরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় এক ঋষিকল্প ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় শান্তিলাভ করিয়া নির্জ্জন কুটীরে জপ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে থাকেন। যে রঘুনাথ দাস পরিণত বয়সে বৃন্দাবনে গোস্বামী পদে বরিত হইয়াছিলেন, তিনি এসময়ে বালক। বালক রঘুনাথের সহিত প্রৌঢ় হরিদাসের এই সময়ে সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য পণ্ডিত ও ভক্ত বলিয়া দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; হরিদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শান্তিপুরে যান। কিন্তু সেখানেও তাঁহার বেশী দিন থাকা হইল না। কারণ আচার্য্য তাঁহাকে অত্যধিক আদর করিতেন, সন্ন্যাসী কি তত আদর সহিত পারেন? শান্তিপুর ছাড়িয়া হরিদাস ফুলিয়াগ্রামে আসিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত ও ফুলিয়ায় হরিদাস; উভয়ের সম্মিলনে প্রেম-তরঙ্গে সে দেশ ভাসিয়া গেল। নামানুকীর্ত্তনে দেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দেশাধ্যক্ষ মুসলমান কাজীর তাহা সহিল না। তখন দেশ শাসনজন্য দেশমধ্যে নানাবিভাগে মুসলমান কাজী বা বিচারক নিযুক্ত হইতেন। শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে

অধ্যক্ষ ছিলেন গোরাই কাজী। হরিদাসের নামানুকীর্ত্তন তাহার সহিল না। তাহার জানা ছিল, হরিদাস যবনকুলে জাত; মুসলমান হইয়া হরিনাম,— এমন পাপ কি আছে? হরিদাসকে শাসন করিবার জন্য কাজী ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শুধু হরিদাসকে শাসন নহে, তেমন শাসন কাজীও করিতে পারিত; কিন্তু হরিদাস যে হরিনাম শুনাইয়া দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে, মুসলমানে হরিনাম করিলে পাঠান শাসন যে অচিরে অস্তমিত হইবে! সুতরাং রোগের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে; হরিদাসের সর্ব্বনাশ সাধন সংকল্পে তাঁহার বিপক্ষে রাজদ্বারে নালিশ রুজু হইল। গৌড়াধিপ হুসেন সাহ তখন দেশের রাজা, বিচার তাঁহার নিকট হইবে। হরিদাস কারারুদ্ধ হইয়া গৌড়ে আনীত হইলেন।

তথায় হরিদাসের বিচার হইল। সে বিচারের সঙ্গে ধর্ম্মবিচারও চলিয়াছিল। হুসেন সাহ প্রকৃতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু যেখানে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরোধ, সেখানে হুসেন সাহ মুসলমানের পক্ষে, হিন্দুর কেহ নহেন। উচ্চ যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস যেন হরিনাম না করেন, তাহাই হুসেনের প্রথম অনুরোধ হইল; তিনি হরিনাম ত্যাগ করিলে রাজকোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, তাহারও আভাস দেওয়া হইল। কিন্তু এখানে হরিদাস প্রহ্লাদের অবতার, বীর সন্ন্যাসী, তিনি সদর্পে বারংবার বলিলেন;—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ প্রাণ।
তবুও আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

কত বুঝান হইল, কিন্তু সেই একই উত্তর। তখন ক্রোধভরে কাজীর ব্যবস্থায় হরিদাসের শাস্তির আদেশ হইল। গৌড় তখন প্রকাণ্ড সহর; উহাতে ২২টি বাজার ছিল। আদেশ হইল হরিদাসকে লইয়া এই ২২ বাজারে বেত মারা হইবে। তাহাই হইল। দুরন্ত যবনের নিদারুণ প্রহারে হরিদাস ভীষণ কষ্ট পাইলেন, কিন্তু সে কষ্টের বোধ ছিল না। তিনি সমাধিগত সাধুর মত নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, আর মধ্যে মধ্যে শ্রীভগবানের অবতারের মত শত্রুর জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন :—

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহে এ সবার অপরাধ।"

এমন উক্তি আর কি ভারতে হইবে? দারুণ প্রহারে হরিদাস অজ্ঞান হইয়া

পড়িলে, মৃতবোধে তাহার দেহ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইল। অচিরে তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া তীরে উঠিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চৈতন্যদেব প্রেমতরঙ্গে নবদ্বীপ অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হরিদাস আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পরে চৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থিতি করিবার সময়ে হরিদাসও তথায় বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি চৈতন্য-চরণে মস্তক রাখিয়া হরিনাম করিতে করিতে, জীবন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। পুরীতে এখনও হরিদাসের মঠ আছে। সে মঠ দর্শন না করিলে হিন্দু যাত্রীর পক্ষে পুরীপর্য্যটন বিফল হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—রামচন্দ্র খাঁ।

হরিদাসের বেনাপোলত্যাগের পর রামচন্দ্র খাঁ বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্র হুসেন সাহের নিকট হইতে যে যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজ্য সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল শুনা যায়, তিনি কঠোরভাবে শাসনদণ্ড চালনা করিতেন। এজন্য তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি বঙ্গেশ্বরকে কর দিতেন না। এই সকল কারণ হইতে বোধ হয় হুসেন সাহ শৈশবকালে যে তাঁহার আশ্রয়ে কিছুকাল প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহা অসত্য নহে। তিনি সাধারণতঃ রামচন্দ্র নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার প্রকৃত নাম ইহা ছিল না। শান্তিধর নামক এক ব্রাহ্মণ হুসেন সাহের নিকট "রাম খাঁ" উপাধি পান। এই রাম খাঁ উপাধি, শেষে রামচন্দ্র খাঁ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামচন্দ্র বহু অর্থ বিলাসবাসনা-তৃপ্তির জন্য ব্যয় করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুণ্য কার্য্যের ব্যয় ও যথেষ্ট ছিল।

বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজপুকুরিয়া গ্রামে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রথমতঃ একটি বাহিরের পরিখা ; উহা বৃত্তাকারে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়াছিল। উহার মধ্যে একটি চতুষ্কোণ গভীর পরিখা ছিল, উহা এখনও বর্ত্তমান। কোন কোন স্থানে বেশ জল আছে ; শ্রীযুক্ত কুঞ্জেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই রাজবাটীর অসংখ্য ভগ্নস্তূপের পার্শ্বে উত্তর-

রামচন্দ্র খানের রাজপুরীর
ভগ্নাবশেষ
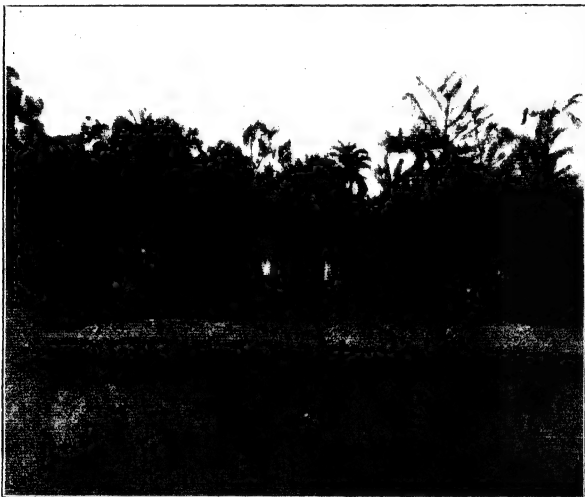
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য

Printed by K. V. Seyne & Bros.

পূর্ব্বকোণে সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীর পূর্ব্বদিকের প্রাচীন পরিখাটি একটু খনন করায় এক্ষণে বারমাস জল থাকে। নির্জ্জনতা যদি গৃহ-বাসের পক্ষে সুখের কারণ হয়, তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মত সুখী কেহ নাই। নিকটে অন্য কোন লোকজনের বাড়ীঘর নাই। চারিদিকে রাজবাটীর ইষ্টকস্তূপসমূহ নিবিড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া বন্যশূকরাদির আশ্রয়-স্থান হইয়া রহিয়াছে। তথাকার ঘনান্ধকার দিবালোকেও অভ্যাগতের রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়া থাকে। গড়ের বাহিরে পশ্চিমদিকে একস্থানে দুইটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে এবং প্রান্তরের মধ্যেও সে স্থানে ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, এ সকল স্থানে রামচন্দ্রের হাতীশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি ছিল।

কিন্তু রামচন্দ্রের প্রধানকীর্ত্তি তাঁহার জলদানপুণ্যে। প্রবাদ এই, নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার খনিত ১০০ পুষ্করিণী আছে। আমরা তাহার কয়েকটি মাত্র দেখিয়াছি এবং নাম পাইয়াছি। (১) চা'লধোয়ানী পুকুর; (২) হাঁসপুকুর; (৩) দবদবে পুকুর, ইহাতে ২০ বিঘা জলাশয়; (৪) মিঠাপুকুর; (৫) "দীঘির-পাড়"—হয়ত পূর্ব্বে দীঘির অন্য নাম ছিল এবং উহার পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া কিছু বিশেষত্ব ছিল; এখন দীঘিরই নাম "দীঘির পাড়" হইয়া গিয়াছে—ইহাতে ৩০ বিঘা জলাশয়। (৬) কালুর পুকুর, (৭) রামচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড দীঘি এখন "ভবার বেড়ের দীঘি" নামে পরিচিত। ইহা এক্ষণে রেলের রাস্তার দক্ষিণে পড়িয়াছে, ইহার জলাশয়ের পরিমাণ ৫০ বিঘা! খাঁ জাহান বা সীতারামের দীঘির সহিত রামচন্দ্রের দীঘিগুলির তুলনা না হইতে পারে কিন্তু খাঁ জাহান বা সীতারাম ত সব স্থানে যান নাই। জলকষ্ট ত স্থান বিশেষ সীমাবদ্ধ হয় না। যশোহর-খুলনার উত্তর দিকে সীতারাম, পূর্ব্বভাগে খাঁ জাহান, দক্ষিণে প্রতাপাদিত্য যেমন অসংখ্য জলাশয় দ্বারা দেশের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, পশ্চিমভাগের একাংশেও তেমনি রামচন্দ্র জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।* হরিদাসের প্রতি রামচন্দ্রের অত্যাচার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে হইতে পারে, নবমতের প্রবর্ত্তকদিগকে এমন

* সম্ভবতঃ বহু পুকুরের অস্তিত্বের জন্যই রামখানের আবাস স্থানের নাম কাগজপুকুরিয়া হইয়াছিল।

কত শত্রুতাই সহ্য করিতে হয়। তথাপি রামচন্দ্রের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ যে লোক-সমাজে তাঁহাকে একান্ত নিন্দিত করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিন্দাভেদ করিয়াও তাঁহার জল-দানপুণ্যের কথা লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

পাঠান রাজগণ লোকহিতকর কার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। হুসেন সাহ যে এবিষয়ে সর্ব্বাগ্রণী, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাস কখনও প্রবাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। পাঠান শাসনের অত্যাচার-কলঙ্কের মধ্যে ও প্রবাদ একটি কথা প্রকাশ করে যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনুগত জমিদারগণ কোন লোক-হিতকর কার্য্য করিলে তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব দাবি করিতেন না। রাজনীতির এমন উচ্চ আদর্শ অতীব দুর্ল্লভ। যাহা হউক, অন্য নৃপতি কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিলেও হুসেন সাহ যে রাম খাঁর রাজস্ব বহুদিন মাপ করিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইবার কারণ আছে।

সত্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়াছিলেন হরিদাসের প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত রামচন্দ্র যে মহদপরাধের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল।* বৈষ্ণব-বিদ্বেষে এই পাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। চৈতন্যদেবের সহিত যিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ ছিলেন, সেই নিত্যানন্দদেব এক সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই ভ্রমণের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল ;—নবধর্ম্মমত প্রচার এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদিগের শাস্তি বিধান।

"প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥" (চরিতামৃত)

তিনি রামচন্দ্রের কথা জানেন এজন্য একদিন শিষ্যদল সহ কাগজপুকুরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র নিজে ভক্ত অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, ভৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে দুর্গামণ্ডপ তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান নহে। নিকটবর্ত্তী গোয়ালার বাড়ীতে বিস্তীর্ণ গোশালায় তাঁহাকে স্থান

---

* "রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রুইল
সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল।
চৈতন্য চরিতামৃত।

দেওয়া যাইবে। শুনিয়া নিত্যানন্দ অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে মণ্ডপগৃহ গোবধকারী ম্লেচ্ছের যোগ্য বাসভূমি হইবে। তাঁহার সে অভিসম্পাত অচিরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। রামচন্দ্র রাজস্ব না দিলেও হুসেন সাহ তাঁহার উপর অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু হুসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরৎ সাহের আমলে বঙ্গেশ্বরের সৈন্য সামন্ত কর আদায় করিবার জন্য উপস্থিত হইল; এবং নিত্যানন্দ উঠিয়া গেলে রামচন্দ্র যে মণ্ডপ-ঘরে মাটি খুড়িয়া গোময়লেপন দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ছিলেন. সেই ঘরেই মুসলমান-সৈন্য আসিয়া বাসা করিল, অবধ্য বধ করিয়া ঘরে মাংসাদি রন্ধন করিল এবং

"স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।" (চরিতামৃত)

এইভাবে রামচন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। সৈন্য সামন্তের অমানুষিক অত্যাচারে সে গ্রাম লোকশূন্য শ্মশানভূমি হইয়া গেল।

স্থানীয় প্রবাদে কিন্তু রামচন্দ্রের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে আর একটু ঔপন্যাসিকতা আছে। রামচন্দ্রের রাজবাটীতে রাজপরিবারের আত্মরক্ষার্থ ভূগর্ভে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল; উহার মধ্যে প্রবেশের জন্য বাহির দিক্ হইতে একটিমাত্র দরজা ছিল। সে দরজাটিও এমন স্থানে ছিল যে কেহ সহজে তাহার সন্ধান পাইত না। নবাব-সৈন্যের আগমনে রামচন্দ্র সমস্ত ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ সহ এই গুপ্তদুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উহার গুপ্ত দ্বারে তালা লাগাইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য কালু উহার চাবি লইয়া এক বৃক্ষোপরি লুকাইয়া রহিল। কালুর উপর আদেশ ছিল নবাব-সৈন্য দেশ ত্যাগ করিলে সে গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিয়া দিবে। নবাব-সৈন্য আসিয়া রামচন্দ্রকে না পাইয়া তাহার বাটী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উপর ভীষণ অত্যাচার করিল এবং অবশেষে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় একজনে দেখিল একটি পুষ্করিণীর উপর বিলম্বিত ডালে পত্রগুচ্ছের আড়ালে কালু পলাইয়া আছে; তৎক্ষণাৎ দর্শকের হস্তস্থিত ধনুক হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইল এবং সে অব্যর্থ সন্ধানে আহত হইয়া কালু নিম্নস্থিত পুকুরে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল। তদবধি পুকুরের নাম কালুর পুকুর। এখনও কালুর পুকুর আছে। এখনও প্রাচীন রাজবাটীর প্রধান ভগ্নস্তূপসমূহের উত্তরদিকে একটী খোলা স্থান দেখাইয়া স্থানীয় লোকে বলিয়া থাকে উহা "পাটনাচের জমি" এবং উহারই

নিম্নে রামচন্দ্র সপরিবারে প্রবেশ করিয়া আর উঠেন নাই। লোকে মনে করে, সে স্থান খনন করিলে অপরিমিত ধনরত্ন পাওয়া যায়; আমরা মনে করি ধনরত্ন পাওয়া যাউক বা না যাউক কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গল্পটী কোন উপন্যাস-লেখকের সরস উপাদান হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ আছে।

চৈতন্য চরিতামৃতকারের বর্ণনায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। রামচন্দ্র সপরিবারে বন্দী হইয়া গৌড়ে নীত হইয়াছিলেন। হয়ত তিনি সেখানে হুসেনের সহিত সম্বন্ধসূত্রের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ রাজসরকারে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

নবাবিষ্কৃত দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এ বিষয়ে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। রামচন্দ্রের দুইটি পুত্র ছিলেন; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ এবং কনিষ্ঠ ভুবনানন্দ। ভুবনানন্দের উপাধি ছিল কবিকণ্ঠাভরণ। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং "বিশ্বপ্রদীপ" নামে এক বিরাট্ আভিধানিক গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে অষ্টাদশ বিদ্যার যাবতীয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। বহু রশ্মি বা আলোকের সমবায়ে যেমন প্রদীপ হয়, বিশ্বপ্রদীপেরও বিভিন্ন ভাগে তেমনি আলোক, অংশু প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায় ছিল। অধ্যায়ের শেষে যে সব ভণিতা ছিল, তাহার একটি এই :—

যং কণ্ঠাভরণং কবীন্দ্রসদসাং শ্রীরাম-খানাপর
খ্যাতেঃ শান্তিধরাদসূত ভুবনানন্দং সুতং জীবনী।
বিদ্যাষ্টদশকেন তদ্বিরচিতে বিশ্বপ্রদীপে স্ফুটং
সংপ্রাপাঙ্গশিখান্তরে পরিণতিং শিক্ষাখ্যমালোকনম্॥ *

অর্থাৎ যে শান্তিধরের উপাধি ছিল শ্রীরামখান, তাঁহার ঔরসে ও জীবনী দেবীর গর্ভে কবীন্দ্রসমাজে বরণীয় ভুবনানন্দ কবিকণ্ঠাভরণ জন্মগ্রহণ করেন এবং

---

* India Office Catalogue of Sanskrit manuscripts No. 1781, pp 1082-3 সেখানে বিশ্বপ্রদীপ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণী আছে; "Vishyapradipa", a cyclopœdia of (chiefly astronomical) knowledge by Bhubanananda son of Santidhar Rambala (or Ram khan) and Jibani and younger brother of Krishnananda."

তিনি অষ্টাদশ বিদ্যার বিশিষ্ট আলোচনা দ্বারা বিশ্বপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

উক্ত বিরাট্ গ্রন্থের সামান্য দুইখণ্ড মাত্র পাওয়া যাইতেছে। একখণ্ড জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিষয়ক; উহা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আপিসের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হইয়াছে। অপর খণ্ড সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক, উহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তৎসম্পাদিত পুঁথির তালিকায় প্রকাশিত করিবেন। অন্য ১৬ খণ্ড পুস্তকের এখনও কোন সন্ধান নাই। যদি উহাদের সন্ধান হয় এবং সমগ্র গ্রন্থখানি একত্র প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিরাট্ পুস্তক বিলাতী বিখ্যাত কোষগ্রন্থের (Encyclopædia) মত ভারতবর্ষের এক অপূর্ব্ব গৌরবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইত। এই পুস্তকে কৃষ্ণানন্দ ও ভুবনানন্দ সম্বন্ধে যে দুই একটি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা উহারা রাজ-সরকারে কিরূপ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দররূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণানন্দ সম্পর্কীয় শ্লোকটি এই :—

> "কৃষ্ণানন্দঃ সমজনি ততো মেধ্যবিত্তৈরযোধ্যা-
> কাশীবাসিদ্বিজপরিষদাং কল্পিতানল্পবৃত্তিঃ।
> গৌড়ক্ষৌণীপরিবৃঢ়দৃঢ়প্রেমসন্দর্ভপাত্রঃ
> বিদ্যানন্যামনুগুণনিকা স্নানপূতান্তরাত্মা॥"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, গৌড়াধিপের প্রিয়পাত্র হইয়া সুপণ্ডিত ও পবিত্রাত্মা কৃষ্ণানন্দ অযোধ্যা-কাশীবাসী ব্রাহ্মণদিগকে সেই সেই দেশে বৃত্তিদান করাইয়াছিলেন। কাশী অযোধ্যাদি দেশে বৃত্তিদান করিতে পারেন, সেরসাহ ব্যতীত এমন কোন গৌড়াধিপের কল্পনা করা যায় না। হুসেন সাহের মৃত্যুর কয়েকবৎস পরে তৎপুত্র মাহমুদ সাহের রাজত্বকালে সেরসাহ বীরবিক্রমে বঙ্গাধিকার করেন (১৫৩৮)। সুতরাং রামচন্দ্র খাঁ গৌড়াধিপ হুসেন সাহের সমসাময়িক হইলে, তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ সেরসাহের সমকালীন হইতে পারেন। অন্য একটি শ্লোকে ভুবনানন্দের কথা আছে :—

> "মন্ত্রি-গৌড়বিড়ৌজসঃ কবিসম্ভাষণে কঞ্চন,
> স্থেমানং দধদম্বভুব ভুবনানন্দোঽনুজাতস্ততঃ।

গ্রন্থঃ সূক্ষ্মবিচারমন্থমথিতাদ্বিস্তীর্ণবিদ্যার্ণবাৎ,
সারঃ প্রীতিসমীভয়াসুমনসাং তেনায়মভ্যুদ্ধৃতঃ॥

ভুবনানন্দ গৌড়াধিপতির কবিসভা সম্ভাষণে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিদ্যার্ণব মন্থন করিয়া সূক্ষ্মবিচারসম্পন্ন মহাগ্রন্থ সম্পাদন করেন। বাস্তবিকই ভুবনানন্দের সর্ব্বতোমুখী পাণ্ডিত্যে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। আমরা কিন্তু তরল গল্পে বিশ্বাস করিয়া সে পণ্ডিতপরিবারকে ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়াছি। দেশে ইতিহাসচর্চ্চার যে কত আবশ্যক, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়।

——:——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—গাজীর আবির্ভাব।

শিশুকাল হইতে আমরা গাজীর কথা শুনিয়া আসিতেছি। নিম্নবঙ্গে গাজীর কথা শুনে নাই, এমন লোক পাওয়া যায় না। রামলক্ষ্মণের মত গাজীকালুর নামও এক সঙ্গে গ্রথিত। যশোহর-খুল্‌নার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "মনসার ভাসান" যেমন প্রচলিত, "গাজীর গীত"ও তেমনি। ইহাতে শুধু গীত নহে, "আলাপচারি"ও আছে অর্থাৎ গানের মাঝে মাঝে পাঁচালির মত গাজী কালুর জীবনকথা কথিত হয়। এক সময়ে এদেশে গাজীর গীত এত প্রচলিত ছিল; এবং উহার একই কথা লোকে শুনিতে শুনিতে এমন বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, যে "গাজীর গীতের আলাপ" বলিলে, যে কথা লোকে শুনিয়া শুনিয়া আর শুনিতে চাহে না, এমন কথা বুঝায়। গাজীর নামে এই দুই জেলায় কত গ্রামের নাম আছে, গাজীরহাট, গাজীরঘাট, গাজীপুরের অভাব নাই। লোকে কোনও কার্য্যে বলপ্রয়োগ করিবার সময় গাজীর নাম স্মরণ করে। তবে গাজীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্মরণ করে, নৌকার দাঁড়িমাঝিরা। এই নদীমাতৃক দেশে গাজীসাহেব নাবিকদিগের আরাধ্য দেবতা হইয়া রহিয়াছেন। এ গাজীসাহেব কে? লোকে তাহার কথা যত শুনে, তেমন কি তাঁহাকে কেহ চিনে? দুস্তর নদীপথে নৌকা ছাড়িবার সময় যখন দাঁড়িমাঝি যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া, দাঁড়ে ও হাইলে হস্তার্পণ করিয়া ভক্তিবিনত ধীর গম্ভীরভাবে "গাজী বদর বদর" বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকে,

তখন জানিতে ইচ্ছা হয়, এই ভাগ্যবান্ পুরুষেরা কে? আবার নদীতরঙ্গে নৃত্যের তালে তালে দাঁড় বাহিতে বাহিতে যখন দাঁড়ীরা গায়—

"আমরা আজি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান। *
শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচপীর বদর্ বদর্॥"

তখন মনে হয়, শুধু গাজী এবং বদর নহে, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরও আছেন,—গঙ্গাদেবী, তিনি শুধু হিন্দুর সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচপীর। এ পঞ্চদেবতা কে?

পূর্ব্ববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর পাঁচপীরের কথা পাই—

পোড়া রাজা গয়েস্‌দি, তা'র বেটা সমস্‌দি,
পুত্র তা'র সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান্ গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী
কলিযুগে যা'র অবসর;
বাদসাই ছিঁড়িল বঙ্গে, কেবল ভাই কালুসঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির। †

সুবর্ণগ্রামে এই পাঁচপীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগা বা মন্দির আছে। শ্রীহট্ট সহরে উহাদের কবরস্থান "পাঁচপীরের মোকাম," বলিয়া পরচিত। ‡ আবার পাঁচপীর যে শুধু বঙ্গেই আছে, তাহা নহে। ভারতবর্ষের অনেকস্থানে পাঁচপীর আছে এবং স্বতন্ত্র লোক লইয়া সে সব স্থানে পাঁচপীর হইয়াছে। বঙ্গের পাচপীর—গায়সউদ্দীন, সামসুদ্দীন, সেকন্দর, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীর গীতে ইহাদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহার সহিত ইতিহাস মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, গায়সুদ্দীন বলিতে দিল্লীর বাদসাহ গিয়াসুদ্দীন তোগলককে বুঝাইতেছে, কিন্তু তাঁহার সহিত সামসুদ্দীনের কোন সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার এক বিখ্যাত গিয়াসুদ্দীন ছিলেন; কিন্তু তিনি সেকন্দর সাহের পুত্র। তাহা হইলে সেকন্দরের পুত্র গাজী কে ছিলেন, বুঝা যায় না। মোটকথা, পাঁচজনের মধ্যে সামসুদ্দীন ও সেকেন্দরকে বিশেষরূপে চিনিতে পারা যায়। সামসু-

* পোলাপান—শিশুগণ; নিখাবান—রক্ষাকর্ত্তা।
† শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪২৪ পৃঃ
‡ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয়ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪৭পৃঃ।

দ্দীন বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান শাসনকর্ত্তা; তাঁহার সময়েই শ্রীহট্টে সাহ্‌-জালালের আগমন হইয়াছিল, তিনি তৎপুত্র সেকন্দরকে শ্রীহট্টে মুসলমান-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এইরূপ ভাবে স্বধর্ম্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত করার মাহাত্ম্যে পিতাপুত্রে পীরশ্রেণীভুক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর সেকন্দর সাহ সিংহাসন লাভ করেন; তিনিও সুশাসক বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারই সময় বাঙ্গালাদেশের জরিপ হয়; তিনি যে মাপের গজ ব্যবহার করিয়া ছিলেন, উহাই সেকন্দরী গজ বলিয়া খ্যাত। এই সেকন্দরের ১৮ পুত্র; তন্মধ্যে গিয়াসুদ্দীন অন্য ১৭ জনকে নিহত করিয়া রাজা হন। সুতরাং সেকন্দরের পুত্র গাজী সাহেবের কোন বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ সেকন্দরের রাজত্ব কালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে খাঁ জাহানের পূর্ব্বে কেহ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারজন্য যশোহরে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, যিনিই বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী। * সাহাজালালের সময় হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহুজন এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ২টি শ্রেণী আছে —আউলিয়া ও গাজী। আউলিয়া ও ফকিরগণ শান্তিপ্রিয়, তাঁহারা যুক্তিতর্কে বা কৌশলে হিন্দু বৌদ্ধকে নিজের ধর্ম্মে টানিয়া লইয়াছেন; গাজীদিগেরও উদ্দেশ্য এক, কিন্তু তাঁহারা বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই গাজীনামধারী রাজনৈতিক সন্ন্যাসিগণ প্রয়োজন মত রাজার সাহায্যে সৈন্যসামন্ত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ এমন কি লুটপাট করিতেন। আউলিয়াগণ প্ররোচনায় সাধুজীবনের আদর্শে এবং জনহিতৈষিতার পরিচয়ে কার্য্যসিদ্ধি করিতেন; কিন্তু গাজীগণ ছলেবলে কৌশলে অবিচারে অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন করিয়াছিলেন। গাজীদিগের মধে যে কেহ কেহ সাধু ছিলেন না তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেণীতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন; সেখানে তিনি ও তাঁহার বংশীয়গণ সমাধিস্থ আছেন। জাফরগাজীর এক পুত্রের নাম বরখানগাজী; তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া

* "Ghazi signifies a conqueror, one who makes war upon infidels" Tabakat-i-Nasiri (Raverty) P. 70 note 2.

তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বরখান্ গাজীও আমাদের প্রস্তাবিত "গাজীর গীতের" বরখান্ গাজী এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। কারণ জাফর খাঁর মস্‌জিদের পারশীক লিপিতে যে তারিখ আছে, তাহাতে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দ হয়; কিন্তু সে সময়ে যশোহর জেলায় মুকুট রাজা প্রাদুর্ভূত হন নাই। সে যুগে যশোহর-খুল্‌নার অনেকস্থান বসতির অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে উভয় বরখাঁন্ গাজী যে জোর করিয়া রাজার কন্যা কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা। উক্ত জাফর খাঁর নিজেরই নাম বা তাঁহার কোন সহচরের নাম দরাফ খাঁ ছিল, তাহা জানা যায় না। দরাফ খাঁ যে শেষ জীবনে গঙ্গা-ভক্ত হইয়া অপূর্ব্ব গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। সময়ে সময়ে গাজীদিগের মধ্যেও জাতিনির্ব্বিশেষে অতিরিক্ত দয়ালু লোক দেখা যাইত, এজন্য আমাদের দেশে কোন অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে "দয়ার গাজী" বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পীরের অন্যতম গাজীর বিশেষ কোন নাম পাওয়া যায় না। তিনি সাধারণতঃ বরখান্ বা বড়গাজী এবং গাজী সাহেব বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে। তিনি রাজা মুকুটরায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য রাজধানী ছারখার করেন এবং তাঁহার কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। এই গল্পের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া কয়েকজন মুসলমানী বাঙ্গালায় "গাজীকালু ও চম্পাবতী" পুঁথি রচনা করিয়াছেন, এবং ঢাকা ও কলিকাতা হইতে উহার কয়েকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। যদিও এই সকল সুলভ অশুদ্ধ "বটতলার" পুঁথি শিক্ষিত ব্যক্তির ঘৃণা উৎপাদন করে, তবুও ইহা একশ্রেণীর লোকের যথেষ্ট চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকে। কর্ম্মবিরত নাবিকেরা রাত্রিকালে উন্মুক্তহস্তে প্রদীপে তৈল ঢালিয়া দিয়া, সুরসংযোগে এই পুঁথি পাঠ করে, তখন সে পার্শ্ববর্ত্তী তরণীমালা হইতে সাগ্রহ শ্রোতা পাইয়া থাকে। এই সকল পুস্তকের গ্রাম্য ভাষায় লিখিত আবর্জ্জনারাশির মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত আছে। আমরা প্রথমতঃ এই পুঁথির স্থূলমর্ম্ম দিয়া পরে ইহার ঐতিহাসিকতার বিচার করিব।

বিরাটনগরে সেকেন্দর সাহ রাজা ছিলেন, তাঁহার রাণী অজুপাসুন্দরী; তিনি বলিরাজার কন্যা, সুতরাং গঙ্গাদেবীর ভগিনীপুত্রী। ইঁহাদের প্রথম

পুত্র জুলহাস, তিনি শিকারে গিয়া নিরুদ্দেশ হন। দ্বিতীয় পুত্র গাজী; ইহা ব্যতীত এক পালিত পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম কালু। রাজারাণী প্রাপ্ত-বয়স্ক গাজীকে রাজ্য দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা লইলেন না; রাজা হিরণ্যকশিপুর মত তাঁহার উপর কত অত্যাচার করিলেন, কিছুতেই ফল হইল না। গাজী গোপনে কালুকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং বাঙ্গালাদেশে সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বাঘ, কুমীর, সবই তাঁহার বশীভূত। কিন্তু নানাস্থান ভ্রমণ করাই ফকিরের রীতি বলিয়া গাজী কালু ছাপাইনগরে শ্রীরামরাজার দেশে পৌঁছিলেন; রাজবাটীতে অগ্নি লাগিল, রাণী অপহৃত হইলেন, অবশেষে যে দেশে একজনও মুসলমান ছিল না, সে দেশে সব মুসলমান হইয়া নিস্তার পাইল। ছাপাই নগরে একটি সুবর্ণমণ্ডিত মস্‌জিদ প্রস্তুত হইল। অবশেষে তাঁহারা সোণারপুরে ও পরে ব্রাহ্মণনগরে রাজা মুকুটরায়ের দেশে গেলেন। মুকুটরায়ের সাত পুত্র ও এক কন্যা, তাহার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতীর মত সুন্দরী আর নাই, গাজী তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইলেন। মুকুটরায় যবনদ্বেষী ব্রাহ্মণ, তাঁহার দেশে সব ব্রাহ্মণ; তিনি যবনের মুখ দেখিলে ত্রিরাত্র (অশৌচ প্রতিপালন) করেন। মুকুটরায়ের কন্যার সহিত গাজীর বিবাহের প্রস্তাব করিতে কালু রাজদরবারে উপনীত হইলেন; রাজা যবনের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া কালুকে বন্দী করিলেন। তখন গাজীর সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধিল। গাজী অসংখ্য ব্যাঘ্র সৈন্য লইয়া গোপনে নদী পার হইয়া মুকুটের রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। মুকুটরায়ের এক দিগ্বিজয়ী বলশালী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম দক্ষিণরায়। তিনি কুমীর লইয়া গাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, কিন্তু ডাঙ্গায় কুমীরে কি বাঘের সঙ্গে পারে? দক্ষিণরায় গদাহস্তে গর্জ্জিয়া আসিয়া গাজীর "আসা" ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবশক্তিতে অবশেষে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। গাজী দক্ষিণরায়ের কাণকাটিয়া, "বার হাত লম্বা" টিকি কাটিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এবার "বারকোটী নয় শত সেনা" ও "লক্ষ লক্ষ তোপতীর" প্রভৃতি লইয়া মুকুটরায় স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন; দিনে দিনে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রিতে মুকুটরায় তাঁহার মৃত্যুজীব কূপ" হইতে জল ছিটাইয়া হাতী, ঘোড়া, লোকজন সব বাঁচাইয়া দিতেন। তখন গাজী গরু মারিয়া রক্ত

দিয়া কূপের সে শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। আর মুকুটরায়ের উদ্ধার নাই। গাজীর লোকেরা রাজবাটীতে যেখানে সেখানে প্রবেশ করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল; অবশেষে সকলে গাজী কালুর পদানত হইল। রাজা-রাণী পাত্রমিত্র সকলে পৈতা ছিঁড়িয়া কলমা পড়িলেন এবং "ঝুটি কাটিয়া" মুসলমান হইলেন। গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহ হইল, এবং চম্পাকে গাজী লইয়া গেলেন। পথে একদিন গাজী দেখিলেন, এক নদীর কূলে তিনশত যোগী তপে নিযুক্ত আছেন; গাজী গঙ্গাকে ডাকিয়া যোগীদিগের অভীষ্ট কমলে-কামিনী দর্শন করাইলেন; যোগীরা মুসলমান ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম নাই দেখিয়া "ঝুটি কাটিয়া" মুসলমান হইল। পরে পাতালপুরী হইতে জুলহাসকে লইয়া গাজী কালু ও চম্পা সাগর পার হইয়া বিরাটনগরে গেলেন। ইহাই পুঁথির স্থূল কথা।

এখানে সর্ব্বপ্রথম বিরাট নগর, পরে ছাপাই নগর, সোণারপুর ও ব্রাহ্মণ নগর এই চারিটি স্থানের নাম পাইতেছি। বিরাটনগর কোথায়? গাজী সেকন্দরসাহের পুত্র হইলে এই অজানিত বিরাটনগরের রাজধানীর কথা উঠিবে কেন? সেকন্দর সাহ গৌড়াধিপ ছিলেন। আরও দেখা যাইতেছে সমুদ্র পার হইয়া গাজী সুন্দরবনে আসিলেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ বা উড়িষ্যা হইতে আসাই সম্ভব। যখন পূর্ব্ববঙ্গে গাজী কালুর সমাধি স্থান দেখিতে পাইতেছি, তখন পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। বঙ্গেশ্বর সুলতানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব; হয়ত তিনি সেকন্দরনামধারী অন্য কোন প্রাদেশিক রাজার পুত্র ছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোন বণিকের জাহাজে বর্ত্তমান খুল্‌না জেলার দক্ষিণাংশে কোথায়ও অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-প্রধান প্রাচীন স্থানের উপরই তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য হইত। বিশেষতঃ সে সময়ে গাঙ্গেয় উপদ্বীপের সবস্থানে বসতি হয় নাই, প্রাচীন বৌদ্ধস্থানগুলিই সকলের পরিজ্ঞাত ছিল। বারবাজার ও হাতিয়াগড় কিরূপে বৌদ্ধ আমলে প্রধান স্থান ছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। গাজীর প্রথম দৃষ্টি এই দিকে পড়াই সম্ভব, এবং তাহাই পড়িয়াছিল। গাজীর ছাপাইনগর চাঁদসওদাগরের

নামসংযুক্ত চাম্পাইনগরে নহে। অনেক অনুসন্ধানের ফলে দেখিয়াছি, ইহা বারবাজারেরই একাংশ।

বর্ত্তমান বারবাজার রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে, একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে সাধারণ লোকে শ্রীরাম রাজার দীঘি বলে। ঐ দীঘির দক্ষিণ ও বাদুরগাছার পশ্চিমাংশকে পূর্ব্বে ছাপাইনগর বলিত। স্থানীয় বৃদ্ধ মুসলমান অধিবাসীরা এখনও ছাপাই নগর জানে। এখন ছাপাইনগর উক্ত বাদুরগাছা মৌজার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেখান হইতে শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টিত বাড়ী লুপ্ত হয় নাই। শ্রীরাম রাজার দীঘি অতি সুন্দর জলাশয়; উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ; জলে শৈবালাদি নাই, পাহাড় অতি উচ্চ, জল নির্ম্মল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তীরে প্রকাণ্ড বাঁধা ঘাটের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দীঘি হইতে একটু পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেই শ্রীরাম রাজার বাড়ী দেখা যায়। সে বাড়ীর চারি ধার নদীর মত বিস্তৃত গড়ের দ্বারা বেষ্টিত। সে গড়ে এখনও জল আছে, এবং রাশি রাশি প্রস্ফুটিত পদ্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম শোভা বিস্তার করে। এই গড়খাই এত বিস্তৃত, গভীর এবং দুর্গম যে উহা পার হইয়া ভগ্নবাটীতে যাওয়ার উপায় নাই। সে বাটী বাঁশের ঝোপ ও বন্য বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া শ্বাপদসমূহের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। সেখানে বাঘ বোধ হয় সর্ব্বদা আছে, এবং স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ পরিখাবেষ্টিত বাড়ীর দক্ষিণ তীরে এক বৃহস্পতিবারে গাজী সাহেব প্রথম জাহির বা প্রকাশ হন বলিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবারে রাত্রিতে সে স্থানে ব্যাঘ্র নিশ্চয় আসিয়া থাকে, কারণ গাজী ব্যাঘ্রের দেবতা। পথে আসিতে আসিতে গাজীর সহিত অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল, তিনি দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরাম রাজার বাড়ীর দক্ষিণে পরিখাপারে যেখানে প্রথম আস্তানা করিয়াছিলেন, তথায় একটি অতি প্রকাণ্ড বহুবর্ষজীবী বটবৃক্ষ সাক্ষীর মত এখনও দণ্ডায়মান আছে। যাহা হউক গাজী কালু এখানে শ্রীরাম রাজার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া এমন কি তাঁহার স্ত্রী হরণ করিয়া, দেশশুদ্ধ হিন্দু বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া, মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়া যান। শ্রীরাম রাজা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে রাণী প্রত্যর্পিত হইয়াছিলেন। গাজীর এই অত্যাচারকাহিনী মুসলমানদিগের নিজের পুঁথিতেও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বার বাজারের একটু দক্ষিণে মাস্‌লে-হাসিলবাগ নামক গ্রামে এক হাট হইত, ঐ হাটের নাম বদরের হাট। নৌকায় মাঝিরা যে বদরের নাম না উচ্চারণ করিয়া নৌকা ছাড়ে না, সেই বদরের নামেও এ হাট হইতে পারে। এই বদর উদ্দীন এক জন প্রসিদ্ধ পীর, চট্টগ্রাম সহরে পীর বদরের কবর আছে। হাসিল-বাগে আসিয়া শ্রীরাম তাঁতির উপর গাজী সাহেব অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং তাহাকে ধনী করিয়া দেন। তিনি জামলাগোদা নামক এক ব্যক্তির গোদ আরোগ্য করিয়া দেন। পুঁথিতেও তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। স্থানীয় লোকে বলে যে তাহারা শুনিয়াছে গাজী এখান হইতে কুনিয়া নগরে গিয়া মটুক রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। পুঁথিতে কিন্তু কুনিয়া নগরের স্থলে ব্রাহ্মণ নগর আছে। আমরা সে কথা পরে বলিব।

বারবাজার হইতে গাজী কালু সোণারপুর গিয়াছিলেন। এই সোণারপুর হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত। চব্বিশ পরগণা জেলায় কলিকাতা হইতে দক্ষিণ মুখে যাইবার রেলওয়ে পথে এখনও সোণারপুর একটি প্রসিদ্ধ জংসন ষ্টেশন। সোণার-পুরে গাজী কালু প্রভৃতি সকলে মস্‌জিদে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া পুঁথিতে বিবৃত আছে। সম্ভবতঃ গাজী কালুর পূর্ব্বে ত্রিবেণী হইতে বরখান্ গাজী এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোণারপুর তখনও একটি সুন্দর সহর ছিল। এই স্থানে কিছুকাল অধিষ্ঠান করিয়া গাজী মুকুট রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই মুকুট রায় কে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—মুকুট রায়।

প্রাদেশিক কাহিনী এবং প্রচলিত প্রবাদ হইতে আমরা কয়েকজন মুকুট রায়ের পরিচয় পাই। (১) রায় মুকুট নামে নবদ্বীপ অঞ্চলে একজন পণ্ডিত ছিলেন, ইনি অমরকোষের এক টীকা প্রণয়ন করেন। রায় মুকুটপদ্ধতি নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও তাঁহার নাম রক্ষা করিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য ইঁহার এক উপাধি ছিল, 'বৃহস্পতি।' ইনি ব্রাহ্মণ এবং গৌণ কুলীন। (২) জমিদার মুকুট রায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিনোদ রায়। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্র, চাটুতি গাঞি। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রাজবালা' নামক উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, মুকুট রায়ের কন্যা

দুর্গাবতীর সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোঁসাঞি-দুর্গাপুরনিবাসী কুলীনাগ্রগণ্য কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়; এবং তজ্জন্য জয়দিয়ার রায় চৌধুরী বংশের সহিত সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোহরের অন্তর্গত জয়দিয়ার রায়চৌধুরীগণ যে উক্ত বিনোদ রায়ের বংশসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বংশের সহিত দুর্গাপুরের বন্দ্যবংশের সম্বন্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ "অধিকারী" উপাধিযুক্ত। অধিকারীরা প্রধান কুলীন এবং স্বভাবে আছেন। কাশ্যপ-গোত্রীয় বিনোদ রায় বংশজ ছিলেন, তদ্বংশীয়ের সহিত বিবাহ হইলে কুল থাকে না। সুতরাং জয়দিয়ার সহিত দুর্গাপুরের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। জয়দিয়ার সম্পর্কিত মুকুট একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন; নলডাঙ্গার রাজবংশ প্রবল হইলে সে বংশের জমিদারীর লোপ হয়। (৩) ঝিনাইদহ অঞ্চলে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন, তাঁহার নাম রাজা মুকুট রায়। ইনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, পারিহাল গাঞি। ইহার এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম গন্ধর্ব্ব রায়, মুকুট রায়ের পতনের পর তিনি বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক খাঁ উপাধি ভূষিত হন। এই গন্ধর্ব্ব খাঁ জোর করিয়া খড়দহমেলের অবসথী বংশীয় রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন; তদবধি ঐ বংশে পারিহালভাবাপন্ন দোষ স্পর্শিয়াছিল। এখনও রাঘবের বংশীয়গণের পারি-মেল রহিয়াছে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলে কুলীনের কুল ভঙ্গ হয় না, শুধু দোষস্পর্শ হয়। সম্ভবতঃ দুর্গাবতী এই প্রতাপশালী রাজা মুকুট রায়ের কন্যা; রাজকন্যার নামানুসারে দুর্গাপুরের নাম হইয়াছিল এবং দুর্গাবতীর পুত্রবংশেও পারিহাল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও অধিকারী মহাশয়দিগের সে দোষ আছে। এই রাজা রায় মুকুটের অনেক সৈন্য সামন্ত ছিল, কথিত আছে তিনি ১৬ হল্‌কা হাতী, ২০ হল্‌কা অশ্ব ও ২২০০ কোড়াদার না লইয়া বাহির হইতেন না। * খাঁ জাহান প্রভৃতির মত তিনিও জলাশয় প্রতিষ্ঠায় পুণ্যবান্ ছিলেন; রাস্তা নির্ম্মাণ ও জলাশয় খনন করিতে করিতে তিনি অগ্রসর হইতেন। এখনও ঝিনাইদহের সন্নিকটে এরূপ অনেক রাস্তার ভগ্না-

* Report on the Agricultural Statistics of Jessore (Jhenidah and Magurah) by Babu Ram Sanker Sen (1872-3), Appendix. xlii.

বশেষ ও জলাশয় রহিয়াছে! জলাশয়ের মধ্যে ঢোলসমুদ্র সর্ব্বপ্রধান, উহা ৫২ বিঘা জমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত মিঠাপুকুর, নটিপুকুর নামে আরও কতকগুলি পুকুর এখনও বর্ত্তমান আছে। ঝিনাইদহের পূর্ব্ব ধারে 'বিজয়পুরে' এই রাজার রাজধানী ছিল; * উহার দক্ষিণে পশ্চিমে 'বাড়ীবাথান' নামক স্থানে তাহার প্রকাণ্ড গো-শালা ছিল। তাহার খুব অধিকসংখ্যক গাভী ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে 'বৃন্দাবনের' নন্দ মহারাজ বলিত। "বেড়বাড়ী" নামক স্থানে তাহার উদ্যান ছিল। যেখানে তাহার কোড়াদার সৈন্যেরা বাস করিত, তাহার নাম কোড়াপাড়া। এ সবগুলি স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। মুকুট রায়ের রাজবাটীর কিছু নাই, তবে ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণে দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকস্তূপ প্রবাদের সাহায্যে কিছু নিদর্শন রক্ষা করিয়াছে। রায় মুকুট নিজে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, এবং গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিলেন। কথিত আছে গয়েশকাজি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার একটি গোহত্যা করে বলিয়া, তিনি উক্ত কাজিকে নিহত করেন। সেই কথা বঙ্গেশ্বরের নিকট পৌঁছিলে, তাঁহাকে বাঁধিয়া লইবার জন্য অসংখ্য সৈন্য প্রেরিত হয়। শৈলকূপার সন্নিকটবর্ত্তী বাঘুটিয়া-নিবাসী কায়স্থবংশীয় রঘুপতি ঘোষ রায় মুকুটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার অধীনে আর দুইজন অসীম বলশালী বীর ছিলেন, তাঁহাদের নাম চণ্ডী ও কেশব। ইঁহারা চণ্ডী সর্দ্দার ও কেশব সর্দ্দার নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া লোকে মনে করিত ইঁহারা চণ্ডালবংশীয়। কিন্তু চণ্ডীসম্বন্ধে এরূপও শুনা যায় যে, তাঁহার সহিত রঘুপতির অত্যন্ত প্রণয় ছিল, রঘুপতি চণ্ডীকে বৈবাহিক সম্বোধন করিতেন; সম্ভবতঃ চণ্ডীও কায়স্থ ছিলেন। প্রবাদ আছে রায় মুকুটের আর এক দল পাঠান সৈন্য ছিল, তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন গয়েশ-উদ্দীন। বাড়ী-বাথানের সন্নিকটে গয়েশপুর নামক একটি স্থান আছে; উহার উৎপত্তি গয়েশ-কাজি হইতে হইয়াছিল, কিংবা লোকের মুখে যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানে সেনাপতি গয়েশউদ্দীনের শিবির ছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, নবাব-সৈন্যের আগমন সংবাদে রায় মুকুট স্বীয় পরিবারবর্গ

---

* কেহ কেহ বলেন বিজয়পুরে রাজার আত্মীয় স্বজন থাকিতেন, বাড়ীবাথানেই তাঁহার দুর্গাদি ছিল। বাস্তবিক এই বাড়ীবাথানের সন্নিকটেই তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্নগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি গুপ্ত দুর্গে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পর পর দুই দিন যুদ্ধে নবাব-সৈন্য পরাজিত হইল। চণ্ডী ও কেশব জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া রাজার জনৈক পাঠান-সৈন্যকে নবাব-সৈন্য ভাবিয়া কালী-মন্দিরে বলি দেয়; তাহার ফলে সমস্ত পাঠান-সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে। নবাবপক্ষ হইতে রাজার পাঠান-সৈন্যগণকে হস্তগত করিবার কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা জানি না। মোট কথা, বাড়ীবাথানের সন্নিকটে উভয় পক্ষে যে তৃতীয় যুদ্ধ হয়, তাহাতে মীরজাফরের মত গয়েশউদ্দীন যুদ্ধে বিরত ছিলেন বলিয়া মুকুট রায় সম্পূর্ণ পরাজিত ও বন্দী হন। বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বাধ্যতা স্বীকার করাইয়া তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

কোন রাজবংশের পতন বিবৃত করিতে হইলে, এ দেশের একটা চির প্রচলিত প্রথা আছে। যেখানে প্রকৃত ইতিহাস নির্ব্বাক্, সেখানে একটা মামুলী গল্পের অবতারণা করিয়া পাদপূরণ করা হয়। পাঠান ও মোগল আমলে হিন্দুরাজগণ একটু বিদ্রোহী হইলেই তাহার বিরুদ্ধে নবাব-সৈন্য আসিত; ফলে হিন্দুরাজা পরাজিত ও বন্দী হইতেন। বন্দীকে লইয়া যাইবার সময়ে, তাহার সঙ্গে প্রায়ই দুইটি কপোত কপোতী যাইত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তখন এই সংবাদবাহী কপোতের বিশেষ ব্যবহার ছিল। বিংশ শতাব্দীর সভ্য ইয়োরোপে সংবাদবাহী কপোত যেমন দুঃসাধ্য সাধন করিতেছে, ৫।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গেও কপোতের সে গুণের সদ্ব্যবহার করা হইত। কিন্তু প্রভেদ এই,—বঙ্গীয় কপোতেরা পরিণামে উপকার না করিয়া সর্ব্বনাশই সাধন করিত। হিন্দুর নিকট যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা যবনহস্তে জাতিকুল নাশই অধিকতর অসহনীয় ছিল। কারণ সে যুগে যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থই জাতিধর্ম্ম নাশ। এ জন্য বন্দী রাজা সঙ্গে দুইটি পারাবত লইয়া রাজধানীতে যাইতেন, যদি তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতেন, পারাবাত সঙ্গেই থাকিত। আর যদি নিতান্তই তাঁহার দেহান্ত হইত, তাহা হইলে তিনি পারাবত দুইটি ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। পারাবত উড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসামাত্র জানা যাইত যে রাজার দেহান্ত ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলে আত্মহত্যা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বংশচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতেন। কিন্তু বঙ্গের পারাবতগুলি উড়িয়া আসা ছাড়া অন্য

কোন বিশেষ শিক্ষা পাইত না, এবং তাহারা উড়িয়া আসিবার জন্য পাগল হইত। ইহার ফল হইত যে অনেক সময়ে রাজার নিষ্কৃতির আজ্ঞা হইলেও দৈবক্রমে পারাবত উড়িয়া আসিয়া বংশ নির্লোপ করিত; তখন রাজা ফিরিয়া আসিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিতেন। এমন যে কত ঘটনা হতভাগিনী বঙ্গজননীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিবে? মহারাজা বল্লাল সেন হইতে আরম্ভ করিয়া কত জনের সম্বন্ধে যে এই কপোতকাহিনীর সংযোজনা হইয়াছে, তাহার অবধি নাই। এ অঞ্চলেও কপোতের ভুল দ্বারা বহু রাজবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে; তন্মধ্যে দেবগ্রামের দেবপাল রাজা, দেউলিয়ার চন্দ্রকেতু, মহম্মদপুরের সীতারাম, হরিণাকুণ্ডুর শালিবাহন, ও বাড়ীবাথানের এই মুকুট রায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। মুকুট রায়ের কপোত ফিরিয়া আসিবামাত্র তাঁহার পরিবারবর্গ গুপ্তদুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী পরিখাতে নিমজ্জিত হইয়া আত্মহত্যা করেন; যেখানে তাঁহার কন্যারা মরেন তাহা "কন্যাদহ," যেখানে তাঁহার দুই স্ত্রী নিমজ্জিত হন, তাহা "দুই-সতীনে" এবং যেখানে রাজদৈবজ্ঞ নিমজ্জিত হন, তাহা "দৈবজ্ঞদহ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল স্থান আছে, কিন্তু তাহা আর সে পরিখা নাই; পরিখা বিলে পরিণত হইয়া দুর্গচিহ্নও বিলুপ্ত করিয়াছে।

(৪) চতুর্থ মুকুট রায়ের বাড়ী ছিল, ব্রাহ্মণনগর। * যশোহর জেলায় যেখানে বর্ত্তমান ঝিঁকারগাছা রেলওয়ে-ষ্টেশন অবস্থিত, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর কোণে লাউজানি বলিয়া গ্রাম আছে। ঐ লাউজানিই ছিল এক সময় ব্রাহ্মণনগর। উহা কাপোতাক্ষের কূলে অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ উহার অবস্থান ছিল, এখন আর তেমন নাই। তখন ব্রাহ্মণনগরের পশ্চিম ভাগে সুবিস্তীর্ণ কপোতাক্ষ এবং দক্ষিণসীমা দিয়া হরিহর নদ প্রবাহিত হইত; উত্তর পূর্ব্ব দিকে বিল ছিল। ইহার মধ্যে পরিখাবেষ্টিত দুর্গে রাজা মুকুট রায় বাস করিতেন। তিনি গুড়গাঞিভুক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঠান আক্রমণের পূর্ব্ব হইতে গুড়গাঞিভুক্ত ব্রাহ্মণেরা যশোহর-খুল্‌নার নানা স্থানে নদীতীরে বাস করিতেন।

---

* আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বারবাজারের মুসলমানদিগের মুখে কুনিয়া নগরের কথা শুনিয়াছি। গাজী কুনিয়া নগরে মুকুটরায়কে পরাজিত করেন। রায়মঙ্গল পুস্তকে আছে:— "বড় খাঁ গাজীর সাথে, মহাযুদ্ধ খনিয়াতে।" বাবু রামশঙ্কর সেন লিখিয়া গিয়াছেন যে মুকুট রায়ের রাজধানী খড়িয়া নগরে ছিল। Ramsunkers's Report p. xliii.

তাঁহারাই এক সময়ে চেঙ্গুটিয়া পরগণার রাজা ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি দক্ষিণডিহি প্রভৃতি স্থানের রায় চোধুরী উপাধিভূষিত গুড়ব্রাহ্মণেরা কিরূপে খাঁ জাহানের অভিযানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং পরে কিরূপে এই বংশীয় কামদেব ও জয়দেব মহম্মদ তাহেরের কৌশলে পীরালি-মুসলমান হইয়া যান। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুকুট রায় প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য্য করিতেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে মহেশপুর হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম দিকে এ রাজ্য গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। * এই শাসনকার্য্যে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহার আত্মীয় ও সেনাপতি দক্ষিণ রায়। ‡ দক্ষিণ রায়ও ব্রাহ্মণ এবং দেবভক্তিপরায়ণ। রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে মুকুটেশ্বর শিবমন্দির ছিল, দক্ষিণরায় মন্দিরে গিয়া শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অধিবাসীর সংখ্যা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিল বলিয়া নগরের নাম ব্রাহ্মণনগর হইয়াছিল। মুকুট রায় অতিরিক্ত যবনদ্বেষী ছিলেন; তখন সম্যক্ শাসন বিস্তৃত না হইলেও দেশ যবনাধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু তবুও মুকুট রায় যবনের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, যবনের মুখ দর্শন করিতেন না, কোনও কারণে যবন দর্শন করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। শাসনের সুব্যবস্থার জন্য মুকুট রায়ের রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে উত্তর ভাগ তিনি নিজে শাসন করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার অধীনে যথেষ্ট পদাতিক ও অশ্বারোহি সৈন্য ছিল; দক্ষিণ দেশ বা ভাটি মুল্লুকের শাসনভার দক্ষিণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে লোকে ভাটীশ্বর এমন কি আঠাঁর ভাটির রাজ্যেশ্বর বলিত। *

---

* কেহ কেহ বলেন মুকুট রায়ের জমিদারি পাবনা হইতে সমুদ্র এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তৎকালীন দিল্লীর পাঠান বাদশাহের নিকট হইতে পাঞ্জালাভ করিয়াছিলেন। "প্রদীপ", ১৩১১ আশ্বিন; গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬১ পৃঃ।

† মুসলমানী কেতাবেও আছে:—"দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোসাঞি
তার সমতুল বীর ত্রিভুবনে নাই।"

‡ যতক্ষণ একবার ভাঁটা থাকে, অর্থাৎ ৬ ঘণ্টায় যতদূর নৌকাপথে পাওয়া যায়, তাহাকে এক ভাঁটি পথ বলে। সুন্দর বনে এইভাবে দূরত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। নৌকাপথে ঘণ্টায় ৩।৪ মাইল গেলেও এক ভাঁটায় অন্ততঃ ২০ মাইল পথ অতিক্রম করা যায়। তাহা হইলে আঠার ভাঁটায় অন্ততঃ ৩০০ মাইল যাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুন্দর বন রাজ্য পূর্ব্বকালে উত্তর দিকে যতদূরই বিস্তৃত থাকুক, তাহা ৮০ মাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল না। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন

এজন্য তাঁহার রীতিমত নৌ-বাহিনী ও নৌ-সৈন্য ছিল। এই ভাটি দেশে কাঠ, মধু, মোম প্রভৃতি হইতে আয়ও কম হইত না। সুন্দর বন তখন উত্তর দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ভীষণ ব্যাঘ্র প্রভৃতির উৎপাত ছিল। দক্ষিণ রায় তেমনি বলবান্ পুরুষ ছিলেন; তিনি তীর ধনুক ও অস্ত্র সাহায্যে বহু ব্যাঘ্র ও কুমীর শিকার করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে মল্লযুদ্ধেও সুন্দর বনের বাঘের মুণ্ডপাত করিতে পারিতেন। অতিরঞ্জিত হইলে এই সকল গল্প কতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ রায় এই বলবীর্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সুন্দর বনের ব্যাঘ্রভীতিনিবারক দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

এই ব্যাঘ্রের দেবতার পূজাপদ্ধতি প্রচার জন্য অনেকেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য এবং নিমতা গ্রামনিবাসী "রায়মঙ্গল"-প্রণেতা কৃষ্ণরাম দাসই প্রধান। রায় মঙ্গল হইতে জানা যায় প্রভাকর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে বন কাটাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি শিবের বরে দক্ষিণরায় নামক পুত্র লাভ করেন। দক্ষিণ রায়ের আর এক ভ্রাতা বা বন্ধু ছিলেন কালু রায়। এই কালু রায়ের সহিত গাজীর সহচর কালুর কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। *

সম্ভবতঃ প্রভাকরের পুত্র দক্ষিণ রায় হাতিয়াগড় প্রদেশে আজন্ম ব্যাঘ্র শিকার প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিয়া, সুন্দর বনে শাসন বিস্তারকার্য্যে পিতার

"দক্ষিণ রায় আঠার ভাঁটির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ আঠারটি ভাঁটায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অধিকার পাইলেন।" এবং "রায়মঙ্গলে"ও আছে, দক্ষিণ রায়ের আমল আঠার ভাঁটি।" দক্ষিণরায় দেবতা কবি কৃষ্ণরামকে স্বপ্ন দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার,—
আঠার ভাঁটির মধ্যে হইবে প্রচার।" সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩য় ভাগ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৯৭ পৃঃ।

আমাদের মনে হয় যেমন সুন্দর বনে নদীবিশেষের নাম আঠার বাঁকী অথচ তাহাতে ঠিক আঠারটি বাঁক আছে কি না সন্দেহ, সেইরূপ আঠারটি নদীর গতিপথ দ্বারা সমস্ত সুন্দর বন বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

* কেহ বলিয়াছেন দক্ষিণরায় ও কালুরায় অভিন্ন ব্যক্তি। (Dacca Review vol. 3 No. 3 p. 148, Wise's Notes on Races & pp 13-14). "রায়মঙ্গলে" কিন্তু অন্যরূপ আছে। দক্ষিণ রায় নিজেই বলিতেছেন যে তিনি কালু রায় কর্ত্তৃক হিজলী প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষ, ৮ম, ২৮৯ পৃঃ।

সহায়তা করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি মুকুট রায়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল; তিনি সেই বীর যুবককে স্বীয় কার্য্যের সহায়ক রূপে গ্রহণ করেন। রাজার ধনবল ও জনবল দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া, বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে বা জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দর বনে শত্রু শাসন করিতে করিতে এমন রণপাণ্ডিত্য লাভ করেন, যে তাঁহার ভয়ে কেহ সুন্দর বনে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। দক্ষিণ রায়ও মুকুট রায়ের মত যবনদ্বেষী ছিলেন। এই যবনদ্বেষই তাঁহাদের কালস্বরূপ হইয়াছিল। এই জন্যই গাজী তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে অগ্রসর হন।

এই স্থানে আমরা ধীর ভাবে কয়েকটি কথা বিচার করিব। আমরা চারি জন মুকুট রায়ের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম দুই জনের সহিত প্রস্তাবিত ইতিহাসের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই। তৃতীয় জনকে আমরা রায় মুকুট বলিয়াছি; চতুর্থ জনকে বলিয়াছি মুকুট রায়। এই দুই জনকে এক ব্যক্তি বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। যিনি ঝিনাইদহের মুকুটের কথা বলিতে গিয়াছেন, তিনি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার একটি রাজধানী দক্ষিণ দিকে ছিল; কিন্তু সে মুকুটের সহিত গাজীর যুদ্ধ বা চম্পাবতী নামক তাঁহার কোন কন্যার কথা উল্লিখিত হয় নাই। * অপর পক্ষে যিনি ব্রাহ্মণনগরের মুকুটের কথা বলিয়াছেন, তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্য উত্তর দিকে অনেক দূর বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি নবাব সৈন্যের সহিত যুদ্ধের কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই। আমরা মনে করি, এই দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাহার কয়েকটি কারণ সংক্ষেপতঃ এই—(১) রায়মুকুট পারি-শ্রোত্রিয় এবং মুকুট রায় গুড়-শ্রোত্রিয়, যদিও শেষোক্ত জনের সামাজিক নিদর্শন সম্বন্ধে জনশ্রুতি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই। (২) রায় মুকুটের চম্পাবতী নামে কোন কন্যার কথা পাওয়া যায় না। (৩) রায় মুকুটের সহিত গাজীর যুদ্ধ হয় নাই বা দক্ষিণ রায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের উল্লেখ নাই। (৪) রায় মুকুট যুদ্ধে বন্দী হইয়া রাজধানীতে নীত হইয়াছিলেন; মুকুট রায় বন্দী হইবার পূর্ব্বেই

* বাবু রামশঙ্কর সেন রায় মুকুটের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণনগরের মুকুটরায়ের কতক বিবরণ দিয়াছেন। কুশদহ ৩য় বর্ষ, ৬৬, ১১১, ১৩৮ পৃঃ।

কূপে পড়িয়া আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। (৫) রায় মুকুট নবাব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কালে পরিবারবর্গ শৈলকূপার সন্নিকটে কোন দুর্গে রাখিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু হয়। অথচ প্রবাদ অনুসারে অন্য মুকুট রায়ের পরিবার-বর্গ ব্রাহ্মণনগরে কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। সুতরাং রায়মুকুট ও মুকুট রায় এক ব্যক্তি নহেন, এবং তাঁহারা এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হন নাই। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণনগরের মুকুট রায় হোসেন সাহ ও তৎপুত্র নসরৎ সাহের রাজত্ব কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন এবং ঝিনাইদহের রায় মুকুট তাঁহার অনেক পরে অর্থাৎ মোগল-আমলের প্রথম ভাগে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এইরূপ অনুমান করিবার কি কারণ আছে, তাহা পরে বলিব। আমরা এখানে রাজা মুকুট রায়ের কথাই বলিতেছি।

মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী * ও তাঁহার সাত পুত্র এবং একটি মাত্র কন্যা। সাত ভ্রাতার ভগিনী বলিয়া ভগিনীটি সকলেরই বিশেষ আদরের ছিল; এরূপ আদরের ভগিনীর প্রসঙ্গ উঠিলে আমাদের এখনও "সাত ভাই চম্পার" কথা অনেকে বলিয়া থাকে। চম্পাবতী অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী ছিল; এমন কি তাহার রূপের কথা নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গাজী সেই রূপের খ্যাতি শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মুকুট রায়ের মুসলমান-বিদ্বেষের কথা জানিতেন। সেই ধর্ম্মবিদ্বেষের জন্য প্রতিহিংসা লইবার কল্পনাই হউক বা প্রকৃত রূপমোহেই হউক, গাজী চম্পাবতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য কালুকে পাঠাইলেন। মুকুট রায় যবনের দুঃসাহসিক প্রস্তাবে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কালুকে কারাবদ্ধ করিলেন। সুলতান হোসেনসাহ মুকুট রায়ের যবন-বিদ্বেষের কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং পরে গাজীর বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিয়া লইয়া উহার প্রতিশোধ দেওয়া জাতিগত কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া ছিলেন। গাজী সোণারপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাপথে অনেক সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, হুসেন সাহের সৈন্যদলও আসিতেছিল। যেন সকল আয়োজন ও অভিযান কালুর কারামোচনের জন্যই হইতেছিল।

দক্ষিণ রায় এ যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। দক্ষিণ দিক্ হইতে যখন গাজীর সৈন্য আসিবার উপক্রম হইতেছিল, তখন তিনি ত্বরিত গতিতে নৌ-

* "রায়মঙ্গলে" কিন্তু দক্ষিণ রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বাহিনী সাজাইয়া লইয়া অতর্কিত ভাবে গাজীর সৈন্যের উপর পড়িলেন, এবার গাজীকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, ইছামতী-তীরে তারাগুণিয়া গ্রামে সৈয়দ সাদাউল্লার বাটীতে গাজী সাহেব আশ্রয় লইয়া-ছিলেন। * পরে গাজী সমস্ত সংবাদ সুলতান হুসেন সাহের নিকট গিয়া অতি-রঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। গাজীর পরাজয়, কালুর কারাবাস, মুসলমানের অপমান, হিন্দুরাজন্যের অবাধ্যতা—সকল একত্র করিয়া এক ধর্ম্মযুদ্ধের কারণ উপস্থিত করিল। গৌড়েশ্বরের সৈন্যসমূহ জাতীয় মর্য্যাদার জন্য মুকুট রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। হিজলী ও হাতিয়াগড় প্রদেশ হইতেও গাজী সাহেব অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলেন। দক্ষিণ রায় ও নদীতীরসমূহ উৎসন্ন ও বাসশূন্য করিয়া, খাদ্যদ্রব্য দূরীভূত বা ভূপ্রোথিত করিয়া, যেখানে সেখানে গুপ্ত সৈন্য সংস্থাপন করিয়া শত্রুর আগমন-পথ কণ্টকময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

গাজী কালুর পুঁথিতে আছে, গাজী কতকগুলি ব্যাঘ্র লইয়া ব্রাহ্মণনগরের নিকট উপনীত হইলেন এবং ব্যাঘ্রদিগকে মেষ করিয়া লইয়া গুপ্তভাবে নগরে প্রবেশ করিলেন। এ ব্যাঘ্র সুন্দর বনের চতুষ্পদ ব্যাঘ্র বলিয়া বিশ্বাস করি না, তবে ইহারা সুন্দর বনের অসভ্য মল্লজাতীয় বলশালী সৈন্য হইতে পারে। মোট কথা, গাজী গুপ্ত ভাবে নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অন্য দিক্ হইতে গৌড়ে-শ্বরের সেনা আসিল। কয়েক দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল। মুসলমানেরা পুরীর মধ্যবর্ত্তী কূপের জলে গো-রক্ত প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া বিষাক্ত করিয়া দিল। † অবশেষে মুকুট রায় পরাজিত হইলেন। তখন দক্ষিণ রায় অন্য সৈন্য লইয়া

---

* কুশদহ, ৩য় বর্ষ, ১:৩ পৃঃ।

† প্রবাদ এই মুকুট রায়ের পুরী মধ্যে একটি কূপ ছিল, তাহার নাম মৃত্যুজীব কূপ। ঐ কূপের জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিত। শত্রু কর্ত্তৃক গোমাংস নিক্ষিপ্ত হওয়াতে কূপের সে শক্তি নষ্ট হয়। এখনও লাউজানিতে যশোহর রাস্তার সন্নিকটে এই মৃত্যুজীব কূপ বা জীয়ৎ কুঁড়ির স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পরমশ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় স্বপ্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে জঙ্গীপুরের মধ্যে এক স্থানে জীবৎ কুণ্ড আছে, উল্লেখ করিয়াছেন। সেও হুসেন সাহের আমলের ঘটনা। এক তিওর রাজার সহিত যুদ্ধকালে হুসেন সাহের সৈন্যগণ গোমাংস দ্বারা সেখানেও উক্ত কুণ্ডের শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃঃ।

দক্ষিণ দিকে ছিলেন। মুকুটের পরিবারবর্গ অধিকাংশই কূপে পড়িয়া আত্ম-হত্যা করিলেন। কেবলমাত্র মুকুটের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র কামদেব ও কন্যা সুভদ্রা বা চম্পাবতী বন্দী হইলেন। শত্রুরা ইঁহাদের উভয়কেই অখাদ্য খাওয়াইয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছিল। কেহ বলেন গাজী সাহেব চম্পাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মুসলমানী পুঁথিতে আছে গাজী সাহেব চম্পাবতীকে বিবাহ করিবার কিছু দিন পরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আবার কেহ বলেন, গাজী সাহেব চম্পাবতীকে বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিবার প্রস্তাবনা ছল মাত্র; যবনদ্বেষী মুকুট রায়কে শাসন করাই উদ্দেশ্য ছিল। গাজীরা হিন্দুর সহিত বিবাদ করিতেন, বা হিন্দু জাতির উপর অত্যাচার করিতেন, সে শুধু ধর্ম্মের জন্য। অন্যান্য গাজীদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে বিশ্বাস হয় না যে গাজীসাহেব নর-পিশাচদিগের মত ইন্দ্রিয়সেবী ছিলেন। এ বিষয়ে মুসলমানী পুঁথিতে গাজী সাহেবের কামুকতার যে বিস্তৃত কাহিনী আছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হয়। উক্ত পুঁথিতেই আছে যে কালু গাজী সাহেবের চরিত্র-পতন দেখিয়া বারংবার ভর্ৎসনা করিতেছেন। * যাহা হউক, গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহান্তে বা বিবাহের পূর্ব্বে, সেই রাজকুমারী কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পলায়ন করিয়া সাতক্ষীরার গণরাজার আশ্রয় লন এবং অবশিষ্ট জীবন মনস্তাপে, স্বজন-শোকে, আত্মচিন্তায় ও ধর্ম্মসাধনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল, তাহা সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিয়া পরসেবায় এমন ভাবে তাঁহার আদর্শ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকে তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিত, মায়ের মত ভক্তি করিত,—তাঁহার নাম হইয়াছিল "মাই চম্পা বিবি।" তাঁহার মৃত্যুর পর এই মাতৃদেবীর ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর ও বৃহৎ এক-গুম্বজ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। সাতক্ষীরার সন্নিকটে লাপ্‌সা গ্রামে এই বিখ্যাত "মাইচাম্পার দরগা"

---

* কালু বলিতেছেন :—"কহে তুমি হও ভাই আল্লার ফকির; হিন্দু মোছলমান তুঝে সবে মানে পীর। হেন কথা বল তুমি বড়ই তকছির। জগত মাঝারে কত হৈল পীর অলি, বিধির দোয়াতে বুঝি নাহি ছিল কালী। তাদের অদৃষ্টে নাহি লিখিল এমন। তারা না কান্দিল কেহ নারীর কারণ। ইত্যাদি।"

এখনও আছে। * মাইচাম্পার পূর্ব্বজীবন নানা অদ্ভুত কাহিনীর অন্তরালে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। †

মুকুট রায়ের শিশুপুত্র কামদেব নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে চারঘাটে আশ্রয় লন। তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠাকুরবর হইয়াছিল। তিনি মুসলমান ফকিরের মত চারঘাটে বাস করিতেন। তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া ক্রমে সে ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্ত্তী কালে তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুরবর প্রায় ১০০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের উত্থানপতন এবং এমন কি প্রতাপের মৃত্যুর পরে ঠাকুরবর দেহত্যাগ করেন। হরি শৌণ্ডিক বা হ'রে শুঁড়ি নামক একজন প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিক্ চারঘাটে বাস করিত। তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য ঠাকুরবর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হরি তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহার ফলে ঠাকুরবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত হরি শৌণ্ডিকের বিবাদ ও পতনের মূলে যে ঠাকুরবরের প্ররোচনা ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনা করিব। হ'রে শুঁড়ি মৃত্যুও শ্রেয়ঃ বোধ করিত, কিন্তু ঠাকুরবরের কথায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই; তজ্জন্য সে অঞ্চলে একটা কথা আছে:—"ম'রলো, তবুও হ'রে শুঁড়ি ঠাকুরবর বল্‌ল না" অর্থাৎ ঠাকুরবরের বশ্যতা স্বীকার করিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—দক্ষিণরায় ও গাজীর কথার শেষ।

ব্রাহ্মণ নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণরায়ের পতন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ দক্ষিণরায়ের সম্মিলিত সৈন্যের সহিত সমস্ত মুসলমান সৈন্যের সহিত আর একটি মহা যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের প্রকৃত ফল কি হয়, তাহা

---

* বারাসতের সন্নিকটে ঘোলা গ্রামে কাছারীর দক্ষিণ দিকে মাইচাম্পার একটি আস্তানা আছে।

† কেহ বলেন চাম্পা বিবি বোগদাদের খালিফা বংশের অনূঢ়া কন্যা। তিনি ধর্ম্ম প্রচারার্থ এদেশে আসেন। Khulna Gazetteer p. 182.

জানা যায় না। তবে এই যুদ্ধে যে দক্ষিণরায় দমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ বলেন তিনি শেষ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইষ্টদেবতা সূর্য্যের মন্দিরের সম্মুখে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, দিব্যধামে গমন করেন। * কিন্তু "রায়মঙ্গল" প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, তিনি এই যুদ্ধের পর গাজীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

"বড় খাঁ গাজির সাথে, মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তা'র পর।"

এই দোস্তানি বা বন্ধুত্বের ফলে উভয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রভু হইয়া বসেন। কিন্তু তাঁহাদের উপর প্রভু ছিল, তাহারা যতই প্রভুত্ব করেন, বনদেবতার স্থান তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ। এ সম্বন্ধে রচিত গল্প আছে; "বনবিবির জহুরা নামা"—নামক মুসলমানী কেতাবে বনবিবির কেচ্ছা আছে। ঐ পুস্তকের মূল তাৎপর্য্য এই।—মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি, সতীনের কৌশলে গর্ভাবস্থায় সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হন। তথায় বনবিবি ও সা জঙ্গুলী নামে তাঁহার কন্যা ও পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ভাটীশ্বর দক্ষিণরায়ের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের আদেশে বনবিবি ভ্রাতাকে লইয়া ভাটিদেশে থাকিয়া যান। শিবাদহ, চাঁদখালি, রায়মঙ্গল হইতে আন্ধারমাণিক প্রভৃতিস্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। দক্ষিণরায় তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিলে, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ অকর্ত্তব্য এই কথা বুঝাইয়া দিয়া দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণী আসিয়া বনবিবির সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হইলে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল, কেঁদোখালি দক্ষিণরায়কে দেওয়া হইল, বনবিবি পরে হাসনাবাদ প্রভৃতি কতকগুলি স্থল নিজে লইয়া আবাদ করিলেন। এই সময় বরিজহাটিতে ধোনাই মোনাই নামে দুই ভাই ছিল। তাহারা সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইয়া মোমমধু আনিবার জন্য বাদায় গেল। তাহাদের সঙ্গে গেল জনৈক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র দু'খে। উহারা গড়খালি পৌছিলে দক্ষিণরায় নরবলি চাহিলেন—বাছিয়া চাহিলেন হতভাগ্য দু'খেকে। তাহাই হইল, দু'খেকে কেঁদোখালিতে নিক্ষেপ করা হইল। তখন বনবিবি আসিয়া দুর্ব্বল দু'খের পক্ষ

* কুশদহ, ৩য় বর্ষ, ১৪১ পৃঃ।

লইলেন। আবার যুদ্ধ বাধিল। এবারও দক্ষিণরায় পরাজিত হইলেন। তখন তিনি গিয়া বনবিবির আনুগত্য স্বীকার করিলেন, তাহার সঙ্গে আর একজন গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বরখান্‌ গাজী, তিনি সেকেন্দর সাহের পুত্র। উভয়ে বনবিবিকে সেলাম করিয়া দেশে ফিরিলেন—আর দেশে ফিরিল দু’খে। বনবিবির কৃপায় তাহার মাতার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচিল, দু’খের অতুল সম্পদ্‌ ও চৌধুরী খেতাব হইল। দু’খে ধনাইএর কন্যা চাম্পাকে বিবাহ করিল। বনবিবির পূজা প্রচার হইল।

বনবিবি মনুষ্য হইয়াই যখন দেবতা হইয়া গেলেন, তাঁহার অনুগত বীর দক্ষিণরায় কেন দেবতা হইবেন না? চিরজীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া যিনি বনবিভাগে বসতির পন্থা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত সুন্দরবন রাজ্য যাঁহার শাসনপ্রতাপে থরহরি কম্পবান ছিল, মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতে তিনি ব্যাঘ্রের দেবতারূপে পূজিত হইলেন। কোথায়ও তাঁহার মস্তকটি পূজা হয়, কোথায়ও বাঘের উপর আসীন গুম্ফ শোভিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির পূজা হয়।

"কাটা মুণ্ড "বারা" পূজা সেই হ'তে ক'রে
কোন খানে দিব্য মূর্ত্তি বাঘের উপরে।" *

তিনি ব্যাঘ্রভীতি নিবারক দেবতা। এই জন্য সুন্দরবনের পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে, বিশেষতঃ ২৪ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলে ও আবাদী মহলে এই দেবতার পূজা হয়। ধবধ'বে গ্রামে এই দেবতার এক মন্দির ও তন্মধ্যে তাঁহার মুকুট ও যোদ্ধৃবেশধারী এক প্রতিমা আছে। গণেশ-মন্ত্রে ও গণেশের ধ্যানোল্লেখ করিয়া এই দেবতার পূজা হয়।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি গাজী সাহেব বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যান। শ্রীহট্টে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জ উপবিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমান্তে বিষগাঁও নামক স্থানে গাজী সাহেবের সমাধি আছে। ঐ স্থানের নাম পরে গাজীপুর হইয়াছিল। † যশোহর খুল্‌না অঞ্চলে গাজীর পূজা হয়, হিন্দু মুসলমানে গাজীর সির্ণী দেয়,

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ২৪৪ পৃঃ।

† Eastern Bengal Notes and Queries by H. E. Stapleton, Dacca Review, vol III. p. 151.

এবং এক সময়ে "গাজীর গীতের" অত্যন্ত প্রচলন ছিল। আমরা যে গাজীর কথা এতক্ষণ বলিলাম, তিনি পাঁচ পীরের অন্যতম বরখাঁন গাজী। কিন্তু তদ্বিষয়েও মতভেদ আছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সেকেন্দর সাহার সহিত বরখান গাজীর পিতা-পুত্র সম্বন্ধ সংস্থাপন করা যায় না। তবে তিনি সেকন্দর সাহের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে ঠাকুরবরের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে না। ঠাকুরবর প্রায় ১০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আমরা দেখিব প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে কার্ভালোর হত্যাকালে অর্থাৎ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ফকির জীবিত আছেন। মুকুটরায়ের মৃত্যুকালে ঠাকুরবরের বয়স যদি ১০ বৎসর হয়, তাহা হইলে উক্ত মৃত্যুর তারিখ আনুমানিক ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ধরিতে হয়। তাহার আনুমানিক ২০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫০০ অব্দে বরখান গাজী সুন্দরবন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সেকন্দর সাহের রাজত্বকালে প্রচারিত হন, তাহা আমরা ধরিতে পারি না। কারণ সেকন্দর সাহের রাজত্বকাল—১৩৫৯ হইতে ১৩৯২ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব আমরা ধরিতে চাই যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আর এক দল গাজী বাঙ্গালাদেশে আসিয়া হুসেন সাহের সাহায্যে হিজলী হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন, বরখাঁন্ বা বড়খাঁ গাজী তাঁহাদের অন্যতম।

পাঠান আমলে নানা সময়ে গাজীগণ বঙ্গে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত নানাসূত্রে হিন্দু বৌদ্ধের বিবাদ হইয়াছে, তদুপলক্ষে নানা গল্প উপকথা জমিয়াছে; নানাস্থানে এই গাজীদিগের আস্তানা ও দরগা আছে; তাঁহাদের অত্যাচার-অবিচার ভাল মন্দ চরিত্রের কথা না জানিয়া সকল জাতীয় লোকে সমভাবে তাঁহাদের প্রতি পীর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। শূন্য হইতে দেখিলে যেমন বহু দূরবর্ত্তী স্থানের উচ্চতা নীচতা বা দূরত্ব সব সমান হইয়া যায়, আমরা এই দূরবর্ত্তী কালে জানিয়া, গাজীদিগের মধ্যে কে অগ্রে কে পরে আসিয়াছিলেন, প্রভৃতি কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না।

কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত বরখাঁন্ গাজী ও পীর গোরাচাঁদ বা গোরাইগাজীকে

অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মুকুটরায়ের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহও গোরাইগাজী করিয়াছিলেন, ইহাই স্থির হইয়াছে। আমরা ইহার সহিত একমত হইতে পারি না। পীর গোরাচাঁদ সম্বন্ধীয় এক স্বতন্ত্র মুসলমানী পুঁথি আছে, তাহাতেও মুকুট রায়ের গল্প নাই। তবে পীর গোরাচাঁদ দেউলিয়ার চন্দ্রকেতু রাজার ধ্বংসের কারণ তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রাজত্বকালে বালাণ্ডা বাগড়ী বিভাগের একটি প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। পাঠানেরাও এই স্থানে একজন শাসনকর্ত্তা পাঠাইয়া দক্ষিণ দেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন দ্বিগঙ্গার সন্নিকটে দেউলিয়া বলিয়া স্থান ছিল; দেউলিয়া এখনও আছে। এই স্থানে চন্দ্রকেতু নামে রাজা ছিলেন, গোরাই গাজী তাঁহাকে মুসলমান করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতাপান্বিত যবনদ্বেষী চন্দ্রকেতুকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তখন গোরাইগাজী রাজসরকারে তাঁহার নামে নালিস করেন। এই সময়ে বালাণ্ডায় পীর সাহ নামক একব্যক্তি পাঠান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চন্দ্রকেতুর সর্ব্বনাশ সাধনের ভার পীর সাহের উপর পড়ে। পীর সাহ চন্দ্রকেতুকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করেন। এখানেও সেই পারাবতের গল্প আছে।* পীরসাহ বালাণ্ডায় বন্দী হইলে পারাবত উড়িয়া গিয়া সংবাদ দেয়, তাহাতে পরিবারবর্গ সকলে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। চন্দ্রকেতু শেষে উদ্ধার পাইলেও স্বজনহীন জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া আত্মহত্যা করেন। দেউলিয়া শ্মশান হইয়া যায়। এখনও সেখানে কিছু ভগ্নাবশেষ আছে।

এদিকে গোরাই গাজী হাতিয়াগড়ে যান। তথায় রাজা মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ শাসন করিতেন। ইঁহাদের সহিত গোরাচাঁদের বিবাদ ও যুদ্ধ হয়। তাহাতে বকানন্দ নিহত হন এবং গোরাই গাজী ভীষণভাবে আহত হইয়া বালাণ্ডার সন্নিকটবর্ত্তী হাড়োয়ায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কালু ঘোষ নামক একজন গোয়ালা তাহার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করে। অবশেষে সেই কথা তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দীনের (১২৩০—১২৩৭) কর্ণগোচর হইলে তিনি গোরাই গাজীর সমাধির উপর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং মস্‌জিদের

* নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য ৬৭-৮ পৃঃ Hunter's Statistical Accounts Vol. I pp. 111-3.

সেবা নির্ব্বাহ জন্য ১৫০০ বিঘা জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন।* ১২ই ফাল্গুন তারিখে গোরাই গাজীর মৃত্যু হয়। তদবধি প্রতি বৎসর ঐ তারিখে হাড়োয়ায় এক প্রকাণ্ড মেলা বসে এবং মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। মেলায় ২৫।৩০ হাজার লোক সমবেত হয়। উহাতে চাউলের ক্রয় বিক্রয়ই খুব বেশী হয়। গোরাচাঁদ এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়ের আরাধ্য দেবতা। ফকিরেরা এখনও কলিকাতার রাস্তায় বা অন্য স্থানে সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া "পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান" বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

পীর গোরাচাঁদ ব্যতীত আরও কয়েকজন গাজী ফকিরের নাম বিখ্যাত হইয়াছে। বারাসতের একদিল সাহ, বাঁসড়ার মোবারক গাজী, এবং সোণার পুরের সন্নিকটে ঘুটিয়ারি সরিফ। মোবারক বা মোবরা গাজী সুন্দর বনের একাংশের ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ করিয়া, সে প্রদেশের সকলের পূজনীয় হইয়াছেন। মোবরা গাজীর দরগা নাই এমন গ্রাম পাওয়া দুষ্কর।† সোণারপুর হইতে ক্যানিং যাইতে ঘুটিয়ারী সরিফ বলিয়া একটি ষ্টেশন আছে। ঐ স্থানে ষ্টেশনের সন্নিকটে সরিফ সাহেবের প্রকাণ্ড দরগা ও মস্জিদ রহিয়াছে। প্রতিবৎসর অম্বুবাচীর দিন সেখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। রেলওয়ে কোম্পানীকে স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

মোটের উপর আমরা দেখিলাম, এই গাজীসম্প্রদায় সকলেই হাতিয়াগড় অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যশোহরখুল্‌নার ভিতর প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মস্রোতের গতি দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে ক্রমে উত্তরপূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

---

* এই মুসলমান নৃপতি আলাউদ্দীন হুসেন সাহ কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঁহাকে হুসেন সাহ ধরিয়া লইয়া, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৃত্যু তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন।

† Statistical Accounts Vol. I. p. 120.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—পাঠান আমলে দেশের অবস্থা।

হুসেন সাহের পুত্র নস্‌রত সাহের রাজত্ব কালে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া মোগল-কেশরী বাবর দিল্লীশ্বর হন। নস্‌রতের পর তাঁহার ভ্রাতা মামুদ সাহের সময়ে বিহারাধিপতি সের খাঁ গৌড়ের সিংহাসন কাড়িয়া লন (১৫৩৮)। কিন্তু তাঁহাকে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আক্রমণজন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তবে তিনি এত সুদক্ষ, এত পরাক্রমশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন, যে হুমায়ুনকে তাঁহার প্রতাপে প্রথম বঙ্গ হইতে ও পরে, এমন কি, দিল্লী হইতেও বিতাড়িত হইতে হয়। তখন বঙ্গেশ্বর সের খাঁ দিল্লীশ্বর সের সাহ হইয়া, প্রাচীন ইন্দ্র-প্রস্থ দুর্গে মস্‌নদ পাতিয়া কিছুকাল সবলহস্তে পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করেন। যশোহর-খুল্‌না সে শাসন বহির্ভূত হয় নাই।

আইনই-আকবরীতে স্পষ্টই লেখা আছে, সের সাহ মহম্মদাবাদ জয় করেন। হুসেনী বংশীয় কে তখন যশোহরের উত্তরাংশে তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে তিনি যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কতকগুলি হস্তী ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহার উল্লেখ আছে। ঐ সকল হস্তী খালিফাতাবাদের জঙ্গলে বন্য হইয়া গিয়াছিল। আকবরের শাসনকালে যশোহর-খুল্‌নায় যথেষ্ট বন্য হস্তী পাওয়া যাইত। * ইহা হইতেই প্রতাপাদিত্য তাঁহার হস্তি সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। সের সাহ শস্যের পরিবর্ত্তে অর্থ দ্বারা রাজকর দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সময়ে রাজস্বের হারও অতি কম ছিল। মোগল আমলে উক্ত হারের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সের সাহ সুশাসক হইলেও, তাহাকে নিবাজ্জিত বাদসাহী রক্ষা করিবার জন্য এত বিড়ম্বিত

---

* The ruler of this district (Mahammadabad), at the time of its con quest by Sher khan, let some of his elephants loose in its forests from which time they have abounded," "The Sarkar Khalifatabad is well wooded and holds wild elephants. "

Ain-iAkbari, Jarret, Vol. II, P. 123.

থাকিতে হইয়াছিল যে তাহার সে শাসনের অন্তরালে সমগ্র বঙ্গে, এমন কি, মহম্মদাবাদ, খালিফাতাবাদ, ফতেয়াবাদ সরকারে অর্থাৎ যশোহর-খুল্‌নায় যথেষ্ট প্রাদেশিক শাসন বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। উহারাই ফলে ভুঞা রাজগণের আবির্ভাব হইতেছিল। আমরা দেখিব পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে যশোহর-খুল্‌নার উত্তরাংশে ফতেয়াবাদে মুকুন্দরাম রায় এবং দক্ষিণাংশে যশোর-রাজ্যে বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য মস্তকোত্তোলন করেন। এই ভুঞা রাজগণকে পরাভূত করিবার জন্য যথেষ্ট বল ক্ষয় করিয়া মোগল-কুলতিলক আকবরকে বঙ্গদেশে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকের পরবর্ত্তী খণ্ডে সে বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে। আমরা এক্ষণে পাঠান-আমলের সাধারণ অবস্থার কতক স্থূল মর্ম্ম দিয়া এ খণ্ডের উপসংহার করিব।

পাঠান ও মোগল—নবাগত পাঠান বঙ্গে প্রবেশ করিবার সময়ে হিন্দুর দেশে পদে পদে বাধা পাইয়া, ধর্ম্ম প্রচারে, রণরঙ্গে বা অত্যাচারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আবর্ত্তের প্রথম স্তর পার হইলে, তাহারা স্থির হইল; তখন দেখা গেল, তাহারা ধনলুণ্ঠন বা দূরে বসিয়া রাজ্যশাসন করিবার জন্য আসে নাই। তাহারা আসিয়াছিল, ধর্ম্মপ্রচার করিতে এবং স্থায়িভাবে বঙ্গদেশে বাস করিতে। সুতরাং তাহারা ক্রমে ক্রমে পরকে আপন করিয়া, হিন্দুকে মুসলমান করিয়া, হিন্দুমুসলমান উভয়ের হিতকর কার্য্যাদির প্রতিষ্ঠান করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া বসতি স্থাপন করিল। কিন্তু মোগল তাহা করে নাই; মোগল আসিয়াছে, গিয়াছে, রাজ্য শাসন করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে বিশেষ কিছু চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। অথচ প্রাচীন যুগের পাঠান কীর্ত্তিসমূহ এখনও বর্ত্তমান। এই কীর্ত্তি-মন্দিরগুলির স্থাপত্যেরও একটা বিশেষত্ব আছে।

স্থাপত্য—কুটীরই ভারতবর্ষের আদর্শ আবাসস্থলী—বিশেষতঃ গাঙ্গেয় উপদ্বীপে এবং তদন্তর্গত যশোহর-খুল্‌নায়। এ দেশে পাহাড় পর্ব্বত নাই; লোণামাটীতে ইট ভাল হয় না; যাহা হয়, তাহা বহুকাল টিকে না। অথচ এই গরিব দেশে কাঠ, খড়, বাঁশ, নল, গোলপাতা প্রচুর জন্মে; সুতরাং কাঠ বা বাঁশের সাহায্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করাই এ দেশের চিরন্তন প্রথা। এই পর্ণশালাগুলি চৌচালা বা দোচালা হইয়া থাকে; চৌচালা ঘরের আদর্শ রাঢ় হইতে আসিয়াছিল, উহাকে সাধারণতঃ চৌরি ঘর বলে; দোচালা ঘরের পদ্ধতি

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিল, এজন্য উহাকে বাঙ্গালা ঘর বলে। এই চৌরি বা বাঙ্গালা ঘর নির্ম্মাণ করিতেই এদেশের লোক অভ্যস্ত। মন্দিরাদির জন্য তাহারা যখন ইটের দ্বারা স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, তখনও এই চৌচালা বা বাঙ্গালা ঘরের আদর্শ ভুলে নাই। এইজন্য এ দেশীয় মন্দিরের ছাদ প্রায়ই চৌচালা ঘরের মত। গোলগুম্বজ মুসলমান আমলে আমদানী হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে ইট দ্বারাই দোচালা বাঙ্গালা ঘর হইত; কখনও বা ঐরূপ দুইখানি বাঙ্গালা একত্র জুড়িয়া জোড় বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করা হইত। চৌরি ঘরে চারিধারে চারিখানি বারান্দায় চাল দিয়া যেমন আটচালা ঘর হয়, মন্দিরেও ঠিক ঐ ভাবে চারিধারে ঘুরাইয়া বারান্দা দেওয়া হইত। বড় চৌচালা মন্দিরের উপরে চারি কোণে চারিটি এক মধ্যস্থলে একটি চূড়া দেওয়া হইত, এজন্য ঐরূপ মন্দিরের নাম পঞ্চরত্ন। আটচালা মন্দিরে উক্ত পাঁচটি চূড়া ব্যতীত বারান্দার চারি কোণে চারিটি চূড়া থাকিত, এজন্য সেরূপ মন্দিরের নাম নবরত্ন। এই নবরত্ন মন্দিরের খোলা বারান্দায় দুই দুইটি স্তম্ভে তিনটি করিয়া খিলান থাকিত, সেই স্তম্ভে, খিলানে, ছাদের সীমান্তে চারিধারে নানা কারুকার্য্য থাকিত। এইরূপ কারুকার্য্য হিন্দু-স্থাপত্যের বিশেষত্ব ছিল।

হিন্দু-স্থাপত্যের কোন নিদর্শন দিবার উপায় নাই, কারণ যশোহর-খুল্‌নায় প্রাচীন হিন্দু-যুগের কোন মন্দির নাই। সে সব লবণাক্ত দেশের দোষে এবং অবশেষে পাঠানের অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঠান-আমলের প্রথম-ভাগেরও কোন হিন্দুমন্দিরাদি পাওয়া যায় না; মাত্র পাঠান-আমলের শেষ-ভাগের দুই একটি মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। উহারা মোগল-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া তাহাদিগকে মোগল-স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্তও করা যায়। ডামরেলীর নবরত্ন ও ইচ্ছাপুরের নবরত্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিষয় আমরা মোগলযুগে বিচার করিব।

পাঠানেরা যে সকল মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মোটামুটি একটা নূতন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পদ্ধতি মুসলমানের নিজস্ব হইতে পারে; কিন্তু উহার অধিকাংশই ভারতবর্ষে অর্জ্জিত। সমষ্টিতে পদ্ধতিটি মুসল-মানীয় হইলেও, ব্যষ্টিতে উহা হিন্দুর নিকটই ঋণী। হিন্দুমন্দিরের মত এক গুম্বজ, সেইরূপ স্তম্ভ, কার্ণিশ ও কারুকার্য্য। পাঠানদিগকে বাধ্য হইয়াও এরূপ

অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে তাহাদিগকে হিন্দু-মিস্ত্রী দ্বারা কাজ করাইতে হইত; হিন্দু-মন্দিরের উপাদান মস্‌জিদে লাগাইতে হইত, সুতরাং হিন্দুর ছাঁচ থাকিয়া যাইত। * পাঠানেরা শুধু গোল গুম্বজে এবং গুম্বজের সংখ্যাধিক্যে বিশিষ্টতা দেখাইতেন। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিবারও একটা নূতন রীতি ছিল। সংখ্যার মধ্যে তাঁহারা ১, ৩, ৫, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা গুলির সম্মাননা করিতেন। কোথায়ও ২, ৪, প্রভৃতি জোড় সংখ্যার গুম্বজওয়ালা মস্‌জিদ নাই। খাঁজাহানের সমাধি মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া এক-গুম্বজ মস্‌জিদের অভাব নাই উহা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধি গৃহগুলি প্রায় একগুম্বজই হইত। তিনগুম্বজ মস্‌জিদও সাধারণ প্রকৃতি; গৃহস্থ মুসলমান মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তি রাখিলে প্রায় ত্রিগুম্বজ মস্‌জিদই করিয়া থাকে। পঞ্চগুম্বজ মস্‌জিদ সচরাচর দেখা যায় না; বাগেরহাটে হুসেন সাহের যে মস্‌জিদ আছে, তাহা পঞ্চগুম্বজের দুই সারিতে অর্থাৎ দশগুম্বজে সম্পূর্ণ। আমরা পরে দেখিতে পাইব প্রতাপাদিত্য তাঁহার পাঠান সেনার জন্য যে বিখ্যাত "টেঙ্গা মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চগুম্বজবিশিষ্ট। আবার বিজোড় সংখ্যাগুলিকে পরস্পর গুণ করিয়াও গুম্বজের সংখ্যা নির্ণীত হইত, যেমন ৩×৩=৯; ৩×৫=১৫; ৩×১১=৩৩, ৭×১১=৭৭ প্রভৃতি। এতন্মধ্যে হিন্দুদের নবরত্ন মন্দিরের মত পাঠানের নবগুম্বজ মস্‌জিদের খুব আদর ছিল, আমরা দেখিয়াছি, বাগেরহাটে দিদার খাঁ মস্‌জিদ ও মস্‌জিদকুড়ে বুড়া খাঁর বিখ্যাত মস্‌জিদ উভয়ই নবগুম্বজবিশিষ্ট। আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, খাঁজাহান দিল্লীশ্বর মামুদ তোগলকের উজীর ছিলেন; ঐ মামুদের পিতামহ বিখ্যাত নৃপতি ফিরোজ সাহের এক উজীর ছিলেন, তাঁহারও নাম খাঁজাহান। সেই খাঁজাহান ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বিখ্যাত "কালান মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করেন। দিল্লীতে ইহা একটি অতি প্রাচীন কীর্ত্তি। ঐ মস্‌জিদে

* Though general plan is Saracenic, the details are broadly Hinduistic. This Hindu influence was quite natural. The Governors had to depend entirely on Hindu artisans for construction and for materials they utilised the fragments of Hindu temples they had demolished.—J. A. S. B. Vol. VI. No 1. *See* also Havell's Indian Architecture. pp. 2-3, 13, 21.

পশ্চিমদিকে ৩ সারিতে ১৫টি গুম্বজ ও অপর তিনদিক্ ঘুরাইয়া ১৫টি গুম্বজ আছে। খাঁজাহান উহা দেখিয়াছিলেন, এবং উহারই আদর্শে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; বঙ্গে ছোটপাণ্ডুয়ায় ফিরোজ সাহের ভাগিনেয় সাহ সফি কর্ত্তৃক যে ৩×৭×৩=৬৩ গুম্বজওয়ালা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তিনি তাহাও দেখিয়াছিলেন। এ সকলগুলি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক গুম্বজের মস্‌জিদ নির্ম্মাণ জন্য খাঁজাহান ৭×১১=৭৭ গুম্বজে বিখ্যাত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। এই সকল মস্‌জিদাদির জন্য ইট সে সময়ে ছাঁচে বা ফর্ম্মায় প্রস্তুত হইত না। উৎকৃষ্ট কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া তাহা সমতল স্থানে ঢালিয়া দেওয়া হইত, পরে রৌদ্রে শুকাইলে কোন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া আবশ্যক মত নানা আকারের ইট প্রস্তুত হইত। উহাই পাঁজায় পোড়াইলে ইঠ হইত। মসল্যার জন্য সুরকীর ব্যবহার কম ছিল; সাধারণতঃ বালি চুণ দ্বারাই মসল্যা হইত। আমরা সর্ব্বত্রই সেই একই উপাদানে মসল্যা প্রস্তুত হইত বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি।

ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এ সময়ে হিন্দুরা সকলেই দেবতা-পূজক। তন্মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। শৈব বলিয়া কোন বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না। কারণ শাক্ত বৈষ্ণব সকলেই শিবপূজা করিতেন, কেহই শিবের বিরোধী ছিলেন না। দেবী-মন্দির বা বিষ্ণু-মণ্ডপের পার্শ্বেই শিব-মন্দির শোভা পাইত। এ দেশীয় হিন্দু-স্থাপত্যের বিশেষ নিদর্শন শিবমন্দিরেই প্রকাশ পাইত। পূজার মধ্যে শিবপূজা সহজ, সকল জাতীয় লোকে শিবপূজা করিতে পারে, ইহার জন্য পৃথক্ দীক্ষার প্রয়োজন নাই, এই সকল কারণে শিবপূজা সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছিল। বিষ্ণু-মণ্ডপে বা দেবী-মণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু শিব-মন্দিরে এরূপ কোন বাধা দিবার উপায় হয় নাই। উহার মধ্যে সর্ব্বজাতীয় লোকে যাইত, ইচ্ছামত পূজা করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। শিবই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য দেবতা হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এদেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম একটা বিশেষ মত না হইয়া সর্ব্বজাতীয় লোকের সাধারণ মত ছিল। ব্রাহ্মণেরা শূন্যবাদী বৌদ্ধ শ্রমণের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে দিতেন না। যেটুকু বাকী ছিল, পাঠানদিগের

অত্যাচারে তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পাঠানেরা কিরূপে বৌদ্ধ সংঘারাম ধ্বংস করিত এবং সহজ উপায়ে অধিক সংখ্যক বৌদ্ধকে মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিত। এইরূপে এত বড় একটা বৌদ্ধজাতির যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, তাহার লোপ হইয়াছিল। আবুলফজল এত অনুসন্ধান দ্বারা যে প্রকাণ্ড "আকবর-নামা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমেও বৌদ্ধ কথাটি নাই। ব্রাহ্মণ ও পাঠান উভয়ে বড় দক্ষহস্তে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে কেহ বৌদ্ধবিশ্বাসে ভর করিয়া ব্রাহ্মণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিত না। যাহারা ক্রমে ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহারা "নবশাখ" বা নূতন গঠিত এক শাখা-সম্প্রদায়ে স্থান পাইল। আর যাহারা তখনও বশীভূত হইল না, ব্রাহ্মণের চেষ্টায় ও রাজাদেশে তাহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিল। পশ্চিমবঙ্গে লোকে ভয়ে ভয়ে বুদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনামে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ক্রমে সেই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি যশোহর-খুল্‌নার পশ্চিমাংশে কুশদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়; কুশদ্বীপ অঞ্চলেও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে সে পূজা দেখা যায়। মতান্তর গ্রহণ করা বড় কঠিন কার্য্য; নিম্নশ্রেণীর লোকে তাহা সহজে পারে না। তাহারা সব ত্যাগ করিতে পারে, ধর্ম্মত্যাগ করিতে চায় না। এইজন্য ডোম, হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা ধর্ম্মত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

আমাদের দেশে এখন এইরূপ যে সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ জাতি আছে, তন্মধ্যে যোগী জাতি প্রধান। * ইহাদের আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি দেখিলে সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা কিছু পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। যোগী জাতির কোন ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত নাই; তাহারা আবশ্যকীয় গৃহপূজা ও দীক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য নিজেরা সম্পন্ন করে। যোগীরা সংস্কৃত চর্চ্চার কিছু অধিক পক্ষপাতী; ব্রাহ্মণ

---

* যোগীদিগকে যুঙ্গী বা জুগী নির্দ্দেশ করিয়া উহাদের সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ মত আছে, তজ্জন্য "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থের ৬৫০—৬৬২পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই জাতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়, "The Yogis of Bengal, a monograph" (by Radhagovinda Nath M. A.) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদ্য কায়স্থ ছাড়া এত অধিক সংস্কৃতানুরাগী জাতি নাই। যোগীদিগের সাধারণতঃ গায়ের রঙ্‌ বেশ ফরসা; ইহাতে তাহাদিগকে যেন এদেশের লোক বলিয়া বোধ হয় না। যোগীরা কিছু নিরীহ, ধর্ম্মপ্রাণ, তাহারা মোকদ্দমা-মামলার বিশেষ পক্ষপাতী নহে। যোগীরা অনেকে নিরামিষ আহার ভালবাসে, পূজাদিতে পশুবলি দেয় না। তাহাদের মৃতদেহ পূর্ব্বে অগ্নিদগ্ধ করিত না; যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পুতিয়া রাখিত। * এই সকল দেখিলে বোধ হয়, ইহারা যেন এ দেশের জাতি নহে, ইহারা যেন কোন উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারাও তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের শেষাবস্থায় একদল যোগাচারী বৌদ্ধ এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহারা 'নাথ' উপাধিধারী বলিয়া ঐ সম্প্রদায়কে নাথসম্প্রদায় বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি প্রধান। এক সময়ে ইঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতীয় রাজন্যবর্গের গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন। নেপালে ও তিব্বতে এখনও ইঁহাদের অনেকের পূজা হয়। নেপালে পশুপতিনাথদেবের মন্দিরের সম্মুখে গোরক্ষনাথের মন্দির বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদের ধর্ম্মমত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইলেও হিন্দু অপেক্ষা তাঁহারা বৌদ্ধমতেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। † নাথ-যোগিগণ সেনরাজত্বে বঙ্গের অনেকস্থানে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। "দেশাবলীবিবৃতি" নামক পুস্তকে কথিত হইয়াছে, জনৈক বৌদ্ধ নরপতি বঙ্গদেশীয় যোগিপণ্ডিতের রাজধানী ধর্ম্মপুর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ‡ নাথগণ বঙ্গদেশে নানাজাতি হইতে

---

* আমাদের দেশে এখনও কাহারও গায়ের রঙ্‌ অতিরিক্ত ফরসা দেখিলে, তাহাকে "যুগে'ন সুন্দর" বলা হয়; অর্থাৎ যেন তেমন শ্বেতবর্ণ এদেশীয় লোকের প্রকৃত রঙ নহে। যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পুড়াইয়া থাকে; পূর্ব্বে তাহা পুতিয়া রাখিত। উপবিষ্ট অবস্থায় পুতিয়া রাখা হিন্দুর চক্ষে বিসদৃশ লাগিত, তাহারা মনে করিত উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়। এখনও লোকে "যুগেন পোতা পুতিবার" ভয় দিয়া থাকে।

† Modern Budhism by N. N. Bosu P. 16, J. A. S. B. (1895) "Budhism in Bengal"

‡ A. S. B Ms no. 3582. Discovery of Living Buddhism in Bengal by M. M, Haraprasad Sastri M. A. p, 5.

বহুশিষ্য গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন। * ইঁহারাই বর্ত্তমান যোগী জাতির পূর্ব্বপুরুষ। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত এদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছিল, তখন নিরীহ যোগিগণ শৈবমত পরিগ্রহ করিল। † ক্রমে যোগী ও অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধজাতির মধ্যে দেউল বা চরকপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইল।

এই দেউল পূজাটিই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধোৎসব বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ লাগিত না, এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে লাগে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চজাতির বাড়ীতে রাত্রিতে যে ছাগবলি দিয়া নীলপূজা বা শিবপূজা করা হয়, সে পদ্ধতি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পরে সংযোজিত হইয়াছে। নতুবা এই উৎসবের অধিকাংশ ক্রিয়াদি বৌদ্ধমতমূলক। গর্জ্জন শব্দের অপভ্রংশ 'গাজনে' ধর্ম্ম-প্রচারের জয়োল্লাস বা হুঙ্কার বুঝায়, ‡ ঘূর্ণ্যমান চড়ক বৌদ্ধধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের আভাস দেয়, হবিষ্যাশী সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধশ্রমণের প্রতিকৃতি। এখনও যশোহর-খুল্‌নায় দেউল পূজার প্রকৃত পুরোহিত যোগী জাতি। উহারা শিবপূজায় পাঁচালি গান না করিলে অঙ্গহানি হয়। এই শিবগায়কদিগের নাম "বালা" এবং তাহারা নূপুর পায়ে দিয়া নাচিয়া নাচিয়া যে গান করে তাহাকে "বালাকি" বলে। হস্তলিখিত পুঁথি অনুসারে বালাকি গান করা হয়। ঐ বালাকি পুঁথির সর্ব্বপ্রথমে অতীব অশুদ্ধ গ্রাম্যভাষায় সৃষ্টি বিবরণের সম্বন্ধে এই কথাগুলি পাইয়াছি :—

"অনাহেতু নাছিল, নাছিল ঋষিমেদিনী।
রূপ রেক নাহি প্রভুর অবর্ণ পরিমাণি॥

---

* এই নবদীক্ষিত যোগীরা গুরুর কথা মত শুদ্ধ ভাষায় কথা কহিত। উহা হইতে এদেশে একটা প্রবাদ হইয়াছে—'কা'লকের (কল্যকার) জুগী, ভাতকে বলে অন্ন।"

† "বঙ্গদেশে চৌকি দিল রাজা যত চর।
জুগী পাইলে প্রাণ বধ্য না করিহ ডর।" গোবিন্দ চন্দ্রগীত, ১২৩পৃ। আমরা পূর্ব্বে বিষয়ের কিছু আলোচনা করিয়াছি। ২৫২ পৃঃ

‡ গাজন ধর্ম্ম প্রচারের এক অঙ্গ ছিল। গোবিন্দচন্দ্রগীতে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। "হুঙ্কার ছাড়িল জুগী জোগ করি সার" (১২৫ পৃঃ), "ভস্ম কৈলা গোবিন্দচন্দ্র হুঙ্কার ছাড়িয়া।" (১০৫ পৃঃ) এই হুঙ্কারের একটা অর্থ আছে। একটা সাধারণ প্রবাদ আছে যে "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" অর্থাৎ বহুলোকের একত্র সমাগমে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

না ছিল রবি শশী, শূন্যসতি পার্শ্বঋষি, না ছিল এ মেউর মন্দার।
এ সব দেবগণ, সবে ছিল একজন, শূন্যে ভ্রমিলে নৈরাকার॥
হ'য়ে শূন্য নহে শূন্য, নহে শূন্যাকার।
এই শূন্য স্থল যে প্রভু আপনি নৈরাকার॥"

পাঠক এই বালাকি পাচালির সহিত শূন্যপুরাণের প্রারম্ভেই সৃষ্টিপত্তনের প্রথম কয়েক পংক্তি তুলনা করিতে পারেন ঃ—

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস॥"
"দেবতা দেহারা নছিল পূজিবাক দেহ
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ।" ইত্যাদি *

যে সংস্কৃত ধ্যান দ্বারা কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে, তাহা এই ঃ—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ কর-চরণং নাস্তিকায় নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম চ যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনগতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ" †

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শূন্যপুরাণে যে বৌদ্ধ শূন্যমূর্ত্তির পূজা আছে, দেউল পূজারও আরাধ্য মূর্ত্তি তিনি। এই বৌদ্ধ মহোৎসব ক্রমে শিবের নামে শিবের গল্প সমেত হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যোগীরা "বালা"রূপে তাহাদের পূর্ব্বতন মতেরই পরিচয় দিতেছে। ‡ তাহাদের অবস্থা পাঠান আমলে যেরূপ ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপ আছে।

---

* রমাইপণ্ডিত প্রণীত "শূন্যপুরাণ" (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত) ১ম পৃঃ।

† "Discovery of Living Buddhism" p. 12.

‡ যোগিগণ পৌষ সংক্রান্তিতে হিন্দুদিগের বাস্তুপূজার মত "ধলাই পূজা" করিয়া থাকে। এই ধলাই পূজা অন্য কোন জাতি করে না। এই উপলক্ষে তাহারা কতকগুলি গান গাহিয়া থাকে, তাহার নাম "হে'চো"। ধলার গুণ গাহিয়া যাওয়াই উহার উদ্দেশ্য। এই ধলার গুণ গাওয়া একটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

এই যুগে পাঠানেরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। পাঠানবিজয়ের প্রারম্ভে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের যেমন বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল, শেষভাগে তাহা ছিল না। তখন উভয় জাতি অনেকটা মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছিলেন। যাহারা নূতন মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহারা প্রাচীন হিন্দু-রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এমন কি হিন্দুর মত পূজা ও ব্রতপালনাদি করিত। * রাজা গণেশের সময় হিন্দু-দেবতা সত্যনারায়ণ, সত্যপীর হইয়া মুসলমানেরও আরাধ্য হন। তখন মুসলমানীপ্রথায় হিন্দু মুসলমানে সিরণি দিতে আরম্ভ করেন, সম্ভবতঃ হুসেন সাহ প্রভৃতি ইহার উৎসাহ দিতেন। † কিছুদিন পরে ফরিদপুর হইতে "ত্রিনাথের মেলা" প্রবর্ত্তিত হয়; ইহাতে রাত্রিতে গাঁজা ও মিষ্ট দ্রব্য দিয়া বিনামন্ত্রে শিবের পূজা করা হইত। হরিদাসই "হরির লুঠ" দিবার প্রথা আরম্ভ করেন। এইরূপে গাজীর সিরণি "মুস্কিল আসান" বা গোরাচাঁদের পূজা, বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের পূজা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ হারিতী দেবী হিন্দুদের শীতলাদেবী হইয়া পূজা পাইতেছিলেন।

সমাজ।—সামাজিক রীতিনীতি ধর্ম্মেরই অনুরূপ হয়। ইহাতেও মুসলমানী প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বল্লালের কৌলীন্যপ্রথার পর তদ্বংশীয় দনুজমাধবের সময়ে জাতিসমূহের সমীকরণ হইয়া কিছু কিছু নূতন সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু তদবধি ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে উহার উপর আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই দীর্ঘকাল মধ্যে সহজে নানা গোলযোগ এবং কুলীনদিগের প্রকৃতিতে নানা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণের মধ্যে মেল বন্ধন করেন। তিনি দোষের হিসাবে ব্রাহ্মণ কুলীনগণকে ৩৬টী মেলে বা বিভাগে বিভক্ত করেন, এবং উহাদের কোন্ ঘরের সহিত কাহার আদান-প্রদান হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দেন। দেবীবর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, অথচ বয়সে তাঁহা অপেক্ষা কিছু বড়। কিছুকাল পরে অর্থাৎ মোগল আমলে তাঁহার মেল বন্ধন হইতে ব্রাহ্মণসমাজে অনেক কুফল ফলিয়াছিল। সুলতান হুসেন সাহ হিন্দুদিগের গুণের মর্য্যাদানুসারে পুরস্কৃত করিতেন এবং তাঁহাদিগকে নানা

---

* আমরা পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়াছি। ৩০৯ পৃঃ।

† গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ।

সম্মানিত উপাধি দিতেন। তাঁহার অমাত্য বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁ কায়স্থ-সমাজের নানা সংস্কার করেন। সে সংস্কারের ফল এতদঞ্চলে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এ যুগে দুই দিক্ হইতে দুইটি বিভিন্ন সমাজের শক্তি-স্রোত যশোহর-খুল্‌নাকে প্লাবিত করিয়াছিল। পশ্চিমদিক্ হইতে নবদ্বীপ সমাজ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে চন্দ্রদ্বীপ সমাজ যশোহর-খুল্‌নার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কপোতাক্ষ নদ উভয় প্রতিপত্তির মধ্যসীমা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং উহা দ্বারা লৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তাঁহার সে ব্যবস্থা সমস্ত বঙ্গদেশের উপর কার্য্যকরী হইলেও নদীয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতিনীতিগুলি কুশদ্বীপ পার হইয়া কপোতাক্ষের পূর্ব্বদিকে গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সে অঞ্চলে পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবস্থাই প্রধান ছিল। একাদশী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বিধবাগণ "নির্জ্জলা" উপবাস করেন; কিন্তু কপোতাক্ষের পূর্ব্বদিকে একটা ধারণা আছে যে বিধবাদিগের বিশেষতঃ পুত্রবতী বিধবাগণের নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস করা পাপজনক। প্রকৃত যশোর রাজ্য নদীয়ার সীমা-বহির্ভূত ছিল। বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার অংশ এবং বাগের হাট মহকুমা তখন বরিশালের অংশ ছিল। সুতরাং এখনকার যশোহর-খুল্‌নার সীমানুসারে সমাজের অবস্থা স্থির করিতে হইলে, তিনটি সমাজের অবস্থা বুঝিতে হয়। চন্দ্রদ্বীপ, যশোর ও নদীয়া—আচার-ব্যবহারে ও আহার-পরিচ্ছদে পৃথক্ পৃথক্ ছিল।

সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু বৈষয়িক প্রতিপত্তি কায়স্থেরই অধিক ছিল। আইন আকবরিতে বঙ্গদেশে অসংখ্য কায়স্থ রাজন্যের নাম আছে; ভুঞা রাজগণের মধ্যেও অনেকে কায়স্থ ছিলেন। তবুও পাঠান আমলে রামচন্দ্র খাঁ, মুকুটরায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর পরিচয় পাই; এবং এ যুগের শেষভাগে কুশদ্বীপের অন্তর্গত ইচ্ছাপুরে হোড় চৌধুরীগণ ও ঝিনাইদহ অঞ্চলে নলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈদ্যগণ তখনও কোন জমিদারী সংস্থাপন করেন নাই; তাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা ও চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা সর্ব্বজাতীয় লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কায়স্থ

জমিদারগণ ভূমিবৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র এখনও যে নিষ্কর ভোগ করিতেছেন, তাহা কায়স্থদিগের দ্বারা প্রদত্ত। দ্বিগঙ্গার সেন, বনগ্রামের দত্ত, বোধখানার চৌধুরী, দাঁতিয়ার মিত্র, নলতার ভঞ্জ, হরিঢালী ও মহেশ্বরপাশার গুহমজুমদার, পাঁজিয়ার সিংহ ও বিষ্ণু, বাসড়ীর মিত্র সেখহাটির চৌধুরী প্রভৃতি বিখ্যাত কায়স্থ-বংশ পাঠান যুগে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিওর, কৈবর্ত্ত ও সাহা বংশীয় ভূম্যধিকারীও কোন কোন স্থানে ছিল। মাণিকপুরের তিওর রাজা, মহেশপুর ও চেঙ্গুটিয়ার মাঝিগণ এবং সিঙ্গিয়ার পাতালভেদী রাজার কথা উল্লেখ-যোগ্য।

সমাজে কাঠোর শাসন ছিল; সে শাসন-দণ্ড ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তবে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দলপতি বা সমাজপতিরা আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা করিতেন। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থের মধ্যে কুলীনদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নবাগত কায়স্থ কুলীনেরা মৌলিকদিগের উপর যথেষ্ট আবদার চালাইতেন। ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে সেনহাটি প্রভৃতি স্থানের সর্ব্ববিদ্যা-সন্তানগণ, সারল ও সেনহাটীর কাঙ্গারী বংশ এবং নলডাঙ্গার আখণ্ডল রাজবংশ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সেনহাটি বৈদ্য কুলীনের একটি প্রধান স্থান ছিল। সুবর্ণবণিকেরা সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত হইতেন। বৈশ্যদিগের মধ্যে গন্ধবণিকেরাই বাণিজ্য ব্যবসায়ে দেশে বিদেশে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়; পরে সে ধর্ম্মের বিলোপ সাধন ও শৈবধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, ইঁহারা শিবভক্ত এবং দেশ, শঙ্খ, আবট ও সন্ত্রীশ (ছত্রিশ) এই চারি আশ্রম ভুক্ত হইয়া পড়েন। * এই বণিক্‌গণ একসময়ে সমুদ্রপথে দূরবর্ত্তী দ্বীপোপদ্বীপে গিয়া সামান্য পণ্যবিনিময়ে বিদেশীয় ধন আনিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতেন; † বাঙ্গালীর ঔপনিবেশিকতার অনেক ইতিহাস ইহাদের বাণিজ্যকাহিনীর সহিত জড়ীভূত রহিয়াছে। চাঁদ সওদাগরের "সপ্ত ডিঙ্গা", বেহুলার কলার মান্দাসের বিচিত্র অভিযান বাঙ্গালীর নিকট এমন ভাবে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে যে

* গন্ধবণিক্‌তত্ত্ব ২৩৭ পৃঃ। বৌদ্ধ সংঘে যাঁহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেন, তাঁহারাই সঙ্ঘাশ্রম বা সংখ্যাশ্রমভুক্ত হইয়াছিলেন কিনা বিবেচ্য।

† কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ও দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে বিনিময় দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

গ্রামে গ্রামে চাঁদ সওদাগরের ভিট্টা বাহির হয়, বেহুলা আদর্শ সতীরূপে সীতা সাবিত্রীর পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন, "রামায়ণ" ও কৃষ্ণলীলার মত "বেহুলার ভাসান"ও গৃহে গৃহে গীত হইয়া গৃহস্থের মঙ্গল বৃদ্ধি করে। ইহা হইতেই যশোহর-খুল্‌নার পূর্ব্বভাগে ও বরিশাল জেলায় মনসাদেবীর পূজার এত প্রচলন হইয়াছে। *

শিক্ষা—সেনরাজত্বের মত পাঠান আমলেও শাস্ত্রচর্চ্চা ছিল। যদিও পাঠান-বিজয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় উৎপাতে অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা শত্রুর ভয়ে পাঠ বন্ধ ও পুঁথি লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব চিরকাল ছিল না। খাঁজাহানের আমলে ও হুসেন সাহের রাজত্বকালে পুনরায় ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামমাত্রেই টোল খুলিয়া ছিল, এবং শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। হুসেন সাহ সর্ব্বত্র শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। বৈদ্য পণ্ডিতের টোলেও কাব্য ব্যাকরণ এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ন্যায় স্মৃতি পড়িবার জন্য দলে দলে ছাত্র নবদ্বীপে যাইত। ইহা ব্যতীত সামান্য বাঙ্গালা পড়িবার জন্য পাঠশালা বা "চৌপাড়ি" ছিল; এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কাজী ও মৌলবীগণ স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে পারসী ও আরবী পড়াইতেন। তাঁহারাও ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগের মত ছাত্রদিগের আহার ও বাসস্থান দিতেন। পাঠশালায় প'ড়োগণ "সিদ্ধিরস্তু" বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিত, এবং নাম্‌তা, শত্‌কিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাবুড়ির হিসাব, কাঠাকালি, বিঘাকালি, মণকষা, প্রভৃতি মুখে মুখে অভ্যাস করিত। পাঠান-আমলের শেষভাগ হইতে মুসলমানেরা গুরুগিরিতে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন। তখন হিন্দুর বাড়ীতেও মুসলমান গুরু রাখিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু

* পদ্মপুরাণোক্ত মনসামঙ্গল লইয়া বেহুলার কথা ২২ জন কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বংশীদাস ও বিজয়গুপ্তের পুস্তক বিশেষ বিখ্যাত। "বাইস কবি মনসা" নামক পুস্তকে সকলের কবিতা একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় চন্দ্রধর বা চাঁদসওদাগরের ডিঙ্গা কিরূপে সাগরদ্বীপের পথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া দিগঙ্গার নিকট চন্দ্রকেতু রাজার দেশে বাণিজ্য করিতে আসিত; এবং বেহুলার মান্দাসও সম্ভবতঃ এই পথে পূর্ব্বমুখে গিয়াছিল। নেতি ধোপানীর ঘাটে মনসা পূজার প্রথম প্রচার হয় বলিয়া উল্লেখ আছে। সাগর দ্বীপ হইতে পূর্ব্বমুখে যাইতে আমরা নেতি ধোপানীর নদী দেখিতে পাই। (রেনেলের ম্যাপ দেখ) কেহ কেহ বলেন ধুবড়ীতেই নেতি ধোপানীর ঘাট ছিল।

হিন্দু অধ্যাপকেরা কখনও নিম্ন বা অপর জাতিকে সংস্কৃত শিখাইতেন না। পড়িবার পুঁথিপত্র সমস্তই তালপত্রে লিখিত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজের প্রথম প্রচলন হয়। তখন এ দেশীয় লোকে অনেকে কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। খুল্‌না জেলায় এখনও অনেক কাগজীদিগের বাড়ী আছে।

শিল্প—যশোহর-খুল্‌নায় যথেষ্ট কার্পাস জন্মিত। তুলসী ও বিল্বের মত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে কার্পাসের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকিত। গৃহে গৃহে চরকা ছিল; ব্রাহ্মণীগণ কার্পাসতূলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং অতি সূক্ষ্ম সূত্রে নবগুণ উপবীত প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। ভাল পৈতা তৈয়ার করা একটা বিশেষ প্রশংসার জিনিস ছিল। দরিদ্র গৃহস্থেরা সূতা প্রস্তুত করিত এবং তাঁতিবাড়ী লইয়া গিয়া সামান্য "বাণী" বা পারিশ্রমিক দিয়া উহা দ্বারা আবশ্যকীয় কাপড় প্রস্তুত করিয়া আনিত। এ প্রদেশে কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার মত অধিক পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত কি না বলা যায় না। বাঁশের খণ্ড হইতে গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে লোকে যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিত। বাঁশের ছিঁচে বা কাচনীর বেড়ায় বেতের বান্ধনে বড় কারুকার্য্য প্রকাশ করিত। নানাবিধ জলজ গাছের ছাল বা "বেতী" হইতে মাদুর ও শীতলপাটী প্রস্তুত হইত; নলের দড়মা, মলুয়াপাটী ও হোগলা চাঁচ ঘরের বেড়ায় লাগিত এবং অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধিও করিত। বেতের ধামা, বাঁশের "বেতী" হইতে ডালা, কুলা, ঝাঁকা সংসারীর একান্ত আবশ্যকীয় ছিল। জগন্নাথের রথে, ঠাকুরের দোলায়, কাঠের সিন্ধুকে, কাঁঠালের কাঠের কার্য্যে কাষ্ঠশিল্পীর ক্ষমতা প্রকাশ পাইত। এ দেশীয় কামারেরা উৎকৃষ্ট খাণ্ডা, দাঁ, কোদালী, কুড়ালি, খন্তা, জাঁতি, বঁটী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য অস্ত্র প্রস্তুত করিতে অতুলনীয় ছিল। উৎকৃষ্ট "আঁটালি" বা মাঁচালি প্রস্তুত করিয়া ঘরের মধ্যে টাঙ্গাইয়া, উহাতে গৃহসজ্জা রাখিত; স্ত্রীলোকেরা কাঁথা সেলাই ও "সিকা" প্রস্তুত করিয়া অন্য দেশকে পরাজয় করত যশোলাভ করিত। বিবাহাদি শুভকর্ম্ম উপলক্ষে "আই" গড়ান, পীড়ি, কুলা ও সরা চিত্রিত করা প্রভৃতি কার্য্যে গ্রামে গ্রামে দুই এক স্ত্রীলোক প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার পাইতেন। নৈবেদ্য রচনা, শিবগড়ান ও আলিপনা দেওয়া গৃহশিল্প ছিল। উৎসবাদিতে স্ত্রীলোকেরা বহুজনে মিলিয়া উলুধ্বনি বা

জোকার (জয়কার) দিতনে এবং কখনও সমস্বরে গান করিতেন বটে কিন্তু গানে বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। পুরুষেরা দেহতত্ত্ব ও "ভবানী বিষয়" প্রভৃতি সম্বন্ধে গান করিতেন; যাঁহারা দক্ষ তাঁহারা তানপুরারও সাহায্য লইতেন। রামকথা, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কালীকীর্ত্তন লইয়া পাঁচালি গান হইত, ইহাতে চামর ও মন্দিরার ব্যবহার ছিল। শেষভাগে হিন্দুর মধ্যে মনসার ভাসান ও মুসলমানের মধ্যে গাজীর গান প্রচলিত হইয়াছিল। চৈতন্যযুগে মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্ত্তনে দেশ মাতাইয়া তুলিত। রাজা মুকুট রায়ের সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ হইতে কিন্নরজাতি আনিয়া তাহার রাজধানীর সন্নিকটে বসতি করান; ইহারা নৃত্য-গীতে অতীব সুদক্ষ ছিল। মুকুট রায়ের পতনের পর ইহারা উলসী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। নদীমাতৃক দেশে অনেক লোক নৌকায় বাস করে; তাহারা আত্মতৃপ্তির জন্য যে গান গাহিত, সেই "সারী" গান আবার পরের চিত্ত-বিনোদন করিত। যশোহর-খুল্‌নার "সারী" গানের মত আর মিষ্ট জিনিস কিছু আছে কি না সন্দেহ। এ যুগে লোকে মৃত্তিকার দ্রব্যের উপর সুন্দর রঙ ফলাইয়া "মীনা" (enamel) বা এনামেল করিতে পারিত। হাঁড়ি কলসীর উপর এইরূপ মীনার কাজ হইত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। খাঁজাহানের সমাধি-মন্দিরের মেজের উপর মীনা করা ইট দিয়া ঢাকা ছিল। উহাতে ঘরের ভিতর অতি সুন্দর দেখাইত।

সাংসারিক জীবন—মুসলমানের আক্রমণ বা অত্যাচার দ্বারা দেশের শান্তি যতই নষ্ট হউক, অধিবাসীরা মোটের উপর সুখী ছিল; কারণ খাদ্য দ্রব্য তখন সুলভ ছিল। পাঠান ও মোগলে বিশেষ পার্থক্য এই ছিল, যে পাঠানেরা এদেশে বাস করিতেন, দেশের অর্থ দেশে রাখিতেন, তাহারা মোগলদিগের মত বাঙ্গালার অর্থ লইয়া দিল্লী আগ্রার সৌষ্ঠব বাড়াইতেন না। দেশের অর্থ দেশে থাকায় খাদ্য দ্রব্য সুলভ ছিল, পরিচ্ছদে বিলাসিতা ছিল না, প্রাচীন হিন্দুভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই; দুই চারি জন লোকে নূতন মুসলমানী ধরণ গ্রহণ করিলেও সাধারণতঃ দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয় নাই। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে "দুধ-মাছ" সস্তা ছিল, উহাই প্রধান খাদ্যোপকরণ। ধান চাউল অত্যন্ত সুলভ; "সকল ধান ২২ পাহারী" বলিয়া একটি কথা আছে,

অর্থাৎ ধান এত সস্তা যে ধানের ভালমন্দ বিচার করিয়া দামের তারতম্য ছিল না। ব্রাহ্মণেরা অনেকে নিরামিষভোজী এবং প্রায় সকলেই পর্ব্বদিনে, কার্ত্তিক মাঘ ও বৈশাখ মাসে মৎস্য খাইতেন না বলিয়া মৎস্যাশীর সংখ্যা কম ছিল। মৎস্য কিনিয়াও অতি কম লোকে খাইত; খাল বিল নদী পুষ্করিণীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ মাছ ধরিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রতি গৃহে গরু পোষা হইত; গোপালন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; বিশেষতঃ গরু বিক্রয় করা এক-প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, মুসলমানেরা কিনিয়া লইয়া গোবধ করিতে পারে, ইহার আশঙ্কা ছিল। গোবধের জন্য হিন্দুরা মুসলমানের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেন। ঘৃতই প্রধান খাদ্য ছিল; ঘৃত সংস্পর্শ ব্যতীত চাউল বা অন্ন শুদ্ধ হইত না, ঘৃতবিহীন আহার অতীব নিন্দনীয় ছিল। লোকে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত করিয়া দধি, ক্ষীর, নবনীত খাইত। দধি মাঙ্গলিক দ্রব্য ছিল, উহা ব্যতীত কোনও উৎসব বা নিমন্ত্রণ পূর্ণাঙ্গ হইত না। লোকে ছানা খাইত, চিনি খাইত, কিন্তু তখন সন্দেশ রসগল্যা প্রভৃতির আস্বাদ জানিত না। মুসলমানেরা নিজেদের মত কোরমা, কোপ্তা, কাবাব প্রভৃতি খাইতেন; তাঁহাদের খাদ্যের মধ্যে মাংসই অধিক থাকিত।

অধিবাসিগণ একখানি ছোট ধুতি পরিত, উহা এখনকার ধুতি অপেক্ষা দৈর্ঘ্যপ্রস্থে অনেক কম। গামছা চিরসহচর ছিল। কোনস্থানে যাইতে হইলে ধুতির সহিত একখানি চাদর বা উড়ানি ব্যবহার করা হইত এবং অল্পলোকে চটী জুতা লইতেন। কিন্তু দূরপথে যাইবার সময় চটী জুতা হাতেই চলিত, গন্তব্য স্থানের নিকট গিয়া চটি পায়ে দেওয়া হইত। মোজাজুতার প্রচলন ছিল না; মুসলমানেরা নাগরী জুতার আমদানী করিয়াছিলেন। রৌদ্র-বৃষ্টির জন্য তালপত্রের ছত্র ব্যবহৃত হইত। একটি টাকার মধ্যে একজন সাধারণ ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ হইত। চাদরটি কোচাইয়া কখনও কাঁধে ফেলা হইত এবং কখনও মাজায় বাঁধা হইত; শীতকালে ঐ চাদরের উপর শাল জামিয়ার গায়ে দেওয়া হইত। শাল, জামিয়ার ও বনাত ধনীদিগের শীতবস্ত্র ছিল; উহার একখানি কিনিলে ৩।৪ পুরুষ চলিত। গায়ে লাগিয়া ময়লা হইবার ভয়ে উহার নিম্নে একটি চাদর ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে দোপাট্টা গায়ে দিত, কিন্তু কোচার কাপড়ের মত কিছুতেই শীতবারণ হইত না। লোকে দেব-পিতৃকার্য্যে

বা উৎসবে তসর, চেলি প্রভৃতি পট্টবস্ত্র ব্যবহার করিত। গুরুঠাকুরেরা শিষ্যবাড়ী যাইবার সময় পট্টবস্ত্রই পরিতেন; কেহ কেহ রক্তবস্ত্রই অধিক পছন্দ করিতেন। বালক-বালিকারা শীতকালে অঙ্গরাখা বা আঙ্গা এবং ছিটের দোপরদা দোলাই গায়ে দিত, গরিব সন্তানেরা পরিধানের ধুতিখানি ভাঁজ করিয়া গায়ে দিত; কাঁথাও শীতনিবারণের প্রধান উপায় ছিল। সধবা স্ত্রীলোকেরা লালপেড়ে শাড়ী পরিতেন, পাঠান-আমলে ডুরে কাপড় আসিয়াছিল কিন্তু পাছাপা'ড় হয় নাই। যশোহর-খুল্‌নার পূর্ব্বার্দ্ধের স্ত্রীলোকে দোবেড়া কাপড় পরিত, কুশদ্বীপে সে পদ্ধতি ছিল না। কাপড়ের আঁচল বা অন্য ভাঁজ করা কাপড় ব্যতীত স্ত্রীলোকের বিশেষ শীতবস্ত্র ছিল না। উষ্ণীষ না বাঁধিয়া কোন ধর্ম্মকার্য্য করা হইত না, ব্রাহ্মণেরা দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার সময়ও উষ্ণীষ বাঁধিতেন। অন্য জাতিও তাহার অনুকরণ করিত। মুসলমানেরা পাগড়ী বাঁধিতেন; তাঁহারা অনেক সময়ে পাগড়ী বদল করিয়া হিন্দুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেন; এইরূপে "পাগড়ী বদল ভাই" হইত।

পাঠান-রাজত্বকালে মুসলমানী কায়দা অনেক হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরাও দাড়ি রাখিতে এবং কেহ কেহ বা ইজার পরিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই একটি পারসী বয়েদ না জানিলে ভদ্র-মজলিসে পসার হইত না। কাহাকেও গালাগালি দিবার কালে পারসী ভাষায় গালি দিয়া বলদর্প দেখান হইত! দাঁতে মিশি ও চক্ষুতে সুরমা দেওয়া ক্রমে সংক্রামক হইতেছিল। দাড়ি রাখার পদ্ধতি ক্রমে এত বিস্তৃত হইতেছিল যে, মুসলমান হইতে পৃথক্ বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য শ্মশ্রুধারীরা ব্রাহ্মণ হইলে টীকি, পৈতা ও তিলক, অন্য জাতিরা তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মালা বা টীকি সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিয়া রাখিতেন। বৈদ্যগণ কপালে তিলক, মস্তকে উষ্ণীষ ও স্কন্ধে বৈদ্যকগ্রন্থ লইয়া রোগীর বাড়ীতে যাইতেন। মোল্যাগণ এবং অন্য মুসলমানেরা নমাজ পড়িবার সময় কাছা দিতেন না; কিন্তু হিন্দুরা ইহা ভালবাসিতেন না। তাঁহারা মুসলমানদিগকে "কাছাখোলা" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। অধ্যাপকগণ মুক্তকচ্ছ হইলে বিষয়-জ্ঞানবিহীন বলিয়া উপহসিত হইতেন।

এযুগে হুক্কায় তামাক খাওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে নস্য অনবরত চলিত। নস্যহীন বা পৈতাহীন একই প্রকার অসম্ভব কথা

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বৈদ্যেরাও নস্যসেবী ছিলেন। এদেশীয় বৈদ্য কায়স্থ বা অন্য কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির পৈতা ছিল না। মদ্যপায়ীর সংখ্যা কম ছিল, তবে হাটেবাজারে মদ্য বিক্রয় হইত। তথায় বেশ্যারা বাস করিত। গৃহস্থের ঘরে সতীলক্ষ্মী দেবতার মত পূজিত হইতেন। অনেক স্ত্রীলোক "সহমরণ" যাইতেন; বিধবারা হিন্দু-গৃহে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; দেব-সেবা ও অতিথি-সেবার ভার এবং সংসারের কর্তৃত্ব দিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট ও কার্য্যনিরত রাখা হইত। ইঁহারা চুল কাটিয়া বিলাস-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন; তাঁহাদের অনেকেই রোগ হইলে ঔষধ খাইতেন না। সধবারা চুলে বেণী, লোটন প্রভৃতি নানাবিধ খোঁপা বাঁধিত; কঙ্কণ, বলয়, হার ও নথ পরিত; পাঠান-আমলে চুড়ী, পৈছা, ঝুমকা, গোট প্রভৃতি গহনারও প্রবর্ত্তন হইতেছিল। পুরুষেরাও অনেকে লম্বা চুল রাখিত ও স্ত্রীলোকের মত বাঁধিয়া রাখিত। পাঠান-আমলে লাঠিয়ালেরা "বাবরী" (স্কন্ধ পর্য্যন্ত দোদুল্যমান) চুল রাখিত।

হাটে বাজারে রাজা বা জমিদারের লোক থাকিত; তাহারা রাজস্ব আদায় করিত; ওজনের বাটকারা পরীক্ষা করিত ও বিবাদ মিটাইত। চৌকিদারেরা পাহারা বা চৌকী দিত, সংবাদ লইয়া মণ্ডল বা পঞ্চায়তের নিকট যাইত, এবং তাহাদের আজ্ঞা প্রজাদিগকে জানাইত। গ্রামের মধ্যে নাপিত ক্ষুর, ভাড় ও দর্পণাদি লইয়া ক্ষৌরী করিয়া বেড়াইত, আবশ্যক মত অস্ত্র-চিকিৎসাও করিত, বরের সহিত দর্পণাদি লইয়া বিবাহবাড়ী যাইত। নাপিতই ছিল গ্রামের গল্প-গুজব ও গুপ্ত সংবাদের ভাণ্ডার, সে রামের কথা শ্যামকে বলিয়া বেশ আসর জমাইত এবং সময়ে সময়ে বিবাদ বাধাইয়া দিত। তহশীলের কার্য্য প্রায় কায়স্থ-দিগেরই একচেটিয়া ছিল; তাহারা হিসাব নিকাশে যেমন দক্ষ, শাসন দমনে তেমনি সমর্থ, পরের নিকট হইতে ছলে-বলে বা সদ্ভাবে পয়সা আদায় করিতেও তেমনি মজবুত। পুরোহিতেরা যেমন যজমানের সাতপুরুষের মৃত্যুতিথি ঠিক রাখিয়া সময় মত পিতৃকার্য্য করাইয়া আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতেন, তেমনই সময় অসময়ে সন্ধান লইয়া কায়মনোবাক্যে যজমানের বিপদ্ উদ্ধার করিয়া দিতেন। স্ত্রীলোকেরা চিড়া কুটিত, খই ভাজিত এবং ধান ভানিত। মুড়ি সে সময় ছিল না।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে কাঠের সিন্ধুকই প্রধান গৃহসজ্জা ছিল। উহার ভিতরে

জিনিসপত্র থাকিত, রাত্রিতে উহার উপর শুইবার বিছানা পড়িত। ইহা হুড়কা ও প্রকাণ্ড কুলুপ দিয়া বন্ধ থাকিত। গরিব লোকে ঘরের মধ্যস্থলে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার ভিতর জিনিষপত্র রাখিয়া উপরে বিছানা পাতিয়া শুইত। চোরের ভয় কম ছিল না। সাধারণ লোকে ভাত খাইবার জন্য থালা অপেক্ষাও পাথরের পাত্র অধিক ব্যবহার করিত; পিত্তলের ঘটী ও গাড়ু, কাঁসার বাটী ও ফেরুয়া ব্যবহৃত হইত; মুসলমানেরা বদনা ও আবখোরা প্রভৃতি চালাইয়াছিলেন। হিন্দুরা তাম্রনির্ম্মিত পূজার সাজ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তামার কোন পাত্র সাধারণ সাংসারিক কাজে লাগাইতেন না। মুসলমানেরা তামার বদনা তাঁহাদের জাতীয় চিহ্নের মত করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নূতন মুসলমান ধর্ম্ম লইতেন, তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি বদনা টাঙ্গান থাকিলে লোকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিত। মুসলমানেরা বড় বড় তামার ডেক কালাই করিয়া ব্যবহার করিতেন; হিন্দুদের ছিল পিত্তলের হাঁড়ি এবং বহু কার্য্যে বহুভাবে ব্যবহৃত বহুগুণা বা বগুণা। হুসেন সাহের গৌড়ে ধনীরা স্বর্ণপাত্রে পান ভোজন করিবার প্রবাদ থাকিলেও তেমন ভাগ্য দীনা যশোহর-খুল্‌নার লোকের হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কারণ, গ্রাম্য লোকের দিন স্বভাবজাত সুলভ দ্রব্যে সুখে চলিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাঁহারা বাহিরের অর্থ আনিয়া অনর্থক বিলাস-বিভ্রাটে সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিবার অবসর পাইতেন না। পরবর্ত্তী যুগে যখন বঙ্গের চক্ষু যশোরে নিপতিত হইয়াছিল, তখন যশোর গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে সে যুগের কথা বলিব।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

(ক) সুন্দরবনের বিনষ্টনগরী নলদী (৮৫ পৃঃ)

সুন্দরবনের পাঁচটী বিনষ্ট সহরের মধ্যে নলদী (Noldy) একটী। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে নলুয়া নদীর তীরে যে নলুয়া নামক স্থান আছে, উহাকেই আমরা নলদী বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ঠিক সেই স্থানটীই নলদী না হইতে পারে। কিন্তু উহার সন্নিকটে সুন্দর বনের সেই অংশে যে প্রাচীন সহর নলদী ছিল তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে খুল্‌নার সুপণ্ডিত রেণী সাহেব ফরাসী পণ্ডিত কার্টামবার্ডের নিকট হইতে তিনখানি প্রাচীন মানচিত্রের প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সসন (N. Sauson) কর্ত্তৃক ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত মানচিত্রখানি তিনি বিনষ্ট নগরী বাঙ্গালার প্রাচীন বিবরণ দিবার জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "মুখার্জ্জির ম্যাগাজিন" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। উক্ত ম্যাপে নলদীর অবস্থান রহিয়াছে। নলদীর উত্তরে বিস্তীর্ণ বুড়ন পরগণাও আছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি ভাগীরথী ও মধুমতীর মোহনার মধ্যবর্ত্তী সুন্দরবনের কোনস্থানে বিস্তীর্ণ দ্বীপে নলদী নামক প্রাচীন সহর ছিল। প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা সহরও যেমন অকস্মাৎ জলমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল, হয় ত নলদীর ভাগ্যেও তদ্রূপ হইয়াছে। এখানে সসনের ম্যাপের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

Taken from the chart of the EMPIRE of the GRAND MOGULS, by N. SAUSON, 1652.
Mookerjee's Magazine, New series, Vol. I P. 345.

পরিশিষ্ট।

(খ) বংশাবলী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কর্ণসেনী দেববংশ।

১। সুরদেব (কণ্টকদ্বীপ)
|
২। দনুজারি
|
৩। হরিদেব (পাণ্ডু নগর)
|
৪। নারায়ণ
|
পুরন্দর — ৫। পুরুজিৎ
|
৬। আদিত্য
|
৭। দেবেন্দ্র — ক্ষিতীন্দ্র
|
৮। মহেন্দ্র দেব (১৪১৪—১৭)
|
৯। দনুজমর্দ্দন দেব [চন্দ্রদ্বীপ, রাজধানী কচুয়া]
|
১০। রমাবল্লভ দেব
|
১১। কৃষ্ণবল্লভ দেব
|
১২। হরিবল্লভ দেব
|
১৩। জয়দেব
|
১৪। কন্যা কমলা = বলভদ্র বসু
|
১৫। পরমানন্দ রায়।

১৫। পরমানন্দ রায়

১৬। জগদানন্দ রায়

১৭। কন্দর্পনারায়ণ রায় [বারভূঞার অন্যতম, রাজধানী, মাধবপাশা।]

১৮। রামচন্দ্র রায় [প্রতাপাদিত্যের জামাতা]

১৯। কীর্ত্তিনারায়ণ — ০

১৯। বাসুদেব

২০। প্রতাপনারায়ণ

২১। প্রেমনারায়ণ

২২। বিমলা = গৌরীচরণ মিত্র মজুমদার

২৩। উদয়নারায়ণ — রাজনারায়ণ (প্রতাপপুর)

২৪। শিবনারায়ণ = দুর্গারাণী

লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যু ১৭৮০ — ২৫। জয়নারায়ণ

২৬। নৃসিংহনারায়ণ

২৭। বীরসিংহ নারায়ণ — ২৭। দেবেন্দ্রনারায়ণ

২৮। যোগেন্দ্রনারায়ণ (জীবিত ৫০)

২৮। উপেন্দ্রনারায়ণ (জীবিত ৪৪) — ২৮। ভূপেন্দ্রনারায়ণ (জীবিত ৪০)

রূপ সনাতনের বংশ-লতিকা।
জগদ্‌গুরু।
[কর্ণাটদেশীয় রাজা]
অনিরুদ্ধ দেব
রূপেশ্বর
[কনিষ্ঠ কর্তৃক তাড়িত হইয়া পৌলস্ত্যদেশে বাস করেন]
হরিহর
[জ্যেষ্ঠকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটে রাজা হন]
পদ্মনাথ
[নৈহাটিতে বাস করেন]
পুরুষোত্তম
জগন্নাথ
নারায়ণ
মুরারি
মুকুন্দ
কুমার [ইনি ফতেহাবাদ সরকারে বাস করেন]
সনাতন গোস্বামী
[সাকর মল্লিক]
রূপ গোস্বামী
[দবীর খাস]
বল্লভ বা
অনুপম
জীব গোস্বামী

গুড় বংশ।

১। দক্ষ
২। ধীর গুড়
৩। বিকর্ত্তন
৪। শারণ
৫। কুশধ্বজ
৬। শ্রীদত্ত
৭। ভবদত্ত (বামন খাঁ)
৮। কার্ত্তিক পণ্ডিত
৯। রঘুপতি আচার্য্য (কনকদণ্ডী)

- ১০। রমাপতি
  - ১১। সর্ব্বানন্দ
  - জ্ঞানানন্দ
    - ১২। জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
      - ১৩। নাগরনাথ রায় (দক্ষিণ ডিহি)
      - দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরী (দক্ষিণ ডিহি)
        - কামদেব (কামলউদ্দীন খাঁ চৌধুরী)
        - জয়দেব (জামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী)
        - রতিদেব
        - ১৪। শুকদেব (প্রথম পীরআলি)
  - প্রেমানন্দ
  - অমৃতানন্দ সরস্বতী (সন্ন্যাসী)
- কাশীপতি
- গণপতি

(১৪) শুকদেব।
(প্রথম পীরআলি)
১৫। গৌরীদাস
শ্যামসুন্দর
কালাচাঁদ
মহেন্দ্র দেব
সায়ণাচার্য্য (দত্তক)
কাত্যায়ন
গঙ্গাধর
১৬। নরেন্দ্র দেব
সায়ণাচার্য্য
১৭। শরণাচার্য্য
হরিবল্লভ
(হল্‌দা মহেশপুর)
১৮। রমাবল্লভ
(দক্ষিণডিহি)
কৃষ্ণবল্লভ
১৯। বলভদ্র
২০। মনোহর লস্কর খাঁ চৌধুরী
("মুন্‌কে মনোহর")

২০। মনোহর লস্কর খাঁ চৌধুরী
(মুন্‌কে মনোহর)
২১। উপানন্দ
২১। শুভেন্দ্র
২২। রামগোবিন্দ
রামচন্দ্র
২২। বিদ্যাধর
২২। মধুসূদন
ভবানীচরণ
(বুঞ্চকারা)
রামানন্দ
২৩রামানন্দ
২৩রামগোপাল
২৩রামকৃষ্ণ
২৩রামদাস
২৩ জগদানন্দ
(জগন্নাথপুর)
২৩ রূপরাম
(মহাকাল)
২৩ দুর্গারাম
(সেখহাটি)
অন্য চারিপুত্র
২৩। রামকান্ত
২৪। রামানন্দ
২৫। তারাচাঁদ
২৬। মহেশ
২৭। দীননাথ
পূর্ণানন্দ
সর্ব্বানন্দ
পরমানন্দ
দুর্গাপ্রসাদ
দ্বারকানাথ
২৪। রামদুলাল
২৫। দেবীপ্রসাদ
২৬। রামমোহন
২৭। মহেন্দ্র (ঘোপের ঘাট)
২৮। ইন্দুভূষণ
২৯। প্রফুল্ল

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড—মোগল ও ইংরাজ রাজত্ব।

(সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রস্থ হইতেছে)

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

উচ্ছ্বাস—ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী। ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভাষার লালিত্য এবং রচনার ওজস্বিতায় অতুলনীয়। পড়িতে পড়িতে পাঠককে ভাবে অনুপ্রাণিত, চমকে রোমাঞ্চিত ও আবেগে আত্মহারা হইতে হইবে। কলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালাভাষা শিখিবার উপযুক্ত পুস্তক। আত্মীয় স্বজনকে উপহার দিবার সুন্দর গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা এবং স্বর্ণাক্ষরে সুন্দর বাঁধাই. মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

ধম্মপদ—পালিভাষায় লিখিত "ধম্মপদ" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থের আক্ষরিক পদ্যানুবাদ। ধম্মপদকে বৌদ্ধগীতা বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রের সূত্রপিটকের যাবতীয় ধর্ম্মনীতি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়। এরূপ অসংখ্য উদার-নীতিমালার একত্র সমাবেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই নীতিসমূহ সার্ব্বজনীন; উহা সকল ধর্ম্মের সকল লোকের পাঠ্য। বঙ্গদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এই অপূর্ব্বগ্রন্থ সহজ ও সরল কবিতাকারে ভাষান্তরিত হইয়াছে। প্রারম্ভে গ্রন্থকার একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় ধম্মপদের সঙ্কলন, প্রচার ও দেশ দেশান্তরে প্রতিপত্তিলাভের সুন্দর ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন।

পালি ও তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষার ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয় স্বয়ং একটি জ্ঞানগর্ভ উপক্রমণিকা লিখিয়া এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। পালি বা সংস্কৃত না জানিলেও সকলেই এই পুস্তক বুঝিতে ও নীতিমালা কণ্ঠস্থ করিতে পারিবেন। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। কাপড়ে বাঁধা ও সোণার জলে লেখা, মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রতাপসিংহ—মিবারাধিপতি মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনবৃত্ত। স্কুলের ছাত্রগণের পাঠের উপযুক্ত। ভাষার গুণে ইতিহাসও কিরূপে সরস সুখপাঠ্য হয়, ইহাতে তাহা দেখান হইয়াছে। মহারাণার চিত্র-সংবলিত। মূল্য ।৵০ মাত্র।

"প্রতাপসিংহ" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

BENGALEE—The author has narrated the incidents in language which is dignified as his theme. The book contains a neatly executed portrait and ought to find an extensive sale.

A. B. PATRIKA—Though the life of Pratap Singha itself is an attractive subject, it has however received additional beauties at the master hands of Satish Babu. We hope the life of Pratap Singha will he extensively read in this country to form an object lesson for the already fallen race.

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—প্রতাপসিংহের জীবনচরিত ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণপ্রিয় বস্তু। মিত্রমহাশয় আজ সেই বস্তুকে সুচারু চরিতাখ্যানরূপে সর্ব্বজনপাঠ্য করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কবিচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ—"ইতিহাস-বিশ্রুত এক একটি প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত ইতিহাসকে ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলে, তবেই ইতিহাস পাঠ ছাত্রদের পক্ষে আনন্দজনক ও সার্থক হয়। আপনার প্রকাশিত "ভারত প্রতিভা" গ্রন্থাবলী সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আপনার সাধু চেষ্টাকে সফল করিবে, এই আমি আশা করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রত্যেক বালকের হস্তে থাকা উচিত।"

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়—"এই গ্রন্থ আমরা বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের হস্তে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

পণ্ডিত সখারাম গণেশদেউস্কর—"পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে এ পুস্তকের অভাব ছিল। মহাশয় তাহা পূর্ণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

বঙ্গবাসী—"গল্পচ্ছলে লিখিত প্রতাপের জীবনী পড়িতে বেশ মিষ্ট হইয়াছে।"

বসুমতী—"ছেলেদের পড়াইতে হইলে এই প্রকার পুস্তকই পড়াইতে হয়।"

হিতবাদী—"সংক্ষেপে সরল ভাবে বিবৃত ঈদৃশ চরিতাবলী শিশুদিগের চরিত্রগঠনে ও ভাষার পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।"

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,
৬৭ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।